অনির্বাণের চিঠি
৯৩৬৭

Librarian
Uttarpara Joykrishna Public Library
Govt. of West Bengal

শনিবারের চিঠি
২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Gift No. ......5469. Date 19/6/05

মুখবন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অভিযোগ

অনেক দিন হইতে লোকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষায় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, ছাত্রেরা 'মানুষ' হইতেছে না, তাহাদের নিজের মনন-শক্তি নাই, কেতাবে যাহা পড়ে তাহা আবৃত্তি করে, ইংরেজের যাহা দেখে তাহা অনুকরণ করে। কেহ বলিতেছেন, ছাত্রেরা নাস্তিক ও চার্বাকী হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, বি. এ, এম. এ, বি. এস্.-সি, এম. এস্.-সি পাস হইয়াও যুবকদিগকে শিক্ষার নিমিত্ত দলে দলে বিলাত দৌড়াইতে হইতেছে কেন? শিক্ষা যে ভাল হইতেছে না তাহার প্রমাণ, ভারতরাজের অধীনে কর্মপ্রার্থী বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক যোগ্যতা-পরীক্ষায় অন্য প্রদেশের প্রার্থীদের নিকট পরাজিত হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, প্রাপ্তোপাধি যুবক সংসার চালাইবার উপযোগী জ্ঞান পাইতেছে না; কেরানী-গিরি ও মাষ্টারি তাহাদের একমাত্র গতি। শিক্ষা দেশ ও কালোপযোগী হইতেছে না।

যুদ্ধের পর হইতে প্রাপ্তোপাধি যুবকদের চরিত্রে বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া অনেকে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, কেহ দেশের নেতা হইয়া দল বাঁধিতেছেন, কেহ বা নূতন নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু অতি অল্প লোকের সত্যনিষ্ঠা আছে। অধিকাংশ ধন ও মানের লালসায় ধর্মজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়াছেন। যতদিন ব্রিটিশ শাসন ছিল, ততদিন দুষ্প্রবৃত্তি চাপা পড়িয়াছিল। দুই বৎসর হইল দেশশাসন দেশের লোকের আয়ত্ত হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কলেজের ছাত্রেরা এখন দুর্বিনীত হইয়াছে, কাহারও শিষ্যত্ব স্বীকার করে না। কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিতেছে, অধ্যক্ষদের ঘরের দুয়ারে হত্যা দিতেছে। আর, ইহাদেরই মধ্যে

কতক কিছু না পড়িয়া, কিছু না বুঝিয়া, কিছু না ভাবিয়া আপাত-সুখের আশায় কম্যুনিস্ট সাজিতেছে। কেন তাহাদের এইরূপ প্রবৃত্তি হইতেছে? এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে সহজেই মনে হয়, শিক্ষার দোষ ঘটিতেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার কলেজ ও ইস্কুলের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে।

বর্তমানে বঙ্গের তথা ভারতের এক যুগসন্ধি-কাল। এতদিন ভারতভূমি ব্রিটিশ শাসনে ছিল, ব্রিটিশ জাতির অনুকরণে সর্ববিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, সামাজিক ব্যবহার ও চিন্তাধারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চলিয়াছিল। এখন আমাদিগকে জীবনের প্রত্যেক বিষয় ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কি করিলে আমাদের শুভ হইবে, কোন্ ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হইতে পারে, দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমরা কোন্ পথে অগ্রসর হইতে পারি, ইত্যাদি নানাবিধ গভীর প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সমন্বয় কথার কথা নয়, কেবল পাণ্ডিত্যের কথাও নয়। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মিলিত হইয়া প্রশ্নটি সম্যক ধ্যান করিয়া সমাধানের চেষ্টার প্রয়োজন নানা পুস্তক রচিত হইতেছে, কিন্তু এই প্রশ্নের সমগ্র মীমাংসা সম্বন্ধে কোনও পুস্তক রচিত হয় নাই। পূর্বকালে ভারতে কি ছিল, ধর্ম-অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের কি প্রকার সাধনা ছিল, ইতিহাসে তাহার নিদর্শ পাইতেছি। কিন্তু বর্তমান কালে কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কে সমগ্রভাবে বিচার করেন নাই। এক্ষণে কালের গুণে ইহার পরিবর্ত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কে দেশের সম্মুখে দীপ ধরিয়া পথ দেখাইবে বিশ্ববিদ্যালয় নানা বিষয়ের বহু বিদ্যা প্রচার করিতেছেন, কিন্তু খণ্ডিত কে সে সকল সংযুক্ত করিয়া সূত্র নির্মাণ করিবে? বিশ্ববিদ্যালয় দেশে জ্ঞানী ও গুণীর বৃহৎ সমাজ। তিনিই এ প্রশ্ন সমাধানের যোগ্য পাত্র আমি এখানে কতকগুলি প্রশ্নের উল্লেখ করিতেছি এবং যথাজ্ঞান আমা উত্তর লিখিতেছি।

ভারতরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কারে উদ্যোগী হইয়া এ কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় ও বিদেশীয় বড় বড় পণ্ডি

ও অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী সদস্যেরা ইস্কুল-কলেজে প্রদত্ত শিক্ষার দোষ ও ত্রুটির প্রতিবিধানের উপদেশ দিবেন।* ইতিমধ্যে আমার অভিজ্ঞতার ফলে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিয়াছি, তাহা লিখিতেছি।

পূর্বেকার ইস্কুল-কলেজে পড়াশুনা

লেখাপড়া সম্বন্ধেও অনেক ভাবিবার আছে। আমি ছয় বৎসর ইংরেজী ইস্কুলে ও পাঁচ বৎসর কলেজে পড়িয়াছি, এবং কলেজের পাঠ সমাপ্তি মাত্র অন্য কলেজে ৩৬ বৎসর বিজ্ঞানের শিক্ষকতা করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে আমার পাঠ্যাবস্থা সমাপ্ত হইয়াছে। সেকালের সহিত একালের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। পাঠ্যাবস্থায় আমরা রাজনীতি কাহাকে বলে তাহাই বুঝিতাম না। যখন কলেজে পড়ি তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি বাগ্মী ছিলেন। সুবিধা হইলে আমরা ইঁহাদের বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। পরে বক্তৃতার বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে আলোচনাও করিতাম। কিন্তু এই পর্যন্ত।

আমাদের নিত্যকর্ম ছিল, কোন দিকে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইত না। কদাচিৎ সংবাদপত্র পড়িতে পাইতাম। ইদানীর ছাত্রদের তুলনায় আমরা নির্বোধ ছিলাম। ইস্কুলে পড়িবার সময় আমাদের পাঠ্য অল্প ছিল। ইংরেজীতে দুইখানি ব্যাকরণ, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়িয়াছি। ছোট একখানি ইংরেজী ভূগোল এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িয়াছি। ইতিহাসও একখানি। সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ পর্যন্ত পড়িয়াছি। সমুদয় পাটীগণিত, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, পরিমিতি, এ সকলের পরিমাণ অল্প ছিল না। এনট্রান্স্ পরীক্ষার জন্য কোন ইংরেজী পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল না। এক এক ইস্কুলে এক এক পুস্তক পড়া হইত। নোটবই, হিন্ট্ ইত্যাদির নামগন্ধও ছিল না। আমরা ইংরেজী অভিধান দেখিয়া শব্দের অর্থ শিখিতাম; আর ইস্কুলের বড় অভিধান দেখিয়া ইংরেজী বাক্যাংশের অর্থ মুখস্থ করিতাম। আমরা ইংরেজী ভাষা মন্দ শিখি নাই। ইংরেজী রচনায় বানান ভুল ও ব্যাকরণ

* কমিশনের সিদ্ধান্ত বাহির হইবার কয়েক মাস পূর্বেই এই প্রবন্ধ রচিত হয়।

ভুল করিতাম না। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের নিমিত্ত ব্যাকুল হই নাই। এনট্রান্স্ পরীক্ষার নিমিত্ত বর্ধমান হইতে চুঁচুড়া যাইতে হইয়াছিল। নূতন স্থান দেখিয়া আমাদের মনে অল্প চাঞ্চল্য আসিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার নিমিত্ত কিছুমাত্র উদ্‌বেগ হয় নাই। পরীক্ষা দিয়া অন্য এক স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কবে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে, তাহা জানিবার আগ্রহ ছিল না। পরীক্ষার ফল সংবাদপত্রে ছাপা হইত। যখন পুরান হইয়া গিয়াছে, তখন একদিন দৈবাৎ দেখি, আমি পাস হইয়াছি। ইদানীর ছাত্রদের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। অমুক মাসে অমুক দিন পরীক্ষা হইবে, আর কতদিন আছে? কে পরীক্ষক? তিনি সদয় কি নির্দয়? প্রশ্ন কঠিন হইবে কি সহজ হইবে? ইত্যাদি আলোচনা দুই তিন মাস ধরিয়া অবিরাম চলিতে থাকে। কলেজে পড়িবার সময় আমরা এইরূপ আলোচনা করিতাম না। কে পরীক্ষক জানিতাম না। আর কোন্ প্রশ্নের কত নম্বর তাহাও প্রদর্শিত হইত না। এখন ইস্কুলে বালকদিকে অনেক বই পড়িতে হয়। কেবল ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের নিমিত্ত কত বই পড়ে তাহা ভাবিলে মনে হয়, কর্তাদের বিবেচনায় যত বই পড়িবে তত বিদ্যা হইবে। এক ইংরেজীর জন্য পাঁচ-ছয়খান বই পড়িতে হয়; তদুপরি সুবৃহৎ নোটবই। এত আড়ম্বর সত্ত্বেও ছাত্রেরা কলেজে আসিলে প্রোফেসররা বলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ছাত্রেরা বুঝিতে পারে না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা

ছাত্রদের অবিনয়

ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের অবিনয় এক অভাবনীয় ব্যাপার। একদিন সন্ধ্যাবেলায় এখানকার জেলা-ইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত মহাশয় বই হাতে বাড়ি ফিরিতেছিলেন।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

"কর্মভোগ করিতেছিলাম। ছেলেরা মাঠে খেলিতেছিল, আমাকে

সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। আজ আমার পালা ছিল। নিকটে দাঁড়াই নাই, কি জানি কে বিড়ী টানিয়া আমার মুখের দিকে ধুঁয়া ছাড়ে। আমি দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আর বিড়ী টানিতে দেখিলে পাশ ফিরিতাম, যেন দেখিতে পাই নাই। এই কয়টা দিন কাটাইতে পারিলে পরিত্রাণ পাই।"

বাঁকুড়া জেলা-ইস্কুল রাজ-পরিচালিত। উপযুক্ত শিক্ষক আছেন, সেখানেই এই অবস্থা! আর, যে সব ইস্কুল ও কলেজ ছাত্রবেতনে চলিতেছে, সে সকলে ছাত্রদের বিনয়ের (discipline) একান্ত অভাব। ছাত্রেরা জানে, তাহাদের বেতনে শিক্ষকেরা প্রতিপালিত হইতেছেন। শিক্ষকমহাশয়েরাও দুষ্ট ছেলেকে তাড়াইয়া দিতে শঙ্কিত হন, কখন কোথায় তিনি অপমানিত হইবেন।

ধর্মঘট

এখন ছাত্রেরা শিক্ষকদিকে বলে, "আমাদের অধিকারে হাত দিবেন না। কাল ছুটি দিতে হইবে।" অধ্যক্ষ বলেন, "কাল ছুটি দিবার কথা নয়।" পরদিন পাঁচ ছয় জন কলেজের গেটে মাটিতে শুইয়া পড়িল, কেহ তাহাদিকে মাড়াইয়া যাইতে পারিল না। বিনা রণোদ্যমে পাঁচ ছয় জন ছাত্র দ্বারা পাঁচ ছয় শত ছাত্রের কলেজে ছুটি হইয়া গেল। "পরীক্ষা দিব না।" ব্যস্। "অমুক অমুক ছাত্রকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাদিকে পুনর্বার কলেজে ভর্তি করিতে হইবে।" অধ্যক্ষ অসম্মত। পরদিন কয়েকজন ছাত্র কলেজবাড়ীর বারাণ্ডায় অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিল অর্থাৎ হত্যা দিয়া পড়িল। পূর্বে দুরারোগ্য রোগ হইলে লোকে ঠাকুরের দুয়ারে হত্যা দিত, এখনও দেয়। কভু কদাচিৎ গ্রামে ন্যায্য পাওনা আদায় করিবার নিমিত্ত অধমর্ণের দুয়ারে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু আত্মহত্যার ভয় দেখাইত না। যতপ্রকার শাসন আছে, তন্মধ্যে এই শাসন চরম। এখন ইহা ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক হইয়াছে। এই সে বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র কর্তৃপক্ষের পথরোধ করিয়া পড়িয়া ছিল। কর্তৃপক্ষ ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। ছাত্রেরা হত্যা দেওয়ার অর্থ বুঝে না। বুঝে না, যাহার দুয়ারে হত্যা দিতেছে তিনি দয়াল ও ছাত্রবৎসল;

তিনি কখনও ছাত্রের মৃত্যু দেখিবেন না। এই বিশ্বাস থাকে বলিয়াই হত্যা দেয়। যাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছ, তাঁহার নিকট কৃপাপ্রার্থী হওয়া লজ্জাকর নয় কি? হত্যা দেওয়া পুরুষোচিত নয়, ইহা নারীত্বের লক্ষণ। ইহারই নামান্তর "বালানাং রোদনং বলম্।" অন্যথা, কাল যাঁহাকে অপমান করিয়াছে, যাঁহার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, যাঁহাকে গৃহরুদ্ধ করিতে ইতস্তত: ভাবে নাই, আজ তাঁহার নিকটে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার বাৎসল্য প্রত্যাশা করিতে পারে? শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্মঘট এক সম্পূর্ণ কৃত্রিম অভিনয়। স্বাভাবিক হইলে ইউরোপ ও আমেরিকায় এই প্রকার ধর্মঘট দেখা যাইত। সেখানে নাই, এখানে কেন আছে?

তথাপি রাজ-পরিচালিত ইস্কুল-কলেজে ধর্মঘট প্রায় হয় না যে সকল ইস্কুল ও কলেজে মাছের তেলে মাছ ভাজা হইতেছে, সেখানেই ধর্মঘট হইতে দেখা যায়। ছাত্রেরা সেখানে দুর্বিনীত ও অসহিষ্ণু হয়, তাহাদের মোড়লও জুটে। ইস্কুল-কলেজের দোষও থাকে। হয়ত উপযুক্ত শিক্ষক নাই, গ্রন্থশালা নাই, বিজ্ঞানের ছাত্রদের কর্মাভ্যাস-শালা নাই, কর্মাভ্যাস-সামগ্রী নাই। ছাত্রেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবহেতু কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের 'দাবি' মিটাইতে পারেন নাই। সেখানে ছাত্রদের ধর্মঘট ন্যায্য মনে করি। তথাপি হত্যা দেওয়া গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করা উচিত।

স্বাধীনতার ভ্রান্ত ধারণা

ইস্কুলের এক বালক তাহার পিতাকে বলিল, "আমার অধিকারে হাত দিবেন না।" সে বাহিরে বাহিরে ঘুরে, যথাসময়ে বাড়ী আসে না, মন দিয়া পড়েও না। পিতা ভর্ৎসনা করিলেন, পুত্র কোথায় চলিয়া গেল। দেখা নাই, মাতা ব্যাকুল, পিতা ব্যতিব্যস্ত হইয়া এখানে ওখানে খুঁজিতে লাগিলেন। পরে তাহাকে পাওয়া গেল, কিন্তু পিতা-মাতার শাসনের বাহিরে চলিয়া গেল। এখন ছাত্রেরা কথায় কথায় বলে, "স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।" এই বুলি তাহাদের যে কত অনিষ্ট করিতেছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অরণ্যে স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার, সমাজে নয়। এখানে স্বাধীনতা

সীমাবদ্ধ। নিষেধ মানুষকে সংযত করে। সামাজিক শাসন ও রাজ-শাসন মানুষের মঙ্গলের জন্যই রচিত হইয়াছে। ছাত্রেরা এইরূপ উপদেশ পায় না। তাহারা জানে না, মানুষ তিন ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে—পিতৃঋণ, দেবঋণ ও ঋষিঋণ। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সূত্র। কোন্ আদ্যকালের পিতামাতা হইতে বংশপরম্পরাক্রমে তোমার জন্ম হইয়াছে। তোমার এই মনুষ্যজন্মের যাঁহারা কারণ, তাঁহাদিকে অস্বীকার করিতে, তাঁহাদের নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে পার কি? দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছ, কত সুখ ভোগ করিতেছ, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তার অন্বেষণ করিতেছ। যাঁহারা কারণ, তাঁহাদিকে শ্রদ্ধা করিবে না?

দ্বিতীয় ঋণ দেবঋণ। যে দেবের বিধানে তুমি জীবিত আছ, তুমি বাড়িতেছ, তুমি ধর্ম-অর্থ-কাম উপার্জন করিতেছ, তুমি সে দেবকে অস্বীকার করিতে পার? তিনি যে তোমার জীবনের কর্তা, কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? প্রত্যহ এই দেবঋণ মনে আসিবে না কি? অন্ততঃ মাঝে মাঝে এক-একদিন এই দেবঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে না কি?

ঋষিঋণ তৃতীয় ঋণ। তুমি কাহার জ্ঞান পাইয়া বড় হইয়াছ? কাহার জ্ঞান পাইয়া এত বিষয় চিন্তা করিতে পারিতেছ? কে সে জ্ঞান অর্জন করিয়া রাখিয়াছেন? কে তোমার গুরু? প্রত্যহ যে দিনযাপন করিতেছ, দিনচর্যা, রাত্রিচর্যা, ঋতুচর্যা, কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ? যিনি গুরু তিনিই ঋষি। তোমার পিতামাতা, তোমার শিক্ষক, তোমার নিকট ঋষিতুল্য। তুমি ঋষিঋণ অস্বীকার করিতে পার কি? তিনি অপ্রসন্ন হইলে তুমি জ্ঞানার্জন করিতে পারিবে কি?

সমাজের অসত্যের প্রাবল্য

বর্তমানে ছোট-বড় উচ্চ-নিম্ন সকল শ্রেণীর মধ্যে অসত্য প্রবল হইয়াছে। শ্রমিক উপযুক্ত বেতন পাইলেও যথাসময়ে যথাদিবসে আসে না, যখন ইচ্ছা হয় আসে। তাহার কাছে একটি লোক বসিয়া না থাকিলে পুরা কাজ করে না। আদালতে মকদ্দমা হু হু করিয়া

বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্বে দলিলের সাক্ষী পাওয়া যাইত না। সাক্ষী ভয় করিত, আদালতে যাইতে হইলে উকীল তাহাকে মিথ্যা কথা বলাইবে। এখন ইচ্ছা করিলেই যত ইচ্ছা তত সাক্ষী পাওয়া যায়, ইচ্ছা করিলেই সত্য সাক্ষীকে অদৃশ্য করিতে পারা যায়। যাহারা এই বুদ্ধি জানে তাহারা নিরক্ষর লোক নয়। কে চোরাবাজারের কারবার চালাইতেছে? কাহাদের চুরি ধরিবার জন্য নূতন পুলিস নিযুক্ত হইয়াছে? ইহাঁরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পাইয়াছেন। আর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাহ্বানের (convocation) সময়ে শুনিয়াছেন, চরিত ও ব্যবহার দ্বারা সে উপাধির যোগ্য হইতে হইবে। কে 'বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্কে'র টাকা চুরি করিয়াছিল? কে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের 'বঙ্গলক্ষ্মী মিল'কে উৎসন্ন করিয়াছিল? তাহারা অশিক্ষিত নয়। বাঙ্গালীর কত ব্যাঙ্ক 'ফেল' হইতেছে! সকল ব্যাঙ্ক বুদ্ধির দোষে 'ফেল' হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফল কি অসত্য প্রবঞ্চনা ও চুরিবিদ্যা শিক্ষা?

ছাত্রদের অবিনয়ের কারণ

যদি ছাত্র অবিনীত হয়, মাতা পিতা শিক্ষক ও অপর গুরুজনের অবাধ্য হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার শিক্ষা সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। বর্তমানে নানা কারণে ছাত্রেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশরাজশাসন ভঙ্গ করিতে গিয়া লোকে কোন শাসনই সহিতে পারিল না। সে সময়ে নেতারা রাজার শাসন অমান্য করিতে ছাত্রদিকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। রাজশাসনই গুরুতর শাসন; উহা ভাঙ্গিতে গিয়া সমাজশাসনও শিথিল হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও পরে নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে যে পৈশাচিক কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা সংবাদপত্রদ্বারা বঙ্গের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সেই অরাজকতার ফল বর্তমান ছাত্রদের মনেও মুদ্রিত রহিয়াছে। এই কারণে জনসাধারণের চিত্তচাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। ছাত্রেরাও তাহার আবর্তে পড়িয়াছিল। যুদ্ধ অবসান হইতে না হইতে অর্থলালসা সর্বগ্রাসী হইয়াছে। যাহাঁদিকে লোকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাহাঁদেরও তাই দুর্নাম প্রচারিত হইতেছে। যাহাঁরা নেতা সাজিতেছেন, তাহাঁরা

দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের ধন-মান-প্রভুত্বের নিমিত্ত অধিক বিবাদ করিতেছেন। দেশ স্বাধীন হইল; অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যাভাব উগ্রভাবে দেখা দিয়াছে। লোকে এই সকল চিন্তায় আকুল। কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর আর্থিক অবস্থা ফিরিয়াছে। কিন্তু যে মধ্যশ্রেণী সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহাদের দুর্দশার অবধি নাই। কন্যাদের বিবাহ হইতেছে না, উদরান্নের নিমিত্ত ঘরের বাহিরে গিয়া পরের দাসীবৃত্তি করিতেছে। এই অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা চঞ্চলমতি হইয়া কোনও প্রকার শাসন মানিতে পারিতেছে না। এই সকল অসন্তুষ্ট যুবক-যুবতীই কম্যুনিস্ট সাজিয়া মনে করিতেছে, রুষ দেশ পরম সুখে ও শান্তিতে আছে। কেহ তাহাদিকে বুঝাইয়া দেয় না, রুষ দেশের বজ্রশাসন তাহারা একদিনও সহিতে পারিত না। আর, সে কি জীবন, যে জীবন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম? একটা প্রাণহীন যন্ত্র? পশ্চিমের একটা দেশও শান্তিতে নাই। সে দেশের সভ্যতা আমাদের দেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে দেশ মনে করে, এই জীবনেই সব শেষ। অতএব সুখের আশায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে, মনে করিতেছে, ভোগেই সুখ। আমাদের দেশ বৈরাগীর দেশ ছিল না। বড় বড় নগর, বড় বড় পত্তন ও বাণিজ্যস্থান, বড় বড় অট্টালিকা, প্রাসাদ, কত মুক্তামাণিক্য, হীরক, হীরকের অলঙ্কার, কত প্রকার যুদ্ধাস্ত্র ও সমর-সজ্জা, ইত্যাদি সবই ছিল। লোকে কাম ভোগ করিত, কিন্তু ধর্মানুগত হইয়া করিত। অর্থ উপার্জন করিত, কিন্তু ধর্মানুগতভাবে করিত। ধর্ম অর্থ কাম, এই তিনের মধ্যে ধর্মই আদি। দেশে দস্যু-তস্কর ছিল কূটনীতি ও দুর্নীতিও ছিল, কিন্তু সত্য হইতে ধর্ম কখনও বিচ্যুত হয় নাই।

বিপ্লব দ্বারা সমাজতন্ত্র আসিবে না

সমাজ পরিবর্তনশীল। কিন্তু যে পরিবর্তন অল্পে অল্পে উপস্থিত প্রয়োজনানুসারে সাধিত হয়, সে পরিবর্তনই হিতকর হইয়া থাকে। বৈদিক-সমাজ উপনিষদের কালে ছিল না, উপনিষদের সমাজ মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ছিল না। কিন্তু বিপ্লব দ্বারা পরিবর্তন ঘটে নাই। সবাই বুঝিতেছি, একদিকে কুবেরের ধন, অন্যদিকে দারুণ দারিদ্র্য, এ অবস্থা কিছুতেই টিকিবে না। যৌথ কৃষিকর্ম আরম্ভ হইয়াছে; কোন

কোন ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে আসিতেছে; শ্রমিকের অভাব-অভিযোগ মিটাইতে মন্ত্রী মহাশয়েরা সর্বদা চেষ্টা করিতেছেন; ইত্যাদি নানা প্রকারে সমাজতন্ত্র অল্পে অল্পে আসিতেছে। ইহা কেহ রোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লব দ্বারা নয়। কম্যুনিস্টরা রাষ্ট্রবিপ্লব চায়।

বর্তমান ইতিহাস-পুস্তকে ভারতীয় সংস্কৃতির কোন উল্লেখ নাই

আমাদের ছাত্রেরা দেশের প্রকৃত ইতিহাস শুনিতে পায় না। ইতিহাসে পায়, অমুক জাতি এই দেশে বাস করিত, অমুক জাতি তাহাকে পরাজিত করিয়াছিল, অমুক বীর রাজা হইয়াছিলেন, অমুকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অমুকের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। তুর্কী, পাঠান, মোগল, ইংরেজ, ইহাদের শাসনবর্ণনায় ইতিহাস পূর্ণ। কদাচিৎ কোন ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম, ষড়্দর্শন, চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত ধারার পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না।

অচিরে দেশ-বহির্ভূত ও সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষার পরিবর্তন আবশ্যক

অন্য দিকে ইস্কুল, কলেজ, য়ুনিবার্সিটি বিদেশী। সে দেশে যাহা অল্পে অল্পে বহুকালে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে সব এ দেশে স্থাপিত হইয়াছে। সে দেশের জল বায়ু মৃত্তিকার গুণে যে বৃক্ষ স্বাভাবিকক্রমে জন্মিয়াছে, বাড়িয়াছে, ফলপ্রসূ হইয়াছে, সেই বৃক্ষ এ দেশে রোপিত হইয়াছে। এ দেশে সে বৃক্ষের ফল হইল না। বহুকষ্টে বৃক্ষের সেবা করিয়া জীবিত রাখা হইয়াছে, কিন্তু তাহার জীবন্তভাব নাই। এ বৃক্ষে কদাচিৎ ফল হইয়াছে। জ্ঞানী, বিদ্বান ও মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু নগণ্য। এই সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষা, দেশ-বহির্ভূত শিক্ষা অচিরে পরিবর্তিত করিতে হইবে। ইস্কুল, কলেজ নাম থাকিবে না। পাঠশালা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, এই এই নাম গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠশালা হইতে ছাত্রেরা শিষ্টাচার অভ্যাস করিবে, ব্রত-পালন ও ধর্মাচরণ করিবে। বাল্যকাল হইতে অভ্যাস না জন্মাইলে পরে তাহা স্থায়ী হয় না। আমার 'শিক্ষাপ্রকল্পে' এ বিষয় সবিস্তরে

লিখিয়াছি। কলেজে আসিবার পূর্বেই ছাত্রের মতিগতি নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে ; তখন শাসন ও বিনয়-শিক্ষা প্রায় অসম্ভব।

গুরুকুল ও বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ

এখানে একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে। আমাদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এ দেশের আদর্শ শিষ্য হইবে, ব্রহ্মচারী হইবে, গুরুকুলে বাস করিবে কি ? বর্ত্তমানে কলেজের ছাত্রেরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণে জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজ আর আমাদের সমাজ সম্পূর্ণ বিপরীত। পাশ্চাত্ত্য সমাজে যাহা অশিষ্ট নয়, আমাদের সমাজে তাহা অশিষ্ট। যেমন, বর্ত্তমানে আমাদের ছাত্রেরা ইস্কুলে কলেজে থিয়েটর করিতেছে, অবাধে যে-সে সিনেমায় যে-সে চিত্র দেখিতেছে, বিড়ী ও সিগারেট টানিতেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই আচরণ দূষ্য বিবেচিত হয় না। কিন্তু সে দেশেও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে। সে সব না মানিয়া বিদেশের আচার অনুকরণে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ছাত্রাবস্থায় যে ভোগবিলাসী হয়, ইস্কুল-কলেজ ত্যাগ করিবার পরও তাহার সেই অভ্যাস রহিয়া যায়। সকলেই দেখিয়াছেন, ইংরেজী-শিক্ষিত লোকেরা একটা নূতন জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ভাষা দেশের সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। তাহাদের মনের ভাব, ধরণ-ধারণ দেখিলে অপর সাধারণ লোকে তাহাদের সহিত মিশিতে চায় না।

কটক কলেজে নাটক অভিনয়ের কথা

আমি বহুকাল হইতে কলেজের ছাত্রদের নাটক-অভিনয়ের বিরোধী। আমার অভিজ্ঞতা লিখিতেছি। আমি কটক কলেজে বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলাম। অধিকাংশ ছাত্র ওড়িয়া, দুই-পাঁচজন বাঙ্গালী। কলেজে ছাত্রদের সহিত ওড়িয়া কিংবা বাংলায় কথা কহা চলিত না। কবে হইতে ছাত্রদের মাতৃভাষা অকথ্য ও অশ্রাব্য হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কেবল সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়ের মাতৃভাষা ও আরবী-ফারসীর মৌলবী সাহেবের উর্দু ভাষা ব্যবহারের অধিকার ছিল। তাঁহাদিগকেও ইংরেজীতে সংস্কৃত শ্লোক কিংবা আরবী পদ্য ব্যাখ্যা করিতে হইত।

অর্থাৎ, কলেজ-বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই শিক্ষকেরা ইংরেজ হইতেন। কলেজের অধ্যক্ষ এক ইংরেজ ছিলেন। কলিকাতায় বাঙ্গালী ছাত্রেরা থিয়েটর করে, কটকে ওড়িয়া ছাত্ররাই বা কেন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? অধ্যক্ষ গণেশচতুর্থী ও পরদিন সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে ছাত্রদিকে থিয়েটর করিতে অনুমতি দিলেন। পরে শুনিলাম, আমাদেরই দুই তিন জন শিক্ষক অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অভিনেতাদিকে তালিম করিবার ভার লইলেন। তৎকালের বিধি অনুসারে সে নাটক মাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমোদিত হইয়া আসিয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, নাটকে রাজদ্রোহিতা নাই। কলেজ-বাড়ীর উপরতলার একখানা ঘরে ১৫ দিন ধরিয়া মহড়া চলিতে লাগিল। কোন কোন বর্ষের পাঠ ঘণ্টাখানেক আগেই বন্ধ হইতে লাগিল। সেখানে আর তাঁহারা ইংরেজ নহেন। তাঁহাদের যে একটা কৃত্রিম গৌরব ছিল সে আর ফিরিয়া পাইলেন না। আমি থিয়েটরের বিরোধী; সকলেই জানিতেন। আমাকে কেহ কোন কথা বলিতেন না। নির্দিষ্ট দিনে কলেজের এক মাঠে অভিনয় হইবার সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল কলেজ ছুটি; দুই দিন আ।ম যাই নাই, দেখিও নাই। আমার বাসা নিকটে ছিল। রাত্রি নয়টার সময় কি হইতেছে দেখিতে গেলাম। দেখি, এক বিস্তীর্ণ সামিয়ানা টাঙ্গান হইয়াছে, রঙ্গমঞ্চ খাড়া হইয়াছে, কটকের যাবতীয় ভদ্রলোক বসিয়াছেন, আর তাঁহাদের পিছনে লোকারণ্য। কটকে থিয়েটর ছিল না, কেহ দেখিতে পাইত না। তারপর বিনামূল্যে দেখিতে পাইবে, আর কলেজের বাবুরা 'নাট' করিতেছেন! লোকের আগ্রহের সীমা নাই। আমি অধ্যক্ষের নিকটে এক চেয়ারে বসিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। ওড়িয়া নাটক তিনি বিন্দু-বিসর্গও বুঝেন না, শুধু ছাত্রদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আসিয়া বসিয়া ছিলেন। অনেক আগে হইতেই অভিনয় চলিতেছিল। একটু পরে দেখিলাম, এক ছাত্র নটী সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে গান ও নৃত্য করিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া চরকীর মত নৃত্য, আর দর্শকদের মধ্যে উচ্চধ্বনিতে "বাঃ, বাঃ! এঙ্কোর, এঙ্কোর!!" রব উঠিতে লাগিল। নিঃস্তব্ধ হইলে এক

ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, "আমি পঁচিশ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিতেছি।" আমি তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আমার এক প্রাক্তন ছাত্র, উকীল। আমি বলিলাম, "তুমি কি কারণে পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিবে?" তিনি বলিলেন, "এই নগরে নাটক অভিনয় নাই। এ একটা মস্ত কলা। অভিনেতাদিকে উৎসাহ দিবার জন্য আমি এই পুরস্কার দিতে চাই।" আমি বলিলাম, "দেখ, তোমরা তোমাদের পুত্রদিকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কলেজে পাঠাইয়াছ, অভিনয়শিক্ষার জন্য নয়। তুমি চাও কি তোমার পুত্র পরে নাটকের অভিনেতা হইবে?"

"আজ্ঞে না, না।"

"তবে তুমি কাহাকে উৎসাহ দিতে চাও?" নিরুত্তর।

আবার একটু পরে রঙ্গমঞ্চে নৃত্য। আবার এক ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, "আমি এক পদক দিব ঘোষণা করিতেছি।" আমি তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলাম। দেখিলাম, তিনিও আমার এক প্রাক্তন ছাত্র, ছোট হাকিম। আমি বলিলাম, "দেখ, কে নর্ত্তকী সাজিয়াছে, তুমি তাহাকে চেন কি?"

"আজ্ঞে, না।"

"মনে কর সে তোমার পুত্র, আমাদের ও তোমাদের সম্মুখে হাবভাব করিয়া নাচিতেছে, তুমি চাও কি?"

"এঁ্যা, এঁ্যা!"

"তাহা হইলে তুমি তোমার পুত্রকে নর্ত্তকী দেখিতে চাও না, অন্যের পুত্রকে দেখিতে চাও!"

তিনি অধোবদন হইলেন। ইহার পরে আমি চলিয়া আসি। পরে শুনিলাম, রাত্রি ১টা-২টা পর্যন্ত অভিনয় চলিয়াছিল। আরও শুনিলাম, সোডা-লেমনেডের সঙ্গে অপের পানীয়ও চলিয়াছিল। তাহাদের বিশ্রামের জন্য আরও দুই দিন কলেজের নিয়মিত কাজ হইতে পারিল না। আমি রঙ্গমঞ্চের নূতন বেশে কোন ছাত্রকেই চিনিতে পারি নাই। কিন্তু পরে কেহ পুরস্কার দেয় নাই, পদকও দেয় নাই। আর, মোড়ল দুই-তিনবার আই. এ. দিয়াও পাস হইতে

পারে নাই। আর একজন তিনবার বি. এ. ফেল হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, কলেজে আর থিয়েটর হয় নাই।

কলেজে সহশিক্ষা

ইহা ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। তখন কলেজে উৎসব অল্প ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার দিন, আর কোথাও কোথাও সরস্বতীপূজার দিন উৎসব হইত। এখন উৎসবের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক কলেজে সহশিক্ষা চলিতেছে, অর্থাৎ তরুণ-তরুণীরা এক সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করিতেছে। যদি পাঠগ্রহণেই সহশিক্ষার সমাপ্তি হইত, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু কলেজের উৎসব বাড়িয়া গিয়াছে, তরুণদের এক নূতন আকর্ষণ হইয়াছে। সহপাঠিনী তরুণীরাও তরুণদের সহিত উৎসব করিতেছে। আজ সরস্বতীপূজা; সরস্বতী বীণাবাদিনী, অতএব জলসা হইবে। তরুণ-তরুণীরা বাদ্য ও গান করিবে, কখনও বা তরুণীরা নৃত্য করিবে। আজ বর্ষা-মঙ্গল, অতএব গানবাজনার আয়োজন চাই। আজ বার্ষিক সামাজিক অনুষ্ঠান, থিয়েটর চাই। তরুণেরা অভিনেতা, তরুণীরা দর্শক ও শ্রোতা। রাত্রি ১২টা-১টা পর্যন্ত অভিনয় চলিতে থাকে, তরুণীরাও বসিয়া থাকে। আজ কতক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত কলেজ ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহাদিকে বিদায়-ভোজ দিতে হইবে, একত্র ফোটো তুলাইতে হইবে, নৃত্যগীতও চাই। আজ নূতন ছাত্রছাত্রী কলেজে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদিগকে সাদর-সম্ভাষণ করিতে হইবে, অতএব নাচগান চাই। আমি বুঝিতে পারি না, যে কলেজ বিদ্যামন্দির, সে কলেজে এত প্রকার আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে ছাত্রেরা কেমন করিয়া মনের চাঞ্চল্য দমন করে, কেমন করিয়া একাগ্রচিত্তে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। কলেজে প্রবেশ করিলেই কি বয়োধর্ম অতিক্রম করিতে পারা যায়? প্রথম যৌবন অতি দুরন্তকাল। গ্রীষ্ম দেশ। অল্প বয়সেই যৌবনের দৈহিক ও চৈত্তিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইংলণ্ডের যে যে কলেজে সহশিক্ষা প্রচলিত আছে, সে সে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অবাধে মেলামেশা করে কি? সে দেশে গৃহস্থের বাড়ীতে কিংবা কোন

সামাজিক অনুষ্ঠানে যুবতীরা তাহাদের সহপাঠীদের সহিত মিশিতে পায় কি? যদি পারে, তবে সে দেশে নারী-কলেজ কেন আছে? পাশ্চাত্য কলেজের হুবহু অনুকরণ দ্বারা এ দেশের সংস্কৃতির মূলোচ্ছিন্ন হইতেছে। নানাভাবে ইহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

বাঙ্গালী নরনারীর যথেচ্ছ বেশভূষা

সংবাদপত্রে দেখি, কলিকাতায় উৎসব হইতেছে, রাজপথে কলেজের তরুণীরা যাত্রা করিতেছে। সংবাদপত্রে তাহাদের ফোটো মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু তরুণদের হয় না। তরুণীরা নর্তকীছন্দে শাড়ি পরিয়া চলিয়াছে, শাড়ির অঞ্চল স্থানভ্রষ্ট হইয়া কটি-বেষ্টন করিয়াছে। তরুণীরা আঁচলার প্রয়োজন ভুলিয়াছে। নর্তকীছন্দে শাড়ি পরিধান বঙ্গদেশের নয়। বাঙ্গালীর ধুতি ও শাড়ি পরা দেখিলেই তাহাকে চিনিতে পারা যায়। পুরুষের মাথায় পাগড়ী বা টুপী থাকে না, অন্য প্রদেশে সেরূপ নয়। পাশ্চাত্য দেশে নারীর যে বেশ অনুমোদিত, আমাদের দেশে তাহা অনুকরণের অযোগ্য। বাঙ্গালী-চরিত্রে ঘুণ ধরিয়াছে, দৈনিক সংবাদপত্রে পাঠকদের তৃপ্ত্যর্থে সিনেমার রূপাজীবিনীদের চিত্র মুদ্রিত হইতেছে। কারণ, চিত্রনাট্য একটা আর্ট্, বড় কলা। আর, কলাচর্চা না করিলে পশু থাকিতে হয়। Arts for arts' sake, এই মত দ্বারা যাঁহারা পরিচালিত হইতেছেন, তাঁহারা ভুলিতেছেন, মানুষ আর্টের জনক, আর্টের কিঙ্কর নয়। ইংরেজ জাতি কেবল ভারতভূমি অধিকার করেন নাই, ভারতচিত্তও অধিকার করিয়াছেন। ইংলণ্ড আমাদের গুরুদেশ। সে দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি আমাদের অনুকরণীয় হইয়াছে। এই পরের অন্ধ অনুকরণ দ্বারা কোনও জাতির শ্রী থাকে না। স্বদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্জন করিলে কর্ণধারহীন তরীর ন্যায় দেশটা ভাসিয়া যাইতে থাকে। আমার আশ্চর্য ঠেকে, কেমন করিয়া ভদ্রলোক জাঙ্গিয়া অর্থাৎ 'হাফ্‌প্যাণ্ট' পরিয়া সভাতে আসিয়া চেয়ারে বসেন। আরও আশ্চর্য ঠেকে, মহিলারা তৎক্ষণাৎ সভা ত্যাগ করেন না। যতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাক, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা প্যান্টু দোষের হয় না। কিন্তু বসিতে গেলেই উরু

দেখা যায়। সভায় এক পুরুষ নারীকে উরু দেখাইয়াছিল, সে কারণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়া গেল; এ কথা কেমন করিয়া ভুলি?

বিশ্ববিদ্যালয়কে সংস্কৃতি রক্ষার ভার লইতে হইবে

আজকাল কেহ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের উপদেশ মানেন না। বৃদ্ধোপসেবা উঠিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়কেই আমাদের সংস্কৃতি রক্ষার ভার লইতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়কেই সমাজের শ্রেয়স্কর আদর্শ দেখাইতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়কেই দেশের কল্যাণকর মস্তিষ্ক হইতে হইবে। আমি প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দেখিলেই জিজ্ঞাসা করি, "আপনার গন্তব্য কি? পথ কি? যদি নূতন সমাজ গড়িতে চান, সমাজের যুবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাইয়া দেন। আপনার কল্পিত সমগ্র সমাজ-সৌধের চিত্র দেখিতে চাই। এখানে একটা দ্বার, এখানে একটা বারাণ্ডা, এইরূপ খণ্ড-খণ্ড নির্মাণ দ্বারা সমাজ-সৌধের মানস-চিত্র বুঝিতে পারা যায় না।" অদ্যাপি আমি এ প্রশ্নের উত্তর পাই নাই। সত্যজ্ঞান প্রচার করিয়া দেশের মঙ্গল বিধান করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সহিত কর্ম যোগ করিতে বলিয়াছিলেন। নেতাজী ব্রহ্মনিবাসী কন্যাদিকে লইয়া 'ঝাঁসীর রাণী বাহিনী' গঠন করিয়াছিলেন। সেখানে এক বাঙ্গালীকন্যা লালিতা-পালিতা হইয়াছিল, কলিকাতায় তাহার বিবাহ হইয়াছে। সে শ্বশুরগৃহে স্নানের পর মালাজপ না করিয়া কোন কাজ করে না। মহাত্মা গান্ধীও সেই পথে চলিয়াছিলেন; দেশে অহিংসা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

অর্থনৈতিক সমস্যা ও নরনারীর কর্মভেদ

এক্ষণে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে কন্যাদের বিবাহ হইতেছে না। তাহারা উদরান্নের নিমিত্ত আপিসে আপিসে ঘুরিতেছে, পরের দাসী হইয়া কালযাপন করিতে বসিয়াছে। আমি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' "নরনারীর কর্মভেদ" নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। কয়েকজন জ্ঞানী, ভবিষ্যদ্দর্শী, দেশহিতৈষী বন্ধু সে প্রবন্ধের বিষয়ের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি তাহাতে লিখিয়াছিলাম, "আমি ধনসাম্য বুঝিতে পারি, ইহা সম্ভব হইতে পারে,

কারণ ইহা মানুষের হাতে। কিন্তু জনসাম্য অসম্ভব মনে করি; কারণ, জনসাম্যসাধন সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রেত নয়। স্রষ্টা নর ও নারীকে পৃথক কর্মের নিমিত্ত পৃথক করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। নারী নরের কর্ম করিলে সে আর নারী থাকে না।" ইত্যাদি। তাহাতে পশ্চিম দেশের পুরুষদিকে ধিক্কার দিয়াছিলাম, তাহারা স্বীয় কন্যা পালন করিতে পারে না, পরের দাসী হইতে পাঠায়। আমাদের দেশেও সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। শতধিক্কারেও এ অসার সমাজের চৈতন্য হইবে না। এক বিশ্ববিদ্যালয় এই কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন। শিক্ষিতা নারী শিক্ষিকা হইতে পারেন। এই কর্ম দ্বারা তাঁহার মর্যাদার বিশেষ হানি হয় না। কন্যাকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে আবশ্যক হইলে সে ঘরে বসিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করিতে পারে, এবং বিবাহ না হইলে ভ্রাতার সংসারে পূজনীয়া, লক্ষ্মীস্বরূপা কর্ত্রী হইয়া থাকিতে পারে।

কন্যাদের বিবাহ

কেন কন্যাদের বিবাহ হইতেছে না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, শিক্ষিত যুবকেরা বিবাহ সম্বন্ধকে একটা দারুণ বন্ধন মনে করিতেছে। কিন্তু এই ভাব স্বাভাবিক নয়। যে যুবকের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়, তাহার বিবাহে অনিচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার সে অবস্থা নয়, সংসার প্রতিপালনে যাহার ক্ষমতা আছে, সে কেন বিবাহ করিতে চায় না? কেহ কেহ মনে করেন, জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত হইলে বর্তমান বিবাহ-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু সে বিবাহও তো একটা বন্ধন। যুবকেরা বন্ধনমুক্ত থাকিতে চায়। একবার এক কলেজে-পড়া অনূঢ়া তরুণী আমায় বলিয়াছিল, গান্ধর্ব বিবাহ সুখের হয় না। সে দেখিয়াছে, দম্পতির মোহ অধিককাল স্থায়ী হয় না।

এই সেদিন দেখিলাম, এক শিক্ষিতা বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত কন্যা খুঁজিতেছেন। আমি বলিলাম, "আপনি এখানে থাকিয়া কেমন করিয়া কন্যার সন্ধান পাইবেন, কেমন করিয়াই বা তাহাকে দেখিতে যাইবেন? আপনার পুত্র শিক্ষিত,

উপার্জনক্ষম, তাহার বয়সও হইয়াছে, সে কলিকাতায় থাকে, তাহাকে লিখুন, সে তাহার বিবাহের কন্যা খুঁজিয়া দেখিয়া স্থির করিবে।" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "যুবকেরা নিজেদের বিবাহের সময় অন্ধ হয়।" আমি জিজ্ঞাসিলাম, "সে আপনার দেখা বাছা কন্যা বিবাহ করিবে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, সে সম্মত আছে।"

"আপনি ভাগ্যবতী। কোন কোন কলেজে সহশিক্ষা প্রচলিত আছে, আপনি অনুমোদন করেন কি?"

"একেবারে না। ইহাতে কন্যাদের চিত্তচাঞ্চল্য আসিবেই আসিবে। পরে তাহারা সুখী হইতে পারে না।"

ঢাকায় এই মহিলার নিবাস ছিল। সেখানে তাঁহার স্বামী উকীল ছিলেন।

সেদিন কলেজের এক ছাত্রী সহশিক্ষা সমর্থন করিতেছিল। "দাদু, আপনাদের যুগ বহুকাল চলে' গেছে। আপনারা বই নিয়ে বসে' থাকতেন, আমাদের শুধু বই নিয়ে থাকলে চলে না। এখন আমাদের চারিদিকে চোখ মেলে দেখতে হচ্ছে। কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে? আমাদের কত জনকে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগী হ'তে হবে, আপিসে যেয়ে পুরুষদের সঙ্গে চাকরি করতে হবে। এখন আমরা ঘরের কোণে বসে' থাকলে তখন অতল জলে পড়ব। তখন আমাদিকে কে রক্ষা করতে আসবে?" কিন্তু এখন যে নানা আপিসে বহু নারী কর্ম করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন সহশিক্ষিতা ছিল? নারী সংবাদপত্র পড়িতেছে, কোথায় কোন্ নারী কি কর্ম করিতেছে, সব জানিতেছে। তাহাতেই তাহাদের হাতেখড়ি হইয়া যাইতেছে। নির্ভয়ে সৈনিক ও পুলিসের দারোগা হইতেছে। দেশরক্ষার জন্য নারীকে সৈনিকের কাজও করিতে হইবে। কিন্তু সে এক কথা, আর, সকল নারীকে পুরুষোচিত কাজের নিমিত্ত শিক্ষিত করা অন্য কথা। সহশিক্ষার একটা গুণ এই যে, ইহা দ্বারা নরনারীর পরস্পর কৌতূহলের হ্রাস হয়। কিন্তু পথে ও বক্তৃতা-সভায় দেখিতে দেখিতে সেই ফল হয়।

বাঙ্গালীর চরিত্রের শোচনীয় অবনতি

গত ৩০।৩৫ বৎসর হইতে বাঙ্গালী-চরিত্রের শোচনীয় অবনতি হইয়াছে। দেশ হইতে সত্য অন্তর্হিত; অসত্য, প্রবঞ্চনা, শঠতা, অর্থলোলুপতা প্রবলভাবে প্রকট হইয়াছে। অসত্যের জন্যই বাঙ্গালী বাণিজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিশ্বাসই বাণিজ্যের মূল। মারোয়াড়ী বণিকেরা মানুষ চিনিতে পারে, কাহাকেও ধারে মাল ছাড়িয়া দেয়, কাহাকেও দেয় না। তাহারা সাধু-সদাশয় নয়, কিন্তু বাণিজ্যে নিশ্চয় সৎ। মারোয়াড়ীতে মারোয়াড়ীতে পরস্পর এত বিশ্বাস যে একজনের টাকার অভাব হইলে অন্যে নিঃসঙ্কোচে তাহাকে ধার দেয়। বাণিজ্যবুদ্ধি এক পৃথক্ বুদ্ধি। সে বুদ্ধি বি. কম্ এম. কম্. পাস হইলেই আসে না। বরং যত পাস হয়, তত অকেজো হয়। মারোয়াড়ী বণিক অল্প-বিদ্যকে তাহার দোকানে লইবে, কিন্তু বহু-বিদ্যকে লইবে না। ব্যাঙ্কেও তাহাই। এম. কম্-এর মূল্য পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু বর্তমান বাঙ্গালীরই পূর্বপুরুষেরা কি বিপুল ব্যবসায় করিতেন! অতুল সম্পত্তিও করিয়াছিলেন। যতদিন আমাদের ছাত্রদের মধ্যে সাধুতার সহিত ব্যবসায়-বুদ্ধি না জন্মিতেছে, ততদিন বঙ্গদেশে অবাঙ্গালী বণিকেরা বিস্তার লাভ করিবেই।

আশ্চর্যের বিষয়, ইদানীং কলেজের ছাত্রও মিথ্যা কথা বলিতেছে; আমার কাছে ইহা অভাবনীয় মনে হয়। আমি অনেক ছাত্র দেখিয়াছি; সকলেই যে সাধু ও সত্যবাদী ছিল, তাহা নয়। কিন্তু এরূপ ছাত্র কদাচিৎ চোখে পড়িয়াছে। আমি কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা ব্যতীত তিন মাস অন্তর আমার ছাত্রদের পরীক্ষা করিতাম। কৃষ্ণপট্টে প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতাম। ছাত্রেরা উত্তর লিখিয়া আমার টেবিলে রাখিয়া যাইত, কখনও কেহ বই খুলিয়া দেখে নাই। ছাত্রেরা পাশাপাশি বসিত, ইচ্ছা না করিলেও পাশে কে কি লিখিতেছে দেখিতে পাইত। তথাপি কদাচিৎ ইহা ঘটিতে দেখিয়াছি। তাহারা জানিত, এই পরীক্ষার ফল আমি লিখিয়া রাখি, এবং বার্ষিক পরীক্ষার সময় সে ফল বিবেচনা করি।

ছাত্রদের ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা

আমি বালক ও যুবকদের খেলাকে পাঠের তুল্য প্রয়োজনীয় মনে করি। ইহা দ্বারা শুধু দেহের স্বাস্থ্য নয়, মনের স্বাস্থ্যও রক্ষিত হয়। নির্দোষ খেলা দ্বারা তাহাদের মন কুপথে ধাবিত হয় না। কটক কলেজে আমাকে বার দুই অধ্যক্ষের কাজ করিতে হইয়াছিল। ছাত্রেরা খেলার জন্য বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু টাকা দিত, আর কলেজ হইতেও তত টাকা দেওয়া হইত। ইহার নাম ক্রীড়াভাণ্ড। কিন্তু কলেজের জন পনর ছাত্র ক্রিকেট বা ফুটবল খেলিত, আর কয়েকজন টেনিস খেলিত। অবশিষ্ট পাঁচ শত ছাত্র কিছুই করিত না। এক 'ড্রিলমাষ্টার' ছিলেন, পূর্বে সমর-বিভাগে কাজ করিতেন। তিনি আসিয়া এক এক বর্ষের ছাত্রদিকে সপ্তাহে এক দিন ড্রিল করাইয়া যাইতেন। তাহাও অসময়ে, পড়ার মাঝে বেলা দুইটার সময়। অধিকাংশ ছাত্র ড্রিল-মাষ্টারকে মানিত না, তাহাঁর আজ্ঞা পালন করিত না। আমি একদিন গিয়া ছাত্রদের পাশে দাঁড়াইলাম। আর বুঝিলাম, এই ব্যবস্থায় কিছুই ফল হইবে না। যাহাতে সকল ছাত্রই প্রত্যহ কায়িক পরিশ্রম করে তাহার উপায় চিন্তা করিয়া দেখিলাম। তিনটার সময় কলেজ ছুটি দিতে হইবে। ছাত্রেরা বাড়ী কিংবা হোস্টেলে গিয়া বিশ্রাম করিয়া কিছু খাইয়া ৫টার সময় আবার আসিবে। শিক্ষকদিকে ডাকিলাম। আমার অভিপ্রায় শুনাইলাম। তিনটার সময় ছুটি শুনিয়াই তাহাঁদের চক্ষুস্থির। কলেজে ৪টা, ৪।।০টা, কোন কোন বর্ষে ৫টা পর্যন্তও নিয়মিত কাজ চলিতে থাকে। তাহাঁরা আপত্তি তুলিলেন। কেহ বলিলেন, "রুটিনে যত ঘণ্টা আছে, আমি এক ঘণ্টাও কমাইতে পারিব না।" কেহ বলিলেন, "এই রুটিনে আমি দুই বৎসরে পাঠ্যপুস্তক শেষ করিতে পারি না; আমি আরও সময় চাই।" সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাঁরা সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাঁরা আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন। আমি বলিলাম, "দেখুন, আমিও শিক্ষক, আমারও বিজ্ঞানছাত্রদের কর্মাভ্যাস করাইতে হয়, কিন্তু কখনও সময়ের অভাব মনে হয় নাই।"

"কেমন করিয়া করেন? আমরা পারি না কেন?"

"আপনারা কিছু মনে করিবেন না। আমি লেক্‌চার দিই, আপনারা বই পড়েন। বইএর পংক্তি পড়িতে হইলে সময়ে কুলাইবে না ঠিক। কিন্তু প্রত্যেক পংক্তি পড়িতে হইবে কেন? বিজ্ঞান বিষয়ে বইএ যাহা আছে, আপনারা তাহা আবৃত্তি করেন, আমি একেবারেই করি না। বইএ যাহা নাই, আমি তাহাই বলি।" ইত্যাদি।

ঘণ্টা দুই বিতর্কের পরে তাঁহারা সম্মত হইলেন, রুটিন পাল্‌টান হইল। আমাদের মধ্যে যিনি ছাত্রদের খেলার পরিদর্শক ছিলেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অন্ততঃ আধ ঘণ্টা শরীরচালনার ব্যবস্থা করিলাম। যাহারা দূর হইতে আসিত, তাহাদিকে অবশ্য বাদ দিতে হইল। প্রত্যহ কলেজ আনাগোনাতেই তাহাদের কায়িক শ্রম হইত।

ক্রমশ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

দরিদ্র-নারায়ণ

দেখে এনু প্ল্যাটফরমে-ফরমে
গড়ায় গড়ায় নারায়ণ।
ওপার হইতে তাড়ায়ন পেয়ে
এপারে আত্ম-ভাঁড়ায়ন।
আহা, যত নর হ'ল নারায়ণ।

শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম
ছাড়ি কাষ্টম্‌-ক্ষেত্রে
অশ্রুমোচন কমললোচন
চাহে হরিতকী-নেত্রে।
ছোলা কলা হাতে সেবকবৃন্দ
ডাকিছে, তোরা কে যাবি আয়,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে গাঁদি লেগে ভেসে
নারায়ণ আজ খাবি খায়।

এবার সেবার সুবর্ণযোগ,
ধ্বনিত দিগ্‌দিগন্ত,
দ্রাবিড় বেলুড় মাড়োয়ার হ'তে
ছুটিছে পুণ্যবন্ত।
যে যেমন পায় কুড়িয়ে নে যায়,
পতিতোদ্ধার-পরায়ণ ;—
বাংলায় আর নয় মেলা ভার,
যা আছে সেরেফ্‌ নারায়ণ।
সেবারের শোধ নিতে খ্যাপা হর
নারায়ণে তুলে নিয়েছে পিঠে,
ত্রিশূল উঁচিয়ে খুঁচিয়ে কুচিয়ে
ছড়াবে নব একান্ন পীঠে।
তীর্থে তীর্থে পাঁজরা কণ্ঠা
দাপ্‌না টেংরি সকলি পাবে,
প্রাণের চিহ্ন কোথাও পাবে না
কন্যাকুমারী আপঞ্জাবে।

হায় হায় হায় শুধাব কাহায়,—
পদ্মার জল ছিল না কি রে ?
কোন্ মরীচিকা মিটাতে দিল না
মৃত্যুপিপাসা সে স্বাদু নীরে ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

—

তলানি

নবীন যুগের এসেছে কঠিন দিন,
শর্করা ফেলে সবে দেয় স্যাকারিন—
শুধু মিঠা আছে, নাই কোন উত্তাপ।
কে রাখে মানুষে, জ্ঞান যার অভিশাপ ?

কল্যাণ-সঙ্ঘ

গল্পের আরম্ভ-কাল : ইং সন ১৯৪৭। চৈত্র মাসের চতুর্থ সপ্তাহ।

বিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে এক্সপ্রেস ট্রেন। দুই পাশে গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাপ, খানা-ডোবা, ঘুমন্ত ছোট ছোট গ্রাম, ছায়া-ছবির মত চোখের সামনে পার হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণা-পঞ্চমীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। তার আলোতে বহুদিনের পরিচিত প্রান্তর-বনভূমি অপরিচয়ের রহস্তে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

একটি কামরায় একটি জানালার পাশে সমরেশ ব'সে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। গাড়ির মধ্যে প্রায় সবাই আছে ঘুমিয়ে। যারা সুবিধে করতে পেরেছে বিছানা পেতে লম্বা শুয়ে আছে; যারা পারে নি তারা ব'সে ব'সে, যে যতটা পারে, ঘুমিয়ে নিচ্ছে। হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস মুখে লাগছে সমরেশের; মাঝে মাঝে ঘুমের জালে চোখ জড়িয়ে আসছে; জোর ক'রে ঘুমের জাল ছিঁড়ে ফেলে ধাবমান ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

আজ দু বছর পরে বাড়ি ফিরছে সমরেশ। কলকাতা থেকে প্রায় দেড় শো মাইল দূরে তার বাড়ি। পশ্চিম-বঙ্গের ছোট একটি শহরে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় তার জেল হয়েছিল। তখন সে এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। প্রায় দু বছর আগে সে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তি পেয়েই সে তার বিধবা বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্তে বাড়ি গিয়েছিল। তার পরই কলকাতায় আসে এম.এ.র পড়া শেষ করবার জন্তে। জনৈক ধনী কংগ্রেস-নেতার বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা ক'রে পড়াশুনার খরচ চালাত। নেতা মহাশয়ের সেক্রেটারিরও কাজ করতে হ'ত তাকে। তাঁর সঙ্গে নানা জায়গায় নানা কাজে যেতে হ'ত। কাজেই এর মধ্যে বাড়ি আসবার সুযোগ হয় নি। বাড়িতে থাকবার সুযোগ জীবনে কতদিনই বা হয়েছে তার! কৈশোর-অবস্থাতেই স্কুলের গণ্ডি যখন ও পার হয় নি, তখন থেকেই শুরু হয়েছে কারাবাস। ১৯৩০ সালের স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে। জেলে থাকতে থাকতে বহু বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, বিভিন্ন কর্মপন্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে; অনেক সংযোগ ও বিয়োগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

যাদের সঙ্গে একদা পথ চলেছিল পাশাপাশি, তারা গিয়েছে অন্য পথে। যারা ছিল ভিন্নপথের যাত্রী, তারা হয়ে উঠেছে সহযাত্রী। এমনই ক'রে চলতে চলতে জীবন-পথে ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে। বহু-পদ-চিহ্ন-লাঞ্ছিত অতীত জীবন-পথের দিকে ফিরে তাকিয়ে মনে পড়ে সেই সহযাত্রীদের, যাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিয়েছে কত আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সুযোগ-দুর্যোগ, ভাব-ভাবনা, ভাবী ভারতের কত রঙিন স্বপ্নবিলাস। বহু ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের রথ আজ সাফল্যের সিংহদ্বারে উত্তীর্ণ হয়েছে; যারা নানা ভাবে, নানা দিক থেকে রথকে অগ্রসর ক'রে দিয়েছে, তারা আজ কোথায়? পথের মাঝেই প্রাণ হারিয়েছে অনেকে; কেউ কেউ হাত গুটিয়ে স'রে দাঁড়িয়েছে; গতি ও গন্তব্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে, কেউ কেউ উল্টো টান দিয়ে রথের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করেছে।

অতীত সহযাত্রীদের স্মরণ করতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে প্রতুলের কথা। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে খেলা করেছে, একসঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, জেলে গেছে, জেলের ভেতরে পড়াশুনা করেছে, পরীক্ষায় পাস করেছে, একসঙ্গে পথ থেকে পথান্তরে গেছে, আবার পূর্বপথে ফিরে এসেছে। ১৯৪২ সালে দুজনেই এম.এ. পড়ছিল তারা। তাদের সহপাঠিনী ছিল শুক্তি গুপ্তা। পূর্ববঙ্গের মেয়ে। কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত। শ্যামবর্ণের ছিপছিপে মেয়েটি। রূপে সজ্জায় অন্য সহপাঠিনীদের কাছে দাঁড়াতে পারত না সে। তবু তার মুখে ছিল এমনই একটি বুদ্ধির দীপ্তি, সুকুমার লাবণ্য, ব্যবহারে এমনই সহজ শালীনতা, সংযত, স্বল্প কথাবার্তায় এমনই শিক্ষিত ও সচেতন মনের পরিচয়, চাল-চলনে এমনই স্বাতন্ত্র্য ও দৃঢ় ভঙ্গী যে, এতগুলি সুন্দরী মেয়ের মধ্যে থেকেও সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। প্রতুলের সঙ্গে কেমন ক'রে আলাপ হ'ল তার। শুক্তির যোগ ছিল কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে। তারই প্রভাবে ১৯৪২এর আন্দোলন থেকে দূরে স'রে পড়ল প্রতুল। এখন সে কম্যুনিস্ট। তাদের জেলা-শহরে পার্টির কাজ করছে। শুক্তি গুপ্তাও আছে সেখানে। মত ও মনের

মিল সত্ত্বেও এখনও বিয়ে হয় নি তাদের। প্রতুলের বিধবা মা এখনও বেঁচে আছেন। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধবা হয়ে ছেলের অসবর্ণ বিবাহ তিনি নিশ্চয়ই সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর জন্ম দুজনে অপেক্ষা করছে সম্ভবত।

একটি ছোট স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সামনের বেঞ্চিতে ব'সে ব'সে ঢুলছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ চোখ খুলে ব'লে উঠলেন, কোন্ ইষ্টিশান, মশায়? প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে, কাঠের খুঁটির মাথায় কাচের ঘেরের মধ্যে কেরোসিনের ল্যাম্পের স্বল্পালোকে কাঠের তক্তায় লেখা স্টেশনের নাম পড়বার চেষ্টা করলে সমরেশ। ভদ্রলোক হেঁকে বললেন, বলুন না মশায়! হঠাৎ স্টেশনের একজন খালাসী স্টেশনের নাম হাঁকতেই, ভদ্রলোক ধড়ফড় ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলেন, আরে! এখানেই যে নামতে হবে আমাকে! শশব্যস্ত হয়ে বাক্স থেকে জিনিস-পত্র নামাতে শুরু করলেন। সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি নেমে যান; কি কি জিনিস আমায় বলুন, আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

তাই দিন তো মশায়।—ব'লে ভদ্রলোক, দরজা খুলে নেমে পড়লেন। সমরেশ এক-একটি ক'রে তাঁর জিনিসগুলি নামিয়ে দিলে। ভদ্রলোক জিনিসগুলি গুনতে গুনতে বললেন, ভাল ক'রে দেখুন দেখি, আর কিছু আছে কি না! সমরেশ বললে, রয়েছে তো অনেক কিছুই; এর মধ্যে আপনার কিছু আছে কি না জানব কি ক'রে?

তা বটে।—ব'লে ভদ্রলোক আবার গণনা শুরু করলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল। সমরেশ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর দিকে তাকিয়ে; ভদ্রলোক মুখ তুলে সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে মশায়। বসুন আপনি, নমস্কার। প্রতিনমস্কার জানিয়ে সমরেশ দরজা বন্ধ করলে।

বসবার আগে সমরেশ দেখে নিলে, তার জিনিসগুলি যথাস্থানে নিরাপদে আছে কি না; বাঙ্কের ওপরে বিছানা, সুটকেস; বেঞ্চির নীচে ফলের ঝুড়িটা! ফল তার মায়ের জন্ম। মাসখানেক আগে তাঁর অসুখ হয়েছিল। চিঠি গিয়েছিল তার কলকাতার ঠিকানায়।

সে তখন কলকাতায় ছিল না। ফিরে এসে চিঠি পেয়েই সে মাকে দেখতে চলেছে।

চিঠি লিখেছিল তাদের পাড়ার একটি মেয়ে। নাম তিলোত্তমা। তিলোত্তমার বাবা ছিলেন তার বাবার বন্ধু। দুই পরিবারের মধ্যে একটা অকৃত্রিম আত্মীয়তার বন্ধন গ'ড়ে উঠেছিল। তাঁদের মৃত্যুর পরও সে বন্ধন অটুট আছে। তিলুর অল্প বয়সে তার মা মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকে সমরেশের মায়ের কাছে মানুষ হয়েছিল। তার মাকে সে নিজের মায়ের মতই ভালবাসে। আজ পর্যন্ত কদিনই বা সমরেশ মায়ের কাছে থাকতে পেরেছে! তিলু নিজের মেয়ের মত বরাবরই মায়ের কাছে কাছে থেকেছে; নানা আবদারে তাঁকে ব্যস্ত রেখে সন্তান-বিরহের দুঃখকে ভুলিয়ে রেখেছে। রোগে সেবা করেছে, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে; সংসারের নানা অভাব ও অসুবিধা থেকে তাঁকে সাধ্যমত আড়াল ক'রে রেখেছে। মাও তাকে স্নেহ করেন, নিজের মেয়ের মত, বোধ করি নিজের ছেলের চেয়েও বেশি। নিজের সন্তানের চেয়েও তার ওপরেই বেশি নির্ভরতা তাঁর।

তার মায়ের ভার হাতে নিয়ে তিলু সমরেশকে দেশসেবা করবার সুযোগ দিয়েছে। তিলুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কতবার চিঠিতে তিলুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে সে। প্রতিবারই তিলু যা জবাব দিয়েছে, তার ভাবার্থ এই যে—তোমাকে দেশসেবার নাম ক'রে ভবঘুরের মত জীবন কাটাবার জন্যে কাকীমার ভার নিই নি আমি; নিয়েছি নিজের দায় ব'লেই; তোমার মা কি তোমার একলার? মুখে এ ধরনের কিছু বলতে গেলেই তিলু ঝাঁঝিয়ে উঠেছে—খুব হয়েছে, থাম, মায়ের ওপর তোমার দরদ কত জানতে বাকি নেই আমার। দেশসেবা হচ্ছে তোমাদের! রক্ত-মাংসের মায়ের ওপরে যাদের মমতা নেই, মাটির মায়ের ওপর ভালবাসা তাদের ভণ্ডামি—

তিলু সমরেশের চেয়ে আট-ন বছরের ছোট। ছোটবেলায় ছোট বোনের মত তার কাছে কাছে থাকত। তার বন্ধু-বান্ধবরা তাকে তার ছোট বোন ব'লেই জানত, আদর করত, রাগাত। তখন থেকেই একটু ঠাট্টা ক'রে তাকে কিছু বললেই,

সে রেগে উঠত। ছোটবেলায় বেশ মোটা-সোটা ছিল ব'লে সমরেশ তার নাম দিয়েছিল—তালোতমা; ডাকত তালু ব'লে। তিলু রেগে আগুন হয়ে উঠত; তাকে আঁচড়ে, কামড়ে, হাতের কাছে যা পেত তাই ছুঁড়ে মেরে, নাস্তানাবুদ ক'রে দিত। কাঁদতে কাঁদতে সমরেশের বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করত। সমরেশের বাবার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিল সে। তাঁর সঙ্গে স্নান করত, খেত, ঘুমোত। তার সব কথা বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করতেন তিনি। কতবার তার নামে মিথ্যে ক'রে লাগিয়ে তিলু তাকে বাবার কাছ থেকে ধমক খাইয়েছে। বাবা মারা যাবার পরে তিলু তো মায়ের ডান হাত হয়ে উঠল। নিজেদের বাড়িতে যেতই না, সব সময় মার কাছে থাকত। তিলুর বাবা আপত্তি করতেন না। তার বাবার মৃত্যুর পর তিলুর বাবাই অভিভাবকের মত তাদের সব দেখাশোনা করতেন। সংসার চালনায় মাকে পরামর্শ দিতেন। সময়ে-অসময়ে অনেক বিষয়ে অনেক ভাবে সাহায্য করতেন। তখন থেকে তিলু হয়ে উঠল যেন তার অভিভাবক। পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলা-মেশা, খেলা-ধুলা সব বিষয়ে সর্বদা খবরদারি করত। একটু এদিক ওদিক হ'লেই শাসন করত, নিজে পেরে না উঠলে মাকে ব'লে দিত। মা ধমক-ধামক করতেন না; হা-হুতাশ করতেন; নিজের দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ করতেন; যে বিধবার একমাত্র পুত্র বিগড়ে যায়, তার বিষ খেয়ে মরা উচিত—চোখের জলে তা জানিয়ে দিতেন।

তিলুর সতর্ক প্রহরা ব্যর্থ ক'রে সমরেশ যখন লবণ-আন্দোলনে যোগ দিলে এবং লুকিয়ে বাড়ি থেকে চ'লে গেল, তখন তিলু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই তার উপরে তিলুর মন কড়া হয়ে উঠল। বাড়িতে গেলে সেবা-যত্নের ত্রুটি করত না, কিন্তু কথায় কথায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ হানত। তারপর নানা আন্দোলনে জড়িত হয়ে কারাবাসেই তার জীবন কেটেছে; বাড়িতে থাকতে পেয়েছে খুব কম দিনই। কিন্তু যে কদিন বাড়িতে থেকেছে, তিলুর সেই একই ব্যবহার—সতর্ক ত্রুটিহীন সেবা-যত্ন, কথায় কথায় হুল-বেঁধানো, মাকে উত্তেজিত ক'রে সক্রন্দন অনুযোগ করানো।

এখন তিলুর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। বি.এ. পাস ক'রে স্থানীয় হিন্দু গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের কাজ করছে। তিলুর বাবা মারা গেছেন। কাকাই এখন অভিভাবক। বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, তবু বিয়ে করতে চাইছে না কিছুতেই। কাকাবাবুর বয়স হয়েছে; পায়ে ধরেছে বাত; হিল্লি-দিল্লি ছুটোছুটি ক'রে পাত্র খুঁজে আনবার শক্তি নেই। তবু লোকমুখে কোন উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলেই সমরেশের মাকে দিয়ে কথাটা তিলুর কাছে উত্থাপন করেন। তিলু প্রবল অনিচ্ছা জানায়। বলে, আমি গেলে কাকাবাবুকে কে দেখবে? হেতুটা কাকাবাবুর মনে লাগে। চুপ ক'রে যান। তিলুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত করবার চেষ্টা তার মাও বেশি করেন না। তিলুকে নিজের কাছ-ছাড়া করবার তাঁর ইচ্ছা নেই। তিলু যদি চির-দিনের মত তাঁর কাছে থেকে যায়, তিনি ব'র্তে যান। তাঁর বিশ্বাস, তিলুর মত শক্ত মেয়েই তাঁর বে-আক্কেল বাউণ্ডুলের ছেলেকে শায়েস্তা করতে পারবে। তিলুর হাতে যদি ছেলেটিকে গচ্ছিত ক'রে যেতে পারেন তো তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারবেন। তাঁর অন্তরের এই গোপন বাসনাটি তিলুর কাছে জানাবার ত্রুটি করেন নি। তিলুর কাছ থেকে কখনও আগ্রহের ইঙ্গিতও পান নি। কাকা-বাবুর কাছে ও ধরনের প্রস্তাব করতে সাহস হয় না তাঁর। তিলুরা বড়লোক। ওর কাকা ছিলেন একজন নামজাদা উকিল, অনেক টাকা রেখে গেছেন মেয়ের জন্তে। যে-সে ছেলের হাতে দেবে কেন ওরা? বিশেষ ক'রে সমরেশের মত ছেলের হাতে, যে ছেলে চোদ্দ-পনরো বছর বয়স থেকে জেল খাটতে শুরু করেছে, জীবনে এক পয়সা রোজগার করবার সামর্থ্য হবে না যার। একবার মা কাকাবাবুর কাছে বলেছিলেন, ছেলেটার বিয়ে দিলে হয়তো ঘরবাস করে, নয় ঠাকুরপো? কাকাবাবু স্পষ্টবক্তা লোক; জবাব দিয়েছিলেন, ও ছেলের হাতে কে মেয়ে দেবে, বউদি? মেয়ে কি লোকের ক্যালনা এত? এ খবরটি তিলুর কাছ থেকেই শোনা তার। এ ধরনের শ্রুতি-সুখকর খবর বাড়িতে পা দেবা মাত্র তিলু জানিয়ে দিতে ত্রুটি করে না।

তবে সে জানে, তিলু তাকে বোনের মত, পরম বান্ধবীর মত স্নেহ করে। কথায় কাঁটা ও ব্যবহারে বিরাগের ভাব থাকলেও, লিচুর কর্কশ আবরণের নীচে অম্ল-মধুর কোমল শাঁসের মত, তিলুর অন্তরের মধ্যে একটি সরস সুকোমল স্নেহ টসটস করছে; সমরেশ নিজের অন্তরের মধ্যে তা অনুভব করে। একে সম্বল ক'রে, কোন দিন সে জীবন-পথে তার চিরদিনের সাথী হতে রাজী হবে কি না—এ আশা করবার ভরসা হয় না। তবে নিজের মনে সে জানে, এ জীবনে যদি কোন দিন ঘর বাঁধবার সাধ হয়, তিলুকে ছাড়া তার চলবে না।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। মাঝারি-গোছের স্টেশন। পিছনেই বিস্তীর্ণ ঘন জঙ্গল, জ্যোৎস্নালোকে অতিকায় জন্তুর মত ঘুমোচ্ছে। কান পেতে শুনলে ওর হৃদ্‌স্পন্দন শোনা যায়; শোনা যায় ওর নিশ্বাসের নিয়মিত শব্দ। কতকগুলো যাত্রী নেমেছে গাড়ি থেকে; কুলীদের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে দর-কষাকষি করছে। দু-তিন মিনিট মাত্র গাড়ি দাঁড়াল। ঢং ঢং ক'রে গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বাজল। গাড়িটা চলবার উপক্রম করতেই একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে গাড়ির সামনে এসে ব'লে উঠল, দরজাটা খুলে দ্যান বাবু দয়া ক'রে, গাড়িতে উঠব আমি। সমরেশ তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা খুলে হাত ধ'রে গাড়িতে তুলে নিলে লোকটিকে। লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, বড় দয়া করলেন বাবু। বারো কোশ রাস্তা ছুটতে ছুটতে আসছি। মেয়েটা আমার মরমর খবর পেয়েছি সাঁঝ-রেতে। এ গাড়ি ধরতে না পারলে মেয়েটাকে দেখতেই পেতাম না। বড় উবগার করলেন বাবা। খোদা তোমার ভাল করবেন। লোকটি নিঃসন্দেহে মুসলমান। মুখে লম্বা দাড়ি, মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা। লম্বা শীর্ণ চেহারা। গায়ে একটি মলিন ফতুয়া, পরনে খাটো ধুতি। হাতে একটি পুঁটলি। লোকটি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল একটু জায়গার জন্যে। কোথাও এক তিল জায়গা নেই। সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় নামবে? লোকটা সবিনয়ে বললে, পরের ইষ্টিশানে বাবা। সমরেশ বললে, তা হ'লে তুমি আমার জায়গাটাতে ব'স। লোকটি ঘাড় নেড়ে বললে, তা কি হয়

বাবা! আপনি বসুন, এইটুকু রাস্তা দাঁড়িয়েই যাব। সমরেশ তার হাত ধ'রে বললে, তুমি ব'স না কত্তা, অনেকক্ষণ ব'সে আসছি; একটু দাঁড়িয়ে থাকলে, কিছু কষ্ট হবে না আমার; ব'স তুমি।—ব'লে জোর ক'রে বসিয়ে দিলে তাকে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

জঙ্গলের সীমানা শেষ হয়ে মাঠ শুরু হয়েছে। শস্যহীন দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। উপরে তারকাকীর্ণ আকাশ। চোখের সামনে সারমেয়-অনুসৃত বর্শাধারী কালপুরুষ; জ্বলজ্বল করছে মণিময় কোমরবন্ধ। দিগন্ত-রেখার একটু ওপরে ঝিকমিক করছে একটি নীলাভ তারা। এই প্রগাঢ় শান্তিময় বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মনে হয় না, পৃথিবীতে কোথাও কোন বিভেদ আছে, বিদ্বেষ আছে, মারামারি হানাহানি আছে, অত্যাচার উৎপীড়ন আছে, প্রতিশোধ প্রতিহিংসা আছে। অথচ দেখেছে তো নিজের চোখে—কলকাতার হাঙ্গামার সময়ে মানুষের নগ্ন পাশবিক রূপ, উলঙ্গ খড়্গের মত নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি। দেখেছে তো, নির্বিচারে নিরীহ নির্দোষ পথিকের বুকে ছুরি মারতে ভদ্র শিক্ষিত যুবকের পর্যন্ত বাধে না। বিদ্বেষের বিষে নীল হয়ে উঠেছে মানুষের মন। ঐ যে দীন দরিদ্র মুসলমান কৃষক তার কাছে সামান্য সাহায্য পেয়ে বিগলিত হয়ে উঠেছে, তাকে আশীর্বাদ করছে মনে মনে, ওরই মত জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মুসলমান স্পষ্ট দিবালোকে চোখের সামনে হিন্দু নারীকে নির্যাতিত হতে দেখে প্রতিবাদ তো করেই নি, বরং অত্যাচারীদের উৎসাহ দিয়েছে। নোয়াখালি গিয়েছিল সে। দেখে এসেছে, হিন্দুদের ওপরে কি অত্যাচার হয়েছে সেখানে। হিন্দুদের পাড়াকে পাড়া জ্বালিয়ে দিয়েছে, মুসলমানরা হিন্দু গৃহস্থের ধনসম্পত্তি লুঠ করেছে, মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। হিন্দুদের ও-দেশ থেকে উৎসাদিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে তারা।

কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা মনে করতেই মনে পড়ল একটি মেয়ের কথা। কলকাতায় যে পাড়ায় থাকত, সেই পাড়ার মেয়ে। হাঙ্গামা শুরু হতেই সমরেশ পাড়ার যুবকদের নিয়ে একটি রক্ষীদল গঠন করেছিল—মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে।

তাদের পাড়ার পাশেই ছিল একটা মুসলমানপাড়া। সেখান থেকে মুসলমানরা দল বেঁধে কয়েক বার তাদের পাড়া আক্রমণ করেছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাদের হঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিরোধের প্রাবল্য দেখে মুসলমানরা আর আক্রমণ করতে সাহস করে নি। সে সময়ে পাড়ার মেয়েরাও নিজেদের মধ্যে একটি সেবিকা-দল গঠন করেছিল—আহতদের সেবার জন্যে। সে নিজেও আহত হয়েছিল; মাথা ফেটে গিয়েছিল তার। মেয়েরা পালা ক'রে সেবা করেছিল। তাদের মধ্যে একটি মেয়ের নিপুণ স্নেহকোমল হাতের সেবা সে কোনদিন ভুলবে না। হাঙ্গামা একটু থামতেই মেয়েটি কলকাতা থেকে চ'লে গিয়েছিল। জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না তার সঙ্গে। কিন্তু তার মনের পটে সেই মেয়েটির স্নিগ্ধ-শ্যাম মূর্তিটি খোদাই হয়ে গেছে; মুছবে না কোনদিন।

লোকটি নেমে গেল। যাবার সময়ে আশীর্বাদ ক'রে গেল—খোদা ভাল করুন, বাবা।

ভোর-রাত্রে তাদের স্টেশনে গাড়ি থামল। ইতিমধ্যে যারা এই স্টেশনে নামবে, তারা ঘুম ছেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠে মোটঘাট সামলাতে আরম্ভ করেছে। গাড়ি থামতেই হুড়মুড় ক'রে নামতে আরম্ভ ক'রে দিলে তারা। গাড়ি অনেকক্ষণ থামে এই স্টেশনে। তবু ব্যস্ততার সীমা নেই কারও। সকলে নেমে যাবার পর ধীরে সুস্থে নামল সমরেশ। একটা কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে ওভার-ব্রিজের দিকে চলল। রেলের কর্মচারী টিকিট আদায় করছিল ব্রিজের এ পাশে দাঁড়িয়ে। তাকে টিকিট দিয়ে, ব্রিজ পার হয়ে একটা রিক্‌শাতে জিনিস-পত্র সমেত নিজে চ'ড়ে বাড়ির দিকে চলল।

২

পরদিন অপরাহ্ণ। বারান্দায় মায়ের কাছে সমরেশ ব'সে ছিল। মাস খানেক আগে মায়ের গুরুতর অসুখ হয়েছিল। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তবে এখনও বেশ বল পান নি শরীরে। তাতেই কোন রকমে সংসারের কাজ করছেন। অসুখের পরটাতেই পেরে উঠতেন না। তিনু রান্না-বান্না ক'রে দিয়ে যেত। এখন নিজেই রান্না

করছেন। বিধবা মানুষ, এক বেলা রান্না করলেই হয়ে যায়। যা থাকে রাত্রে বুড়ী ঝিটার হয়ে যায়। সমরেশ এসেছে ব'লে এ বেলায় রান্নার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আসন-পিঁড়ি হয়ে ব'সে বঁটিতে তরকারি কুটতে কুটতে ছেলের সঙ্গে গল্প করছেন।

মা বললেন, যা হয়েছিল বাছা! এ যাত্রা আর বাঁচতাম না। তিলু যা করেছে, পেটের মেয়েও অত করে না। সমরেশ বললে, বরাবরই তো ও তোমার সেবা করে মা। মা ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, তা তো করে বাছা। চিরদিন তো আর করবে না। কি ওর মতি-গতি হয়েছে, বে করতে চাচ্ছে না; না হ'লে কবে কোথায় চ'লে যেত। এতদিন কাছটিতে আছে, তাই ভাগ্যি। ওর কাকা যা উঠে-প'ড়ে লেগেছে, বেশি দিন থাকতে দেবে না আর।

সমরেশ বললে, তাই নাকি! চেষ্টা তো করাই উচিত। বয়স তো কম হয় নি তিলুর।

মা একবার ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমার অনেক দিনের সাধ বাছা, তিলুটিকে বউ করবার। ভগবান যে বাদ সাধলেন; ছেলেই মানুষ হ'ল না আমার।

কথাবার্তা আবার সেই পুরাতন খাতে বইবার উদ্যোগ করছে দেখে সমরেশ বললে, তোমার শরীর যা দুর্বল, রাত্রে নাই বা রাঁধলে মা। মুড়ি-টুড়ি খেলেই হবে। মা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, তা কি হয় বাছা! কতদিন পরে এসেছিস, চারটি ভাত আর রান্না ক'রে দিতে পারব না! তা ছাড়া মুড়িই কি পাওয়া যায় নাকি! টাকায় দশ পাই মুড়ি, তাও চোঁয়া-পোড়া। আটা-ময়দার তো মুখ দেখবার জো নেই।

বাইরের বারান্দা থেকে ডাক এল, কাকীমা! সমরেশের মা সাদর সস্নেহ কণ্ঠে আহ্বান করলেন, এস মা, এস। তোমারই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। তিলু কাছে এসে দাঁড়াল। লম্বা চেহারার গঠন। ধবধবে ফরসা রঙ। মাথায় একরাশ কালো চুল এলো খোঁপায় বাঁধা। মুখ-শ্রী সুন্দর। পরনে সাদা কালোপাড় শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, পা খালি। গলায় সরু সোনার হার চিকচিক করছে। হাতে চারগাছি ক'রে সোনার চুড়ি। তার সঙ্গে একটি তরুণী। বয়স

ষোল-সতেরো। পাতলা ছিপছিপে; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আয়ত চোখের কালো তারা দুটি কৌতুকে চঞ্চল। মুখে অতি রমণীয় কমনীয়তা। যৌবনের জাগরণাভাস সর্বদেহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ছোট কপালটি ঘিরে কালো কোঁকড়া চুলের সুবঙ্কিম সীমারেখা। দীর্ঘ বেণীটি সাপের মত পিঠে ঝুলছে। পরনে ফিকে নীলরঙ শাড়ি, ওই রঙের ব্লাউজ, হাতে গলায় রঙিন রেশমী সুতোর কাজ-করা। পায়ে স্যাণ্ডেল। হাতে সোনার চুড়ি, গলায় হার, কানে দুল।

সমরেশের মা বললেন, নাতনী কবে এলে গো?

জবাব দিল তিনু; বললে, কাল সন্ধ্যেবেলায়।

জামাই এসেছেন নাকি?

না। ওকে এখানে নামিয়ে দিয়ে কলকাতা গেছেন।

ইষ্টিশান থেকে এল কার সঙ্গে?

তপনবাবুর সঙ্গে। ওই যে রায় বাহাদুরের ভাইপো উকিল। মধুপুরে হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলেন। ওদের সঙ্গেই ফিরলেন। জামাইবাবু তো লতুদের নিয়ে এতদিন ওখানেই ছিলেন। তপন-বাবুদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকতেন। তপনবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেছে ওঁর।

মা বললেন, ওই মাদুরটা পেতে ব'স মা দুজনে।

সঙ্গের মেয়েটিকে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, দিদি? এসে ব'স।

সমরেশ এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিকে দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সেই মেয়েটি, যে কলকাতার হাঙ্গামার সময়ে একান্তভাবে তার সেবা করেছিল। সমরেশকে দেখে মেয়েটির মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। আপনার লোক নাকি তার! আগে জানলে মিঃ রায়ের মেয়ের এত চাল সহ্য করতে হ'ত নাকি!

হাঙ্গামার সময়ে মিঃ রায়ের বাড়িতে ছিল সমরেশ। ওই পাড়ায় যে রক্ষীদল গঠন করা হয়েছিল, তার দলপতি ছিল সে। সেই সময়ে তার অক্লান্ত পরিশ্রম, পৌরুষ ও দেহের শক্তি, অপরিমিত সাহস, নির্বিচার নির্ভরতা, শিষ্ট ব্যবহার, বুদ্ধি-চাতুর্য, ও শৃঙ্খলা-বিধানের শক্তি

সারা পাড়ায় নরনারীদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ ক'রে পাড়ার তরুণীদের। তারা তার একটু সেবা করতে পেলে, তার একটা আদেশ পালন করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হয়ে যেত। সে আহত হয়ে পড়লে, সবাই হুমড়ি খেয়ে সেবা করতে শুরু করলে। মেয়েটির বাড়ি ছিল মিঃ রায়ের বাড়ির পাশেই। দিবারাত্র সে সমরেশের বিছানার পাশে থাকত, তার শুশ্রূষা করত। বন্ধুরা ঠাট্টা করত তাকে। বিশেষ ক'রে মিঃ রায়ের অহঙ্কারী মেয়েটা। হাবে-ভাবে কথায়-বার্তায় জানিয়ে দিত, ইনি ওদের তাঁবেদার লোক, সেবা-শুশ্রূষার যা ব্যবস্থা ওরাই করবে; সকলের মাথা-ব্যথার দরকার কি? ওঁর কাজের বাহাদুরিটা ও আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করত। সে সময়ে যদি সে জানত, ইনি তার আপনার লোক, তা হ'লে তার মুখ-নাড়া বন্ধ ক'রে দিত সে।

একদৃষ্টে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। দুর্দিনের ঘন আঁধারের মধ্যে পরিচয়, চেনাচিনি হয় নি বেশি; চিনে নিচ্ছিল দুজন দুজনকে।

তিলু মুখ ফিরিয়ে এদের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল, লতু, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এখানে এসে ব'স্।

তিলু মায়ের পাশেই বসল। লতুকে বসাল তার ওপাশে। সমরেশের দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে রইল সে।

সমরেশ মনে মনে হেসে বললে, মেয়েটি কে মা? মা বললেন, ওকে চিনিস নে? তিলুর বোনঝি, নীলুর মেয়ে—লতু।

সবিস্ময়ে সমরেশ বললে, 'তাই নাকি! ওকে দেখেছি তো কলকাতায়।

লতু অর্থাৎ লতিকা কথা বললে, তিলুর দেহের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, আপনার মাথাটা সারতে কতদিন লেগেছিল? সচকিত হয়ে উঠল সমরেশ, মায়ের কাছে এসব কথা পাড়লে লাফিয়ে উঠবেন এখনই, এদের সামনেই কান্নাকাটি. খেদ-ক্ষোভ শুরু করবেন; সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে। তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, বেশি দিন না। কথার ধারাটা বদলে দেবার জন্যে বললে, তিলু কি চিনতে পারছ না নাকি?

মায়ের দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিল তিনু। তার ডান পাশটা ছিল সমরেশের দিকে। সে মুখ না ফিরিয়েই ধারালো কণ্ঠে জবাব দিলে, চিঠির পর চিঠি লিখে যার কাছে জবাব পাওয়া যায় না, মায়ের গুরুতর অসুখ, বাঁচবেন কি না সন্দেহ—খবর পেয়েও যার বাড়ি আসতে ফুরসুৎ হয় না, তার সঙ্গে আর চেনাচিনি কি? কি বলুন কাকীমা?

লতুর মুখে সমরেশের মাথায় আঘাতের কথা শোনা অবধি মায়ের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল শঙ্কা, ব্যাকুলতা; বললেন, ওর কথা ছেড়ে দাও মা। দেশছাড়া ছেলে। লতুকে বললেন, ওর মাথায় কি হয়েছিল দিদি?

লতু ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বলতে শুরু করতেই তিনু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, তুই থাম্, আমি বলছি। সমরেশ আলোচনার স্রোতকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে বললে, আমি তো কলকাতায় ছিলাম না তিনু। দিল্লী গিয়েছিলাম; তা ছাড়া আরও অনেক জায়গায় যেতে হয়েছিল। মেসে চিঠিটা প'ড়ে ছিল ম্যানেজারের কাছে। মেসে দু মাস যাওয়া হয় নি তো।

তীব্র কটাক্ষক্ষেপ ক'রে তিনু বললে, যেখানেই থাক, ঠিকানা একটা ছিল তো? ম্যানেজার চিঠি পাঠিয়ে দেয় নি কেন?

ওকে ঠিকানা জানানো হয় নি।

মুখ টিপে হেসে তিনু বললে, পাছে বাড়ির খবর কিছু পৌঁছে যায় এই ভয়ে! শুনুন কাকীমা, কি রকম কথা!

মাও ছেলের দিকে সক্ষোভ দৃষ্টিপাত করলেন একবার, বললেন, ওর কথা যেতে দাও মা। বল, কি হয়েছিল ওর?

তিনু বললে, মাথা ফেটে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর।

মাথা ফাটল কি ক'রে?

মুসলমানদের সঙ্গে মারামারি ক'রে। লতু লিখেছিল, আর একটু হ'লে বাঁচত না।

মা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, সে কি মা! আমাকে তো কিছু বল নি!

তিনু বললে, কি ক'রে জানব কাকীমা যে, আমাদের ইনি।

লতু তো নাম লেখে নি, লিখেছিল, ওর এক বন্ধুর মাস্টার মশায়ের এমনই হয়েছে।

লতু বললে, আমি তো নাম জানতাম না, ওঁকে মাস্টার মশায় ব'লেই ডাকতাম সবাই। সমরেশকে বললে, আপনাকে তো আবার পুলিসে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, না? মীরা লিখেছিল।

ভ্রূ কুঁচকে উৎসুক কণ্ঠে তিলু বললে, মীরা কে?

লতু বললে, ডাঃ রায়ের মেয়ে, ওকেই পড়াতেন উনি।

মা সভয়ে বললেন, এর ওপর আবার পুলিসে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল?

তিলু বললে, গুণ্ডামি করলে ধরবে না? সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, তা জেল থেকে খালাস পেলে কখন?

সমরেশ বিরক্তির সঙ্গে বললে, জেল হয় নি, ছেড়ে দিয়েছিল।

গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলে তিলু, কতদিন পরে?

জবাব দিলে লতু, এক মাস নাকি আটকে রেখেছিল।

মা কেঁদে ফেললেন, বললেন, এ ছেলে নিয়ে আমি কি করি মা! জেলে জেলেই কাটাবে নাকি!

তিলু সহানুভূতি জানিয়ে বললে, কেঁদে আর কি করবেন কাকীমা? যেমন অদেষ্ট ক'রে এসেছিলেন। লেখাপড়া শিখেও সুমতি যদি না হয়, তা ভগবানের মার ছাড়া আর কি!

মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, মিথ্যে আমাকে বাঁচিয়ে তুললে মা! মরলে বেঁচে যেতাম; বেঁচে থেকে আরও কত কি দেখতে শুনতে হবে, কে জানে!

ব'লে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন মা। তিলু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, এবারে কি পরীক্ষা দেবার সময় হয়েছে? জিজ্ঞেস করেছেন ওকে?

মা মাথা নেড়ে বললেন, না মা। এসে থেকে তো ঘুমোচ্ছে। কখন জিজ্ঞেস করব? তুমিই কর না।

জবাব দিলে লতু, পরীক্ষা দিয়েছিলেন, পাস করেছেন।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিলু বললে, তুই জানলি কি ক'রে?

মীরা লিখেছিল।—জবাব দিলে লতু।

তিনু স্নেহের স্বরে বললে, ওর জন্তে এত মাথাব্যথা কেন তার?

লতু বললে, ওর মাস্টার মশায় যে! তা ছাড়া উনি যা করেছিলেন, ওঁর জন্তে পাড়ার সবারই মাথাব্যথা।

তাই নাকি!—ব'লে মুচকি হেসে আড়চোখে সমরেশের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনু।

সমরেশ বললে, মা, একটু চা-টা দেবে, না, ব'সে ব'সে ওই সব বাজে কথা শুনবে?

মা বললেন, বাজে কথা নয় বাছা। তিনু বাজে কথা বলবার মেয়ে নয়। কই, দেখি তোর মাথাটা—

সমরেশ বললে, কিছু নয় বলছি যে! সামান্য কি একটু হয়েছিল। মেয়েদের তিলকে তাল করা অভ্যাস, বিশেষ ক'রে—। কথাটা শেষ না ক'রেই বললে, নামটা মিথ্যে রাখি নি।

তিনু সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, আমিও নামটা মিথ্যে রাখি নি।

লতু সোৎসুক কণ্ঠে তিনুকে জিজ্ঞেস করলে, কি নাম মাসী?

সমরেশ জবাব দিলে, তাল, তালোত্তমা।

তিনু বললে, ভোঁদা, ভোঁদড়।

লতু হেসে চোখ ডাগর ক'রে ভ্রূ নাচিয়ে বললে, আপনার ওই নাম! মীরাকে লিখতে হবে তো—তোমাদের পাড়ার বীরপুঙ্গব আমার ভোঁদু মামা। ও যা মেয়ে, চিঠি পেয়েই পাড়ায় ঢাক পিটিয়ে দেবে।

সশঙ্কে সমরেশ বললে, না না, ওসব লিখো না।

তিনু বললে, লিখে দিস তো লতু! ওর লম্বা-চওড়া শরীরটার পরিচয় সবাই পেয়েছে, মগজের খবরটাও দিয়ে দিস তো।

মা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে এদের কথা শুনছিলেন; শেষে বললেন, আমি, মা, ওকে আর কলকাতা যেতে দেব না; যদি বাবার নাম করে তো ওর পায়ে মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হব।

মা সমরেশের মাথার কথাটা ইতিমধ্যে ভুলে বসেছিলেন, তিনু স্মরণ করিয়ে দিলে, ওর মাথাটা দেখব বলছিলেন যে।

মার মনে পড়ল, বললেন, ঠিক বলেছ মা। সমরেশকে বললেন, দেখি, কাছে স'রে আয়।

সমরেশ মায়ের কাছ থেকে একটু দূরে স'রে ব'সে বললে, বলছি যে এমন কিছুই নয়, কেবল পরের কথা শুনে—

তিনু মুখ গম্ভীর ক'রে লতুর দিকে তাকিয়ে বললে, বেশি কিছু নয়! তুই তবে মিছে কথা লিখেছিলি?

লতু প্রতিবাদ করলে, বেশি নয় আবার কি? মিঃ রায় ডাক্তার হয়েও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। দেখ না তুমি, ডান কানের কাছাকাছি দেখবে।—ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

তিনু বললে, তোকে দেখাতে হবে কেন? ও-ই দেখাক না। মা এত ক'রে বলছেন; বড় হয়েছে ব'লে এত অবাধ্য হওয়া উচিত নাকি?

মা বললেন, তুই দেখা তো দিদি। তোর তো মামা, লজ্জা কি?

লতু কাছে এসে সমরেশের মাথা নীচু ক'রে চুল চিরে সকলের সাগ্রহ দৃষ্টির সামনে দেখিয়ে দিলে, মাথার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লালচে রঙের স্থূল অমসৃণ বিদারণ-রেখা।

মা আতঙ্কে ব'লে উঠলেন, ও মাগো! কি সর্বনাশ হয়েছিল গো!

তিনুও ব'লে উঠল, উঃ, এ যে সাংঘাতিক!

মা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন; তিনুর দিকে তাকিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কি হয়ে যেত মা! কিছু জানতে পর্যন্ত পারতাম না।

তিনুর মুখে নামল মেঘ; চোখে সজলতার আভাস; মুখে কিছুই বললে না।

সমরেশ বললে, কবে কি হয়ে গেছে, তাই নিয়ে হৈ-চৈ করবে নাকি তোমরা?

মা বললেন, যদি সর্বনাশ হয়ে যেত বাছা?

সমরেশ বললে, হয় নি তো কিছু। আর যদি হ'তই, দেশের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে তোমার ছেলে প্রাণ দিয়েছে ব'লে তুমি গর্ব করতে মা। পুরুষদের পক্ষে এর চেয়ে গৌরবময় মৃত্যু আর কি আছে?

মা চুপ ক'রে রইলেন। জবাব দিলে তিনু, দেশের মা-বোনদের জন্যে

প্রাণ দেওয়ার গৌরব কে অস্বীকার করছে? কিন্তু নিজের মায়ের মুখের দিকেও তাকাতে হবে তো! মা বললেন, বল তো বাছা, বুঝোও দেখি ওকে। ও যে পনেরো বছর বয়স থেকে বনের মোষ তাড়াতে মত্ত হয়ে রইল, মায়ের দিকে ফিরে তাকালে না, বিধবা বুড়ী মায়ের কেমন ক'রে দিন কাটছে খবর নিলে না; ওর কি এগুলো কর্তব্য নয়? বেটা-ছেলে, লেখাপড়া শিখে ঘর-সংসার করবে,রোজগার করবে, পিতৃপুরুষের নাম রক্ষা করবে, এই তো দেখে এসেছি চিরদিন। শহরে এত ছেলে রয়েছে, কে ওর মত বৈরাগী বাউলের মত ঘর ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ও যদি এমন করে বাছা, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে স্বামীজীর আশ্রমে গিয়ে বাস করব। কিসের জন্যে এ সংসারে বাঁধা থেকে ইহলোক পরলোক দুই-ই নষ্ট করা?

তিনু বললে, যে বুঝবে না, তাকে বুঝিয়ে কি হবে কাকীমা?

সমরেশ বললে, তোমরা কি এমনই সমানে চাপান-উতোর চালাতে থাকবে নাকি সন্ধ্যে পর্যন্ত? একটু চা-ও খেতে দেবে না? না দেবে তো ব'লে দাও বাপু, আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি।

মা বললেন, যাচ্ছি বাছা, সামলাই আগে। বুকের ভেতরটা এখনও কাঁপছে, আমার হাত-পা আসছে না।

তিনুকে বললে সমরেশ, তাই তিনুই একটু চা ক'রে খাওয়াও না! স্বামীজী-টামিজী না হ'লেও নেহাৎ পাপিষ্ঠ তো আর নই।

লতু ইতিমধ্যে গিয়ে মাসীর পাশে ব'সে মুখের ভাব যথাসম্ভব গম্ভীর করে ব'সে ছিল। তাকে উদ্দেশ ক'রে সমরেশ বললে, লতুও তো একটু চা ক'রে খাওয়াতে পার। তখন তো খুব সেবা করেছিলে। এখন একটু চায়ের জন্যে ট্যা-ট্যা করছি, শুনেও গ্যাঁট হয়ে ব'সে আছ!

লতু লজ্জিত মুখে বললে, যাব মাসী? উনুনে আঁচ আছে দিদিমা?

তিনু বললে, থাক্, তোকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

মা বললেন, কিছু খাবারও ক'রে দিতে হবে মা। দুপুরে কিছু খেতে পারে নি। আমিও যাই, চল্।

তিনু বললে, তা হ'লে তুইও চল্, লতু। লুচি ভেজে দিই খান-কতক, তুই বেলে দিবি চল্। সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, বাড়ি থেকে পা

বাড়িয়েই যে একেবারে সব ভুলে যায়, তার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে করে না। মা বললেন, অমানুষকে ওসব ব'লে লাভ কি মা?

তিনু আর একবার সমরেশের দিকে কটাক্ষে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

লতু মুখ টিপে হাসতে লাগল।

ওরা চ'লে যাবার পর একটা ডেক-চেয়ার বের ক'রে সমরেশ বারান্দায় ব'সে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মা ডাক দিলেন, ওখানে একলা ব'সে রইলি কেন? এখানে আয় না। তিনুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, একালসেঁড়ে মানুষ, একা থাকবে না তো কি করবে?

মায়ের চিরন্তন সায় শোনা গেল, যা বলেছ বাছা।

সমরেশ গিয়ে দেখলে, রান্নাঘরের বারান্দায় মা লতুর সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করছেন। তিনু রান্নাঘরের ভেতরে ব'সে লুচি বেলছে ও ভাজছে। জানলার ফাঁক দিয়ে তিনুর মুখের দিকে তাকালে সমরেশ। আগুনের আঁচে মুখটি লাল হয়ে উঠেছে; কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

তিনু হঠাৎ মুখ তুলে তাকালে তার দিকে, চোখাচোখি হবামাত্র মুখ নামিয়ে নিলে। বুড়ী ঝি এক পাশে ব'সে মসলা পিষছিল। তাকে দেখে হাত ধুয়ে এসে আসন পেতে দিলে।

মায়ের কাছে ব'সে সমরেশ বললে, লতু ব'সে ব'সে গল্প করছ, মাসীকে সাহায্য করছ না?

লতু আবদেরে নাকী সুরে বললে, তা কি করব! গেলুম তো, মাসীমা যে বারণ করলেন।

সমরেশ বললে, তোমার মাসী বারণ না করলে তুমি পারতে লুচি বেলতে? তোমাদের কলেজে ওসব শেখানো হয় নাকি?

লতু বললে, কলেজে আবার ওসব শেখা যায় নাকি! বাড়িতে শিখেছি। কাকীমা আমাদের ওসব বিষয়ে ভারি কড়া। আমাদের বোনদের পালা ক'রে সপ্তাহে একদিন রান্নাঘরের কাজ করতে হয়।

মা বললেন, কলেজে পড়লেই বা বাছা। যারা কাজের মেয়ে,

তারা লেখাপড়াও শেখে, ঘর-সংসারের কাজকর্মও করে। ওই যে আমাদের তিনু; বি.এ. পাস করেছে; কিন্তু কাজে-কর্মে ওর কাছে কেউ দাঁড়াক দেখি।

সমরেশ লতুকে বললে, কলকাতায় কাকার বাড়িতে থাকতে বুঝি? নিজের কাকা?

লতু বললে, বাবার নিজের খুড়তুতো ভাই।

কলকাতা থেকে তোমরা কি সবাই চ'লে গিয়েছিলে?

কাকা, কাকীমা আর দুজন দাদা কলকাতায় ছিলেন। আমরা, বোনরা আর ছোট ছোট ভাইরা চ'লে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের এক পিসীমা। গত পুজোর ছুটিতে সবাই গিয়েছিলেন। পুজোর পর বাবা ছুটি নিয়ে এলেন। তারপর থেকে উনিই আমাদের কাছে ছিলেন।

জামাইবাবু ছুটি নিয়েছেন বুঝি?

এক বছরের ছুটি নিয়েছেন। পাওনা ছিল অনেক ছুটি—

উনি এলেন না তোমাদের সঙ্গে?

উনি কলকাতায় চ'লে গেলেন পিসীমাকে পৌঁছে দিতে। তা ছাড়া আর কি কি কাজ আছে সেখানে।

তুমি তা হ'লে এখন কলকাতায় ফিরছ না?

লতু চুপ ক'রে রইল।

সমরেশ বললে, পড়াশোনায় ইতি ক'রে দিলে তা হ'লে?

ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিলে তিনু, জামাইবাবুর আর পড়াবার ইচ্ছে নেই। ছুটির মধ্যে ওর বিয়ে দেবেন উনি।

সমরেশ বললে, বর ঠিক হয়ে গেছে নাকি?—ব'লে লতুর মুখের দিকে তাকালে। লতু লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

তিনু বললে, ঠিক কিছু হয় নি। কথাবার্তা চলছে এক জায়গায়।

মা ব'লে উঠলেন, হ্যাঁ রে, তপনকে চিনিস?

সমরেশ বললে, হ্যাঁ, চিনি।

তপনকে চেনে বইকি সমরেশ। বয়সে তার চেয়ে বছর কয়েকের ছোট। একসঙ্গে এক বছর এম.এ. ক্লাসে পড়েছিল। বড়লোকের

ছেলে; বাবা ছিলেন এ শহরের সেরা উকিল। চমৎকার চেহারা। গলাখানিও চমৎকার; নিখিল-ভারতীয়-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় আধুনিক সঙ্গীতে সর্বপ্রথম হয়েছিল একবার। হাব-ভাব চাল-চলন মেয়েদের মনোরঞ্জক। কলেজের ছাত্রী-মহলে একচ্ছত্র প্রতিপত্তি ছিল তার। ক্লাসের দুর্ধর্ষ মেয়েরাও, যাদের একটি কটাক্ষের আঘাতে ক্লাস সুদ্ধ ছেলে কাবু হয়ে উঠত, যাদের হাসির উত্তাপে কড়া অধ্যাপকরাও নরম হয়ে উঠতেন, তারাও মন্ত্রমুগ্ধ সর্পীর মত তার সামনে নেতিয়ে পড়ত। নিত্য নূতন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করা ছিল তার পেশা ও নেশা। কিন্তু পরিচয়ে প্রণয়ের রঙ ধরতে না ধরতেই স'রে পড়ত। মেয়েটি ভুল ভেঙে ব্যথা-ভরা চোখে তাকিয়ে দেখত, তপন আর একজন নূতন মেয়ের সঙ্গে খেলা শুরু করেছে। ফুঁসিয়ে উঠে তপনকে দংশন করতে পারত না কেউ। কাছে গেলেই তপনের সহজ অকুণ্ঠ ব্যবহারে নিজের ভুলের জন্যে লজ্জা পেত।

তিনু বাইরে এসে খাবারের থালা নামিয়ে দিলে সমরেশের সামনে। ঝিকে বললে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিতে। নতুকে বললে, তুই চা-টা করুগে দেখি।—ব'লে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে লাগল।

মা বললেন, ভারি গরম, না, মা? আমার কাছে এসে ব'স্। তিনু বসল মার কাছে। নতু চা করবার জন্যে ভেতরে চ'লে গেল। মা মৃদুকণ্ঠে বললেন, তপনের সঙ্গে নতুর বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে? তিনু বললে, ঠিক হয় নি এখনও। কথাবার্তা চলছে। রায় বাহাদুর তো তপনবাবুকে দেখবার জন্যে ওখানে গিয়েছিলেন। ছিলেনও মাসখানেক। তখন জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। নতুকে দেখে রায় বাহাদুরের নাকি খুব পছন্দ হয়েছে। তপনবাবুর মায়েরও অনিচ্ছা নেই।

মা বললেন, তপন বেশ রোজগার করে তো?

তিনু বললে, করেন তো শুনি। তবে রোজগার করার তো ওঁদের দরকার নেই কাকীমা। খুব বড়লোক ওঁরা। জমিদারি আছে, কলিয়ারি আছে, অনেক টাকা আয় মাসে।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ হবে মা। মা-মরা মেয়ে সুখী হোক।

তিলু বললে, মা-মরা মেয়েদের জীবনে সুখ খুব আশা করা যায় কি কাকীমা?

মা বললেন, কেন যায় না মা? খুব যায়। আমি বলছি মা, ও সুখী হবে। আর তুমিও সুখী হবে মা।—ব'লে সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন।

সমরেশ বললে, তপন তো প্রতুলদের সঙ্গে কাজ করছিল, না?

তিলু বললে, দিন কতক ঘাড়ে ভূত চেপেছিল ওঁর। তা রায় বাহাদুর ভূত নামিয়েছেন।

সমরেশ বললে, যাব একবার প্রতুলের কাছে।

ব্যঙ্গের স্বরে তিলু বললে, যাবে বইকি! পুরোনো বন্ধু! জায়গা খালি আছে এখনও। প্রতুলকে একটু ধরলেই ভর্তি ক'রে নেবে।

মা বিরক্তির স্বরে বললেন, কারও দলে আর ভর্তি হয়ে কাজ নেই বাছা। কতদিন পরে বাড়িতে এসেছিস, দিন কয়েক বাড়িতেই থাক্।

তিলু মুখ টিপে হেসে বললে, পরদুয়োরী মানুষ, ঘরে টিকতে পারবে কেন কাকীমা?

যা বলেছ মা! কি ক'রে যে ওকে ঘরে বাঁধি, ভেবে আর কূল পাই না আমি।

খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে সমরেশ দেখলে, তিলু এক-দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে কি আছে তিলুর? আছে কি ওর অন্তরের আকুল আহ্বান? ওর দৃষ্টি কি সহস্ররেখায় টানতে চায় তাকে ওর একান্ত পাশে, ওর জীবনের একেবারে মধ্যবিন্দুতে? চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না সমরেশ।

হঠাৎ তিলুর দৃষ্টি পিছলে গেল; সামনে থেকে উর্দ্ধায়িত হ'ল। মুখ ফিরিয়ে সমরেশ দেখলে, পিছনে দাঁড়িয়ে আছে লতু, হাতে চায়ের পেয়ালা।

লতু পেয়ালাটা সমরেশের সামনে নামিয়ে দিতেই সমরেশ তা তুলে নিলে; তাড়াতাড়ি এক চুমুক খেয়ে বললে, চমৎকার চা করেছ তো লতু!

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

ছাব্বিশে জানুয়ারি

(পূর্বানুবৃত্তি)

৬

এই প্রসঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাটাও আলোচনা করা দরকার। আর্থিক নীতি নির্ধারণ তো ফাঁকা আকাশে হয় না, বাস্তব জগতেই হয়। সুতরাং বাস্তব জগতে যদি এমন এমন ঘটনা ঘটিতে থাকে যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্ত পরিবেশই বদলাইয়া গেল, তাহা হইলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চেহারাও বদলাইতে বাধ্য। আমরা ধরিয়া লইলাম, চার পাশে এখন শান্তি থাকিবে, দেশের লোক দেশের উন্নতির জন্য একমনে কাজ করিতে পারিবে, সেই অনুসারে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করিলাম, কাজ শুরু করিলাম। কিন্তু কিছু সময় কাটিতে না কাটিতেই দেখা গেল যে, চার পাশে শান্তি নাই, স্থির মনে কাজ করিবার উপায় নাই, নানা গণ্ডগোল লাগিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় পূর্বের পরিকল্পনা অব্যাহত থাকিতে পারে না। বর্তমান অবস্থায় ঘটিয়াছেও তাহাই। স্বাধীনতা লাভের সময় আমরা যে আশায় কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল অন্য নানা-রকম সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। বাস্তুহারাদের সমস্যা, কাশ্মীরের সমস্যা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানা ব্যাপারে আমরা জড়াইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং সে সমস্যাগুলিকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিলে তাহা সফল হইবে না, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথাও ভাবিয়া রাখিতে হইবে।

আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিতে গেলে দুইটি কথা বিশেষ করিয়া ভাবিতে হয়। প্রথম হইল, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গতি মোটামুটি কোন্ দিকে যাইতেছে ও যাইবে। দ্বিতীয় হইল, ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক। পাকিস্তান পরিস্থিতি এক হিসাবে—এক হিসাবে কেন মূলতও—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হইতে বিচ্যুত নহে। এমন কি, পাকিস্তানের শরিয়তী চেহারা বাদ দিলে বাকিটা সবই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সহিত গভীরভাবে সংযুক্ত, কারণ পাকিস্তানের জন্মই আন্তর্জাতিক কূটকৌশলের প্রয়োজনে।

জগতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেরূপ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে

মুখে যতই সদ্ভাব থাকুক না কেন, ইংলণ্ড আমেরিকা এবং রুশিয়ার মধ্যে যে গভীর মতৈক্য আছে তাহা নাই, বরং পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে দুইটি power-bloc আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আণবিক বোমা উদজান বোমা তৈরি হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু এ অবস্থায় বার বার ঘোষণা করিয়াছি যে, আমরা কোনও power-blocএই যাইব না, আমরা এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিব। আমরা কার্যক্ষেত্রেও তাহাই করিতেছি।

অবশ্য এই নীতির স্বপক্ষে বহু কথা বলিবার আছে। আমরা কোন্ দলে যাইব? রুশিয়ার আদর্শ লোককে আকৃষ্ট করে। জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বৈষম্য থাকিবে না—এ কথায় কাহার মন না আকৃষ্ট হয়? কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, রুশিয়ার দলে যাওয়া মানে শুধু তো রুশিয়ার আদর্শকে গ্রহণ করা নয়, কমিন্‌ফর্মের হুকুম অনুসারে চলা। সে ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতাই বা বজায় রহিল কই? লণ্ডনের বদলে মস্‌কো হইতে শাসিত হইলে কি আমাদের আর কোনও অভিযোগ রহিল না? সুতরাং যদি সেভাবে রুশিয়ার দলে যোগ দিতে না পারি, তাহা হইলে কি ইংলণ্ড-আমেরিকার দলে যোগ দিব? এখানেও তো সেই একই কথা। শুধু বন্ধুভাবাপন্ন থাকিলে কি দলে যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ হইল? ইতিমধ্যেই তো অভিযোগ উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, পণ্ডিত নেহরুর নীতির ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে আমেরিকার নীতি ব্যাহত হইতেছে। সুতরাং এই অবস্থায় কাহার সঙ্গে যোগ দিব? বরং তাহার চেয়ে বলা ভাল, আমরা কোনও পক্ষেই যোগ দিলাম না, সকলের প্রতিই আমরা সমান বন্ধুভাবাপন্ন।

কিন্তু ইহার আরও একটা দিক আছে। বর্তমান অবস্থায় এইরকম নিরপেক্ষতার নীতি নিছক যুক্তির দিক দিয়া ঠিক হইলেও বাস্তবতার দিক দিয়া ইহার আরও একটা দিক ভাবিবার আছে। তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের যে রকম আভাস পাওয়া যাইতেছে এবং তাহার গোড়াপত্তন যে ভাবে শুরু হইয়াছে, এই ভাবে যদি চলিতে থাকে তাহা

হইলে বড় বড় দুইটি power-blocএর মধ্যে তফাত আরও বাড়িবে। সেই অনুসারে গোটা জগৎ দুই দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে, তখন আর নিরপেক্ষ থাকা অধিকাংশ দেশের পক্ষেই সম্ভব হইবে না। জগতের সুদূর কোণে হয়তো দুই-একটা ছোটখাট দেশ নিরপেক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত বড় দেশ এবং strategic areaতে অবস্থিত দেশের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন। অন্তত ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিলেও যাঁহারা যুদ্ধ করিবেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে চাহিবেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই চাহিবেন যে ভারতবর্ষ পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে নামুক, তাহা না হইলে তাঁহাদের যুদ্ধ সফল হওয়া কঠিন।

আমরা যদি তাঁহাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করি, তাহা হইলে ফল কি হইতে পারে? ইতিহাস তো বড় নির্মম ব্যাপার, সেখানে দয়ামায়ার স্থান নাই, সেখানে কেউই ভদ্রতা করিয়া বলিতে আসিবে না, আহা, ভারতবর্ষ নূতন স্বাধীন হইয়াছে, যদি ভারতবর্ষ না চায় তবে যুদ্ধ না-ই করিল, আমরা ভারতবর্ষকে বাদ দিয়াই যুদ্ধে নামি। বরং চেষ্টা হইবে, প্রাণপণ চাপ দিয়া ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাইবার। তাহার জন্য যত কিছু চাপ সবই পড়িবে।

যদি আমরা সে সমস্ত চাপ সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে কোন কথা নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইল, আমরা সে চাপ সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব কি না? কথাটি খুব ধীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমত এখন পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলেও স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যে রকম উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রয়োজন তাহা গড়িয়া তুলিতে পারি নাই, একদিনে তাহা হওয়া সম্ভবও নহে। আমাদের নৌবাহিনী বিমানবাহিনী নিতান্তই ছোট, এখানে কোনও মোটর-এরোপ্লেনের কারখানা নাই, সমরোপকরণও এ দেশে খুব কমই তৈরি হয়। এ সব বিষয়েই আমাদের নির্ভর করিতে হয় অন্যান্য দেশের উপরে, কিছুকাল ধরিয়া এখন নির্ভর করা ছাড়াও উপায় নাই। যদি বুঝিতাম যে আমরা অস্ত্রেশস্ত্রে এমন প্রস্তুত যে, কোনও দেশ আমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করিবে না, দিলেও আমরা তখনই

তাহা আটকাইতে পারিব, তাহা হইলে আমরা বুক ফুলাইয়া আমাদের নিরপেক্ষতার নীতি জাহির করিতাম, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। বরং সে ক্ষেত্রে জগতের শান্তি আমরাই বজায় রাখিতে পারিতাম। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বলসঞ্চয় করিতে পারিতেছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের উপর মোক্ষম চাপ দেওয়া অন্য দেশের পক্ষে খুবই সহজ।

দ্বিতীয়ত আরও একটা চাপ দিবার সুবিধা হইয়াছে পাকিস্তান হইয়া। এইজন্যই পাকিস্তানের কথা আলোচনা করিতে গেলে তাহার মর্মার্থ ভাল করিয়া বোঝা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সেইজন্যই তিনটি কথা খুব পরিষ্কার করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

প্রথম কথা হইল এই যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গণ-আন্দোলনের ফলে এবং ইতিহাসের নিয়মে আসিয়াছে। সে স্বাধীনতা জোর করিয়া আদায় করা। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের জন্ম এবং স্বাধীনতা এ রকম কোনও গণ-আন্দোলনের ফল নহে। যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তুলিয়া সাম্রাজ্যবাদ চিরকাল আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ বাড়িতে বাড়িতেই আজ দেশ-বিভাগে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শাসকদের প্রতিকূলতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—পাকিস্তানের স্বাধীনতা শাসকদের অনুকূল দাক্ষিণ্যের ফলে ঘটিয়াছে। তাহার প্রতিকূলতা বরং ভারতবর্ষেরই সঙ্গে, যা কিছু ভারতবর্ষের আদর্শ তাহার সঙ্গে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সেইজন্য একটা positive বস্তু, পাকিস্তানের স্বাধীনতা কেবলমাত্র incidental—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘটিল বলিয়াই পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘটিল। বরং ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া অতিরিক্ত শক্তিশালী হইয়া না উঠিতে পারে, সেইজন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি।

ইহা হইতে কতকগুলি জিনিস খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটিতেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাধীন হইয়াছে বলিয়াই তাহার শত্রু অনেক। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল আমাদের স্বাধীনতাকে ভাল

চোখে দেখেন না। শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের চেয়ে একটু বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা ইতিহাসের গতি বোঝে, সেইজন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় আপত্তি করে নাই। কিন্তু মার্ক্স বহুপূর্বেই বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের শ্রমিক সম্প্রদায় এক অদ্ভুত পদার্থ, সোনার পাথরবাটি। সেইজন্ত শ্রমিকদল আমাদের স্বাধীনতায় আপত্তি করে নাই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে চিরকাল ইংলণ্ড পাকিস্তানের সাহায্যে ভারতবর্ষকে চাপ দিতে পারে, সে যে দলই ইংলণ্ড শাসন করুক না কেন। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র বিমান ঠিক সমানভাবে হইয়াছে,—আমাদের তিনটি জেটবিমান দেওয়া হইয়াছে, পাকিস্তানকেও তিনটি জেটবিমান দেওয়া হইয়াছে। নৌবাহিনীর বেলাতেও বোধ হয় তাই। কিন্তু উপকরণ সরবরাহে এই রকম সমান ওজনে বিচার করাটাই সব কথা নহে। ভারতবর্ষের প্রতি যে সন্দেহ এবং যে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ আছে, পাকিস্তানের প্রতি সে সন্দেহ এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাই—এ কথাটা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল। তাহার প্রথম কারণই হইল পাকিস্তানের জন্ম সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে, তাহার স্বাধীনতা incidental, সে সারা জগতের চাপ সহ্য করিয়াও বলে না যে, সে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ভারতবর্ষ কোন্ দিকে যোগ দিবে তাহার স্থিরতা নাই, সে যখন তাহার নিজস্ব নীতি ত্যাগ করিতে চায় না, সে যখন জোর করিয়া স্বাধীনতা আদায় করিয়াছে, পক্ষান্তরে পাকিস্তানের যখন এই সব বালাই নাই, তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রশক্তি কাহাকে বেশি নেক্‌নজরে দেখিবেন, তাহা বোঝা বেশি কঠিন নয়।

দুঃখের বিষয়, বার বার রূঢ় অভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও আমরা এই কথাটি বুঝিতে চাহিতেছি না। কাশ্মীরের ব্যাপারে কি আমরা ইহার পরিচয় পাই নাই? হানাদারদের নাম করিয়া পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিল, অথচ এখন দুই দেশেরই সমান বিচার হইতেছে। এই আক্রমণের কথাটার জবাব যুক্ত জাতিসংঘ দিতেছেন না—এ অভিযোগ তো পণ্ডিত নেহরু নিজেই করিয়াছেন। ইহার

মধ্যে তো অন্য কোনও কথা নাই—হানাদারদের নাম করিয়া পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে—হয় তাহাদের সমস্ত সৈন্য সরাইয়া লইতে বাধ্য করা হউক, না হয় যুক্ত জাতিসংঘ পরিষ্কার বলিয়া দিন যে তাঁহারা পাকিস্তানকে কথা শোনাইতে অপারগ—ইহা ছাড়া তো অন্য কোনও পথ নাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তো তাহা হইতেছে না। ভারতবর্ষকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিচার করা হইতেছে, আপোস মীমাংসা সালিশীর নানা প্রস্তাব উঠিতেছে—এমন কি ধীরে ধীরে পাকিস্তানের স্বপক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। পণ্ডিত নেহরুকে ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন দেশ যতই সম্মান দিক না কেন, তাহাতে তাহাদের রাষ্ট্রগত নীতি তো কিছু বদলাইতেছে না, বরং ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে যত রকম সম্ভব চাপ দিবারই চেষ্টা হইতেছে। পূর্ববঙ্গে এ রকম অমানুষিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল, সেটা বড় হইল না, কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষে যে কিছু ঘটনা ঘটিল সেটাকে বড় করিয়া ধরিয়া ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে সমপর্যায়ে ফেলিয়া বিদেশের কাগজে আলোচনা শুরু হইল। সেদিন তো ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্রীযুত কেসকর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বি. বি. সি. হইতে কাশ্মীর হানাদারদের নেতাকে বক্তৃতা দিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, অথচ এ সব বিষয়ে ভারতবর্ষের তরফ হইতে বক্তৃতা দিতে দিবার সুযোগ দূরে থাক্‌, ভারতবর্ষের সরকারী বিবৃতিগুলির পর্যন্ত কোনও উল্লেখ বি. বি. সি. হইতে হয় নাই। অন্যান্য দেশেও ভারতবর্ষের প্রতি এ রকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইয়াছে ও হইতেছে—এ কথা শ্রীযুত কেসকর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুকে আমেরিকা যথেষ্ট সম্মান দেখানো সত্ত্বেও আমেরিকা হইতেই অভিযোগ উঠিতেছে যে, পণ্ডিত নেহরু আমেরিকার আন্তর্জাতিক নীতি কার্যকরী করিবার পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে এরূপ প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যাইবে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা তো স্বাভাবিক। যে দেশের জন্য আমার প্রয়োজনে, যে দেশ নিজস্ব কোনও নীতির খাতিরে আমার মতে মত দিতে অস্বীকার করে না, যে দেশ হাতে থাকিলে আমি ভারতবর্ষকে চাপ দিতে পারিব, আমি সে দেশের পক্ষে না গিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে যাইব কেন?

পাকিস্তানের কথা যখন আমরা ভাবি তখন আমাদের এই দিকটা সর্বদা মনে রাখা দরকার। ইহাই হইল প্রথম কথা। তাহার সঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। সেটি হইল এই যে, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন ঐ নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তেমনই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাহার নীতি ভারতের প্রতিকূল হইতে বাধ্য। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য যে চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদীরা শুরু করিয়াছিলেন তাহাই ক্রমে বড় হইতে হইতে পাকিস্তানে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাসের পরিণতিতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ আজ যদি পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, ইতিহাসেরই নিয়মে পাকিস্তান সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শকে বাধা দিবার চেষ্টা করিবে, ইহা সত্য—তা না হইলে ইতিহাসই মিথ্যা হইয়া যায়।

তৃতীয়ত এই সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে পাকিস্তানের শরিয়তী রূপ। ইহা তাহার নিজস্ব। পাকিস্তান ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহা বর্তমান গণতান্ত্রিক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নহে, তাহা ইসলামের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। তাহার ফলে যে বৈষম্য, যে ধর্মান্ধতা, যে পরমতাসহিষ্ণুতা হওয়া অনিবার্য, তাহারই ভয়াবহ রূপের পরিচয় আমরা পাইতেছি। পশ্চিম-পাকিস্তানে ইহার আস্বাদ আমরা পূর্বেই পাইয়াছিলাম, এখন পূর্ব-পাকিস্তানে তাহার আস্বাদ পাইতে শুরু করিয়াছি। এ বিষয়ে নূতন করিয়া আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ সারা বাংলা ইহার ফলে মর্মান্তিক আর্তনাদ করিতেছে, ইহার নিদারুণ আঘাত আমাদের বুকে অত্যন্ত সাম্প্রতিক।

৭

অবস্থা তো দাঁড়াইয়াছে ইহাই। এ বিষয়ে নানা রকম আলাপ-আলোচনা হইতেছে, সকলেই এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু তবু মনে হয়, এত আলাপ-আলোচনার মধ্যেও সমস্যাটির আসল মৌলিক রূপটি ধরা পড়িতেছে না,—সেইজন্য আমরা এদিক্ ওদিক্ হাতড়াইতেছি বটে, কিন্তু ঠিক কোনও সমাধানে আসিতে পারিতেছি না। তাহার ফলে জনসাধারণও বিভ্রান্ত হইতেছে,

তাহারা সাময়িক উত্তেজনা-বশে নানা রকম কাজ ও অকাজ করিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এ রকম গভীর সংকট আমাদের জাতীয় জীবনে আর কখনও আসিয়াছে কি না সন্দেহ। সেইজন্য পূর্বে জনসাধারণকে এ বিষয়ে যত ভাবিতে হইয়াছে এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভাবিতে হইবে, পূর্বে নেতাদের যে সংকট তরণ করিতে হইয়াছে তাহার চেয়ে এখন অনেক বড় সংকট তরণ করিতে হইবে—পূর্বে যতটা নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল এখন তার চেয়ে আরও অনেক বড় নেতৃত্বের প্রয়োজন হইয়াছে।

এ কথা অত্যুক্তি নয়। এই প্রবন্ধে যে কথাটা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতেই ইহা বোঝা যাইবে। এক দিকে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপের দিকেই যাইবে, উন্নতির পথে যাইবে না—ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যদি তাহার উপর রাজনৈতিক সমস্যা আরও বাড়ে তাহা হইলে যেটুকু দেশগঠনমূলক কাজ করা সম্ভব হইত তাহাও সম্ভব হইবে না। অন্য দিকে দেশের অবস্থা অবনতির চরমে পৌঁছিয়াছে, দেশের লোকের যে বিপুল আশা হইয়াছিল তাহাও দ্রুত লোপ পাইতেছে, তাহার ফলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় যে সমস্যা ছিল সীমাবদ্ধ, আজ তাহা জগৎময় ছড়াইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় আমাদের সমস্যা ছিল সীমাবদ্ধ। এক দিকে ইংরেজ শাসক ও তাঁহাদের কিছু অনুচর,—অন্য দিকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ। তখন তো কাজ ছিল কেবল ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে চেতনা জাগরিত করিয়া দেওয়া, তাহাদের মনে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা ও সক্রিয় উদ্যম জাগাইয়া দেওয়া। ইহার বেশি কিছু কাজ তখন ছিল না। অবশ্য গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ বার বার বলিয়াছিলেন, সংগ্রামের মধ্যেও আমাদের আরও বেশি কথা ভাবিতে হইবে, আমরা কি ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করিব তাহার রূপ আমাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। আমরা তাঁহাদের শিক্ষা আংশিক গ্রহণ করিয়াছি, সর্বাঙ্গীণ অভ্যাস করি নাই। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা "দোসরা অক্টোবর"

প্রবন্ধে করিয়াছি। ফলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় আমরা গঠন করি নাই, কেবল ভাঙিয়াছি—আমাদের কাজ ছিল দেশের লোকের মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা সঞ্চারিত করা এবং তাহার জন্য তাহাদের সক্রিয় করিয়া তোলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা কারণে অকারণে অহরহ কেজো এবং অকেজো উত্তেজনার সঞ্চার করিতেও দ্বিধা বোধ করি নাই। এইভাবে যখন আমাদের স্বাধীনতা লাভ হইল, মামলা জিত হইল, তখন দেখিলাম আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াও লাভ করি নাই—মামলা জিত হইলেও ডিক্রি জারি দিতে গিয়া নানা ফ্যাসাদ দেখা দিয়াছে। তখন আমাদের দায়িত্ব ছিল না, এখন সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে। তখন যত দোষ সবই পড়িত ইংরেজের ঘাড়ে, এখন আর প্রত্যক্ষত ইংরেজকে কোন দোষ দিতে পারি না। তখন ইংরেজ যাহা করিত তাহা তাহাদের খোলাখুলি করিতে হইত, জগতের সামনে বদনাম তাহাদের প্রকাশ্যভাবে কিনিতে হইত। এখন ইংরেজ আর এখানে গুলি চালায় না, গ্রেপ্তার করে না,—কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দল পাকায়, উস্‌কানি দেয়, চাপ দেয়। পূর্বে অন্য কোনও দেশের সঙ্গে আমাদের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না, এখন সকল রাষ্ট্রের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক, প্রত্যেকেই চায় আমরা তাহার দলে যোগ দিই, না দিলে তাহারা বিরুদ্ধে যাইবে। পূর্বে আমাদের কোনও শরিক ছিল না, এখন পাকিস্তান হওয়ার ফলে আমরা শরিকানি হাঙ্গামায় পড়িয়া গিয়াছি। পূর্বে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র কোনও শরিককে দিয়া আমাদের অসুবিধায় ফেলিতে পারিত না, এখন সে রকম অসুবিধায় ফেলিবার সুবর্ণসুযোগ মিলিয়া গিয়াছে। পূর্বে আমাদের যুদ্ধ করিতে হইত কেবল ইংরেজের সঙ্গে। এখন সংগ্রাম করিতে হইতেছে শুধু ইংরেজের সঙ্গে নয়, জগতের সব কয়টি Power-blocএর সঙ্গে, কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব নীতি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই সে নীতি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনমত আমাদের চালাইবার চেষ্টা করিবেন। পূর্বে যে সমস্যা আমাদের দেশের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা এখন জগতের সীমানায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং যাঁহারা এই সমস্ত সমস্যাকে আলাদা করিয়া দেখিবেন তাঁহারা ভুল করিবেন। কাশ্মীরের সমস্যা আলাদা সমস্যা নহে, সেইখানেই তাহার সীমা শেষ হইয়া যায় নাই। পাকিস্তানের সমস্যা কেবল সাম্প্রদায়িক সমস্যা নহে। পাকিস্তান যদি বুঝিত, এরূপ সাম্প্রদায়িক বর্বরতা ঘটিলে সমস্ত জগৎ তাহাকে চাপিয়া ধরিবে, তাহা হইলে যতই শক্তিশালী রাষ্ট্র হউক না কেন, এ রকম বর্বরতা করিতে সাহসী হইত না। বি. বি. সি.র ঘটনাটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে, ইহাও বৃহত্তর ইতিহাসের পটভূমিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়, জগৎ-ইতিহাসের কামার-শালায় সেই সম্পর্ক গড়িয়া পিটিয়া তৈরি হইবে। সুতরাং এই সমস্যাটিকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে না দেখিলে ইহার প্রকৃত সমাধান করা যাইবে না। সাময়িকভাবে আমরা যাহাই ভাবি বা করি না কেন, সেই সঙ্গে আমরা যদি সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ না বুঝি এবং সেই অনুসারে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করি তবে রোজ রোজ নূতন নূতন সমস্যা ঘটিতেই থাকিবে, কোনদিনই আমরা উদ্ধার পাইব না। আর সেইজন্য পাইতেছিও না।

সেইজন্য আমাদের প্রথমেই পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই যে সমস্ত সমস্যা আমাদের সামনে আসিতেছে ইহার রূপ যতই বিভিন্ন হোক না কেন, মূলত ইহা একই। সে সমস্যা হইল, আমাদের স্বাধীনতার সমস্যা। আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহা বজায় রাখিয়া তাহাকে আরও সুদৃঢ়, সুপ্রতিষ্ঠিত, সজীব ও প্রাণবান করিয়া তুলিতে পারিব কি না! এই কথাটি যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝি, তাহা হইলে আমাদের সমাধানের পথও অন্য রকম হইবে। তখন এক-একটা সমস্যার আলাদা আলাদা সাময়িক সমাধানের চেষ্টা না করিয়া আমরা আরও স্থায়ী ও মৌলিক সমাধানের ব্যবস্থা করিতে পারিব।

আজ যখন দেশের চারিধারে অনুসন্ধান করি তখন দুঃখের সঙ্গে অনুভব করি, এই কথাটা কোথাও কেহ স্পষ্টভাবে বলিতেছে না— ইহার উপলব্ধি নেতাদের উক্তি বা জনসাধারণের কাজে কোথাও

ফুটিয়া উঠিতেছে না। যদি এ কথাটা নেতারা অনুভব করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা তো সমস্ত জাতিকে ডাক দিয়া বলিতেন, আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় যে সঙ্কটে ছিলাম, আজ তাহার চেয়ে অনেক বড় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের স্বাধীনতা আজ অনেক বেশি বিপন্ন। সুতরাং পূর্বে স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতিকে যে চেষ্টা করিতে হইয়াছে, এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছে। সেজন্য পূর্বে যেখানে দু-চার-দশজন লোক স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিলেই চলিত, এখন আর তাহাতে হইবে না—সমস্ত জাতিকে একযোগে নিয়মনিষ্ঠার সহিত সৈনিকের মত অনেক বড় স্বাধীনতা-যুদ্ধে আবার নামিতে হইবে, তাহা না হইলে এই বৃহত্তর সংগ্রাম হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না। কিন্তু সে রকম সর্বাঙ্গীণ ডাক তো এখনও আসে নাই। আসিলেও লোক তাহাতে উপযুক্তভাবে সাড়া দিতেছে কই?

পক্ষান্তরে জনসাধারণেরও এ বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট কর্তব্য আছে। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, বড় দেশ বা বড় জাতির জীবনে যখন গভীর সংকট আসে, তখন সমস্ত জাতি একযোগে একপ্রাণে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে, এক সংকল্পে কাজ করিতে থাকে, তাহাদের প্রত্যেকের মনে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা কঠোর কর্মের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইতে থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময়কার কথা মনে করুন। যখন জার্মানির বিজয়বাহিনী দুর্ধর্ষ বেগে ফরাসী দেশকে মথিত করিয়া দিল, তখন সমস্ত ফরাসী জাতি তো একযোগে উদ্‌বুদ্ধ হইল না! সে সময় চার্চিল ফরাসী দেশে গিয়া দেখিলেন, চারিপাশে গণ্ডগোল শুরু হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে গিয়া চার্চিল লিখিয়াছেন, ফরাসী দেশ তখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে a classic example of order, counter-order, disorder। তাহারই ফলে ফরাসী জাতির পতন দ্রুততর হইল। অন্য দিকে ফরাসী দেশের পতনের পর যখন জার্মানির মুখোমুখি ইংলণ্ডকে একা দাঁড়াইতে হইল, তখন তো অন্য সমস্ত দেশ, এমন কি আমেরিকাতেও অনেকে ভাবিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের শেষ হইয়া আসিল, বড় জোর ছয় সপ্তাহেই ইংলণ্ড শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু

ইংলণ্ডের সত্যকার পরিচয় তাহা ছিল না। সে সময় ইংলণ্ডের মনের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া চার্চিল লিখিয়াছেন : The buoyant and imperturbable temper of Britain...might have turned the scale. Here was this people, who in the years before the war had gone to the extreme bounds of pacifism and improvidence, who had indulged in the sport of party-politics, and who, though so weakly armed, had advanced so light-heartedly into the centre of European affairs, now confronted with the reckoning alike of their virtuous impulses and neglectful arrangements. They were not even dismayed. They defied the conquerors of Europe. They seemed willing to have their Island reduced to shambles rather than give in. (Churchill : *Second World War*, Vol. II, p. 226-27)

এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অটল সংকল্প না থাকিলে শুধু অর্থবল লোকবল বা আমেরিকার সাহায্যে ইংলণ্ড জয়ী হইতে পারিত না, এই রকম দৃঢ়বীর্য হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই ইংলণ্ড সংকট কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। তেমনই যদি আমাদের জাতির সামনে গভীর সংকট আসিয়াছে—এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলেই গোটা দেশ সেই রকম ভাবে এক যোগে অটল প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় সংকল্প লইয়া স্থিরভাবে লক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছে না কেন?

এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ করি। পণ্ডিত নেহরু কিছুদিন পূর্বে পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন (বোধ হয় ১৭।৩।৫০ তারিখে) তাহাতে সকলেই খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন, সংবাদপত্রে তাঁহার যথেষ্ট সমালোচনা করা হইয়াছে, কোনও কোনও বার-লাইব্রেরির উকিল-মোক্তারেরা একত্রিত হইয়া তাঁহার পদত্যাগ দাবি করিয়া প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর পশ্চিম-বাংলায় হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডবও হইয়া গেল, তাহার জন্য হাওড়ায় সামরিক আইন পর্যন্ত জারি হইল। পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতি ভাল কি মন্দ সে কথা এখানে আলোচনা

করিতেছি না। ধরিয়া লইলাম, বিবৃতিটি খুবই খারাপ, কাহারও মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু তবুও জনসাধারণের কি করা উচিত ছিল? সংবাদপত্রে প্লাকার্ডে পোস্টারে দাবি জানানো হইয়াছে, যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। যদি তাহাই জনসাধারণের কাম্য হয় তাহা হইলে জনসাধারণের কর্তব্য কি? যুদ্ধ তো উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বরং শৃঙ্খলার চূড়ান্ত সীমা, এ কথা তো নূতন করিয়া বলিবার দরকার নাই। উচ্ছৃঙ্খল জনতা দাঙ্গা করিতে পারে বটে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে হইলে যে সুশিক্ষিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাদল দরকার, এ কথা তো সকলেই জানেন। সুতরাং যাঁহারা বাস্তবিকই যুদ্ধ চান, তাঁহারা যদি জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া শিক্ষিত করিয়া তুলিতেন তাহা হইলে বুঝিতাম, তাঁহারা সত্যই তাঁহাদের লক্ষ্যে অবিচল আছেন। প্রশ্ন উঠিবে আজ শিক্ষার ক্ষেত্র কোথায়? জবাবে বলিব, সৈন্যদলে আজ বাঙালীর ভর্তি হইতে কোন বাধা নাই—ইহা বহুদিন আগেই ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সৈন্যদলের কথাও ছাড়িয়া দিলাম। এইখানে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক যে জাতীয়-রক্ষী-বাহিনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেখানেও তো অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, শিক্ষালাভের পর তাঁহারা গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন এবং প্রয়োজনের সময় তাঁহাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হইবে। তবুও জাতীয়-বাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ভর্তি হয় না কেন? সব জায়গা হইতে লোক ভর্তি হয় না কেন? কিছুদিন পূর্বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিন হাজার জাতীয় বাহিনীর মধ্যে দুই হাজার আট শতই পশ্চিম-বঙ্গের, আবার তাহার মধ্যে প্রায় দুই হাজারই চব্বিশ-পরগনার। এমনটি কেন হইবে? সারা বাংলা দেশ ইহাতে উৎসাহিত হইবে না কেন? যাঁহারা পূর্ববঙ্গে লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দলে দলে ইহাতে যোগ দিবেন না কেন? তাহার বদলে এখানকার নিরীহ মুসলমান বধের মধ্যে ঘৃণ্য কাজের অনুষ্ঠান কেন হইবে? আরও প্রশ্ন করিব। যাঁহারা যুদ্ধ যুদ্ধ বলিতেছেন তাঁহাদের কথামত যদি সত্যই যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে যুদ্ধ হইলে কেবল পূর্ব-পাকিস্তানে হইবে না, পাঞ্জাবে কাশ্মীরে সর্বত্র

হইবে এবং সেই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাহায্য পাকিস্তান পাইবে, আমরা নয়। সুতরাং সেই যুদ্ধে জয়ী হইতে গেলে আমাদের প্রত্যেকটি লোককে অসীম কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে—তাহা না হইলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না। প্রশ্ন করি, যদি সে প্রয়োজন সত্যই আসে তাহা হইলে জাতি সেরকম সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে তো? মাতা পুত্রকে ছাড়িয়া দিতে, পত্নী স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে, প্রত্যেকটি লোক স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন তো? অথবা প্রত্যেকেই আমরা তৈল-ঢালা স্নিগ্ধতনু লইয়া নিরুপদ্রবে শান্তিতে জীবনযাপন করিব, কেরানীরা পাখার তলায় কলম পিষিবেন, উকিল-মোক্তারেরা মোকদ্দমার ফাঁকে বার-লাইব্রেরিতে সভা করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিবেন—এইভাবেই আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করিব? আরও প্রশ্ন করি। কলিকাতায় যদি বোমা পড়ে—এবং বেশি রকম পড়ে—আমরা লণ্ডনবাসীদের মত নির্ভীক বীর্যে কাজ করিয়া যাইতে পারিব তো? কলকারখানা সমস্ত চলিবে তো? শহরে অরাজকতা হইবে না তো? দলে দলে কলিকাতা ত্যাগের হিড়িকে সরকারকে যুদ্ধের চেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না তো?

এ সব প্রশ্ন কাল্পনিক নহে, সত্য। এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিবার ক্ষমতা যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধের দাবি করিবার অধিকারও আমাদের নাই। বাস্তবিক পক্ষে নেতারা যেমন আমাদের পথ দেখাইবেন তেমনই নেতাদেরও জানাইয়া দিতে হইবে যে, আমাদের দিক হইতে আমরা স্বাধীনতাকে সবল ও সুদৃঢ় করিবার জন্য যা কিছু ত্যাগ দরকার সব কিছুতেই রাজী আছি, কিছুতেই ভয় পাইব না। আমাদের প্রস্তুতি সত্ত্বেও যদি নেতারা ইতস্তত করেন তাহা হইলে বুঝিব যে, তাঁহারা সংকটের সময় নেতৃত্ব করিতে পারিলেন না, তখন ইতিহাসের দাবিতে আপনিই অন্য নেতা গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু যদি আমাদের মধ্যেই গলদ থাকে ষোল আনা, তাহা হইলে নেতাদের ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা অগ্রসর হইবেন কি করিয়া?

আসল কথাটা সেই পুরাতন কথা। আমরা সস্তা দাম দিয়া

স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলাম, দাম সস্তা করিবার লোভে দেশ-বিভাগ করিতেও রাজী হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে, ইতিহাস তাহার পাওনা ছাড়িবে কেন? সে তাই নির্মম হস্তে তাহার সমস্ত বকেয়া পাওনা সুদ-সমেত আদায় করিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই পেষণে তো বাঙালী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, সারা ভারতবর্ষ সংকটের সম্মুখীন। কিন্তু তাহাতে দুঃখ কি? যে মূল্য আমরা পূর্বে দিই নাই, তাহা যদি এখনও অ-দেওয়া থাকিত, তাহা হইলে আরও পরে হয়তো আরও এমন নিদারুণতর মূল্যের দাবি আসিত যে, সে দাবি আমরা হয়তো মিটাইতেই পারিতাম না, আমাদের স্বাধীনতাই আমরা বজায় রাখিতে পারিতাম না। তাহার চেয়ে যদি আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে দেনা-পাওনা এখনই শোধবোধ হইয়া যায়, তাহা হইলে এইটুকু ভরসা তো অন্তত মনের মধ্যে দেখা দিবে যে, এই জ্বলন-দহনের মধ্য দিয়া আমাদের সমস্ত মালিন্য, সমস্ত কপটতা ঘুচিয়া গিয়া এমন একটি শুভ্র নির্মল ভাস্বর প্রাণজ্যোতিতে আমরা সুপ্রতিষ্ঠ হইব, যাহার অমিত তেজ এবং নিষ্কলঙ্ক শ্রেয়োবুদ্ধি আমাদের সত্যের পথে নির্ভীক মনে স্বার্থ-ত্যাগের সঙ্গে আগাইয়া দিতে পারিবে। কারণ, বাস্তবিকই আমরা এখন যে পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়। যে সব সমস্যা চারিপাশে দেখিতেছি, তাহা স্বাধীনতার সমস্যা ছাড়া কিছুই নহে। আমরা যেমনই বিশ্বের খোলা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, অমনই অনেক ঝড়-ঝাপটাই আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে। ইহাই তো স্বাভাবিক, ইহা কাটাইয়া অবিচল গতিতে স্বাধীনতার তরী চলিতে থাকিবে, তবেই তো আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব। সেই দিকে সমস্ত দেশের প্রস্তুতি প্রয়োজন, তবেই ছাব্বিশে জানুয়ারির উৎসব সফল হইবে।*

"দায়ভাগী"

* এই প্রবন্ধ লিখিবার পর নেহরু-লিয়াকৎআলি-চুক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা লইয়াও মতভেদ হইয়াছে। কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, চুক্তি হওয়ার হাওয়া অনেকখানি পরিষ্কার হইয়াছে, এবং যদি চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষে কাজ হয় তাহা হইলে উভয়েরই মঙ্গল।

জমি-শিকড়-আকাশ

সর্বেশ্বর সুর করিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। প্রায়-মুখস্থ শ্লোকগুলির উচ্চারণ-সুখে বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন। অধ্যায় শেষ হইলেও কিছুক্ষণ কান পাতিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ছন্দ-মাধুর্য কানের মধ্যে তখনও যেন ঝংকার তুলিতেছে। অবশেষে গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া প্রণাম করিলেন। সযত্নে যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

উঠিলেন।

খড়মের শব্দে সচকিত হইয়া স্ত্রী সুনয়না খাবার লইয়া আসিলেন। সর্বেশ্বর চিঁড়া-দই মাখিতে আরম্ভ করিয়াই থামিয়া গেলেন।—কলা নেই?

না।—সুনয়না বলিলেন।—থাকবে কোত্থেকে?

কালকেই তো আনা হ'ল?—সর্বেশ্বর অবাক হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

রাত্রে দুধের সঙ্গে সকলকে দিলাম যে।

সর্বেশ্বর মুখ নামাইয়া প্রতিক্রিয়া গোপন করিয়া ফেলিলেন। সশব্দে খাইতে আরম্ভ করিলেন।

সুনয়না সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, আজ বাজার থেকে এনো আবার। রেখে দোব তোমার জন্যে।

সর্বেশ্বর কোনও জবাব দিলেন না।

বাবা, স্বামীজী এসেছেন।—ছোট মেয়ে উমা আসিয়া খবর দিল।

যাচ্ছি। বসতে বল্।—সর্বেশ্বর খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলেন।

স্বামী গৌড়ানন্দই সর্বেশ্বরকে অভ্যর্থনা করিলেন, আসুন। অনেক দিন যান নি আশ্রমে! ভাবলাম, অসুখ-বিসুখ হ'ল নাকি!

সর্বেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, না না। পরীক্ষার হাঙ্গামা গেল। সময়ই পাই নি।

আজ বিকেলের দিকে আসুন না। প্রফেসর দত্ত যাবেন। আলাপ করা যাবে।

যাব।—সর্বেশ্বর জবাব দিলেন। একটু ভাবিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে ভালই লাগে। আমার মনে হয়, রামমোহন-বাবুর অবিশ্বাস বিশ্বাসেরই আর এক রূপ।

এথিক্‌স্‌ মানেন, রিলিজিয়ন মানেন না।—গৌড়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, নীতি মানেন, ঈশ্বর মানেন না।

কিন্তু কান আর মাথার মত ছুটোর সম্বন্ধ।—সর্বেশ্বর দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বাভাবিক সহজ কথায় বলিয়া উঠিলেন, একটা মানলে আর একটা স্বতঃসিদ্ধের মত মানা হয়ে গেল যে।

গৌড়ানন্দ সমর্থনে হাসিলেন শুধু। বলিলেন, ভাল কথা, বীরেশ্বরের স্থবিধে কিছু হ'ল ?

কি হবে ?—সর্বেশ্বর বলিলেন, নিজে কোন চেষ্টা করবে না—

কি করবে তবে ?

যা করছে। দালালি।

দালালি ?—গৌড়ানন্দ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, দালালি করতে পারবে ?

কি করবে।—সর্বেশ্বর সখেদে বলিলেন, বাড়িতে সেধে কে বড় চাকরি দিতে আসবে বলুন ? অর্ডার-সাপ্লাই, দালালি এই সব করে আর কি। একটা কিছু করতে তো হবেই ? একা আর পেরে উঠছি না স্বামীজী। একটা হেডমাস্টারের আয় যে দেশে একজন রাজমিস্ত্রির আয়ের সমান, সে দেশে প্রফেসরির চেয়ে দালালিই ভাল। অনেক বেশি পয়সা। একটু থামিয়া বলিলেন, সংসারটা বড় হাঙ্গামা স্বামীজী। আবার বলিলেন, আপনারা বেশ আছেন। আশ্রম-জীবন। এক-একবার ভাবি—

সর্বেশ্বর শেষ করিলেন না। গৌড়ানন্দ স্মিতহাস্যে বুঝিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন না, কি ভাবেন। বলিলেন, কিন্তু সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত জীবন, সেই তো আদর্শ।

বড় কঠিন স্বামীজী।

কঠিন তো বটেই।—স্বামীজী সমর্থন করিলেন।

কেহই আর অগ্রসর হইলেন না। সংকোচ বোধ করিলেন সম্ভবত। গৌড়ানন্দ পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, আপনার ভাই—বীরেশ্বরের কাছে অনেক আশা করেছিলাম।

সর্বেশ্বর একটুখানি করুণ হাস্যসহকারে বলিলেন, আশা! আমার কাছেও অনেকে অনেক আশা করেছিল স্বামীজী। আশা!

গৌড়ানন্দ বেদনার সুরে কহিলেন, তাই বটে।

আপনার লেখাটা শেষ হয়েছে?—সর্বেশ্বর হঠাৎ যেন ধ্যানলোক হইতে নামিয়া আসিলেন।

গভীর তৃপ্তির উপর দিয়া ছোট স্মিত হাস্যের ঢেউ খেলিয়া গেল। গৌড়ানন্দ বলিলেন, হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। দেখাব আপনাকে।

দেখব।—সর্বেশ্বর আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইংরেজীতেই লিখেছেন শেষ পর্যন্ত?

হ্যাঁ।—গৌড়ানন্দ অহেতুক দৃঢ়স্বরে কহিলেন, শুধু বাংলা দেশের জন্যে ওটা লিখি নি আমি। গোটা পৃথিবীর লোকে পড়ুক—এই আমার ইচ্ছে। অবশ্য না-পড়ার স্বাধীনতা তাদের রইল।—বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পড়বে না কেন, পড়বে।—সর্বেশ্বর সান্ত্বনা দিলেন।

যাবেন তা হ'লে সন্ধ্যেবেলা?

নিশ্চয় যাব।—সর্বেশ্বর বলিলেন, আপনার বইখানা দেখব।

আচ্ছা, উঠি তবে। বেরুবেন নাকি?

হ্যাঁ, বাজারের দিকে যাব। বাজারটা নিজেই করি স্বামীজী।

গৌড়ানন্দ গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। একটু দাঁড়াইয়া বলিলেন, খাওয়ার জিনিস নিজের রুচিমত কেনার একটা আনন্দও তো আছে?

তা আছে।—সর্বেশ্বর লজ্জার পরিবর্তে গর্ব বোধ করিলেন এবার।

গৌড়ানন্দ চলিয়া গেলেন। সর্বেশ্বর ভৃত্য লোচনকে সঙ্গে লইয়া বাজারের দিকে রওনা হইলেন।

পথে দ্বিতীয় কালীবাড়ির উদ্দেশ্যে প্রণাম শেষ করিয়া পা বাড়াইতেই সর্বেশ্বর বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। বীরেশ্বর।

সর্বেশ্বরের গায়ে ঠেকিয়া প্রায় হোঁচট খাইয়া উঠিল বীরেশ্বর। লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, ও, দাদা!

হ্যাঁ।—বলিয়া নিঃশব্দে সর্বেশ্বর অগ্রসর হইলেন।

বীরেশ্বর ধীরে ধীরে কয়েক পা চলিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

ছুটিয়া সর্বেশ্বরকে ধরিয়া বলিল, একটা কথা। আমি একটা মিথ্যে কথা ব'লে এসেছি। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে—

সর্বেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কি কথা?

কয়েক দিনের জন্যে কিছু টাকা লোন নিতে হ'ল। সাগরমল দিতে চায় না। অনেক ব'লে-ক'য়ে—। বলেছি যে, বাড়িটা আমাদেরই।—বীরেশ্বর নিঃসংকোচে ঝরঝর করিয়া বলিয়া গেল।

সর্বেশ্বর বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে তাই সত্যি ব'লে স্বীকার করতে হবে? আমি বলব, এটা কাকার বাড়ি নয়, আমাদেরই? আমি—আমি বলব এই মিথ্যে কথা?

আচ্ছা, থাক্।—বীরেশ্বর বিবেচনা করিয়া বলিল, দোষ তো নেই কিছু। শুধু কথা। টাকাটা তো সাত দিনের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, থাক্। জিজ্ঞেস করবে না বোধ হয়।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বীরেশ্বর দ্রুতপদে ফিরিয়া গেল।

যদি জিজ্ঞেস করে?—সভয়ে ভাবিল বীরেশ্বর। নাঃ।

বাড়ি ফিরিয়া বীরেশ্বর নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ দরজায় পিঠ লাগাইয়া বাহিরের পৃথিবীটাকে যেন পিছনে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল। মাথাটা বারকয়েক ঝাঁকিয়া লইল মনে মনে। মুক্ত বীরেশ্বর এবার হালকা দেহে ছোট টেবিলটার দিকে অগ্রসর হইল। কাগজের নিশানা দেওয়া বইখানা খুলিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে পড়িতে আরম্ভ করিল।

সাগরমল!

তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল বীরেশ্বরের মুখে। চার-পাঁচ লাইন গোড়া হইতে আবার পড়িতে হইল। বার্গসঁয়ের 'এলাঁ ভাইটালে'র তলায় সাগরমল এবার ডুবিয়া গেল। মাঝে মাঝে মনে আসে, কিন্তু বসে না আর। স্থানাভাবে সাগরমলেরা বীরেশ্বরের মন হইতে তখন খসিয়া গেল।

পড়িতে পড়িতে সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে ছোট টিপ্পনীর সমালোচনা

লিখিয়া যাইতেছিল বীরেশ্বর। 'এটা যুক্তি নয়', 'প্যাচ', 'নো', 'ফ্যালাসি'। ইত্যাদি।

দরজায় কে ধাক্কা দিল।

ঠাকুরপো, দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছ কেন? খোল।

সুনয়না।

কেন?—বীরেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল।

খাবে না? সকালে বেরিয়ে গেছ, কিছুই তো খাও নি।

কিচ্ছু খাব না বউদি। খিদে নেই।—বীরেশ্বর করুণস্বরে কহিল।

দরজা খোল তো। কাজ আছে।

বীরেশ্বর পাতার সংখ্যাটা দেখিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুনয়না ঘরে ঢুকিয়া বইখানা বন্ধ করিয়া দিলেন।—চল।

বীরেশ্বর হতাশ দৃষ্টিতে বইখানার দিকে একবার তাকাইয়া সুনয়নার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

খাইতে আরম্ভ করিয়া বীরেশ্বর হাসিয়া বলিল, আজকে সাগরমলের কাছে কি চমৎকার মিথ্যে কথাটা বলেছি বউদি।

তাই নাকি?—সুনয়না উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা বলতে পার তুমি?

পারি না? খুব পারি। এখন জলের মত বলতে পারি। না বললে ছাড়ে না যে!

তা হ'লে বলবে না কেন? বেশ করেছ।—সুনয়না বলিলেন। আমি আরও ভাবছিলাম, তুমি দীপিকাদের ওখানে গেছ।

না না।—বীরেশ্বর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

সুনয়না কিছুক্ষণ সস্মিত নয়নে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, কিছু আশা-ভরসা পেলে?

কিসের আশা-ভরসা?—বীরেশ্বর যেন চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণে জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, বড় ভুল বুঝেছ বউদি। ওসব আশা-ভরসার কোন স্থান নেই আমার জীবনে। ওর চেয়ে অনেক—অনেক বড় কাজ আছে আমার।

কি কাজ?

বীরেশ্বর মনে মনে লজ্জিত হইল। ছি-ছি! একান্ত নিজস্ব গোপন কথা কাহারও কাছে বলা হাস্যকর। কিন্তু বউদি—। বউদির কাছে বলা যায়। ভাবিল বীরেশ্বর।

লেখাপড়ার কাজ তো?—সুনয়না আবার বলিলেন, সে আমি বলেছি দীপিকার কাছে। একটু ছিট আছে।

ছিটই বটে। বীরেশ্বর বউদির অজ্ঞতায় কৃপাহাস্য করিয়া বলিল। কিন্তু তোমার সঙ্গে তার দেখা হ'ল কোথায়?

সুনয়না মিটিমিটি হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, এসেছিল।

এখানে?

হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো বলছি। আমারও মনে হ'ল যেন—

যেন কি?—বীরেশ্বর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার নতমুখে হাত ধুইতে ব্যস্ত হইল।

আর বেশি বেগ পেতে হবে না তোমায়। এখন শুধু—

বীরেশ্বর উঠিয়া পড়িল।—ভুল, ভুল বউদি। ওকে চিনতে পার নি।

বাহির হইবার মুখে হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—কি বলছিলে? ওঃ! খেপেছ? সর্বনাশ! মুখেও এনো না।

ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা আবার বন্ধ করিতে যাইয়া বীরেশ্বর থামিয়া রহিল কিছুক্ষণ। দরজা খোলা রাখিয়া হাত দুইটা নামাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বইখানা খুলিয়া কয়েক পাতা উল্টাইয়া আবার বন্ধ করিয়া রাখিল। একখানা খাতা বাহির করিয়া খুলিয়া শেষ লাইনটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

পোঁ করিয়া একটা মোটর-সাইকেল আসিয়া বাড়ির সম্মুখে ক্যাঁচ করিয়া থামিয়া গেল। মচমচ শব্দের তরঙ্গ তুলিয়া মিলিটারী ভঙ্গীতে ঘরে প্রবেশ করিল একজন সতেজ বলবান যুবক। বলেন্দু।

বীরেশদা!—বলেন্দু বসিয়া টেবিলে একটা কিল মারিয়া বলিল, আজকে ছটায় রেডি হয়ে থাকবেন।

কি ব্যাপার বলুন তো?—বীরেশ্বর বলেন্দুর ধাক্কা খাইয়া যেন জাগিয়া উঠিল।

শিকারে যাব। বাঘ মারা দেখতে চেয়েছিলেন না?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

আজ নিয়ে যাব আপনাকে। খুব ভাল ক'রে মাচা বানানো হয়েছে। যাবেন তো?

যাব।

বেশ। ছটায়। এটা কি বই?—নাম পড়িয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া ফেলিল।—ওরে বাবা! সাংঘাতিক!

বীরেশ্বর মৃদুহাস্যে বইখানা হাতে তুলিয়া লইল।

কোন দার্শনিক ব্যাপার নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। বৈজ্ঞানিক-দর্শন বলা যায়।—বীরেশ্বর করুণার সঙ্গে বুঝাইয়া দিল।

বলেন্দু হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া সভয়ে বলিল, মাথায় থাকুন। তা হ'লে ছটা। আমি তুলে নিয়ে যাব।

একটা লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল বলেন্দু। যেমন আসিয়াছিল তেমনই সশব্দে বাহির হইয়া গেল। মোটর-সাইকেলের ভটভট শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বীরেশ্বর জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দৈত্য!—হঠাৎ মনে হইল বীরেশ্বরের। এতক্ষণে অবজ্ঞা করিতে পারিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সরিয়া আসিল ভিতরের দিকে। ঘড়ি দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল। অনেক কাজ আছে।

বইখানা এবং খাতাখানা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়া বীরেশ্বরও বাহির হইল। পথে নামিতেই সর্বেশ্বরের সঙ্গে আবার দেখা হইল। সর্বেশ্বর বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। বীরেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সাগরমলের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?

না।—সর্বেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিলেন।

বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। সর্বেশ্বর বাড়ির মধ্যে ঢুকিলেন।

সুনয়না জিজ্ঞাসা করিলেন, মাছ আন নি?

সর্বেশ্বর সহর্ষে বলিলেন, এনেছি। একেবারে টাটকা পাবদা মাছ।

কই, দেখি?—লোচনের হাত হইতে মাছের পুঁটলিটা লইয়া খুলিতে লাগিলেন সুনয়না।

সর্বেশ্বর জামা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, বেশ ক'রে একটু সরষে দিয়ে—বুঝেছ?

আচ্ছা।—সুনয়না আশ্বাস দিলেন।—কলা এনেছ?

এনেছি এক কাঁদি।—সর্বেশ্বর ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, ছোঁয়া যায় না। দিন দিন যেন বাড়ছেই দাম। উঠানে ছায়ার দিকে দৃষ্টি পড়ায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বেলা হয়ে গেছে। একটু তাড়াতাড়ি কর।

২

বীরেশ্বর রাস্তা হইতে পলাতকের মত ঢুকিয়া পড়িল দীপিকাদের বাড়ি। দীপিকার দাদা প্রদীপের নাম ধরিয়া একবার ডাক দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। প্রদীপ ঘরেই ছিল। বীরেশ্বর শরীরটা প্রদীপের বিছানায় এলাইয়া দিয়া বলিল, দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও ভাই।

দীপিকাও ছিল ঘরে। হাতের বইখানা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রদীপের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

প্রদীপ বলিল, কি ব্যাপার বীরেশদা? কেউ তাড়া করেছে নাকি?

হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর।—বীরেশ্বর একটু ধাতস্থ হইয়া হাসিয়া জবাব দিল।

কে?—দীপিকা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল।

সবাই।—বীরেশ্বর আলস্যভরে বলিল, ব্যবসা তো কর নি প্রদীপ!

ব্যবসাই তো ভাল।—প্রদীপ বলিল।

ভাল, আর উঠতে না হ'লে।—নিজের কাছে বলিল বীরেশ্বর।

উঠতে না হ'লে!

অতল কাদার মধ্যে নাক পর্যন্ত ডুবে গেলে অবস্থাটা কি রকম হয়? ভাল? বরাবর বাস করলে ভালই বোধ করি। কিন্তু আমাকে যে আবার উঠে আসতে হয়।

ব্যবসা কাদার মত বুঝি?—দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল।

হ্যাঁ। আর মানুষগুলো কেঁচোর মত, কিলবিল করে।

দীপিকা খিলখিল এবং প্রদীপ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেশ্বর হাসি-হাসি মুখে বিরস তীক্ষ্ণকণ্ঠে আবার বলিল, যতক্ষণ থাকি আমাকেও করতে হয়। ওদের মতই। কি করব বল?

প্রফেসরি না হোক, একটা মাস্টারিও তো কোনখানে নিতে পারতেন।—প্রদীপ দুঃখ প্রকাশ করিল।

পারত্যাম। কিন্তু সেও তো আর এক রকমে কিলবিল করতে হ'ত, পয়সার অভাবে।

এ কথা সমর্থন করে না প্রদীপ। অন্তত প্রতিবাদের মহৎ সুযোগ পাইয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলিল, পয়সাকে আপনি এত উচ্চে স্থান দিচ্ছেন কেন বীরেশদা?

বড় দুঃখে প'ড়ে ভাই।—বীরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল।—কিন্তু উচ্চে তো নয়। পয়সা থাকলেও লোকে কাদার মধ্যে কিলবিল করে।

তবে?

জীবনটাই কিলবিল করছে এখনও—বীরেশ্বর জবাব না দিয়া হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট মন্তব্য করিয়া উঠিল।

তা হ'লে তো পয়সা থাকা না-থাকা সমান।—প্রদীপ বলিল।

বীরেশ্বর শূন্য হইতে মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে নামিয়া আসিল। বলিল, না না না। পয়সার আমার বড় প্রয়োজন। আত্মরক্ষার জন্যেই প্রয়োজন। অল্প সময়ে বেশি পয়সা।

দীপিকা আলোচনায় যোগ দিতে না পারিয়া এতক্ষণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এবার বলিল, কি করবেন বেশি পয়সা দিয়ে?

অনেক কাজ।—সংক্ষেপে বলিল বীরেশ্বর।

প্রদীপ হাসিয়া দীপিকাকে বলিল, সেদিন বীরেশদার বউদি বললেন না—

ছিট আছে।—দীপিকা মিষ্টি করিয়া একটু হাসিল।

বীরেশ্বর কিছুটা নিস্পৃহ, কিছুটা উৎসুক কণ্ঠস্বরে বলিল, আমার নামে যা-তা নিন্দে করেছেন বুঝি বউদি?

হ্যাঁ। বউদি কিন্তু আপনার নিন্দের পঞ্চমুখ একেবারে।—দীপিকা স্পষ্ট সোহাগের সুরে বলিল। বলিয়া বীরেশ্বরের দিকে চাহিতে তাহার একাগ্র চক্ষুর উপর মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়া রহিল।

বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরাইয়া কিছু বলার তাগিদে বলিতে যাইয়া মুখ দিয়া বাহির হইল, অনেক কাজ—অনেক। দীপিকার সুরটা মনের তলায় ঢেউ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছিল।—স্পষ্ট। এই তো স্পষ্ট।

বীরেশ্বর উঠিয়া বসিল।

প্রদীপ বলিল, আবার কি কাজ?

কাজ?—বীরেশ্বর হাতড়াইতে লাগিল।

অনেক কাজ ব'লে উঠে বসলেন যে?

ওঃ।—বীরেশ্বর জাগ্রত হইল।—কাজ আছেই তো। এখুনি বেরুতে হবে আবার।

কাদার?—প্রদীপ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

কি করব বল?

বাহিরে মোটর-সাইকেলের উদ্ধত শব্দে থামিয়া বীরেশ্বর উৎকর্ণ হইয়া রহিল। বলিল, বলেন্দুবাবু বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা জোর করিয়া দীপিকার উপর পতিত হইল। কিন্তু দীপিকার নত চক্ষু দেখা গেল না।

জুতার অশান্ত আওয়াজে বীরেশ্বর নিঃসন্দেহ হইল। এবার বলিল, বলেন্দুবাবু। আবার শুইয়া পড়িল।

দীপিকা আড়চোখে দেখিয়া লইল।

প্রদীপ আছ?—বলিতে বলিতে বলেন্দু ঝড়ের মত ঢুকিয়া পড়িল ঘরে। একটুখানি থমকিয়া দাঁড়াইল। বীরেশদা নাকি? বেশ, আপনার সঙ্গে আবারও দেখা হয়ে গেল।

প্রদীপ উঠিয়া বসিতে দিল। দীপিকাও উঠিতেছিল, দরকার হইল না বলিয়া আবার বসিল। কিন্তু বলেন্দু না বসিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাথার একটা ঝাঁকুনিতে চুলগুলি সরিয়া গেল পিছনে। বলিল, না, বসব না আমি। সময় নেই। বীরেশদা, আপনি কিন্তু রেডি হয়ে থাকবেন।

বীরেশ্বর ক্লান্তস্বরে বলিল, হ্যাঁ, থাকব।

কোথায় যাবেন?—প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল।

শিকারে।—বলেন্দু প্রসঙ্গটাকে চাপিয়া ধরিল।—যাবে নাকি?

যাব।—প্রদীপ আবদারের সুরে কহিল। নেবেন?

আজ না।—বলেন্দু খুশি হইয়া জবাব দিল, আর একদিন নিয়ে যাব।

দীপিকা বলিল, বাঘ মারবেন নাকি বলেনবাবু?

না, বলেনদা।—প্রদীপ আপত্তি করিয়া উঠিল, বাঘ দেখলে আজ মারবেন না কিন্তু। আমি তা হ'লে দেখতে পাব না। আজকে হরিণ।

যা পাই।—বলেন্দু হাসিয়া বলিল।—ও, ভাল কথা। কালকে খেলা আছে মাঠে। যাও তো কার্ড দুটো রেখে দাও।

দুইখানা কার্ড বাহির করিয়া ধরিল।

আপনি খেলছেন তো?—দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল।

প্রদীপ বলিয়া উঠিল, ওরে বাস্ রে! বলেনদা না খেললে টাউন ক্লাব খেলেছে তবে।

বলেন্দু মৃদুমন্দ হাসিতেছিল।

কিন্তু দুখানা দিলেন কেন?—প্রদীপ বলিল।

বলেন্দু বলিল, দীপিকা দেখতে চেয়েছিল যে।

একটু চমকিয়া উঠিল দীপিকা। মুখের উপর এক ঝলক রক্ত বেশি আসিয়া গেল। কিন্তু জোর করিয়া বলিল, হ্যাঁ, ভারি ইচ্ছে করে ফুটবল-খেলা দেখতে।

বীরেশ্বর নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া ছিল। হঠাৎ উঠিয়া বসিল। বলিল, যাই প্রদীপ।

বীরেশদা, খেলা দেখবেন নাকি?—বলেন্দু জিজ্ঞাসা করিল।

না।—বীরেশ্বর ঔদাস্যভরে কহিল। খেলা আমি দেখি না। সময়ই পাই না।

তুচ্ছ খেলা-টেলা দেখেন না বীরেশদা।—বলেন্দু ঠাট্টা করিয়া বলিল, অনেক উচ্চমার্গে উঠে গেছেন। যেসব বইপত্র দেখেছি পড়তে, সাংঘাতিক। বীরেশদা বয়সে আমার সমানই; কিন্তু মনে মনে আমার ঠাকুরদার মত।

বীরেশ্বর ছাড়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। বীরেশ্বর একটু যেন লজ্জিত হইল। বাহাদুরির ঢঙে; কোন কথা না বলিতেই সে কৃত-

সংকল্প। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এই ভুলটা হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া অনুতপ্ত হইল। বলিল, তা হ'লে তো শিকারে যাবার জন্যে লাফাতুম না। খেলা দেখতে আমার ভাল না লাগলে কি করব বলুন? যেদিন ভাল লাগে, সেদিন যাই।

কোনও দিন ভাল লাগে আপনার?—বলেন্দু কহিল, আমার কিন্তু মনে হয় না।

প্রদীপ সাক্ষী আছে।—বীরেশ্বর শরীরটা যেন একটু আলগা করিয়া দিল একটু হাসিয়া।—বল তো প্রদীপ, গত বছর তোমার সঙ্গে একদিন খেলা দেখতে যাই নি?

প্রদীপ এবং বলেন্দু উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল। ঘরের রুদ্ধ-কাঠিন্য গলিয়া সহজ হইয়া গেল দীপিকার কাছে।

তবে?—বলেন্দু হাসিতে হাসিতে বলিল। ঘড়ি দেখিয়া হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আচ্ছা, চলি তবে।

দীপিকা বলিয়া উঠিল, দাঁড়িয়েই চ'লে যাচ্ছেন? বসবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন নাকি?

বলেন্দু ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।—হ'ল তো? প্রতিজ্ঞা করি নি, দেখ।

দীপিকা ততক্ষণে নতমুখে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরব হইয়া গিয়াছে।

বলেন্দুর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য দীপিকার উপর আটকাইয়া গেল। একটুখানি অচেতন বিস্ময়ের আভাস খেলিয়া গেল চোখে। প্রদীপকে বলিল, আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না কিন্তু। আর একেবারে খেলার মাঠে।

বেশ, আমরা চ'লে যাব।—প্রদীপ বলিল।

এবার উঠি।—বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বলেন্দু।—বীরেশদার দেরি আছে তো?

না, চলুন।—বীরেশ্বরও উঠিয়া পড়িল।—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

সোজা বাসায় এখন।

আমি একটু বাজারের দিকে যাব।

আমি দিয়ে যেতে পারি আপনাকে।

না না।—বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি আপত্তি করিয়া উঠিল। ওসব কলের গাড়িতে আমার সুবিধে লাগে না।

আবার! বীরেশ্বর আবার অনুতপ্ত হইল।—তবে প্রয়োজন হ'লে কোন প্রশ্ন নেই।

বলেন্দু কিন্তু কৃপাহাস্তের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া সশব্দে বাহির হইয়া গেল।

বীরেশ্বর দরজার কাছে যাইয়া একবার ফিরিয়া তাকাইল। বাহিরে বলেন্দুর গাড়ির গর্জন শোনা গেল।

প্রদীপ খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, ওই যে! বলেনদা গাড়ি স্টার্ট দিলে।

দিলেই তো।—বীরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। তীক্ষ্ণ মৃদুকণ্ঠে আবার বলিল, প্রদীপ যখন বলেনদা বলে, আমার মনে হয় বলদা বলছে। ছোট এক ঝলক হাসির সঙ্গে বীরেশ্বরও আর কোন দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল।

প্রদীপ আর দীপিকা পরস্পর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল। শেষে প্রদীপ মুচকি হাসিয়া বলিল, বলেনদাকে দেখতে পারেন না বীরেশদা।

হ্যাঁ।—বলিয়া দীপিকা অধোমুখে পড়িতে আরম্ভ করিল।

৩

গৌড়ানন্দ দাঁড়াইয়া আশ্রমের গাভী-দোহন পরিদর্শন করিতেছিলেন।

সের পাঁচেক হবে মনে হয়, কি বল?

তা তো হবেই।—দোহনকারী গোয়ালা বলিল।

এ বেলা এর বেশি হয় না।—গৌড়ানন্দ বলিলেন, বাছুরকে কষ্ট দিয়ে দুধ বেশি করা ভাল কথা নয়।

নাঃ।—গোয়ালা সমর্থনসূচক ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এই সময়ে সর্বেশ্বর উপস্থিত হইলেন।

আসুন।—গৌড়ানন্দ অভ্যর্থনা করিলেন।

সর্বেশ্বর হাতের লাঠিটা ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। গাভীটার দিকে

দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন, এ গাইটাই আপনার সবচেয়ে ভাল, বেশ সুলক্ষণা। দুধও বোধ করি ভালই দেয়?

এ বেলা সের পাঁচেক হয়।—গৌড়ানন্দ সবিনয়ে বলিলেন।—চলুন, বসিগে।

চলুন।—সর্বেশ্বর সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া একটা উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া গেলেন। মৃদু ধরা গলায় বলিলেন, আপনার আশ্রমের একটা জাদু আছে।

গৌড়ানন্দ সহাস্যে নিরর্থক প্রশ্ন করিলেন, কেন?

আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, আমাদের ঋষিযুগে ফিরে এসেছি। তেমনই শান্ত সমাহিত পরিবেশ।—তেমনই হঠাৎ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, ভারতবর্ষ আপনাদের কাছে ঋণী স্বামীজী। ভারতের আত্মাকে আপনারাই আজও ধ'রে রেখেছেন, মরতে দেন নি।

গৌড়ানন্দও গম্ভীর হইলেন। খোলা বারান্দায় একখানা চেয়ার সর্বেশ্বরকে আগাইয়া দিয়া নিজে আর একটায় বসিলেন। একটু যেন লজ্জা বোধ করিলেন। বলিলেন, চেয়ারে ব'সে একটুও আরাম পাই না আমি, কিন্তু আপনারা, যাঁরা আসেন— একটা মাদুর আনব?

হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব ভাল হবে।

চেয়ারগুলি এক পাশে সরাইয়া গৌড়ানন্দ একটা মাদুর বিছাইয়া দিলেন।

প্রফেসর দত্ত আসিলেন। রামমোহন দত্ত। মাদুর দেখিয়া বলিলেন, আজ কি খাঁটি ভারতীয় মতে?

গৌড়ানন্দ কোন জবাব না দিয়া বলিলেন, বসুন। রামমোহনবাবুর একটু কষ্ট হবে।—সর্বেশ্বরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন।

আবহাওয়াটা দত্ত শুঁকিয়া লইলেন। হাসিয়া বলিলেন, কিছু না। আমিও তো ভারতীয় আত্মারই অংশ।

সর্বেশ্বর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, আমি বলছিলাম স্বামীজীকে। ভারতের ঋষি-আত্মা আপনারাই আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। একটু পরে যোগ করিয়া দিলেন, মরতে দেন নি।

অধ্যাপক ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া দুষ্টিকটুতার প্রায় সীমানায় আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, আত্মা! ঠিক শব্দটাই আপনি ব্যবহার করেছেন। ঋষি-আত্মা!

গৌড়ানন্দ বলিলেন, ভারতের সনাতন শাশ্বত আত্মাই ঋষি-আত্মা। এই তো বলতে চেয়েছেন আপনি?—সর্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিন্তু রাজসিক ক্ষত্রিয়-আত্মাও তো ভারতের সনাতন? কাজেই ওটা আলাদা ক'রে বলাই ভাল হয়েছে।—রামমোহন যুক্তি দিলেন।

গৌড়ানন্দ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। স্থানচ্যুত হইয়া নীচে চাপা পড়িয়া যাইতেছেন অনুভব করিলেন। অথচ কথাগুলিও প্রায় অর্থশূন্য অথবা অবান্তর। বিদ্রূপ?—চকিতে ভাবিলেন একবার।

রামমোহন আবার বলিলেন, তা ছাড়া অনার্য তামসিক আত্মা, সেও ভারতের সনাতন। যে আত্মা প্রচণ্ড আর্য-আত্মাকে প্রায় ধ্বংস ক'রে একচ্ছত্র রাজত্ব করছে আজও।

সর্বেশ্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।—ভুল করছেন আপনি। আত্মা তামসিক হয় না। রাজসিকও হয় না। তমসায় আচ্ছন্ন হতে পারে। ঋষি-আত্মা বলতে আমি মুক্ত জ্ঞানী আত্মার কথাই বলেছি। যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁরা নমস্য।

বিনীত হাস্যে গৌড়ানন্দ উদ্যত রামমোহনকে বাধা দিলেন এবার। বলিলেন, কিন্তু আর্য বেশিক্ষণ খড়্গ চালালে সেটাও ম'রে যাবার ভয় আছে যে।

তিনজনই হাসিয়া উঠিলেন।

রামমোহন বলিলেন, আমি বলতে চাইছিলাম যে, শুধু ভারতের আত্মা বলতে ঠিক কোন্‌টা বোঝায় বলা মুশকিল।

বলেন কি?—সর্বেশ্বর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

গৌড়ানন্দ এতক্ষণে সোজা হইয়া বসিলেন।

ওঃ! তাই বুঝি ঋষি-আত্মা শব্দটা এত সমর্থন করেছেন?—সর্বেশ্বর কহিলেন।

ভারতের আত্মা বলতে আপনার কি মনে হয়?—গৌড়ানন্দ সতেজে প্রশ্ন করিলেন।

অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত। কিন্তু যাঁরা বলেন, তাঁদের অর্থ বুঝি।

কি বোঝেন?—গৌড়ানন্দ আবার গুরু-গম্ভীর প্রশ্ন করিলেন।

বুঝি যে, তাঁরা বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা আর ভারতবর্ষ একাকার মনে করেন।

ভুল করেন?

মারাত্মক ভুল। কতকগুলি পুঁথিমাত্র, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবনের কোন যোগ নেই। বাইরের জগৎকে আমরা ধাক্কা দিচ্ছি। নিজেকেও। এই পুঁথি সম্বল ক'রে আমরা দুনিয়ার স্পিরিচুয়াল লিডারশিপের পদের জন্য দরখাস্ত করেছি। কেউ কেউ পিঠ চাপড়াচ্ছে। অতি হাস্যকর পরিস্থিতি।

সর্বেশ্বর উত্তেজনায় বাক্যহীন হইয়া গৌড়ানন্দের মুখের দিকে তাকাইলেন। গৌড়ানন্দ স্থিতপ্রজ্ঞ-ভঙ্গীতে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, অনেকগুলি তীক্ষ্ণ শব্দ সৃষ্টি করলেন আপনি। দেশকে ভালবাসেন ব'লে রাগ ক'রে বলছেন হয়তো। কিন্তু সত্য বলেন নি। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কথা বাদ দিলাম। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, গান্ধী এ যুগের কথা। জীবনের সঙ্গে যোগ নেই?

রামমোহন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, অবতারের লিস্টটা আর একটু বেড়েছে। কিছু নতুন দেবতা আর মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র। জীবন একটানা অব্যাহত নিজের খাতেই চলেছে। একটুও এদিক-ওদিক হয় নি তো! সোল অব ইণ্ডিয়া!—রামমোহন হাস্য করিলেন।—পৃথিবী এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে—স্পিরিচুয়াল লিডার ভারত পথ দেখাবে!

নিশ্চয়ই দেখাবে।—সর্বেশ্বর হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

নিজে দুচোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না যে! অন্ধের মত ধাক্কা খেতে খেতে এগুচ্ছে।

কিন্তু এগুচ্ছে।—গৌড়ানন্দ গুঁজিয়া দিলেন।

খানার দিকে কি না ঠিক নেই।—রামমোহন হাসিয়া জবাব দিলেন।

গৌড়ানন্দ দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে বলিলেন, সে ভয় নেই। আপনার

ওই অবতার, দেবতা আর ঋষিদের নিষ্কম্প আলো জ্বলছে সম্মুখে। দিক ভুল হবার ভয় নেই।

সর্বেশ্বর উচ্ছ্বাসপূর্ণ দৃষ্টিতে গৌড়ানন্দের দিকে তাকাইলেন, বলিলেন, এর ওপর কোন কথা নেই।

রামমোহন যেন হঠাৎ অশেষ ক্লান্তি বোধ করিলেন। একটুখানি হাসিয়া নীরব রহিলেন। গৌড়ানন্দ বিজয়-গৌরবে সস্মিতবদনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সর্বেশ্বর বেশি সময় দিতে রাজি হইলেন না। গৌড়ানন্দকে বলিলেন, কই, আপনার লেখাটা দেখাবেন না?

ওঃ, হ্যাঁ।—গৌড়ানন্দ উঠিয়া খাতাখানা আনিয়া দিলেন। বলিলেন, নিয়ে যান। কিন্তু বেশি দেরি করবেন না। পাঠাতে হবে।

সর্বেশ্বর নামটা পড়িলেন। গীতা অ্যাণ্ড দি মর্ডান ওয়ার্ল্ড। নাম পড়িয়া অধিকতর শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়া উঠিল চোখে মুখে।

নামের মধ্যেই আইডিয়াটা অনেকখানি ফুটে উঠেছে মনে হচ্ছে!

অন্তত তাই চেয়েছি আমি।—গৌড়ানন্দ বলিলেন।

চমৎকার নামটা হয়েছে।—সর্বেশ্বর পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

গৌড়ানন্দ কিছু বলিবার জন্য বলিলেন, রামমোহনবাবু পড়েছেন।

ভাল হয়েছে লেখা।—রামমোহন জড়তা ভাঙিয়া বলিলেন, শুধু ভারতীয় নয়, ইউরোপীয় দর্শনও উনি সমগ্রভাবে বিচার করেছেন। বেশ পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই করেছেন। তবে—। একটু হাসিয়া বলিলেন, ওই—ব্যাক টু গীতা। আবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কিন্তু লেখা হিসেবে সার্থক হয়েছে। আমার মনে হয়, ভালই চলবে। আজকাল এসব বইয়ের কাটতি অনেক বেড়েছে সব দেশে। নাম-করা কাউকে দিয়ে একটা ভূমিকার মত লিখিয়ে নিতে পারলে সুবিধে হয়।

রামমোহনবাবুর আপত্তি শুধু 'ব্যাক টু গীতা'য়।—গৌড়ানন্দ বলিলেন।

কতগুলি অসুবিধে আছে কিনা।—রামমোহন বলিলেন, ব্যাক টু একবার আরম্ভ করলে আর শেষ নেই যে! ব্যাক টু বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, কনফুসিয়াস। অফুরন্ত। এক আমাদেরই কত রকম আছে। শেষ

কোথায়? তার চেয়ে সমস্ত পৃথিবীর জন্তে একটা ফরোয়ার্ড কিছু করা যায় না?

গৌড়ানন্দ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, সমন্বয়? তাই তো আমি চেষ্টা করেছি রামমোহনবাবু।

বেদান্তের ভিত্তিতে।—রামমোহন হাসিয়া বলিলেন, যাই হোক, বইখানার আদর হবে এ আমি বলতে পারি। বিক্রি ভাল হবে।

বিক্রি ভাল হোক, এ আমি চাইই তো।—গৌড়ানন্দ স্পষ্ট উক্তি করিলেন। আমার আশ্রমেরও টাকার প্রয়োজন। আর যারা কিনবে, তারা পড়বেও নিশ্চয়ই?

পড়বে। সেই কথাই বলছিলাম।—রামমোহন বলিলেন।

কিনলে তো আর না প'ড়ে ফেলে দিতে পারে না, কি বলেন?—সর্বেশ্বর কহিলেন।

গৌড়ানন্দ হাসিয়া উঠিলেন।

রামমোহন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেদনার সুরে বলিলেন, আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি ঠিক—ঠিকমত বলতে পারি নি হয়তো।

না না।—গৌড়ানন্দ এবং সর্বেশ্বর অনুতপ্ত কণ্ঠে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন।

গৌড়ানন্দ সর্বেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিলেন, জানেন? ওঁর কাছে আমি অনেক ঋণী। পরামর্শ দিয়ে, বই দিয়ে, নানা রকমে উনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমি স্বীকার করেছি ভূমিকায়।

সর্বেশ্বর বিস্মিত হইলেন। রামমোহন বিনীত প্রতিবাদ করিয়া বিদায় চাহিলেন।

চলুন। আমিও যাচ্ছি।—সর্বেশ্বর বলিলেন। বিদায় লইয়া উভয়ে একসঙ্গে রওনা হইলেন। পথে রামমোহনই প্রথম কথা বলিলেন।

বিশ্বাস করুন মাস্টার মশাই, স্বামীজীকে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলার ইচ্ছে আমার এতটুকু ছিল না। কিন্তু—। আমার যেন কোন স্বাধীনতাই নেই।—অনেকটা যেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন, যা বলতে চাই নে, কে যেন ঠেলে বার ক'রে দেয় মুখে। শরীর?

সর্বেশ্বর সহসা কোন জবাব দিতে পারিলেন না।

অবশ্য এও সত্যি যে, মনে মনে যে ভাবে ভাবি, আমি তাই বলেছি।

তবে তো আপনার মনই বলেছে।—সর্বেশ্বর এবার বলিলেন।

কিন্তু তা তো নয়। ওভাবে না বলার সংকল্পও তো আমার মনেরই! তা নয়।—হঠাৎ আবার বলিয়া উঠিলেন, হবে হয়তো। আমি সংকল্প করি, মন ভেঙে দেয়।

গভীর দার্শনিক সমস্যা এটা। কাজেই এর মীমাংসা নেই বোধ হয়।—সর্বেশ্বর বিষয়োচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিলেন।

না না।—হাসিয়া হালকা সুরে রামমোহন বলিলেন, দার্শনিক সমস্যা হিসাবে আমি বলি নি কিন্তু। নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দার্শনিক? না না।

সর্বেশ্বরও হাসিয়া নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগিলেন। এক সময়ে বলিলেন, এক দিক দিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে আপনার মিল আছে। আপনিও অবিবাহিত সুখী মানুষ। সংসারের ঝামেলা নেই। মুক্ত।

বিয়ে করি নি, কিন্তু সংসার তো আমার আছেই মাস্টার মশাই।

সর্বেশ্বর হাসিলেন একটু।—বিয়ে-করা সংসার অন্য রকম ব্যাপার রামমোহনবাবু।

হঠাৎ রামমোহন থামিয়া গেলেন। বলিলেন, আচ্ছা, নমস্কার। আমার এই দিকে একটু কাজ আছে।—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুত পাশের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া গেলেন। সর্বেশ্বর অবাক হইয়া সেই দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিয়া আবার চলিতে লাগিলেন।

ক্রমশ

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

আজব চিত্র

আমসত্ব বুঝি ভাল; যদি বল ভাই
কাঁঠালের সত্ব, তাও সঙ্গতিটু পাই;
কাঁঠালের আমসত্ব বল যে যখন,
হতজ্ঞান,—বাহি হয় তথ্য নিরূপণ।

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি

ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যে চুক্তি হইয়া গেল, তাহার মূল কারণ এবং ভবিষ্যতের ফলাফল সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। আমাদের কারবার তাহা লইয়া নয়। আমরা চুক্তিটিকে অন্য এক দিক হইতে পরীক্ষা করিব, এবং ইহা উভয় রাষ্ট্রের দ্বারা যথাযথ রক্ষিত হইলেও ফলাফল কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিবে, তাহারই বিচার করিব। অর্থাৎ, অনেকে যে মনে করিতেছেন, পাকিস্তান চুক্তি ভঙ্গ করিবেই করিবে, অথবা চুক্তির বা যুদ্ধবিরতির সুযোগ লইয়া চুপিচুপি যুদ্ধের জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হইবে, আমরা সেরূপ মতামত পোষণ করিব না; মূল রোগের প্রতিকারকল্পে চুক্তিরূপ ঔষধের ক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত কার্যকরী হইতে পারে, তাহারই বিচার করিব।

আমাদের শাস্ত্রে একটি রীতি প্রচলিত আছে। শিবের পূজাই হউক অথবা বিষ্ণুর পূজাই হউক, পুরাণে কোনও দেবতাবিশেষের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইতিহাস এমনভাবেই আলোচনা করিতে হয় যেন শেষ পর্যন্ত অমোঘ গতিতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, শিব অথবা বিষ্ণু অথবা দুর্গার পূজা ভিন্ন মুক্তির আর কোনও উপায় নাই। আধুনিক কালে মার্ক্সপন্থীগণও অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমরাও সেই পথ অবলম্বন করিব। তবে একেবারে পৃথিবীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক কালের ইতিহাস দিয়াই আলোচনা শুরু করিব।

মূল ব্যাধি

কথাটা অনেকের নিকট অপ্রিয় মনে হইতে পারে কিন্তু যুক্তির দিক দিয়া হয়তো প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, পাকিস্তানের উদ্ভব এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে প্রাদেশিকতার বোধ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতা আসলে একই মৌলিক রোগের বিভিন্ন প্রকাশ। কথাটা খুলিয়া বলি।

ইংরেজ জাতি এ দেশে ধনতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের অস্ত্রহিসাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার ফলে ভারতে উৎপাদন-ব্যবস্থা ওলটপালট হইয়া যায়। কিন্তু এই পরিবর্তনের মাত্রা কোনও প্রদেশে কম, কোনও প্রদেশে বেশি হয়। বাংলা দেশের অধিবাসীগণ ইংরেজী শিক্ষা আশ্রয় করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্র ও ধনতন্ত্রের প্রসাদে এক নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। ইহাদের সহিত পূর্বতন ভূমির-সহিত-সম্পর্কযুক্ত মধ্যবিত্তের যোগ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়। যাহারা চামড়ার কাজ করিত, অন্যান্য কোনও কোনও শিল্প আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিত, তাহারাও পুরুষানুক্রমের ব্যবসা ছাড়িয়া হয় চাষীমজুরে পরিণত হয়, নয়তো কারখানায় কারিগরের কাজ করে, নয়তো মধ্যবিত্ত চাকুরিয়ার পদ গ্রহণ করে। ফলে পুরাতন উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর মানুষের আশ্রয় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ইহা অবশ্য শূন্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন উৎপাদন-ব্যবস্থাটি ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত নূতন ব্যবস্থার কাছে মার খাইয়া যায়।

বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে আজ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, উড়িষ্যা বিহার বা আসামেও তাহাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু আরও ধীরে এবং আরও পরে। ফলে, সেই সকল প্রদেশে যখন ইংরেজী ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটে তখন বাংলা দেশই তাহার জন্য কেরানী, শিক্ষক, ডাক্তার, মোক্তারের যোগান দেয়। সেই সময় অন্য প্রদেশের অধিবাসীরা নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে মনের দিক হইতে স্বীকার করিতে রাজী হয় নাই; গ্রামের ব্যবস্থায় যতটুকু প্রাণ অবশিষ্ট ছিল, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মোটামুটি কালাতিপাত করিতে লাগিল।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে ভারতবর্ষে ও সারা পৃথিবীতে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় চলিয়াছে তাহার ফলে বাংলার আশেপাশে বিভিন্ন প্রদেশে উৎপাদন-ব্যবস্থার বিপর্যয় প্রচুর ঘটিয়াছে। সেখানকার অধিবাসীগণও উত্তরোত্তর ধনতন্ত্রের প্রসাদজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খাতায় নাম লিখাইতেছে। বাংলা দেশের মুসলমানও পূর্বে আধুনিক পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই, কিছুদিন হইতে বিহারী আসামী বা ওড়িয়ার মত তাহারাও অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু এই অগ্রগতির ফলে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে। ধনতন্ত্রের প্রয়োজনে মধ্যবিত্তকুল বাঙালী না বিহারী না মান্দ্রাজী, তাহাতে ধনতন্ত্রের কিছু আসিয়া যায় না বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বাঙালী বা বিহারী, মান্দ্রাজী ওড়িয়া বা বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ইহাতে অনেকখানি আসিয়া যায় বইকি। বিহারী বা ওড়িয়া বা আসামী অথবা বাঙালী মুসলমান জমির সহিত সম্পর্ক হারাইয়া যখন ধনতন্ত্রের প্রসাদ আহরণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন দেখে উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, কেরানী, ইঞ্জিনিয়ার সকল জায়গাতেই হিন্দু বাঙালীতে একাকার করিয়া রাখিয়াছে। তেলেগু দেশে তামিলভাষাভাষীদেরও ঐ দশা। অতএব প্রতিযোগিতা বাধিয়া যায়, এবং প্রতিযোগিতায় পুরাতন ও পাকা খেলোয়াড়ের কাছে পরাজয়ের আশঙ্কা থাকিলে নূতন খেলোয়াড় স্বভাবত ট্যারিফ ওয়ালের (Tariff wall) আশ্রয় লয়। বিহারের মধ্যবিত্ত চাপ দিয়া চেষ্টা করে যাহাতে বাঙালী সেখানে প্রতিযোগিতায় সমানত্বের সুযোগ লইতে না পারে, ভাষার বেড়া তুলিয়া অথবা ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রাচীরের দ্বারা বাঙালীর প্রতিযোগিতাকে ব্যাহত করিয়া নবশিক্ষিত চাকুরি-অন্বেষণকারী বিহারীকে যেন অপেক্ষাকৃত অধিক সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩৫ সালের অ্যাক্ট অনুসারে যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার আশ্রয়ে বিভিন্ন প্রদেশের শিশু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাঁচিবার ও বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল; বাংলা দেশের মধ্যেও তেমনই হিন্দুর পরিবর্তে মুসলমানধর্মাবলম্বী মধ্যবিত্তের বৃদ্ধি ও প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ইহা হইতেই অবশেষে পাকিস্তানের জন্ম, এবং ইহারই ফলে আজ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি এক-একটি প্রদেশ ক্ষুদে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে একান্তভাবে স্বীয় প্রান্তের অধিবাসীদের (চাষী-মজুরদের নয়, বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত) মধ্যবিত্তীকরণে সহায়তা করিতেছে। ফলে ভারতবর্ষ নামক একটি দেশ আছে, তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিতে বসিয়াছি।

ইহার প্রমাণস্বরূপ ১৯৩৯ সালে "বেঙ্গলী-বিহারী কোয়েশ্চন" নামে নিখিল-ভারত-কমিটীর নিকট পেশ করা এক রিপোর্টের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া রোগের প্রকৃতি ও নিদান সম্পর্কে আলোচনার উপসংহার করিতেছি। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপরে উল্লিখিত সমস্যার বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন—

"স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের জন্য যে দাবি (তাহার মূলে রহিয়াছে) জনপ্রিয় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার অধীনে সরকারী চাকরি ও অন্যবিধ সুযোগ আরও বেশি করিয়া পাওয়া যাইবে, এই আশা। এই দাবির শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং (চাকরি বা অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে) যাহারা এতদিন পশ্চাৎপদ ছিল তাহারা আজ শিক্ষায় অগ্রসর হইয়া এই সকল ব্যাপারে উপযুক্ত ভাগের জন্য দাবি জানাইতেছে। এই দাবি উপেক্ষা করা সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়। চাকরি ও অনুরূপ ব্যাপারে কোনও প্রদেশবাসীর দাবি যে অপরের চেয়ে বেশি—এ নীতি স্বীকার করাই উচিত।

It is not possible to ignore the fact that the demand for creation of separate provinces based largely on a desire to secure larger share in public services and other facilities offered by a popular national administration is becoming more insistent, and hitherto backward communities and groups are coming up in education and demanding their fair share in them. It is neither possible nor wise to ignore these damands and it must be recognised that in regard to services and like matters the people of a province have a certain claim which cannot be overlooked (p. 21)."

ইহাই ছিল 'জনপ্রিয় জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠার পিছনে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও মনের ভিতরকার প্রধান দাবি। এবং ইহারই বশে সুযোগ বুঝিয়া মুসলিম নেতৃবৃন্দ সময়কালে কোপ বসাইয়া

ভারতকে দুই টুকরা করিয়া ছাড়িলেন। ভারতের প্রদেশগুলি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া 'জনপ্রিয় জাতীয় সরকারনিচয়ে' পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার কারণ সর্বভারতের প্রতি প্রেম নয়, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ না পাইলে কোনও প্রাদেশিক সরকারই 'জনপ্রিয়' হইতে পারিবে না।

কথাটা রূঢ় শুনাইতে পারে, কিন্তু ১৯৫০ সালে সত্য। ভবিষ্যতে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, পুরাকালে এরূপ অবস্থা ছিলও না। স্বামী বিবেকানন্দ অথবা মহামতি গোখলে নিজেকে বাঙালী বা মারাঠী বলিয়া ভাবিতেন না, অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেদের ভারতীয় ছাড়া আর কিছু বলিয়া ভাবিতেন এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। কিন্তু আজ ১৯৫০ সালে আমরা নিজেদের রাজনীতিক্ষেত্রে অতিমাত্রায় বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়া, আসামী বলিয়া ভাবিতেছি, ভারতীয়ত্বের বোধ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে।

রোগের চিকিৎসার পূর্বে এই সত্যটুকু আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, নয়তো রোগের চিকিৎসাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা

এবার পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের সমস্যায় আসা যাক।

পাকিস্তান তো প্রতিষ্ঠিত হইল। যে মুসলমান মধ্যবিত্তকুল পদে পদে উন্নতিতে বাধা পাইতেছিল, তাহারা এবার অবাধ গতিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরানী, ছোট বড় ব্যবসাদারের পদ হইতে আরম্ভ করিয়া জমির মালিকানা স্বত্ব ও মহাজনী কারবার সবই প্রায় বেশির ভাগ হিন্দুধর্মাবলম্বীদের হাতে ছিল। অতএব মুসলিম-রাষ্ট্রের সুযোগ লইয়া মুসলিমগণের মধ্যে এক মধ্যবিত্ত ও ধনীশ্রেণী গড়িয়া তুলিতে হইলে হিন্দুর প্রতিযোগিতার সাধ্যকে সঙ্কুচিত করিতে হয়, নয়তো মুসলিম-রাষ্ট্র গড়িয়া লাভ হইল কি? ইহারই ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর উপরে চাপ পড়িতেছে।

আসল চাপের কারণ এবং প্রকৃতি হইল ইহাই। কিন্তু সময়ে সময়ে তাহা রূঢ় কদর্য রূপ ধারণ করিতেছে। নারীহরণ, ধর্মান্তরকরণ, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি ওই চাপেরই অভদ্র প্রকাশ। মূল লক্ষ্য কিন্তু

স্পষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান শিক্ষিত ও উন্নতিকামীর দ্বারা ধনতন্ত্রের প্রসাদ সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত না হইতেছে, ততক্ষণ এই চাপ কখনও ভদ্র, কখনও অভদ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে। যখন মুসলমানের পক্ষেও মধ্যবিত্ত ও ধনীশ্রেণীর নৌকায় আর ঠাঁই থাকিবে না, যখন জনসাধারণ নিজেদের প্রশ্ন করিবে, "ইহাতে শেষ পর্যন্ত আমাদের হইল কি?" তখন হয়তো সমাজবিবর্তনের মধ্যে আর একটি সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে কথা তো পরে।

উপস্থিত, হিন্দু মধ্যবিত্তের পক্ষে প্রতিযোগিতার বাজারে অসুবিধায় পড়িতেই হইবে। পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র মুসলমান-প্রজাকে ইসলামের অজুহাতে ট্যারিফ ওয়াল দিয়া বাঁচাইয়া মধ্যবিত্ত ও ধনীশ্রেণীর নৌকায় উঠিয়া নিজের ঠাঁই করিয়া লইবার সুযোগ দিবেই, কারণ পাকিস্তানের উদ্ভবই সেই বুদ্ধি হইতে হইয়াছে।

কিন্তু পশ্চিম-বাংলার কথা স্বতন্ত্র। হিন্দু শিক্ষিত যে পথে গিয়াছে, তাহার ফলে এখানকার মুসলমান অধিবাসী কোনও দিন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, আজও নয়। এখানে মুসলমান ভাল চাষী, ভাল গাড়োয়ান, ভাল দপ্তরী, রাজমিস্ত্রী ও নানাবিধ কাজের কারিগর। তাহারা যাওয়ামাত্র সে জায়গায় হিন্দুধর্মাবলম্বী অনুরূপ কারিগর বা চাষী যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাইবে না। আর তাহাদের তাড়াইতেই বা কে চায়? তাহারা তো কাহারও অন্নের গ্রাসে হাত দেয় নাই, নিজেরা খাটে, খায়,দায়। এমন লোক আমরা সহজে তাড়াইতে চাই না। আর মুসলমানের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া যদি চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা করে, তাহাতেই বা আমাদের আপত্তি কি? যদি প্রতিযোগিতায় অন্যায় বা পক্ষপাত করা না হয়, তাহা হইলে বাঙালী হিন্দুর ভয় পাইবার হেতু নাই। আর আমরা ইহাও জানি যে, মুসলমান শিক্ষিতের সংখ্যা মারাত্মক নয়, প্রতিযোগিতাতে হিন্দু সমানে সমানে হটিবার পাত্রও নয়।

অতএব পশ্চিম-বঙ্গ হইতে মুসলমান তাড়াইবার প্রশ্ন উঠে না। নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়া আমরা যাহাই করি না কেন, মুসলমানদের তাড়াইবার স্থায়ী কোনও অর্থনৈতিক কারণ পশ্চিম-বঙ্গে নাই; পূর্ববঙ্গে হিন্দুকে তাড়াইবার হেতু আছে।

নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি

এ অবস্থায় নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান প্রজার মধ্যে তাঁহারা তারতম্য করিবেন না। ভারতের পক্ষে এ স্বীকৃতি অনাবশ্যক ছিল, পাকিস্তানের পক্ষ হইতে স্বীকার করিয়া লিয়াকৎ আলি সাহেব ভালই করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোনও মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতায় সমানত্ব দেওয়া এক জিনিস, এবং আর্থিক জীবনে তাহাকে অসমান প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচানো অপর জিনিস। লিয়াকৎ আলি সাহেব কি পূর্ববঙ্গের জনসাধারণকে এ কথা বলিতে পারিবেন, "মুসলমান ডাক্তার, মোক্তার, দোকানীর বিষয়ে তোমরা কোনও পক্ষপাত করিও না; পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হিন্দু ডাক্তার, মোক্তার ও ব্যবসাদারকে তোমার স্বধর্মাবলম্বীর সঙ্গে সমান পর্যায়ে রাখিয়া চলিও"? তাহা হইলে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত বা ধনীকুল হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, "তবে আর পাকিস্তান করিয়া লাভ কি হইল? উহাদের এতদিনের 'অত্যাচার' হইতে বাঁচিবার জন্যই তো আমরা পাকিস্তান চাহিয়াছিলাম, এখন আবার তুমি এ কি কথা বলিতেছ?"

অতএব নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি রাজনৈতিক অধিকারের বেলায় স্বীকৃত হইলেও সাধারণ সাংসারিক জীবনে হিন্দুর পক্ষে পূর্ববঙ্গে বাস করা সমান দুষ্কর হইয়া থাকিবে। নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে সেদিক দিয়া কোনও আশার আলো দেখা যায় না। অর্থনৈতিক রোগের প্রতিকারের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে না পারিলে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার দুঃখের শেষ হইবে না।

আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভদ্রলোক। যুদ্ধের দ্বারা ভারত-পাকিস্তান-সমস্যার সমাধান হইবে না, ইহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাস্ত করিতে পারিলে আজ ভারতে যে ধনতন্ত্র চলিতেছে, পাকিস্তানের উপরে তাহাই কায়েমী হইয়া বসিবে—শুধু মাঝখান হইতে কিছু মুসলমান ধনী ও মধ্যবিত্ত পদচ্যুত হইবে—আর

কোনও স্থায়ী প্রতিকার যুদ্ধের দ্বারা সম্ভব নয়, ইহা হয়তো তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

তাই যাঁহারা "যুদ্ধ চাই", "যুদ্ধ চাই" বলিয়া দাবি জানাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য তিনি বাঙালীর নিষ্ঠুরতা ও অসহিষ্ণুতার জন্য তিরস্কার কম করেন নাই। সরকারী প্রতিকার-চেষ্টার উপর আস্থা হারাইয়া বাঙালী যখন আত্মঘাতী হইয়া উঠিল, তখন তিনি তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছেন। যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না, বরং যুদ্ধ বাধিলে অপরাপর দেশের মধ্যস্থতায় ভারত তাহার নবলব্ধ স্বাধীনতা হারাইয়া বসিবে—ইহা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া লিয়াকৎ আলি সাহেবের সহিত একটি সভ্য চুক্তির জন্য এত বেশি উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। চুক্তির কোনও কোনও শর্ত আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতির বিরোধী জানিয়াও যুদ্ধের আবর্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কিঞ্চিৎ নতিস্বীকার করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, ইহার দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের কি কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে?

ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয়, সে সম্ভাবনার আশা কোথাও পাইতেছি না। অন্তত আলোচ্য চুক্তির মধ্যে সে আশার আলো নাই; মৌলিক সমস্যার সম্বন্ধে স্বাক্ষরকারীগণ যে সচেতন, ইহারই কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু মধ্যবিত্ত আসিতেই থাকিবে, গরিব লোকও দেখাদেখি আসিবে; আর পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমান ভয়ে পলাইয়া যাওয়ার ফলে এখানে নানা ব্যবসায়ে লোকাভাব ঘটিবে এবং নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

প্রতিকারের একটি পথ

তবে পথ কি নাই?

একটি পথ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু পথ অতি দুর্গম, এবং বেশি লোক ওই সঙ্কীর্ণ পথে চলিবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। তবু, ইহাই রোগের শ্রেষ্ঠতম প্রতিকার মনে করিয়া রোগীর কল্যাণার্থে

অন্তত চিন্তার ক্ষেত্রে সে পথ রচনা করিয়া দেখিতেছি, তাহার দ্বারা কতদূর কি হয়!

ধনতন্ত্রের রথ আজ পৃথিবীর সর্বত্রই খোঁড়া হইয়া চলিতেছে। তাহার উপরের রঙে চটা ধরিয়াছে, রাষ্ট্রের ছাতা তাহার উপরে না ধরিলে ছাতের ফাটল দিয়া বর্ষাকালে ঝরঝর করিয়া ভিতরে বৃষ্টি নামে। এই জীর্ণ রথে চড়িয়া পূর্ববঙ্গের মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় সংসারের সাহারা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা বাঙালী হিন্দু, যাহারা আগে হইতে রথে বসিবার জায়গাগুলি দখল করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহারা জনতার ধাক্কায় পথে নামিয়া পড়িয়া ভাবিতেছি, সবটাই জনতার দোষ। কিন্তু অনেকখানি দোষ যে রথের জীর্ণতার ও পথের অসমতার, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। যে রথকে আশ্রয় করিয়া এতদিন সুখে দুঃখে সংসার-মরুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার আয়ু যে বিগতপ্রায়, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়াই উচিত।

স্বীকার না হয় করিলাম। তাহার পর? তাহার পরের কথা সংক্ষিপ্ত। এতদিন মধ্যবিত্তকুল চাকরি, ওকালতি, প্রভৃতি করিয়াছে। আর কিছু করে নাই; ধন উৎপাদনে তাহারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়তা করে নাই; ইংরেজ আমাদের দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে উন্নততর করিয়াছিল, এবং শোষণও করিয়াছিল। আমরা উন্নতীকরণে বেশি সাহায্য করি নাই, সে সুযোগও বেশি আমাদের দেওয়া হয় নাই। শোষণকাজে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করিয়াছি।

সেই অবস্থা হইতে আসিয়া দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার কাজে এবার আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আজ যত উৎপাদন হয়, তাহার মুনাফার দ্বারা হিন্দু ও নবজাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্ত কুল—উভয়কে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নয়। এত পরগাছা জীর্ণ গাছের ডালে বাসা বাঁধিলে গাছই মরিয়া যাইবে। অতএব বাঁচিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে এতদিন যাহারা শোষণসহায়ক মধ্যবিত্তকুল ছিল, তাহাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় (যদি ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিতে চায়) উৎপাদনে সহায়কের পদে আরূঢ় হইতে হইবে।

শুধু ইঞ্জিনিয়ার বা কেরানী নয়, হিন্দু ও মুসলমানকে আজ ভাল মিস্ত্রি হইতে হইবে। ধনতন্ত্রের অধিকারীদের বাধা উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রের সহায়তায় সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া মূলধনের অভাব মিটাইয়া চাষবাস শিল্পবাণিজ্য সবই অধিকার করিয়া দেশের সমগ্র সম্পদকে বাড়াইতে হইবে। গান্ধীজীর কল্পিত জনসাধারণের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে পারিলে আজ যে মধ্যবিত্তকুল পরস্পরের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করিয়া মরিতেছে, তাহারা বাঁচিয়া যাইবে এবং দেশ এতদিনের পুরাতন ধনতন্ত্রের শোষণে যে রক্তহীন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, সেই অবস্থা মোচনের সম্ভাবনা দেখা দিবে।

কিন্তু পথের নেতা কোথায়, যিনি নূতন গঠনের নেতৃত্ব করিবেন, যিনি আচরণের দ্বারা বহুকে ঐ পথে উৎসাহিত করিবেন?

আজ যাঁহারা রাষ্ট্রনেতা, তাঁহারা কি ইহা পারিবেন? যদি পারেন ভাল; যদি না পারেন, হয় দেশের লোক মরিবে অথবা মরণের অপঘাত নিরোধ করিবার জন্য নূতন পুরোহিতের সন্ধান করিয়া তাহাকেই অনুসরণ করিবে।

আমরা এইটুকু কেবল প্রার্থনা করি, মানুষের মুক্তি হোক, তাহারা সুখী হোক এবং কল্যাণের পথে, বুদ্ধিযুক্ত মানুষের স্বেচ্ছায়-গ্রহণ-করা ব্রতের দ্বারা সেই উন্নতি এবং অগ্রগমন সম্ভব হোক।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ঘুড়ি

লাটাই-বাঁধন শক্ত ব'লে
উড়ছে ঘুড়ি,
হাতের সূতার টানে টানে
দেখায় কত জারিজুরি;
গোঁত্তা খেয়ে পড়ে আবার
ফড়্ফড়িয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে,
কারিকে জয় দিয়ে পাশের
ঘুড়ির পানে কেমন ছোটে।

সংবাদ-সাহিত্য

পণ্ডিত জওহরলাল বাংলা সফরে আসিয়া এখানকার বর্তমান দুর্গতির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া গেলেন, বাংলা দেশের তরুণেরা আশাভঙ্গ রোগে ভুগিতেছে; সর্দার বল্লভভাইও সেদিন এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিলেন। উভয়েই সত্য কথা বলিয়াছেন, তবে সে সত্য আংশিক এবং বহু পুরাতন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে গুপ্ত-কবির আক্ষেপ স্মরণীয়—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।" শুধু আশা নয়, বহু কাল হইতে বাঙালীর বাসা ভাষা ও ভালবাসা প্রভৃতি ভঙ্গপ্রবণ সব-কিছুই ভাঙিয়াছে, তবু রঙ্গ কমে নাই। সে বরাবরই নিজের নাসা কর্তন করিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিয়াছে, দলাদলি ও কোন্দলের মোহে পড়িয়া দল ভাঙিয়াছে, ঘর ভাঙিয়াছে, আসর ভাঙিয়াছে, বাসর ভাঙিয়াছে, গলাবাজি করিয়া গলা এবং স্বর ভাঙিয়াছে, অকালপক্কতা লাভ করিয়া তাহার মেরুদণ্ড প্রভৃতি ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার নদীগুলি কূল ভাঙিয়া পাড় ভাঙিয়া ছুটিয়াছে, তাহার ধাড়ীরা শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে জুটিয়াছে, তাহার সমাজ কুল ভাঙিয়া মেল ভাঙিয়া এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছে, এবং ঈশ্বর গুপ্তও যাহার কল্পনা করিতে পারিতেন না, আজ কিউ-কন্‌ট্রোলের লাইন ও আইন ভাঙিয়া সে ব্যাপকতর রঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে; মোটের উপর প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের বারম্বার বিপর্যয়ে বাঙালীর কপাল ভাঙিয়াছে, তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে, তবুও সে একটুও দমে নাই। আজই বা হঠাৎ এমন নূতন কি ঘটিল, যাহার জন্য ভারতবর্ষের প্রধান এবং উপ—উভয়েরই টনক নড়িয়া উঠিল, এবং তাঁহারা ভঙ্গ বঙ্গদেশকে জোড়া দিতে আসিলেন—তাঁহারা আর কেহ হইলে বলিতাম, রঙ্গ দেখিতে আসিলেন।

আমাদের এই বাত্যাসঙ্কুল বঙ্গোপসাগরের ঊর্ধ্বে কালবৈশাখী ও নিম্নে প্রবল জলোচ্ছ্বাস বরাবরই লাগিয়া আছে, কিন্তু পারাপারের তরণীতে কর্ণধারের অভাব ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। গোপালদেব, বল্লালসেন, চৈতন্যদেবের কথা তুলিতেছি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় আসিয়া নব্যবঙ্গের

প্রগতিশীল সমাজের নেতৃত্ব-ভার লইবার পর, তিনি এবং সনাতনী দলের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব যথাক্রমে হাল এবং বৈঠা ধরিয়া উত্তাল-জলধিজলে যে তরণী ভাসাইয়াছিলেন, পর পর বহু চিন্তানায়ক ও জননায়ক আসিয়া বহু ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া তাহাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে লইয়া চলিতেছিলেন, সমাজ শিক্ষা সাহিত্য হইতে ধর্মে, এবং ধর্ম হইতে রাজনীতির দরিয়ায় টালমাটাল খাইতে খাইতে সে তরণী ভাসমানও আছে; কিন্তু আজ হঠাৎ বাংলা দেশে সেই শাল-প্রাংশু মহাভুজদলের অভাব ঘটিয়াছে, যাঁহারা সমগ্র ভারতে নেতৃত্ব করিতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রের পর হঠাৎ "তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর", কে তাহা পূর্ণ করিবে? শ্রীঅরবিন্দ আছেন, কিন্তু তাঁহার বিবেকানন্দ কই? বিধানচন্দ্র যথাসাধ্য করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সে সর্বভারতীয় বিভূতি কই? তিনি বহু কষ্টে ও কৌশলে তাঁহার আশ্রিত অক্ষম হাতগুলিতে উত্তেজনা সঞ্চার করিয়া স্রেফ টীমওয়ার্কের জোরে নিশ্চিত ভরাডুবি হইতে বাংলা দেশকে কোনও ক্রমে রক্ষা করিয়া চলিতেছেন এইমাত্র। অবশ্য এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না যে, এমন ভয়াবহ সঙ্কটে বাংলা দেশ আর কখনও পড়ে নাই, সুতরাং এখন শুধু ভাসাইয়া রাখার কৃতিত্বও অসাধারণ। কিন্তু তিনি বাংলা দেশের দুরন্ত যুবশক্তির আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত রাখিবার ক্ষমতা রাখেন না; তিনি কর্মী, কবি নন; স্থূল বাস্তববাদী, কিন্তু সূক্ষ্ম আদর্শবাদী নন; তিনি শাসনে রাখিতে পারেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ তরুণকে মাতাইয়া গিরিলঙ্ঘনের কাজে নিযুক্ত করিতে পারেন না। "কেবল তুমিই আছ আমিই আছি এই জেনেছি সার" বলিয়া বাংলা দেশের যুবকেরা কখনই তাঁহার অনুসরণ করিবে না, সুতরাং বাংলা দেশের তরুণদের আশাভঙ্গ-ব্যাধির উপশম তাঁহা হইতে হইবে না, এবং নেহরু প্যাটেলের বকুনি আমাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে।

বড় আশা করিয়াছিলাম কেন্দ্রের জোয়ালমুক্ত বাঙালী শ্যামাপ্রসাদ কম্বুকণ্ঠে বাংলার যুবশক্তিকে আহ্বান করিবেন; বলিবেন, তোমরা জাগ, তোমরা আশান্বিত হও, দিকে দিকে অভিযান কর। হে

বাংলার তরুণ, গৃহচ্যুত সর্বস্বান্ত অত্যাচারিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত আশ্রয়চ্ছিন্ন তোমার আত্মীয়স্বজনকে তুমি না উদ্বুদ্ধ হইলে কে রক্ষা করিবে? মুমূর্ষু ও অর্ধমৃতকে তুমি না বাঁচাইলে কে বাঁচাইবে? তুমি উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। আশা করিয়াছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের মসীমুক্ত শ্যামার অসি প্রদীপ্ত হইয়া পথভ্রান্তকে পথ দেখাইবে, ঘুমন্তকে জাগাইবে, ছত্রভঙ্গকে একচ্ছত্রতলে আনয়ন করিবে। তাঁহার সে সংগঠনী শক্তির প্রকাশ এখনও দেখিতেছি না কেন? কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বে অবসন্ন অর্জুনদের তবে কে প্রেরণা দিবে, কে জাগাইবে? যে বঙ্গদেশ বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ সুভাষচন্দ্রের জন্মভূমি, সেই বঙ্গদেশ কি আজ শুধু ঘোষেদের গোয়াল হইয়া থাকিবে?

গত ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে লিয়া-কত আলী ও দিয়া-কত পণ্ডিতের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা রেজিস্ট্রিকৃত করিবার জন্য স্বয়ং লিয়া-কত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে হাজির হইয়াছেন—রেজিস্ট্রার এই অশান্ত পৃথিবীর শান্তি রক্ষার প্রধান অছি স্বয়ং টু্ম্যান সাহেব। ভাববাদী জওহরলাল যে নূতন রাষ্ট্রনৈতিক দুঃশাসনকে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই, প্রত্যক্ষ-কর্মবাদী লিয়াকৎ আলী সাড়ম্বরে তাহারই বক্ষ-রক্ত পান করিবার ভীমপ্রতিজ্ঞা করিয়া আসর জমাইয়া ফেলিয়াছেন। আমরা মানসনেত্রে ভারতবর্ষের নির্মল আকাশে সুপারফোর্ট্রেসের চলমান কালোছায়া দেখিতে দেখিতে পুলকিত হইয়া কাব্য করিতেছি—

লিয়া-কত কহে দিয়া-কতে,
"সুন্নী অথবা সিয়া মতে
'টেল' যদি পড়ে তুমি হারো, দাদা,
'হেডে' হাম কাম কিয়া কতে!"
দিয়া-কত কহে লিয়া-কতে
ব্যাণ্ডেজ বাঁধি হিয়া-ক্ষতে—

"শেষ বোঝাপড়া, হে নবাবজাদা,
হবে জেনো রোজ-কিয়ামতে।"

আমাদেরও ভরসা, এই বৈষয়িক লেন-দেনে আপাতদৃষ্টিতে লিয়া-কতেরা লাভবান হইলেও লম্বা পাল্লায় দিয়া-কতদেরই জিত হইবে। দুর্যোধন-বন্ধু কুরু-সেনাপতি কবচ-কুণ্ডল-একাঘ্নীধারী অঙ্গরাজ কর্ণকে আমরা বিস্মৃত হইলেও পুত্র-বৃষকেতু-উৎসর্গকারী অতিথি-পরায়ণ দাতা কর্ণকে কখনই ভুলিতে পারি না। পৌরাণিক যুগে প্রমাণের অন্ত নাই। ঐতিহাসিককালে ইংলণ্ডের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য হইয়া আছে। সেখানে বার বার দেখিতেছি, দূর পাল্লায় এডমণ্ড বার্করাই জিতিয়াছেন, ক্লাইব ওয়ারেন হেস্টিংসরা নয়। মহাকালের দরবারে ন্যায় ও শান্তিকামীরা চিরদিনই স্মরণীয় হইয়া আছেন, জওহরলালও থাকিবেন। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ দূরদর্শীও নই, ধৈর্যশীলও নই, তাই আপাত-প্রত্যক্ষ পরাজয় বা ক্ষতিকেই বড় করিয়া দেখিতেছি এবং কুঁদুলে মেয়েদের মত কপাল চাপড়াইয়া বলিতেছি, মিন্সের হাতে প'ড়ে হাড়-মাস কালি হয়ে গেল গা!

—

আমরা বলিতেছি মানে—আমাদের ভোক্যাল অর্গানগুলি বলিতেছেন। প্রতিদিন দুই বেলা কর্তার খুঁত ধরিয়া তাঁহারা যে ভাষায় আর্তনাদ করিতেছেন, তাহাতে আমরা অর্থাৎ অপোগণ্ড শিশুরা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না, মায়েদের আঁচল ধরিয়া আমরাও কাঁদিতে শুরু করিয়াছি। এই একতান ক্রন্দন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারে, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি তো কোন্ ছার! আমরা অবোধ, পলিটিক্স বুঝি না। অথচ সংবাদ-পত্র খুলিলেই যখন ছাপার অক্ষরে পাশাপাশি বড় বড় শিরোনামায় দেখিতে পাই—"নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি কার্যকরী হইতেছে", "পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্যাতন বাড়তির পথে", তখন বিভ্রান্ত হইয়া ভাবি, কোন্‌টা সত্য? প্রথম শিরোনামা সত্য হইলে দ্বিতীয় শিরোনামার অর্থ কি? যদি দ্বিতীয় শিরোনামা সত্য হয় তাহা হইলে চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে; যদি তাহা মিথ্যা হয় তাহা হইলে এইরূপ ক্ষতিকর মিথ্যা সংবাদ ইঁহারা অবাধে পরিবেশন করিতেছেন কিরূপে?

এই সব ভাবিতে গিয়া আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি তালগোল পাকাইয়া যাইতেছে এবং আমাদের এক দল চুক্তিকারী সরকারের উপর খড়্গহস্ত হইতেছেন এবং অন্য দল কাছা-কোঁচা বিসর্জন দিয়া চুক্তি-মহিমা কীর্তনে উদ্দাম-নৃত্য করিতেছেন। ফলে একই চুক্তির কৃষ্ণ পক্ষে এবং কালী পক্ষে ব্যাখ্যা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে এই বিভ্রান্তি রোধ করা; যাহা মিথ্যা তাহার প্রকাশ রহিত করা অথবা সত্য চুক্তিবিরোধী হইলেও সাধারণের কাছে তাহা স্বীকার করিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া। সংবাদ-পত্রগুলি যদি এমনভাবে প্রতিদিন একই নিশ্বাসে গরম এবং ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়িতে থাকেন, তাহা হইলে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হইবে এবং ভাল মানুষদেরও সমর্থন গবর্মেণ্ট হারাইবেন।

—

ভাল কথা, একটি সংবাদ-পত্রের একটি আসর লইয়া আমরা মহা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, 'আনন্দবাজার-পত্রিকা'র "কমলাকান্তের আসর"। 'বঙ্গদর্শনে'র কমলাকান্ত শর্মার নাম লইয়া কে কোথায় 'অবতার'-মার্কা রসিকতা করিতেছেন আর প্রত্যহ পত্রাঘাতে আমরা জর্জরিত হইতেছি। যৌবনে দারোয়ানী করিয়াছিলাম বলিয়া চিরদিনই সে দায়িত্ব লইতে হইবে—এ তো বড় মুশকিলের কথা! শুধু কি পত্রাঘাত; টেলিফোনে এবং মুখে লোকে গালাগালি দিয়া ভূত ভাগাইতেছেন! জাল কমলাকান্তের লেখা লইয়া তাঁহাদের আপত্তি নয়, তাঁহাদের আপত্তি কমলাকান্তের নামটা লইয়া। ভদ্রলোক আর নাম পাইলেন না? কমলাকান্তকে লইয়া টানাটানি কেন? বলিলাম, এ আজ নূতন হইতেছে না, ইতিপূর্বে বহু বঙ্গসন্তান ওই নামের জের টানিয়া বহু কেলেঙ্কারি বাংলা সাহিত্যে করিয়াছেন, এই বেলাই বা আপত্তি কেন? বুঝিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের প্রতি তাঁহাদের সেণ্টিমেণ্টে ঘা লাগিতেছে। নব শ্রীকমলাকান্তকে ধরিলাম, বলিলাম, ভায়া, আসরের নাম বদলাও, তুমি বড় জোর বর্মাচুরুট পর্যন্ত চালাও, ও-আফিমী ঢঙ আনিতে পারিবে কেন? কমলাকান্ত ক্যাবলাকান্ত

সাজিয়া বলিলেন, আসরের একটা নাম সাজেস্ট করুন। এটা ওটা সেটা নাম করিলাম, কোনটা ঠিক তেমন মনঃপুত হইল না। বিড়ির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নাম যুক্ত করিয়া যাঁহারা ব্যবসা চালাইতে চান, "মনমোহিনী" "চিত্ততোষিণী" তাঁহাদের পছন্দ হইবে কেন? সুতরাং "কমলাকান্তের আসর"ই চলিতেছে। আমরা বাংলা দেশের পাঠক সমাজকে সবিনয়ে শুধু এইটুকুই জানাইতে চাহিতেছি যে, আনন্দ-ভাগাড়ে ভূত-প্রেত-প্রমথর বেলেল্লা নৃত্য রোধ করিতে পারি, এত বড় মহাদেব আমরা নই।

খবরের কাগজেই পড়িতেছিলাম সুন্দরবনে ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ একটি বাঘ ভাগ্যবিড়ম্বনায় কলিকাতার হগসাহেবের বাজারে মুক্তিলাভ করিয়া বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে। পড়িতে পড়িতে উক্ত বাঘটির সহিত নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া "মুক্তি, না, মৃত্যু" শীর্ষক একটি দার্শনিক-রাজনৈতিক গুরু প্রবন্ধ মনে মনে ফাঁদিতেছিলাম, এমন সময় "সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি"র জয়েণ্ট সেক্রেটারি স্বয়ং ব্রহ্মচারী ভোলানাথ দর্শন দিয়া কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, মহাশয়, সুন্দরবনকে বাঁচান। অবাক হইয়া ভাবিলাম, ব্রহ্মচারী মহাশয় বোধ হয় সুন্দরবনের ব্যাঘ্রহত্যার প্রতিবাদ জানাইতে আসিয়াছেন। প্রশ্নাতুর দৃষ্টি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতেই তিনি বলিলেন, সরকারী খাদ্যসংগ্রহ-নীতির প্রকোপে সুন্দরবনের মানুষ মরিতে বসিয়াছে। মনে পড়িল, কাকদ্বীপ-সুন্দরবন অঞ্চলে সমাজ-বিরোধীদের ঘন ঘন নাশকতামূলক কার্যকলাপের কথা। ভাবিলাম, বুঝি তাহার কথাই বলিতেছেন। কিন্তু না, তিনি বলিলেন, সরকারের নীতি সুন্দরবনের মানুষদের নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে বলিয়াই সমাজ-বিরোধীরা প্রশ্রয় পাইতেছে। সরকারী নীতির ভাল-মন্দ বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই, আমরা সদাশয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। আমরা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবৃতির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"সুন্দরবনের ধান সুন্দরবনবাসী শতাধিক বৎসর ধরিয়া দেশের

সেবায় দিয়া আসিয়াছে। বিনিময়ে পাইয়াছে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা। তাই এখন একটু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে চায়, আমাদের এক-ফসলী দেশে 'ধান ছাড়া যখন কিছুই হয় না' তখন, এই ধান যেন লুঠ করা না হয়, আমাদের ধানের যেন এমন মূল্য ঠিক করা হয়, যাহাতে আমরা খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে পারি। যদি সাগরদ্বীপ হইতে হাসনাবাদ পর্যন্ত সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলকে একই ইউনিট হিসাবে ধরিয়া এখানকার অবস্থানুযায়ী নূতনভাবে নীতি নির্ধারণ না হয়; যেমন চলিয়া আসিয়াছে, চলিতেছে, সেই মতই চালাইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে সুন্দরবন অঞ্চলে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধ করা যাইবে না। বাড়িয়াই চলিবে।

"সুন্দরবন প্রজা মঙ্গল সমিতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সুন্দরবন সমস্যার সমাধান কল্পে গবর্মেণ্টের সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিয়া যাইবে। কিন্তু সরকারী নীতি যেখানে সুন্দরবনবাসীর জীবনে অকল্যাণকর বিবেচিত হইবে, সেখানে সেই নীতি সংশোধন করার দাবি লইয়া সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি ও অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি থানা প্রজামঙ্গল সমিতি গবর্মেণ্ট ও দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইবে।

"সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন দিকে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বাড়িয়া যাইতে থাকায় সমগ্র সুন্দরবনের উপর সরকারী নীতি দ্রুতগতিতে সংশোধিত না হইলে যে অবস্থা দেখা দিতে পারে, তাহা অবহেলিত সুন্দরবনবাসীদিগের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রের নাগরিক ও মন্ত্রীসভার সমর্থক হিসাবে দেশবাসী ও আমাদের মন্ত্রীসভাকে 'সুন্দরবনের ধান ও ভাগচাষ' সম্বন্ধীয় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে বলি।"

ব্যক্তিগত দানধ্যানের মহিমায় আমাদের পুরাণ-ইতিহাসগুলি ওতপ্রোত হইয়া থাকিলেও সামাজিক বা সংঘবদ্ধ দানের বড়-একটা পরিচয় সে-যুগের কাহিনীতে মিলে না। ইহা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। দশে মিলিয়া সমাজের জনহিতকর হাসপাতাল শিক্ষালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এ দেশে সবে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এই সংঘবদ্ধ দানের শক্তি আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি

নাই বলিয়া জনকল্যাণের কাজে এখনও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। আমরা সাধারণেরা যে সমবেত চেষ্টায় বড় বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারি, সে বোধ আমাদের জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন; কারণ, দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা দানবীর রাজা ও জমিদারদের এমন পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাঁহারা পূর্বপুরুষদের কীর্তিই বজায় রাখিতে আর পারিতেছেন না। এখন জনসাধারণের কর্তব্য এগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা। কলিকাতা তিলজলা অঞ্চলে বেদিয়াডাঙ্গা রোডের উপর অবস্থিত মানসিক চিকিৎসালয় "লুম্বিনী পার্কে"র কথা স্মরণ করিয়া আমরা এই মন্তব্য করিতেছি। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪০ সালে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসুর নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালেটিক্যাল সোসাইটির চেষ্টায় স্থাপিত হয়। শ্রীরাজশেখর বসু প্রমুখ কয়েক জন সহৃদয় ব্যক্তির দানশীলতায় চিকিৎসালয়ের কার্য আরম্ভ হয় এবং বিগত দশ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে ইহার কার্যকলাপ প্রসার লাভ করিতে থাকে। প্রথম বৎসরের মাত্র তিনটি ইন্‌ডোর বেড আজ সাতষট্টিটি বেডে পরিণত হইয়াছে বটে, এই স্বল্পকালের মধ্যে বহু সংখ্যক মনোবিকারগ্রস্ত রোগী এখানে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভও করিয়াছেন—কিন্তু গভর্মেণ্ট অথবা কলিকাতা কর্পোরেশনের কোনও সহানুভূতি লাভে ইঁহারা বঞ্চিত আছেন; ফলে ইঁহারা জনকল্যাণের কাজ আশানুরূপভাবে করিতে পারিতেছেন না। আমরা এতকাল মনোবিকার-রোগগ্রস্তদের সামাজিক ভাবে বর্জন করিয়াই আসিতেছিলাম,—গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া অথবা গৃহের বহিষ্কার করিয়া এই রোগীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতেছিলাম। প্রধানত রাঁচীর মানসিক চিকিৎসালয় ও কলিকাতার লুম্বিনী পার্কের চেষ্টায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইতে শুরু হইয়াছে। আমরা এই সকল হতভাগ্যদের ব্যাধিমুক্ত করিয়া আবার সামাজিক জীব হিসাবে গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু রোগীর সংখ্যার তুলনায় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। এই দায়িত্ব জনসাধারণের করপুষ্ট গভর্মেণ্টের। গভর্মেণ্ট যেখানে উদাসীন, সেখানে জনসাধারণকেই এই দায়িত্ব লইতে হইবে। ইউরোপে

আমেরিকায় এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান সাধারণের চাঁদার সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। মাসিক সাংসারিক খরচের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিকের এই খরচও নিয়মিত বরাদ্দ থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি সুপরিচালিত হয়, অর্থাভাবে কখনই ইঁহাদের কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করিতে হয় না। "লুম্বিনী পার্ক" বর্তমানে নিদারুণ অর্থাভাবে ইঁহাদের কল্যাণহস্ত সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইতেছেন, দেশের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা। যে প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়া তাহার অর্ধেকের অধিককে নিরাময় করিয়াছেন, যে প্রতিষ্ঠান ১৯৪৯ সাল হইতে মনোবৈজ্ঞানিক মতে শিশুদের শিক্ষা দিবার জন্য "বোদ্ধায়ন" শীর্ষক বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন, যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্রেরা নিয়মিত হাতে-কলমে কাজ করিবার সুযোগ পান, সেই প্রতিষ্ঠানের দ্বার যদি অর্থাভাবে রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার আমাদের স্থান থাকিবে না, এবং ভবিষ্যৎ বাঙালীর কাছে আজিকার বাঙালীরা চিরদিন পাপভাগী হইয়া থাকিবে। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে এই বিকারগ্রস্ত রোগীদের জন্য সহানুভূতি আছে, ইহার সহিত সামান্য একটু উদ্যম যুক্ত হইলে, প্রত্যেকের তিল পরিমাণ সাহায্য এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও প্রসারের পথে সাহায্য করিবে।

আগামী ১লা জুন (১৮ই জ্যৈষ্ঠ) হইতে 'শনিবারের চিঠি' ও "রঞ্জন পাবলিশিং হাউসে"র সকল বিভাগ ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ (টেলিফোন: বড়বাজার ৬৫২০)-এ স্থানান্তরিত হইবে। গ্রাহক ও পাঠকগণ এখন হইতেই এই ঠিকানায় পত্রাদি ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার

(পূর্বানুবৃত্তি)

কলেজের অধ্যক্ষতা-কর্মের গুরুত্ব

কলেজের অধ্যক্ষতা-কর্ম অতিশয় কঠিন। চারি পাঁচ শত ছাত্রকে চেনা, জানা, তাহাদের দেখাশুনা করা সোজা কাজ নয়। তৎকালে কলেজের প্রায় অর্ধেক ছাত্র কলেজ-হোস্টেলে থাকিত। তাহাদের দেখাশুনা মন্দ হইত না। যাহারা বাড়ি হইতে আসিত, তাহাদের সকলের বাড়ি শিক্ষার অনুকূল ছিল না। আরও, কয়েকজন ছাত্র অতিশয় দরিদ্র, তাহারা কলেজ-হোস্টেলে থাকিতে পারিত না, ৮।১০ জন মিলিয়া পৃথক বাসা করিয়া থাকিত। কোন শিক্ষক তাহাদের সহিত কষ্ট করিয়া থাকিতে চাহিতেন না। এক এক শিক্ষকের উপর তাহাদের দেখাশুনা করিবার ভার ছিল। কিন্তু অসুখ-বিসুখ হইলে কলেজ হইতে তাহারা বিশেষ কোন সাহায্য পাইত না। একদিন দেখি, মাজিস্ট্রেট সাহেব আসিয়াছেন। কেন আসিয়াছিলেন, মনে নাই। তিনি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কলেজের অধ্যক্ষ হইতে ইচ্ছা করি কি না? আমি বলিলাম, "একদিনের জন্যও নয়। আমি এই গুরুভার বহনের অযোগ্য।" তিনি চলিয়া গেলেন, আর কিছু বলিলেন না। সে সময়ে, ইহারই দুই-একদিন পরে এক ছাত্র আমাকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সাত দিনের ছুটি চাহিয়াছিল। দৈবক্রমে সে আমার প্রথম বর্ষের ছাত্র, তাহাকে চিনিতাম। রুগ্ন দেহ, বাঙালী। মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত অনেককাল মেলেরিয়া ভোগ করিয়াছে। মুখ পাণ্ডুর, চক্ষু জ্যোতিহীন; সে কলেজ-হোস্টেলে থাকিত। কেরানীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কেন সাত দিনের ছুটি চায়?" তিনি বলিলেন, "তাহার বিবাহের দিন ঠিক হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য ছুটি চায়।" শুনিয়া আমি স্তম্ভিত; আমি ছুটি দিলাম না। পরদিন দেখি, সন্ধ্যার পর কলেজের এক শিক্ষককে সঙ্গে লইয়া ছাত্রের পিতা আমার বাসায়

উপস্থিত। তিনি রেলের ঘণ্টাখানেক পথ দূরে এক সাবডিভিশনের ডিপুটি। আমি যথাযোগ্য আদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলাম।

"আমি এক সপ্তাহের ছুটি চেয়েছিলাম, আপনি দেন নাই।"

"কি জন্য ছুটি চেয়েছিলেন?"

"তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।"

"ছেলেটি রুগ্ন, বোধ হয় অনেকদিন মেলেরিয়ায় ভুগেছে। বয়সও অল্প। এখানে মাস পাঁচ-ছয় থাকলে তার শরীর সেরে যাবে। আর এত তাড়াতাড়িই বা বিয়ে কেন?"

"কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমি তার কল্যাণ চিন্তা ক'রে তার বিয়ে অনুমোদন করতে পারি না।"

"আপনি কি তার পিতার চেয়ে বেশি চিন্তা করেন?"

"কম কি বেশি, বলতে পারি না। কিন্তু যেদিন আপনি ছেলেটিকে কলেজের হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন, সেদিন হতেই কলেজকে তার কল্যাণ চিন্তা করতে হয়েছে।"

"কোন্ অধিকারে?"

"আপনিই সে অধিকার দিয়েছেন, কলেজের অধ্যক্ষকে পিতৃস্থানীয় ক'রে গেছেন।"

"তা হ'লে আপনি ছুটি দেবেন না?"

"আমি কেমন ক'রে তার অহিত কাজ করি? ইচ্ছা করলে আপনি ছেলেটিকে এই কলেজ হতে নিয়ে যেতে পারেন। তখন আর আমাদের কিছু ভাববার থাকবে না।"

তিনি তাহাই করিলেন।

কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে অনেক কাজ করিতে পারেন, কলেজের ছাত্রদিকে হিতকর পথে চালাইতে পারেন। ইহার পূর্বে আর একবার আমাকে অধ্যক্ষের কাজ করিতে হইয়াছিল। তখন বর্ষাকাল। শুনা গেল, কেন্দ্রাপাড়া নামক অঞ্চল বৃষ্টিতে ও নদীর বাণে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেহ ঠিক খবর দিতে পারিল না। সে অঞ্চলের দুই-তিনটি ছাত্র ছিল।

"তোমরা কাল ভোরে চ'লে যাও, কি হয়েছে দেখে এস।"

তৃতীয় দিবসে ফিরিয়া আসিলে আমি কলেজের ছাত্রদিকে ডাকিলাম।

"সবাই শোন। কত ঘর পড়িয়া গিয়াছে, কত গোরুবাছুর মরিয়াছে, কত লোকের যথাসর্বস্ব ভাসিয়া গিয়াছে, তোমাদের কিছু করিবার নাই কি?"

তখনই বিশ-পঁচিশটি ছাত্র সেখানে গিয়া সাহায্য করিতে ব্যগ্র হইল। তাহারা নিজেদের মধ্যেই প্রত্যেকের নিকট হইতে এক এক আনা চাঁদা তুলিল। কি রকমে সাহায্য করিবে নিজেরাই স্থির করিল, আমাকে কিছুই করিতে হইল না। কেবল ছয়-সাত জন ছাত্রকে ছয়-সাত দিনের জন্য পালা করিয়া ছুটি দিতে লাগিলাম।

আবার এক সুযোগ পাইলাম। একদিন ২৫।৩০ জন ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ, আমাদের দেশে এত অভাব, এত দুঃখ, তোমরা কেবল পড়াশুনাই করিবে, আর কিছু করিবে না?"

"কি করিতে বলেন?"

আমি পাঁচ-সাতটি কাজ নির্দেশ করিলাম। তাহারা উৎসাহিত হইয়া সম্মত হইল। দুই-একটা লিখিতেছি।

১। "তোমাদের মধ্যে কেহ অঙ্কে পাকা, কেহ কাঁচা। যাহারা পাকা, তাহারা কাঁচাদিকে সপ্তাহে দু-ঘণ্টা সাহায্য করিবে। এইরূপ যাহারা ইংরেজীতে পাকা, তাহারা ইংরেজীতে কাঁচাদিকে সাহায্য করিবে।"

২। "সম্মুখে কাটজুড়ী নদী। বর্ষাকালে ভীষণ বেগে স্রোত বহিতে থাকে। আর প্রতি বৎসরই দুই-একটা লোক ডুবিয়া প্রাণ হারায়। তাহাদের বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। তোমরা জন কয়েক ভাল করিয়া সাঁতার শেখ। আর কেমন করিয়া জলমগ্নকে উদ্ধার করিতে হয়, সে কৌশলও শেখ। যখনই দুর্ঘটনা শুনিবে, তখনই যেখানেই থাক দৌড়াইয়া যাইবে, আর জলমগ্নকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।"

৩। "প্রতি বৎসরই কোন না কোন পাড়ায় আগুন লাগে। খড়ের চাল, চাপে চাপ ঘর, পাড়ার একদিকে আগুন লাগিলে অন্যদিক পর্যন্ত

পোড়াইতে পোড়াইতে চলিয়া যায়। লোক জড় হয়, অনেকে আগুন নিবাইতে চেষ্টা করে। তোমরা যেখানেই থাক, তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া কাজের শৃঙ্খলা ও সাহায্য করিবে। তোমাদিকে দেখিলে অপরে লাগিয়া যাইবে।"

৪। "অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ির কর্তা নাই, কিন্তু কাহারও অসুখ হইয়াছে। কখনও বা কর্তার নিজেরই অসুখ হইয়াছে, অন্ত লোক নাই। তোমরা খবর পাইলেই সেখানে গিয়া ডাক্তার ডাকিতে হয় ডাকিবে, ঔষধপথ্য আনিতে হয় আনিবে। এইরূপে তোমরা সেবক হইবে। আর, তোমরা না সেবা করিলে কে করিবে?"

তাহারা সকলেই সম্মত হইল। এই সময়ে এক নূতন অধ্যক্ষ আসিলেন, তিনি ইংরেজ। তাঁহাকে এই সেবক-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বলিলাম। তিনি বলিলেন, "মন্দ নয়"। কিন্তু এই পর্যন্ত। তাঁহার নিজের দেশে কলেজের ছাত্রদের এইরূপ কাজ দেখেন নাই। আর তাঁহাদের দেশ ও আমাদের দেশ সমান নয়; তাহা বুঝিতে পারিবেন না। আর একবার, আর এক নূতন ইংরেজ অধ্যক্ষ আসিয়াছিলেন। একদিন তাঁহাকে বলিলাম, "আমরা কলেজে আছি, আমরা কলেজে কি করি, কেবল ছাত্রেরা জানে। বাহিরের লোকের সহিত আমাদের কোন যোগ নাই। কলেজ হইতে তাহাদের কোন উপকারও হয় না। আমি এই যোগ স্থাপন করিতে চাই। মাসে মাসে আমাদের মধ্যে কেহ সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় চিত্তাকর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। তদ্দ্বারা আমাদের ছাত্রেরাও নূতন নূতন বিষয় শুনিতে পাইবে। এই সব বক্তৃতার নাম হইবে 'College Extension Lectures'।" অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি সম্মত হইলেন। আমার সহযোগীরা বক্তৃতা করিতে সম্মত হইলেন না, আমাকেই প্রথম বক্তৃতা করিতে হইল। নগরের সংবাদপত্রে বক্তৃতার নাম, নির্দিষ্ট দিন ও সময় বিজ্ঞাপিত হইল। দেখি, হলঘর পরিপূর্ণ। বারাণ্ডায় ও দরজায় অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে, ভিতরে প্রবেশের স্থান নাই। আমার বক্তৃতা বাংলায়। ইংরেজ অধ্যক্ষ খানিকক্ষণ বসিয়া আমাকে বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনটি বক্তৃতা হইয়াছিল,

তন্মধ্যে আমাকেই দুটি করিতে হইয়াছিল। একটি বাংলায়, (রাণী বিশ্বেশ্বরী), অপরটি ইংরেজীতে (The Days of our Calender)।

আমাদের বিদ্যা নিষ্ফলা, ইহার কারণ

'জ্ঞানোৎকর্ষ' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ-বচন। প্রায় শত বৎসর হইল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কোন দিকে কোন বিষয়ে কি জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে? আমরা হঠাৎ বলি, আমাদের রাজা বিদেশী, শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহার হাতে, আমরা নিজেরা কিছুই করিতে পারি না। আমি এই উত্তরে তুষ্ট নই। ইংরেজ সাম্রাজ্য চালাইবার জন্য এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। আরও উদ্দেশ্য ছিল, এদেশীয়রা ইংরেজী শিক্ষার গুণে খ্রীষ্টান হইবে এবং ইংরেজের পরম ভক্ত হইবে। প্রথম প্রথম এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। ইংরেজের আর এক ভাব ছিল, তাহারা সভ্য, উদার। এই গর্ব ইংরেজী ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছিল। এ সবই সত্য। তথাপি বাঙালী তাহার সত্তা হারাইল কেন? বোমা করিতে শিখিল, যখন ইংরেজী শাসন অসহ্য বোধ হইয়াছিল। ১৯১৫ সালে বর্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিরূপে আমি দুঃখ করিয়াছিলাম, "আমরা আমাদের ছাত্রদিকে অনুকরণে দক্ষ করিতেছি, প্রকরণে করি না। আর গোরু হারাইলে লোকে গোরু খুঁজিতে যায়। আমাদের গোরু হারায় নাই, আমরা কি অন্বেষণ করিব?" ইহা ৩৪ বৎসর পূর্বের কথা। এখনও সে দুঃখের লাঘব হয় নাই। এ দেশে ও বিদেশে কি ছিল ও কি আছে, বিশ্ববিদ্যালয় সেই জ্ঞান দিয়া আসিতেছেন। অপরে কি করিয়াছে, কি বুঝিয়াছে, কি ভাবিয়াছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাহাই আবৃত্তি করিতেছে, তাহাও সম্পূর্ণ নয়। আমাদের বি. এ, বি. এস-সি, এম. এ, এম. এস-সি পাস যুবকেরা শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইতেছে। সেখানে দুই-তিন বৎসর থাকিতেছে, আর আমাদের দেশে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কর্ণধার হইতেছে। কই, অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে কোন ছাত্র আসে না কেন? বিজ্ঞান বিষয়ে বুঝিতে

পারি, আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যয়বহুল আয়োজন নাই। কিন্তু যখন দেখি, ভাষাতত্ত্ব শিখিতে সে দেশে যাইতে হইতেছে, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইংরেজী সাহিত্য শিখিতেও বিলাত যাইতে হইতেছে, তখন ভাবি, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? বর্ত্তমানে কেম্ব্রিজে ৭০।৭৫ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। প্রত্যেকের মাসিক ব্যয় ৫০০৲ টাকা। দুই বৎসরে ১২০০০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে। ইহার উপর যাতায়াতের খরচ, পরিচ্ছদের খরচ। অন্তত ১৫।১৬ হাজার টাকার কমে কেহ বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতে পারে না। বোধ হয় ইংলণ্ডেই দেড় হাজার ভারতীয় ছাত্র আছে। আমেরিকাতেও অনেক। আমাদের দেশ হইতে বৎসর বৎসর কত টাকা চলিয়া যাইতেছে! বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়িয়া দিলে যাহাতে যন্ত্রাদির প্রয়োগ নাই এমন সব বিষয় শিখিতে কেন লোকে বিলাত যাইতেছে? ইংরেজ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের সঞ্চিত জ্ঞান গুপ্ত রাখিয়াছেন কি? কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় শিক্ষক, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিলাত-প্রত্যাগত এবং সেখানে সম্পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত। তাঁহারা সে দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না কেন?

কোন্ বিদ্যা শিক্ষার্থে বিদেশ-গমন কর্ত্তব্য?

সকল বিষয়েই বিলাতের শিক্ষা আমাদের দেশের উপযোগী নয়। অনেকদিন পূর্ব্বে আমার এক বি. এ পাস ছাত্র জাপান গিয়াছিল। যখন যায়, তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম, "দেখ, আমরা লোহার পেরেক পাই না; বিলাতী কিনিতেছি। এইরূপ আরও অনেক ছোটখাট জিনিস পাই না। শুনিয়াছি জাপান এ সকল বিষয়ে স্বাধীন। তুমি এই ছোটখাট লোহার জিনিস নির্ম্মাণের কৌশল শিখিয়া আসিবে।" তৎকালে কলিকাতায় এক এসোসিয়েশন ছিল। শিক্ষার নিমিত্ত বিদেশগমনপ্রার্থী যুবককে এই সভা হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হইত। আর, কোথায় কোন্ দেশে কি বিষয়ে শিক্ষা ভাল, কোন্ সময়ে শিক্ষা আরম্ভ, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে হইলে সভার সম্পাদকের নিকট যাইতে হইত। আমার ছাত্রটিও কলিকাতার

গিয়া জানিয়া আসিল। কিন্তু জাপান হইতে পত্র লিখিল, "সত্য আমাকে ভুল বলিয়াছেন। ইতিমধ্যে সব কলেজে ভর্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোথাও স্থান পাইতেছি না। আর, জাপানী ভাষা শিখিতেও ছয় মাস লাগিবে। শুধু বসিয়া না থাকিয়া এখানে কৃষি-কলেজে ভর্তি হইয়াছি।" চিঠিখানা পড়িয়া আমার ভারি দুঃখ হইল। ইঞ্জিনীয়ারিং না শিখিয়া সে কৃষিকর্ম শিখিতেছে, অথচ আমাদের দেশের কৃষিকর্মের কিছুই জানিত না। বিদেশে সে-কর্মের ক খ শিখিতে থাকিবে! সে দেশের জল-বায়ু-মৃত্তিকা আমাদের দেশের তুল্য নয়। দুই বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "দেখ, আমাদের দেশে জল-কষ্টের জন্য ভাল চাষ হয় না। জাপান ইহার কি প্রতিকার করিয়াছে?" সে বলিল, "জাপানে জলকষ্ট নাই। আর, যদি কোথাও জলের প্রয়োজন হয়, সেখানে পাম্প্‌ আছে।" আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। সে বলিল, সে কলে চিনি করিতে শিখিয়া আসিয়াছে। সে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রজা ছিল। সেখানে চিনির কল বসিবার মত আখচাষ ছিল না; আর তাহাকে মূলধন দিবার লোকও ছিল না। শেষে মহারাজা তাহাকে তাঁহার রাজ্যের এক ডিপুটির পদ দিয়াছিলেন। তাহার কৃষিবিদ্যা শিক্ষার এই পরিণাম হইল। ভারত গবর্মেণ্টও কৃষিবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত যুবককে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া অন্য কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের অর্জিত কৃষিবিদ্যা ব্যর্থ হইয়াছিল।

আমাদের দেশ হইতে কোন কোন শিক্ষক ও শিক্ষিকা শিক্ষক-শিক্ষণ কর্ম শিখিতে বিলাত যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সেখানের অবস্থা এখানে কোথায় পাইবেন? সে দেশ অতিশয় ধনবান, আমাদের দেশ নির্ধন। সে দেশের সামাজিক ব্যবহার আমাদের তুল্য নয়। এদেশে তাঁহাদের শিক্ষার ক্ষেত্র কোথায়? কেহ কেহ বলেন, বিলাত হইতে ফিরিলে চাকরির বেতন বাড়ে। যে এম. এ কি এম. এস-সি পাস এ দেশে এক শত টাকা বেতন পান, তিনি বিলাত

হইতে ফিরিয়া আসিলে অন্তত আড়াই শত টাকা আশা করিতে পারেন। অর্থাৎ চাকরির বেতন বাড়াইবার জন্য বিলাতযাত্রা হইতেছে।

বি. টি শিক্ষার নিমিত্ত অযথা কালক্ষেপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. টি পরীক্ষার্থী ছাত্রদিকে কলিকাতায় নয় মাস ধরিয়া শিক্ষণ-কলা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। যাঁহারা শিখিতে যান, তাঁহারা বি. এ, বি. এস-সি, এম. এ, এম. এস-সি পাস থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাও থাকেন। তাঁহারা ইংরেজী ভাষা বুঝেন। তাঁহারা শিক্ষণ-তত্ত্ব ও ইতিহাসের বই বাড়িতে বসিয়া পড়িতে পারেন। কেবল শিক্ষণ-কলা সম্বন্ধে উপদেশ লইবার জন্য কলিকাতায় দুই-তিন মাস থাকিলেই চলে। তাঁহাদিকে অকারণে নয় মাস কলিকাতায় আটকাইয়া রাখা হয়। আর, যাহা শিখিয়া আসেন, তাহা পুথীর বচন, অমুকের মত, অমুকের মত। দেখাও যাইতেছে, যাঁহারা বি. টি পাস হইয়া আসেন, আর যাঁহারা পাস ন' হন, তাঁহাদের ছাত্রদের শিক্ষায় প্রভেদ হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিষ্ফলা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ও এম. এস্-সি পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তকের শিক্ষণীয় বিষয় দেখিলে মনে হয় না, আর কিছু জ্ঞাতব্য আছে। আর, পরীক্ষাও যেমন তেমন নয়, অতিশয় কঠিন। এত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেহ কেহ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মেনি দেশে গিয়া আরও উচ্চশিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এত শিক্ষা নিষ্ফলা হইতেছে কেন? আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আর, বিজ্ঞান-কলেজ হইতেও কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুই-চারিখানি ভাল বই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সব আমাদের অতি উচ্চশিক্ষিত যুবকদের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। পশ্চিম দেশের সভ্য জাতিরা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান, বাঙালীও কম নহে। কিন্তু তাহারা যে পরিমাণে সুফলা গবেষণা করিতেছে, সে পরিমাণে আমাদের দেশে পারিতেছে না কেন? মেডিক্যাল কলেজ হইতে কত যুবক এম. বি,

এম. ডি পাস হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম দেশে গিয়া তাঁহাদের লব্ধজ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বাঙালী ডাক্তার আমাদের দেশের বহুব্যাপী রোগের নিদান, ঔষধ বা চিকিৎসা আবিষ্কার করিয়াছেন? উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কালাজ্বরের ঔষধ ব্যতীত আর কোন রোগের কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, কেহ বাধাও পান না। কিন্তু কেন আমরা পশ্চিম দেশের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি? এইরূপ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে শিক্ষিত কেহ বা বিলাতে অধিশিক্ষিত হইয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কার্য করিতেছেন। কিন্তু নামোল্লেখের যোগ্য কোন নূতন সূত্র কিংবা নির্মাণক্রম উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

ইহার কারণ

আমার মনে হয়, বিদেশীর পরাধীনতাই ইহার প্রধান কারণ। চিত্তের পরাধীনতার তুল্য বিষম পাপ আর নাই। আত্মলঘিমাবোধ ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আত্মপ্রত্যয় নাই; অন্যে কি করিয়াছে, কি বলে, আমরা যাহা করিতেছি তাহাতে তাহাদের অনুমোদন পাইতেছি কি না, এই চিন্তা সর্জনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। কোন কিছু নূতন বই লিখিয়া বিলাতের পণ্ডিতদের অভিমতের নিমিত্ত আমরা ব্যাকুল হই। তাহাদের প্রশংসা না পাইলে সে বই অনাদৃত থাকে। বিলাতের বিদ্বানদের মত অভ্রান্ত সত্য, এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গ্রন্থকারের নিজের চিন্তা ও বিচারশক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইবার পর তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে তাঁহার পরম বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য বিদ্বান বোলপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কবি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "এতদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? নোবেল-প্রাইজ না পাইলে আসিতেন কি?" তাঁহারা অধোবদন হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি নিষ্ফলা হইবার দ্বিতীয় কারণ, গবেষণায় উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার পরিবর্তে পদে পদে বাধা আসিয়া জুটিত।

কর্তা ইংরেজ; তিনি চাহিতেন না, তাঁহার অধীন কোন কর্মচারী নূতন কিছু আবিষ্কার করেন। কর্তার অনুমতি ব্যতীত কর্মচারী কিছুই করিতে পারিতেন না। যদি কখনও কিছু করিতেন, সাহেবের খ্যাতি হইত। কর্তা বাঙালী হইলে আরও বাধা ঘটিত। এ বিষয়ে আমি সাক্ষী আছি। আমি কলেজের সাত অধ্যক্ষের অধীনে কাজ করিয়াছি; তন্মধ্যে দুইজন বাঙালী ছিলেন। পাঁচজনের চারিজন ইংরেজ ও একজন জার্মান। আমি বিদেশীর নিকট উৎসাহ পাইয়াছি; কিন্তু বাঙালীর নিকট পুনঃ পুনঃ বাধা ভোগ করিয়াছি।

কলেজের অধ্যক্ষতা-কর্মের যোগ্যতা

কলেজের অধ্যক্ষ হইবার যোগ্যতা পাণ্ডিত্য-গুণে, কিংবা চাকরিতে জ্যেষ্ঠত্ব-গুণে হয় না। অধ্যক্ষ বাঙালী হইলে তিনি ভাবিতেন, বিশেষ অনুগ্রহ হইয়াছে। যে পদ ইংরেজের প্রাপ্য, সে পদ পাইয়া ভয়ে ভয়ে কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইতেন। ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, কল্পনা-শক্তি ও স্বদেশভক্তি থাকিত না। টাকার আবশ্যক হইলে বড় কর্তার নিকটে চাহিতে পারিতেন না। পদের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করিতেন। বিদেশীর পরাধীনতাই এই মনোবৃত্তির কারণ। তথাপি আমি আমার ছাত্রদের সম্মুখে বহুবার ইংরেজকে ধন্যবাদ করিয়াছি। আমাদের কোনও জোর ছিল না, ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া ইংরেজ বাস্তবিক উদারতার পরিচয় দিয়াছে। "যাহা পাইয়াছ, তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর; তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি যত পার লুঠ করিতে থাক; পাস-ফেলের দিকে দেখিবে না। আর কেনই বা ফেল হইবে, তাহারও কোন কারণ নাই।" এইভাবে কতবার ক্লাসে লেকচার দিয়াছি, কতবার স্বদেশের দুর্দশা দেখাইয়াছি। তাহারা শুনিয়াছে, অনেকে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, সে দুর্দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন আমরা নির্ভয়ে ভাবিতে পারি, বলিতে পারি, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি করিতে পারি, আমাদের আত্মগরিমা-বোধ জাগরিত করিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়কেও এই কর্ম করিতে হইবে।

অর্থাভাবে শিক্ষকদের হীনবৃত্তি

প্রথমেই একটা চিন্তা অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে গেলেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ-রাজকোষে অর্থাভাব, কোথা হইতে আবশ্যক অর্থ আসিবে? তদুপরি মুদ্রাবাহুল্য হেতু অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি প্রাণধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দারুণ অভাব ঘটিয়াছে। শিক্ষক পূর্বে এক শত টাকা বেতনে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন, এখন পারেন না। আরও অন্য চিন্তা আছে; পরিবারবর্গের প্রতিপালন-চিন্তা আছে। ইস্কুল-কলেজ হইতে যে বেতন পান, তাহাতে তাঁহার কুলায় না। তিনি গৃহে বসিয়াই হউক, কিংবা ছাত্রের বাড়িতে গিয়াই হউক, ছাত্র পড়াইয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। কেবল ইস্কুলের শিক্ষক নহেন, কলেজের শিক্ষকও এইভাবে অভাব পূরণ করিতেছেন। আরও দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও এইভাবে বিদ্যা বিক্রয় করিতেছেন। ইহার সহিত আনুষঙ্গিক দোষ ঘটিয়াছে। আমি যখন ইস্কুলে পড়িতাম, তখন আমাদের কাহারও গৃহশিক্ষক ছিল না। ইস্কুলে এমন পড়ানো হইত যে, বাড়িতে পড়াইবার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইত না। কলেজে যখন পড়িতাম, তখন একেবারেই গৃহশিক্ষকের সাহায্য অপেক্ষা করিতাম না। তখন গৃহশিক্ষকের আবশ্যক হইত না, এখন কেন হইতেছে? নিশ্চয় শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ ঘটিয়াছে। এমনও শুনিতে পাই, কলেজের কোন কোন শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা না করিয়া যাবৎ তাবৎ তাঁহার কাজ সমাপ্ত করেন। অগত্যা তাঁহারই ছাত্রেরা তাঁহার বাড়িতে গিয়া প্রত্যেকে ত্রিশ টাকা বেতন দিয়া অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। শিক্ষকের এই হীনবৃত্তি নিঃসন্দেহে দূষণীয়। যদি তাঁহারা বর্তমান বেতনে সন্তুষ্ট না হন, তাঁহাদের কর্ম ত্যাগ করা উচিত। ইহাতেই মনুষ্যত্ব। আর, যে শিক্ষকের মনুষ্যত্ব নাই, তাঁহাকে শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত রাখাও কর্তব্য নয়। অন্নচিন্তা চমৎকারা বটে, কিন্তু চৌর্যবৃত্তি দ্বারা শিক্ষকেরই অধোগতি হয়। পূর্বে নিয়ম ছিল, কোন গবর্মেণ্ট-নিযুক্ত শিক্ষকের গৃহশিক্ষকতা করিতে হইলে তাঁহাকে ইস্কুলের কিংবা অধ্যক্ষের অনুমতি লইতে হইত। এখনও সে নিয়ম আছে কি না, জানি না। শিক্ষকের অন্নচিন্তা দূর করিতে না পারিলে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি-চিন্তা বৃথা। পূর্বকালে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কি মধুর সম্বন্ধই ছিল! এখন

সে সম্বন্ধ অর্থগত হইয়াছে। তাহাতে মানুষের সম্বন্ধ নাই। ছাত্রেরা কেমন করিয়া শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবে? সমাজে শিক্ষকেরা সম্মান হারাইয়াছেন। বর্তমানে জ্ঞানের পরিমাণ করিয়া সম্মান লাভ হয় না। সমাজ শিক্ষকের বেতন দ্বারা তাঁহার মূল্য কষিতেছে। অল্প মূল্যে যাহা কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার আর আদর কি? আরও দেখা যায়, যাঁহারা অন্য কর্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না, তাঁহারাই অন্য উপায়ের অভাবে শিক্ষক হইতেছেন। রূঢ় ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহারা 'পেটের দায়ে' শিক্ষক হইতেছেন। এইরূপ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা-ব্যবস্থার কেমন করিয়া উন্নতি হইবে? আর, শিক্ষা-ব্যবস্থা উত্তম না হইলে দেশের কোনও দিকেই মঙ্গল হইবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪৪ সালে) যখন ইংলণ্ড দৈনিক যুদ্ধ-ব্যয় নির্বাহ করিতে কাতর হইয়াছিল, তখন দেখিল, প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তন না করিলে বাঁচিতে পারিবে না। তখন ইংলণ্ড নূতন গুরুতর ব্যয়ে দেশের শিক্ষা-সংস্কার করিয়াছিল, টাকার চিন্তা করে নাই।

দেশব্যতিরিক্ত শিক্ষার কুফল

যাহাদের সু-শিক্ষার ব্যবস্থা চিন্তা করিতেছি, সেই ছাত্রেরা অবিনীত, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইলে আমাদের সমুদয় চেষ্টাই পণ্ডশ্রম হইবে। ব্রিটিশেরা তাঁহাদের দেশের ইস্কুল-কলেজের অনুরূপ ইস্কুল-কলেজ এ দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। সে দেশে তাঁহাদের ইস্কুল-কলেজ সমাজের প্রয়োজনে ও ইতিহাসের ধারায় ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দেশের সমাজ ও ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই যে বিদেশী শিক্ষা প্রবর্তিত হইল, সেটা কৃত্রিম হইল, স্বাভাবিক হইল না, দেশ আত্মসাৎ করিতে পারিল না। লোকে কোট-প্যান্টু পরিয়া আপিসে যায়, ইংরেজীতে কথা কয়, ইংরেজী লেখে। বাড়ি ফিরিয়া এই বাহ্য আবরণ ছাড়িবার পর আত্মস্থ হয়। অবিকল সেইরূপ, ছাত্রেরা ইস্কুল-কলেজে যায়, সেখানে ইংরেজ-বালক সাজে, বাড়ি আসিয়া দেশের বালক হয়। এই দেশব্যতিরিক্ত শিক্ষা দ্বারা আমরা ইংরেজী শিক্ষিত হইয়াও বাঞ্ছনীয় পথে অগ্রসর হইতে পারি নাই। জাপান পাশ্চাত্য-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু আপনাকে

ছাড়ে নাই। এই কারণেই জাপানীদের বি-নয় (discipline) পরাকাষ্ঠায় গিয়াছিল; এই বিনয়ের বলেই তাহারা বলীয়ান্ ও বাণিজ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিল। জাপানে এখনও সে গুণ বর্তমান। আর, ইহারই প্রভাবে আবার সে অচিরাৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। এই বিনয়-গুণেই হিটলার জার্মেনিকে পরাক্রান্ত ও কলা-কৌশলে অদ্বিতীয় করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ছাত্রেরা কভু-কদাচিৎ বালকত্ব করে, কিন্তু বিনয়ই তাহাদের চরিত্রের প্রধান গুণ। আমাদের দেশের নেতারাও ছাত্রদিকে সর্বদা এই উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু সে উপদেশ হাওয়ায় উড়িয়া যায়। যদি বলি, "ওহে, ছাত্রবৃন্দ! বিনয়াভাবে কোনও দেশের উন্নতি হয় না। দেশ তোমাদেরই, দু'দিন পরে তোমরাই ভোগ করিবে, অতএব বিনীত হও;" তাহা হইলে সে উপদেশের কখনও কোন ফল হয় কি? এত সহজে বিনয়লাভ হয় না। বাল্যকাল হইতে বিনয় অভ্যাস করাইতে হইবে। ছাত্র শিষ্ট, বিনীত ও শ্রদ্ধাবান্ এবং শিক্ষক দক্ষ ও ধর্মভীরু হইলে যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারাই দেশে আত্মপ্রত্যয়ী, সত্ত্ববান, শীলবান, ধর্মভীরু, বুদ্ধিমান, কর্মশীল মানুষের উদ্ভব হইবে। তখনই দেশ স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করিবে, এখন শুধু কাগজে স্বাধীনতা শব্দ পড়িতেছে।

দ্বিতায় পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ের ভাবী মানস-চিত্র

এখন স্বাধীন ভারতে যাহাতে পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী মনোভাব না থাকে, প্রথমে সেই চিন্তা করিতে হইবে। এখন সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, কি চাই, কেমনে পাই! সময়ে সময়ে দুই-একটা বিষয়ে উন্নতির কল্পনা শুনিতে পাই, কিন্তু সমগ্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার আলোচিত হইতে দেখি নাই। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ প্রমুখ বিদ্বান্ অভিজ্ঞ দূরদর্শী পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই সমগ্র চিন্তা করিয়াছেন, আমি কি চাই ও কেমনে পাই, এই চিন্তা করিতেছি।

শিক্ষক, ছাত্র, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষার পদ্ধতি ও সামগ্রী, এই ছয় উত্তম হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। কোনও একটার ত্রুটি হইলে বর্তমান কালের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াতে

দাঁড়াইবে। বর্তমানে ছয়টিতেই দোষ আছে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা নাই। পূর্বকালের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ নাই। বিদ্যার কেনা-বেচা চলিতেছে। অধিকাংশ শিক্ষকের বিদ্যাবুদ্ধিও তেমন নাই, নিজের অর্জিত জ্ঞান নাই, চর্বিত-চর্বণ করেন। পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয় ও পুস্তক নির্বাচনে বহু ত্রুটি লক্ষিত হয়। শিক্ষা-পদ্ধতিতেও দোষ আছে। আর, শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহারও অভাব আছে। এখানে সংক্ষেপে দোষ-প্রদর্শন করিয়া তাহা সংশোধনের উপায় চিন্তা করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মবাহুল্য

বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অতিশয় বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। যখন ইহার অধীন কলেজ অল্প ছিল, তখন ইহার উৎপত্তি। এখন বঙ্গ-বিভাগ সত্ত্বেও ইহার অধীনে ৭০।৭২ কলেজ আছে। তদ্‌ব্যতীত ২৫।২৬ বিষয়ে অধিশিক্ষার (post-graduate study) ব্যবস্থা আছে। ইহারও পরে হাজার হাজার ছাত্রের মাতৃকা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও অন্যান্য অনেক পরীক্ষা আছে।

প্রধান তিন কর্মই গুরুতর। বঙ্গবিভাগের পর এক্ষণে প্রায় ৭০০ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় ও ৭০।৭২ কলেজ আর ২৫।২৬ বিষয়ের উচ্চতম শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান যেমন তেমন কর্ম নহে। অন্নবস্ত্রের কষ্ট কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকিবে। এই তিন্‌ কর্মের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিদর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য বলিতে পারেন, কোন্‌ ছাত্র কলেজে প্রবেশের যোগ্য, তাহা ছাত্রকে পরীক্ষা না করিয়া তিনি কেমন করিয়া উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষায় সুফল আশা করিতে পারেন। এই কারণেই মাতৃকা পরীক্ষার ভার তাঁহাকে লইতে হইয়াছে। কিন্তু ফলে তিনি যাবতীয় উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব করিতেছেন। আর, এই কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এত বিধান করিয়াছেন যে, এই সকল বিধান প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অনুসৃত হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এই কারণে যাবতীয় উচ্চ-ইংরেজী

বিদ্যালয়ে দ্বৈত-শাসন চলিতেছে। এক কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় কর্তা শিক্ষা-বিভাগ।

মাতৃকা পরীক্ষার উদ্দেশ্য

হাই-ইস্কুলে দশটি শ্রেণী আছে। নবম ও দশম শ্রেণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য ও পুস্তক শিক্ষা দিলেও ছাত্রেরা মাতৃকা পরীক্ষার যোগ্য হয় না। সপ্তম শ্রেণী হইতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তা হইয়াছেন। যাবতীয় হাই-ইস্কুলের এক লক্ষ্য, ছাত্রকে মাতৃকা পরীক্ষার যোগ্য করিয়া তোলা। অর্থাৎ হাই-ইস্কুলের ছাত্রদিকে কলেজে পাঠের যোগ্য করিয়া বিদ্বান্ করিতে হইবে। মাতৃকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ কোন চাকরি পায় না। কিন্তু অসংখ্য কাজ আছে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বিদ্যার তত প্রয়োজন হয় না। সমাজের কর্ম অসংখ্য প্রকার, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র এক প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকল বালক একই পথে ধাবিত হইতেছে। তদ্দ্বারা সমাজের ক্ষতি, বালকদেরও ক্ষতি। সকল ছাত্রকেই কেন বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়িতে হইবে? আর, যদি এই দুই বিদ্যা হিতকর, তাহা হইলে বালিকাদিগের নিমিত্তও সেই বিদ্যা অবশ্যক করা হয় নাই কেন? স্বাস্থ্যতত্ত্বের তুল্য অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন বালক-বালিকার ইচ্ছাধীন রাখা হইয়াছে। ইহার হেতু পাওয়া যায় না।

মধ্যশিক্ষা-পরিষদ্

অনেকদিন হইতে প্রস্তাব চলিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত রাখিয়া মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত এক পৃথক মধ্যশিক্ষা-পরিষদ্ স্থাপন করিতে হইবে। এতদিন এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। কাহার প্রভুত্ব থাকিবে, কাহার থাকিবে না, রাজার প্রভুত্ব কতখানি, প্রজার কতখানি, এইরূপ তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, এখন আর রাজা-প্রজার দ্বন্দ্ব নাই। আশা হয়, মধ্যশিক্ষা-পরিষদ্ গঠিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে অতিরিক্ত গুরুভার হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন। মধ্যশিক্ষা-পরিষদ্ কোন্ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য, কোন্ ছাত্র অন্য কর্মের যোগ্য, তাহা বাছিয়া দিতে পারিবেন।

মধ্যশিক্ষা-পরিষদ্ গঠন

এই মধ্যশিক্ষা-পরিষদের রচনা সম্বন্ধে আমার কল্পনা লিখিতেছি। ইহাতে ২০ জন সদস্য থাকিবেন। যথা,—

১ শিক্ষাধিকর্তা ;
২ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ;
১ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের পরিদর্শক (Inspector of schools) ;
১ ইংলণ্ডে কিংবা আমেরিকায় শিক্ষিত শিক্ষক ; বয়স ৩০-৪০ ; নির্বাচক শিক্ষাধিকর্তা ;
৩ শিক্ষক ; } নির্বাচক বঙ্গশিক্ষক সমাজ
২ শিক্ষিকা ; } (Bengal Teachers' Association) ;
৪ রাজনীতিবিদ্ } বয়স ৫০-৬০ ;
২ শিল্পবিদ্ (Engineer) } নির্বাচক রাজ-পরিষদ্ ;
২ ডাক্তার ; } "
২ বণিক। }

মোট ২০ জন।

এই সকল সদস্যের মধ্যে শিক্ষাধিকর্তা ব্যতীত অপরে প্রতি দুই বৎসরে চারিজন করিয়া পদত্যাগ করিবেন এবং সে পদে নূতন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। প্রথমে শিক্ষাধিকর্তা ১৯জন সদস্যকে আহ্বান করিবেন। ইঁহারা শিক্ষাধিকর্তা ব্যতিরিক্ত অপর কোন উপযুক্ত সদস্যকে সভাপতি নির্বাচিত করিবেন। তিনি পাঁচ বৎসর সেই পদে থাকিবেন। পাঁচ বৎসর পরে তিনি কিংবা অপর একজন পরিষৎপতি হইবেন।

পরিষদের কার্য

এই পরিষদের কাজ সোজা হইবে না, বিদ্যালয়ে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। আদ্য ও মধ্য শিক্ষা তাঁহাদেরই হাতে গিয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে অনেক ভাবিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন হইবে। আমার 'শিক্ষা-প্রকল্প' হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইতে পারেন। এই

পরিষদ্ শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার বিধান রচনা করিয়া এক কার্যাত্মকের (Executive Committee) হাতে কার্যভার অর্পণ করিবেন। পাঁচ জনে কার্যাত্মক বা কার্যাত্ম-পঞ্চক গঠিত হইবে। ইহাঁরাই শিক্ষাধিকর্তার সহযোগে ও পরামর্শে দেশের শিক্ষা যথোপযুক্তরূপে পরিচালনা করিবেন। যাহাতে জন-সাধারণ তাহাঁদের সহিত মিলিত হইয়া শিক্ষার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করিবেন। এই পরিষদের হাতে প্রচুর অর্থ থাকিবে। দারিদ্র্যহেতু কোনও মেধাবী বালক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে না। তাহারা বেতন দিবে না। কাহাকেও পুস্তক, কাহাকেও গ্রাসাচ্ছাদন দিতে হইবে।

আদর্শ বিদ্যালয়

প্রত্যেক বিদ্যালয় যথোচিত উন্মুক্ত স্থানে স্থাপিত হইবে। বালকেরা খেলিবার মাঠ পাইবে। কত দ্রুতবেগে বালক-বালিকারা দৃষ্টিশক্তি হারাইতেছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান-সত্ত্বেও কাহাকেও চিন্তিত করিতেছে না। ছোট ছোট বালক-বালিকা চশমা চোখে দিয়া চলিয়াছে; ইহার তুল্য শোচনীয় আর কি হইতে পারে?

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একটি নিজের পতাকা থাকিবে। পতাকায় ইচ্ছানুরূপ শব্দ চিত্রিত থাকিবে। বিদ্যালয়ের উৎসবের সময়ে ভারত-পতাকার পরেই বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলিত হইবে। আর, সমুদয় ছাত্র সমবেত হইয়া সে পতাকা নমস্কার করিবে।

বিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভের পূর্বে প্রত্যেক গৃহের শিক্ষক মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে ঈশ্বরস্তোত্র আবৃত্তি করিবেন। বালকেরা তাহাঁকে অনুসরণ করিবে। এই স্তোত্রে এমন কিছু থাকিবে না, যাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আপত্তি হইতে পারে। বাংলা ভাষার স্তোত্র, বিদ্যালয় রচনা করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু ১০।১২ বৎসরের মধ্যে পরিবর্তন করিবেন না। দুই মিনিটে স্তোত্র সমাপ্ত করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে আসিবার তিন ঘণ্টা পরে ছাত্র পুষ্টিকর দ্রব্যযোগে জল-পান করিবে। দেশের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে; যথেষ্ট পরিমাণে দুধ পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে এই সময়ে প্রত্যেককে অন্ত কোন

খাদ্যের সঙ্গে এক পোয়া দুধ দেওয়া উচিত। যদি বাল্যকালে পুষ্টিকর ও বলকর আহার না পায়, দেশের মানুষ কি কাজে আসিবে? শক্তিহীন দেহে মন ও বুদ্ধিও শক্তিহীন হয়।

ইস্কুলে কত ছাত্র থাকিবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ে কোন বিধান করেন নাই। ইস্কুলে ২৫০।৩০০ ছাত্র আছে, ১০০০।১২০০ ছাত্রও আছে। কোন বিদ্যালয়ে ৩০০-এর অধিক ছাত্র থাকিবে না। বিদ্যালয়ে আবশ্যক সংখ্যক গৃহ ও শিক্ষক থাকিলেও প্রধান শিক্ষক মহাশয় ৩০০-এর অধিক ছাত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারেন না। আর, এক শ্রেণীতে ৩০-এর অধিক ছাত্র থাকিলে শিক্ষক সকলের পড়া দেখিতে পারেন না। প্রায় এই কারণেই ছাত্রদের এত গৃহশিক্ষক ও নোট বই-এর প্রয়োজন হয়। প্রধান শিক্ষকের কর্ম অতিশয় গুরুতর। তিনি প্রত্যেক ছাত্রের আচরণ, স্বাস্থ্য, বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ লক্ষ্য করিবেন এবং তাহার অভিভাবকের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিবেন। শিক্ষক যে ছাত্রের দ্বিতীয় অভিভাবক, এই ভাব রক্ষা করিয়া সর্বদা উভয়ের সহযোগিতা কামনা করিবেন। তিনি দিনে দেড় ঘণ্টার অধিক পড়াইবার সময় পাইবেন না। আর, তিনি পর্যায়ক্রমে সকল শ্রেণীতেই পড়াইবেন। তিনি নিজে পড়াইবেন, শিক্ষককে পড়াইতে বলিবেন না। তিনি সর্বদা শিক্ষকদের সহিত সদয় ও সসম্মান ব্যবহার করিবেন। তিনি যে কেবল ইংরেজী পড়াইবেন, কি বাংলা পড়াইবেন, এ নিয়ম রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। মাতৃকা পরীক্ষার পাঠ্য-বিষয় এত উচ্চ নয় যে, তিনি অধিকাংশ পাঠ্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিবেন। তিনি বি. টি পাস অবশ্য হইবেন এবং অপর শিক্ষকের আদর্শস্বরূপ থাকিবেন।

বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের আতিশয্য

বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। এক, বর্ষে বর্ষে পুস্তক পরিবর্তন; দুই, পাঠ্য-বিষয়ের গুরুভার। বিদ্যালয়ে বালকেরা দশ বৎসর পড়ে। প্রথম চারি বৎসরের নাম প্রাথমিক; পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষের নাম মধ্য-ইংরেজী বা মধ্য বাংলা; আর সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম বর্ষের নাম উচ্চ-ইংরেজী। পঞ্চম ও

ষষ্ঠ বর্ষে বালকেরা ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা—এই সাতটা বিষয় শিখে। মনে হইতে পারে, সাতটা বিষয়ের নিমিত্ত অন্তত সাতখানি বই হইলেই চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইংরেজীর সঙ্গে ইংরেজী ব্যাকরণ, ভাষান্তরকরণ, অন্তত আরও দুইখানি বই চাই। বাংলাতেও তাই। ভূগোলের সহিত মানচিত্র অবশ্য চাই। আর একখানি চিত্র-লিখনের বই চাই। অতএব মোট পুস্তক ১৫ খানি। ষষ্ঠ বর্ষে একখানি জ্যামিতি। আমার বিবেচনায় জ্যামিতি পরিত্যাজ্য। যে বালক এই মধ্য-ইংরেজী পর্যন্ত শিখিয়া পাঠ পরিত্যাগ করিবে, জ্যামিতি তাহার কোন প্রয়োজনেই আসিবে না। ষষ্ঠ বর্ষে ইংরেজী ও বাংলার পাঠ্য পরিবর্তিত হয়। অতএব ষষ্ঠ বর্ষে আরও দুইখানি বই চাই। যদি বিদ্যালয় ১৭ খানি বইতেই সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলেও ছাত্রের রক্ষা ছিল। কিন্তু শুনিতে পাই, কোন কোন বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ বর্ষেও অন্য লোকের রচিত অন্তত দুই-চারিখানি নূতন বই পাঠ্য হইয়া থাকে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে কত অনুরোধ উপরোধ রাখিতে হয়, গ্রন্থ-প্রকাশকদিগের প্ররোচনা ও পীড়ন সহিতে হয়, তাহা তিনি অবহেলা করিতে পারেন না। সপ্তম ও অষ্টম বর্ষেও পুস্তক পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ বালক-বালিকারা গ্রন্থকারদিগের অর্থোপার্জনের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইহার আশু প্রতিকার কর্তব্য। পূর্বকালে বিদ্যার দান হইত, বর্তমানে নানাপ্রকারে বিদ্যার বিক্রয় হইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক আছেন। তিনি কেন যে এই অত্যাচার উপেক্ষা করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইংরেজী ও বাংলা বই-ই বা কেন দুই বৎসরের জন্য একই রাখা হয় না? তাহাও বিশেষ চিন্তনীয়। এইরূপ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের একই বই কেন থাকিবে না?

ক্রমশ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

স্বাভাবিক দাবি

বর্তমানেরে কহিছে ডাকিয়া ভবিষ্য কানে কানে,
আমারে তুমি কর মহীয়ান তব আজিকার দানে।

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণ-সঙ্ঘ

৩

পরদিন বিকালে প্রতুলের বাড়িতে গেল সমরেশ। বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে একটা ছোট রাস্তা শহরের দিকে চ'লে গিয়েছে। সেই রাস্তার ধারে প্রতুলদের বাড়ি। সামনে-রাস্তার ও-পাশে বাউরী-পাড়া। ছোট ছোট খড়ে-ছাওয়া মেটে ঘর। পর পর কত বর্ষার বৃষ্টিতে দেওয়াল গ'লে গিয়ে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে উঠেছে; চালের খড় প'চে কালো হয়ে উঠেছে; ঝড়ে-জলে খড় উড়ে ধ'সে গিয়ে এখানে সেখানে বড় বড় ফুটো হয়ে গেছে। আগামী বর্ষার আগে চাল না ছাওয়ালে বর্ষায় জল পড়বে ঘরে। কিন্তু গৃহকর্তাদের এখনও পর্যন্ত উদ্যোগের লক্ষণ নাই। চারদিক ঝোপ-ঝাপে ভরা; অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। যুদ্ধের বাজারে এদের রোজগার বেড়েছে, কিন্তু অভ্যাস বদলায় নি। জন্তু-জানোয়ারের মত দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে কোন মতে বেঁচে থাকে। শুচি-সুন্দর জীবনাদর্শের স্বপ্নও দেখে না ওরা। পাড়ার মাঝখানে একটা পুকুর। অর্ধেকটা শহরের যত আবর্জনা দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি বুজিয়ে দিয়েছে। বাকি অংশটাতে যা জল আছে, তার রঙ হয়ে উঠেছে প্রায় আলকাতরার মত কালো। একটা পচা, ভ্যাপসা, দুর্গন্ধ সর্বদা—বিশেষ ক'রে সন্ধ্যের পরে—এই পুকুরটা থেকে উঠতে থাকে। রাস্তায় দাঁড়ালেও এ গন্ধটা নাকে আসে। অথচ এ পাড়ার বাসিন্দারা এতে কোন অসুবিধা বোধ করে না। এই পুকুরটায় তারা স্নান করে; এর জলে বোধ হয় রান্না-বান্নাও করে। ফলে—প্রতি বৎসর বর্ষার পরে শহরে কলেরা শুরু হয় এই পাড়া থেকেই। যমরাজের বার্ষিক পাওনাটা সর্বপ্রথমে মিটিয়ে দিতে হয় এই পাড়ার লোকদের। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষরা সব দেখে শোনে; কিন্তু তাদের নিশ্ছিদ্র নিরেট ঔদাসীন্য চিড় খায় না কিছুতেই। সমরেশের মনে হ'ল, প্রতুলরা জন-কল্যাণ-কর্মে ব্রতী হয়েছে, মজুর-শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে, কিন্তু এদের জ্ঞান বুদ্ধি রুচি ও মনোবৃত্তির কোন উৎকর্ষ করতে পেরেছে ব'লে মনে হয় না।

প্রতুল বাড়িতেই ছিল। ডাক দিতেই বেরিয়ে এল। সমরেশকে দেখে সবিস্ময়ে বললে, তুমি? এলে কবে?

সমরেশ বললে, কাল সকালে।

প্রতুল মুচকি হেসে বললে, এতক্ষণে আমাকে মনে পড়ল? বেশ লোক তো! এস—এস। সমরেশকে নিয়ে গিয়ে বসবার ঘরে বসাল।

সমরেশের সমবয়সী প্রতুল। ওরই মত লম্বা-চওড়া পেশল দেহ; বিস্তৃত বক্ষপট। কিন্তু সমরেশের মত এর রঙ ফরসা নয়; তবে কালোও নয়; উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে। মুখের গঠন লম্বাটে; দৃঢ় চিবুক ও চোয়াল; খাঁড়ার মত নাক; আয়ত-উজ্জ্বল চোখ। এর মনের ও মতের ঔদার্যের ছায়া পড়েছে এর মুখে ও চোখে।

প্রতুল বললে, কোথায় ছিলে এতদিন? পরীক্ষা তো অনেক দিন হয়ে গেছে! সমরেশ বললে, মিঃ রায়ের সঙ্গে ঘুরলাম অনেক। পরীক্ষার পর নোয়াখালি গিছলাম। তারপর দিল্লী, বোম্বাই। রাজ্যশাসন-ক্ষমতা দেশের লোকের হাতে আসছে। আমাদের নেতারা সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, কে কোথায় স্থান করতে পারবেন, তার জন্যে ছুটোছুটি করেছেন। যাকগে, তোমার খবর কি বল।

আমার খবর তো দেখতেই পাচ্ছ। এখানে রয়েছি।

কলেজের চাকরি করছ নাকি?

মৃদু হেসে প্রতুল বললে, সে চাকরি গেছে। কর্তৃপক্ষ সহ্য করতে পারলেন না আমাকে।

ছেলেদের বিগড়ে দেবার চেষ্টা করেছিলে বুঝি? গোবেচারী ছেলেগুলি, সিনেমা দেখে, নভেল পড়ে, দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা সিনেমা-স্টার আর নভেলের নায়িকাদের নিয়ে আলোচনা করে, নিরীহ নির্বিরোধী ভাবে দিন কাটায়। তাদের মাথায় নানা রকম বেয়াড়া বুদ্ধি ঢোকালে কর্তৃপক্ষদের তো পছন্দ করবার কথা নয়।

প্রতুল বললে, আমি এখানে এসেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটা ক্লাবের পত্তন করি; সপ্তাহে একদিন তারা একসঙ্গে ব'সে নানা বিষয়ে আলোচনা করত। প্রধান অধ্যাপক খুঁতখুঁত করলেও কর্তৃপক্ষ সেটাতে আপত্তি করেন নি। তারপর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে 'কল্যাণ-সঙ্ঘ' স্থাপন করলাম। দুর্গত জনসাধারণের কল্যাণ-সাধন ছিল এর উদ্দেশ্য। ছেলে-মেয়েরা খুব উৎসাহের সঙ্গে

কাজ করতে আরম্ভ করলে। মুচিপাড়ায় মেথরপাড়ায় বাউরীপাড়ায় নৈশ স্কুল চালাতে লাগল, তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতে লাগল, তাদের সাহায্য করবার জন্যে ভিক্ষা ক'রে, থিয়েটার ক'রে, ফুটবল-খেলার ব্যবস্থা ক'রে, স্থানীয় সিনেমা-ওয়ালাকে ধ'রে সাহায্য রজনী আদায় ক'রে টাকা তুলতে লাগল; দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দরিদ্র গ্রামবাসীদের নানা অভাব ও অসুবিধা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে লাগল; এ বিষয়ে কোন খবর পেলে সরকারী কর্ম্মচারীদের ধ'রে যতদূর সম্ভব প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে লাগল; দুর্ভিক্ষের সময়ে সরকারী লঙ্গরখানায়, দুগ্ধ-বিতরণ-কেন্দ্রে খুব কাজ করলে, শহরে ও শহরের কাছাকাছি গ্রামে মড়ক শুরু হ'লে প্রাণপণে সেবা করলে, ঔষধ-পথ্য সরবরাহ করলে। এক কথায়, তাদের চিন্তা ও কর্ম্মধারা সম্পূর্ণ নূতন খাতে বইতে শুরু করল। কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে লাগাম কষতে লাগলেন, কিন্তু একেবারে থামিয়ে দেবার কোন যুক্তি পেলেন না। তারপর একটা ব্যাপার ঘটল। দুজন ছাত্রকে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সামান্য অপরাধে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ছেলেরা জোর ধর্ম্মঘট করলে। প্রিন্সিপ্যাল শেষে ছাত্র দুইটিকে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু আমি ওদের উৎসাহিত করেছি, উত্তেজিত করেছি ভেবে আমাকে বিদায় ক'রে দিলেন।

অধ্যাপকরা কেউ আপত্তি করলেন না?

তা তো দেখলাম না।

সমরেশ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তোমার কল্যাণ-সঙ্ঘ এখনও চলছে নাকি?

চলছে বইকি। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ নেই বটে, তবে পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ কেউ এখনও যোগ-রক্ষা করছে। তা ছাড়া, শুক্তি আছেন, দু-চারজন মহিলা কর্ম্মী আছেন, নতুন কর্ম্মীও অনেকে যোগ দিয়েছেন।

তপনও তো ছিল তোমাদের সঙ্গে?

হ্যাঁ, প্রথম থেকেই ছিল। ওর সাহায্যে অনেক কাজ করেছি আমরা। বিশেষ ক'রে গ্রামের কাজ। ওরই চেষ্টায়, ওরই সাহায্যে

ওদের গ্রামে কল্যাণ-সঙ্ঘের শাখা স্থাপন করা গেছে। সেখানে খুব ভাল কাজ হয়েছে। দুজন ভাল কর্মী তৈরি হয়েছে।

তপনরা তো ওদের গ্রামের জমিদার?

সেইজন্তেই তো অনেক সুবিধে হয়েছে। ওর কাকা রায় বাহাদুর, গ্রামের অনেক বর্ধিষ্ণু লোক, পাশের গ্রামের মুসলমান জমিদার অনেক বাধা দিয়েছে। কিন্তু তপন আমাদের সঙ্গে থাকাতে কেউ কিছু ক'রে উঠতে পারে নি।

সমরেশ একটু চুপ ক'রে কি ভাবলে। তারপর বললে, তুমি তো এখন কম্যুনিস্ট।

প্রতুল হেসে বললে, হ্যাঁ, কম্যুনিস্ট বইকি। তবে এখনও পুরোপুরি নয়, আংশিক। কম্যুনিজ্‌মের সামাজিক কর্মসূচীটাই আমি নিয়েছি, শ্রমিক ও কৃষকদের সাহায্য করা, তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা, মানুষের মত বাঁচবার জন্তে দাবি করতে শেখানো, তাদের সর্ব বিষয়ে সচেতন করা—

সমরেশ বললে, এ কর্মসূচী তো কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন নয়। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে এ কাজ করতে বাধত না।

প্রতুল বললে, কংগ্রেসের কাগজে-কলমে এ কর্মসূচী হ'লেও কংগ্রেস-নেতারা বা কর্মীরা জনগণের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কাজ বিশেষ কিছুই করেন নি। দেশের শাসন-ব্যবস্থা করায়ত্ত করবার জন্তেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন।

কেন? মহাত্মা গান্ধী? জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সমস্ত মানুষের কল্যাণ-ব্যবস্থার জন্তে তাঁর মত চেষ্টা কে করেছে?

প্রতুল হেসে বললে, কেউ করেন নি। সেই কথাই তো বলছি। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এক মাত্র তাঁরই। তাই প্রত্যেকবার দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরু করবার জন্তে তাঁকেই অগ্রণী হতে হয়েছে। কংগ্রেসের অন্তান্ত নেতা ও কর্মীদের মতি-গতি দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে স'রে আসতে হয়েছিল—

সমরেশ বললে, স'রে আসেন নি, কংগ্রেসের পশ্চাতেই আছেন তিনি। তাঁর অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া কংগ্রেসের কোন কাজ কোন দিন হয় নি—

প্রতুল বললে, কংগ্রেস তো এতদিন ধ'রে কাজ করছে। দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সত্যকার কল্যাণ কি হয়েছে বল ?

সমরেশ জবাব দিলে, দেশের রাজশক্তি হাতে না পেলে সত্যকার কল্যাণ-ব্যবস্থা কি ক'রে হবে ?

রাজশক্তি হাতে এলেই যে হবে, তার স্থিরতা কি ? দেশের জমিদার ও পুঁজিপতিরা বিদেশী শাসকদের তাঁবেদারি ক'রে, তাদের অনুগ্রহ-পুষ্ট হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ; দেশের শাসন-ব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করবে তারাই। রাজশক্তি যাদের হাতেই থাকুক, এদের বাধা অতিক্রম ক'রে, দেশের দুর্গত ও দুর্বল কৃষক ও শ্রমিকদের কল্যাণ-সাধন কোনদিন সম্ভব হবে না, যতদিন না শ্রমিক ও কৃষকরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিজেদের দাম ও দাবি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমবেত শক্তিতে শাসন-ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে না পারে।

তার মানেই তো দেশব্যাপী রক্তস্রাবী বিপ্লব ?

বিপ্লবই তো। যে অত্যাচার ও অবিচারের জগদ্দল-পাষাণভার সারা দেশের বুকের ওপর চেপে ব'সে দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের শ্বাস রোধ ক'রে আনছে, তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে উড়িয়ে দিতে হ'লে চাই দেশব্যাপী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

তারপর ?

তারপর দেশের যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ, তাদের হাতে আসবে শাসনশক্তি। নিজেদের কল্যাণের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করবে।

সমরেশ মুচকি হেসে বললে, তারা না করুক, করবে তাদের পাণ্ডারা, যারা তাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে।

প্রতুল বললে, তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে, তারাও শাসন-ব্যবস্থায় স্থান পেতে পারে।

সমরেশ বললে, তোমাদের এই উদ্দেশ্য জেনেও তপন তোমাদের দলে থাকতে রাজী হয়েছে ?

প্রতুল বললে, অন্তত এতদিন তো রাজী ছিল। ওর জমিদারিতে প্রজাদের অনেক সুবিধে ক'রে দিয়েছে। ওরই আগ্রহে এ বছর

পৌষ-সংক্রান্তিতে ওদের গ্রামে কৃষাণ-সভার অধিবেশন হ'ল। তাতে আমাদের নূতন কর্মীরা যখন প্রস্তাব আনল—জমির উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র জমিদার পাবে, তাতে সে আপত্তি তো করলেই না, বরং সোৎসাহে সমর্থন করলে।

সমরেশ মুচকি হেসে বললে, তার কাকা রায় বাহাদুর?

তিনি শুনেই তিড়বিড় ক'রে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর সরকারের কাছে দরবার করলেন, গ্রামের ও পাশের গ্রামের জমিদার আর জোতদারদের সঙ্গে ঘোঁট পাকাতে লাগলেন, গ্রাম থেকে কল্যাণ-সঙ্ঘের উচ্ছেদ করবার জন্যে মাঝে মাঝে জমিদারি নিলামে চড়িয়ে দেবেন ব'লে ভয় দেখাতে লাগলেন।

সমরেশ বললে, তপন কি এখনও তার সম্মতিতে স্থির হয়ে আছে?

এখনকার খবর বলতে পারি না। কারণ মাস দুইয়ের বেশি সে অনুপস্থিত। আমাদের সভার পরে তার গুরুতর অসুখ হয়। তাদের গাঁয়ের বাড়িতে ছিল সে। কাছে আমরা কেউ ছিলাম না। আমার বোন শৈলী ছিল ওখানে ওখানকার কর্মী সুকুমারের মায়ের কাছে। ও-ই তপনের সেবার ভার নিয়েছিল ওখানে। আমাদের কাছে খবর নিয়ে এল সুকুমার। কিন্তু আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই রায় বাহাদুর গিয়ে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। একেবারে অন্দর-মহল-জাত করলেন তাকে। তাকে একবার চোখে দেখতে পর্যন্ত দিলেন না আমাদের কাউকে। মাসখানেক ভুগে তপন একটু সেরে উঠল। রায় বাহাদুর তাকে তাঁর মধুপুরের বাড়িতে শরীর সারতে নিয়ে গেলেন।

তা হ'লে তো তপন এখন রায় বাহাদুরের কবলে?

প্রতুল বললে, রায় বাহাদুর তাকে বিগড়ে দিতে পারবেন না। তপনের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে।

সমরেশ মুচকি হেসে বললে, রায় বাহাদুর না পারুন, কিন্তু তিনি যদি কোন প্রবলতর শক্তি নিয়োগ করেন তপনকে টেনে ধ'রে রাখবার জন্যে? প্রতুল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সমরেশের দিকে তাকালে।

সমরেশ বললে, আমাদের তিলুকে জান তো? তার বোনঝি আর

জামাইবাবু মধুপুরে ছিলেন। তপনদের পাশের বাড়িতেই থাকতেন। তপনের সঙ্গে মেয়েটার আলাপ হয়েছে। মেয়েটা দেখতে ভাল। কলকাতায় কলেজে পড়ত। মেয়ের বাবা বড় চাকরে। মেয়েটিই একমাত্র সন্তান। কাজেই মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করবেন। রায় বাহাদুর নাকি মেয়েটিকে ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ করবার জন্যে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তপনের হেপাজতেই মেয়েটি মধুপুর থেকে এখানে এসেছে।

প্রতুলের মুখের উপর একটি কালো ছায়া দ্রুত পার হয়ে গেল। তারপর সে সহজভাবে বললে, তাই নাকি! তা হ'লে একটু ভয়ের কথা বটে। তোমাদের তিনু তো আমাদের একেবারে সহ্য করতে পারে না। শুক্তি ওর সঙ্গে কাজ করে। কিন্তু এত বিরাগ যে, ওর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা পর্যন্ত বলে না। বোনঝি যদি মাসীর অনুপন্থী হয়, তা হ'লে আমাদের আকাশ থেকে তপনের অস্ত যাবার দেরি নেই।

সমরেশ বললে, খুব সম্ভব। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, এখানে আসবার পরে তপন তোমার সঙ্গে দেখা করেছে?

প্রতুল মাথা নেড়ে জানালে, না।

আগে তার এরকম ব্যবহার কোন দিন দেখেছ?—সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে। প্রতুল জবাব দিলে, না। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কাল সকালে শুনলাম, তপন এসেছে। কাল সারাদিন ওর প্রতীক্ষা করেছিলাম। সন্ধ্যে পর্যন্ত যখন এল না, একবার ভাবলাম, ওর সঙ্গে দেখা ক'রে আসিগে। কিন্তু কি জানি, মনটা কেন পিছিয়ে গেল। আজ সকালে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি ওকে, এখানে একবার আসবার জন্যে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, আগে তো তপন আমাদের এখানে রোজই আসত। এত নিয়মিতভাবে আসত যে, কোন দিন না এলে মা পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠতেন, তপনের কোন অসুখ-বিসুখ হ'ল নাকি? প্র্যাকটিসের দিকে চাড় তো ওর কখনই ছিল না। ওদের গ্রামে আমাদের যে প্রতিষ্ঠানটি আছে সেটিকে কেমন ক'রে আরও দৃঢ়মূল করবে, আরও ব্যাপক করবে, এই-ই ছিল ওর চিন্তা। এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে করতে কতদিন

রাত্রি দুপুর হয়ে গেছে। ওর মা ওকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে লোকের পর লোক পাঠিয়েছেন। এমন অনেক দিন হয়েছে যে, ও লোক ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে এখানেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে।

হঠাৎ বাইকের ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে ডাক, প্রতুলদা আছেন নাকি ?

প্রতুল শশব্যস্ত হয়ে উঠে দরজার কাছে গিয়ে সহাস্যে আহ্বান করলে, এস এস, তোমারই কথা হচ্ছিল।

যে এল, তারই নাম তপন। বয়স সাতাশের বেশি হবে না। নাতিদীর্ঘ গঠন। গায়ের রঙ খুব ফরসা। মুখের গঠন-সৌষ্ঠবে মেয়েলী ধরনের কোমলতা ও মসৃণতা। চোখে সোনার ফ্রেমে আঁটা চশমা ; সোনার রঙ মুখের রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেছে। সুগঠিত নাক। সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধর। পরনে দামী মিহি ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে পাম্প-শু। বাঁ হাতের মণিবন্ধে সোনার ব্যাণ্ড-ওয়ালা সোনার হাত-ঘড়ি। ওর চোখে সতর্ক দৃষ্টি ; ঠোঁটে এক টুকরো অপ্রতিভ হাসি। সমরেশকে দেখে ও যেন স্বস্তি পেল। বললে, আপনি কবে এলেন ?

সমরেশ বললে, কাল সকালে।

একটা চেয়ার টেনে ব'সে, সোনার সিগারেট-কেস বার ক'রে, খুলে সমরেশের দিকে এগিয়ে দিলে। সমরেশ মৃদু হেসে বললে, ধন্যবাদ ; কিন্তু আমার তো চলে না। তপন মুচকি হেসে বললে, দুটি বন্ধুই এক রকম। ব'লে নিজে একটা সিগারেট ধরালে।

প্রতুল বললে, আমার চিঠি পেয়েছ ?

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে তপন ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালে।

প্রতুল বললে, মেয়েরা ভারি ব্যস্ত হয়েছে। ওদের ইচ্ছে, তুমিই ওটার ভার নাও।

ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তা ক'রে তপন বললে, আচ্ছা দেখি, এখনও তো দেরি আছে।

প্রতুল বললে, মেয়েদের আবার শিখতে হবে তো ?

তপন চুপ ক'রে রইল।

প্রতুল বললে, আজ সন্ধ্যের পর একবার যেতে পারবে নাকি?

তপন ঘাড় নেড়ে বললে, আজ তো পারব না। মহেশবাবুর বাড়ি যাচ্ছি। আশ্রমের স্বামীজী আজ আমাদের বাড়ি আসবেন; গীতা পাঠ করবেন; সেইজন্যে ওঁর ভাইঝিকে নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি।

প্রতুল ও সমরেশ দুজনের চোখে চোখ মিলল। প্রতুল বললে, বেশ তো, ও-কাজটা সেরে যাবে।

তপন বললে, চেষ্টা করব; অবশ্য মায়ের যদি আর নূতন কোন বরাত না হয়।

একটু পরে তপন উঠে দাঁড়িয়ে সমরেশকে বললে, আপনি যাবেন নাকি?

সমরেশ বললে, আমার একটু দেরি হবে।

আচ্ছা, আমি আসি, নমস্কার।—ব'লে তপন চ'লে গেল।

একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকল। শ্যামাঙ্গী। ছিপছিপে গড়ন। মুখের চেহারা বেশ ধারালো। চোখ দুটি বড় নয়; কিন্তু সুন্দর। চিবুকটি কিছু চাপা। অধরোষ্ঠ সূক্ষ্ম; বঙ্কিম রেখায় নিবদ্ধ। একে দেখলেই মনে হয়, এর মনের দিগন্তে নেমেছে মেঘ, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেয়েটি সদ্য সান্ধ্য-প্রসাধন সমাপন করেছে; পরেছে একটি ধূপছায়া রঙের শাড়ি; খয়েরী রঙের ব্লাউস। দেহে অলঙ্কার স্বল্প,—হাতে দুগাছি ক'রে সোনার চুড়ি, গলায় একটি বিছা-হার, কানে দুল। মেয়েটি ঘরে ঢুকে একবার সমরেশের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রতুলের কাছে এসে বললে, দাদা, তপনবাবুকে বললে?

প্রতুল বললে, বললাম তো। বললে, ওর বাড়িতে আজ রাত্রে স্বামীজীর গীতা-পাঠ হবে। নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে। সময় করতে পারে তো যাবে।

মেয়েটি মুখ কালো ক'রে বললে, যদি সময় না পান, তা হ'লে যাবেন না তো?

প্রতুল চুপ ক'রে রইল।

মেয়েটি বললে, তা হ'লে কি ক'রে হবে দাদা ? অভিমান-গাঢ় কণ্ঠে বললে, তা হ'লে ওসব বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভাল, কি বল ?

প্রতুল বললে, না না, বন্ধ করবি কেন ? উৎসাহ ক'রে করছে সবাই। ওর একটা ব্যবস্থা করব এখন।—ব'লেই সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, একে চিনিস না ? এও তোর একজন দাদা।

মেয়েটি সমরেশকে নমস্কার ক'রে বিস্মিত মুখে সমরেশের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবটা এই, ইনি আবার কে ? আগে দেখি নি তো !

সমরেশ বললে, আমাকে দেখেন নি তো কখনও। চিনবেন কি ক'রে ?

প্রতুল বললে, ওকে অত সমীহ করতে হবে না, ও আমার ছোট বোন শৈলী ; ওর কথা তো তোমাকে বলেছি কতবার।

সমরেশ হেসে বললে, ভেবেছিলাম তাই। তবে চট ক'রে বড়ত্ব ফলাতে সাহস হ'ল না। শৈলীর দিকে তাকিয়ে বললে, কেমন আছ ? কি পড়াশুনা হচ্ছে ?

জবাব দিলে প্রতুল, আছে ভালই। মা-বাবার কাছে থাকত বরাবর। পড়াশুনা বেশি হয় নি। এখানে এসে আমার পাল্লায় প'ড়ে ম্যাট্রিকটা পাস করেছে কোন রকমে। কলেজের ছাত্রী এখন। অর্থাৎ নামটা আছে কলেজের খাতায়, যায়ও মাঝে মাঝে, তবে পড়াশুনা কিছু করে না। আমাদের মহিলা কর্মীরা নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘ ব'লে একটি সমিতি করেছে, ও হ'ল তার একজন বড় কর্মী। সমিতির কাজ নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত। পড়াশুনো করতে সময় পায় না বেচারা।—ব'লে মুচকি হেসে শৈলীর দিকে তাকালে।

শৈলী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, মনে মনে ও অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রতুল চুপ করতেই ও বললে, তপনবাবুকে তুমি আজই একবার ধ'রে নিয়ে যেও না দাদা। উনি যখন এসে পড়েছেন, ওঁকে দিয়েই গানগুলোর সুর দিইয়ে নেওয়া ভাল। হিমাংশুবাবু যাকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন, সে এমন সুর দিয়েছে যে কানে শোনা যায় না।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার ?

প্রতুল বললে, আসছে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে ওরা রবীন্দ্রনাথের একটা নাটক অভিনয় করতে চায়। গানের সুর দিতে হবে। তপন তো ওসব বিষয়ে ওস্তাদ। শান্তিনিকেতনে অনেকদিন ছিল। শৈলীকে বললে, আচ্ছা, তাই যাব। তুই এক কাজ কর্ দেখি। একটু চা-টার ব্যবস্থা কর্।

সমরেশ বললে, টা নয়, শুধু চা।

শৈলী চ'লে যাবার উপক্রম করতেই প্রতুল বললে, মা কি করছেন রে?

কি আর করবেন? জপ করছেন।—ব'লেই চ'লে গেল।

সমরেশ দুই চোখ কপালে তুলে বললে, কম্যুনিস্টের বাড়িতে জপ-তপ! এ যে তাজ্জব ব্যাপার হে?

প্রতুল হেসে বললে, মা কোন্ এক স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য। সকাল-সন্ধ্যে মন্ত্র জপ করতে হয়। এ বিষয়ে মায়ের অত্যন্ত নিষ্ঠা। অসুখ হ'লেও এর ব্যতিক্রম হয় না। কিছু বলতে গেলে রেগে আগুন হয়ে যান। বলেন—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বাছা। যাবার দিন ঘনিয়ে এল। পরকালের কাজে বিঘ্ন ক'রো না। আমার ওপরে তো মায়ের আস্থা নেই কখনও। আজকাল শৈলীর ওপরেও চ'টে যান। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তা ছাড়া বুড়োবুড়ী নিয়ে আমাদের কারবার নয়। মনের তেল তাঁদের ফুরিয়ে গেছে। আমরা চাই তেল-ভরা নতুন দীপ, আগুনের শিখা ছোঁয়াবামাত্র যা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠবে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, ঘরের ভিতরটা পাতলা অন্ধকারে আবিল হয়ে উঠেছে। প্রতুল বললে, চল, বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসি।

দুজনে নিজের নিজের চেয়ার বারান্দায় বার ক'রে নিয়ে এসে বসল।

সমরেশ বললে, আমাদের তিনুর মনের তেল নিশ্চয় ফুরোয় নি। ওকে জ্বালাবার চেষ্টা কর নি কেন?

প্রতুল বললে, চেষ্টা যে হয় নি, তা নয়। তবে ওর মধ্যে তেলের

সঙ্গে মিশে আছে জল। ভিজে পলতে জ্বলতে চাইল না। বি. এ. পাস-করা মেয়ের যে এমন স্যাঁতসেঁতে ছাতা-ধরা মন হয়, আগে জানা ছিল না।

সমরেশ বিস্ময়ের স্বরে বললে, স্যাঁতসেঁতে! বল কি হে! আমার তো মনে হয়, ওর মন যা-তা তেলে নয়, খাঁটি পেট্রলে ভরা; আগুনের শিখা কাছে নিয়ে যেতে না যেতেই জ্ব'লে ওঠে।

শৈলী দু কাপ চা নিয়ে এল। প্রতুল বললে তাকে, তুই কি যাবি নাকি ওখানে?

শৈলী বললে, যাব বইকি। মেয়েরা সব আসবে। তা ছাড়া আজ আমাদের সমিতির একটা মীটিং আছে।—ব'লে ভিতরে চ'লে গেল।

দুজনে নীরবে চা খেতে লাগল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে আঁধার ঘন হতে আরম্ভ হয়েছে। সামনে মিউনিসিপ্যালিটির অপ্রশস্ত রাস্তা। আলোর বালাই নেই। যুদ্ধের সময় থেকে ব্ল্যাক-আউটের জের চলছে এখনও। সামনে বাউরী-পাড়ায় কয়েকটা ঘরে প্রদীপ জ্ব'লে উঠেছে। বাকি ঘরগুলো অন্ধকার। ঘরের কর্তারা এখনও মদের ভাটি থেকে ফেরে নি। যুবতী মেয়েরা সাজগোজ ক'রে বেরিয়েছে শিকারের সন্ধানে। যারা ছেলেমেয়ের মা, যাদের যৌবনে ভাঁটা পড়েছে, তারাই কেরোসিনের লম্প জ্বালিয়ে সারাদিনের পর রান্না করছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে তিনটি মূর্তি পার হয়ে গেল। তপনের গলা শুনতে পাওয়া গেল। সমরেশ বললে, তপন মাসী-বোনঝিকে নিয়ে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে শৈলী বেরিয়ে এল। সাজগোজ পূর্ববৎ। শুধু পায়ে জুতো। সমরেশ বললে, একা যেতে পারবি?

শৈলী বললে, রাধা আর পদ্মাকে ডেকে নেব রাস্তায়। তুমি যাচ্ছ তো এখনই? যাবার সময়ে তপনবাবুকে ডেকে নিয়ে যেতে ভুলো না।—ব'লে চ'লে গেল।

সমরেশ বললে, তপন আজ যেতে পারবে ব'লে মনে হয় না।

প্রতুল বললে, আমারও তাই। আজ আর চেষ্টা ক'রে লাভ হবে না। পারি তো কাল ধ'রে নিয়ে যাব। আর যদি বুঝি, ও স'রে থাকতে চায়, তা হ'লে জোর ক'রে টানাটানি করব না। তবে মেয়েদের মন একটু ভেঙে পড়বে। তপনের কাছ থেকে ওরা এত সাহায্য পেয়েছে যে, ওর ওপরে ওদের পাওয়ার যেন একটা দাবি হয়ে গেছে। তপন যে ওদের কাছে কোনদিন কৃপণ হয়ে উঠতে পারে, এ কথা ওরা ভাবতে পারে না।

দুজনে চুপ ক'রে ব'সে রইল। মিষ্টি হাওয়া বইছে। সামনের আকাশে তারা ফুটে উঠেছে। দূরে কাদের মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে। পাশের বাড়ির একটা ছেলে তারস্বরে সংস্কৃতের শব্দরূপ মুখস্থ করছে। দূরে একটা বাড়িতে রেডিওতে গান বাজছে।

কিছুক্ষণ পরে প্রতুল বললে, কতদিন থাকবে বাড়িতে ?

সমরেশ বললে, আছি কিছুদিন। মায়ের তো ইচ্ছে, বাড়িতেই থেকে যাই। মাস্টারি বা কেরানীগিরিতে ঢুকে প'ড়ে, কোন রকমে দু-পয়সা ঘরে আনি। বে-থা ক'রে সংসার ফেঁদে বসি।

মাস্টারি কেরানীগিরি করতে হবে কেন ? ভাল চাকরিই পাবে। বিদ্যে-সিদ্যে আছে, কংগ্রেসের খাতা থেকে আমার মত নামও কাটাও নি। কাজেই কংগ্রেসী আমলে তোমাদের ভাল ব্যবস্থাই হবে। চাই কি একটা হাকিমি পেয়ে যেতে পার।

সমরেশ হেসে বললে, অনুশোচনা হচ্ছে তো ফিরে এস না।

প্রতুল দৃঢ়কণ্ঠে বললে, যে পথ ধরেছি, সর্বমানবের মুক্তির এই একমাত্র পথ ব'লে বুঝেই ধরেছি। এই পথে বাধা আসবে, হয়তো ঘনিয়ে আসবে কালবৈশাখীর কালো মেঘ, গভীর আঁধারে সামনের পথরেখা হয়তো অবলুপ্ত হয়ে যাবে, তবু এ-কথা নিঃসংশয়ে জানি, দৃঢ় নিষ্ঠা ও অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে এই পথ অবলম্বন ক'রে থাকলে গন্তব্যে একদিন পৌঁছুবই।

সমরেশ বললে, কংগ্রেসের পথেই বা মুক্তি আসবে না কেন ? যে পথে এতবড় দুর্ধর্ষ শক্তির হাত থেকে এতবড় দেশের মুক্তি এসেছে, সে পথে দেশের সমস্ত লোকের মুক্তি আসবে না ? বিদেশের বিভিন্ন

প্রকৃতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির একদল মানুষ যে উপায়ে নিজেদের মুক্তি এনেছে, তাই আমাদের দেশে চালাতে হবে নাকি? বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব—মহাত্মা গান্ধী বহু চিন্তা ও সাধনার দ্বারা যে পথ আবিষ্কার করেছেন, যে পথে আংশিক সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, তার ওপর বিশ্বাস রাখা চলবে না? তোমাদের পথিকৃত অসাধারণ মনীষী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাই জগতের শেষ চিন্তা, এ বিশ্বাস যতই আঁকড়ে থাক আর প্রচার কর, ভারতের চিরন্তন প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে তা আশ্রয় পাবে না। যারা স্বভাবত অসৎ-প্রকৃতি, তাদের দুষ্ট প্রকৃতিকে, লোভ, বিদ্বেষ ও বিভেদ-বুদ্ধির বিষে বিষিয়ে তুলে দেশে সাময়িক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়তো তোমরা ক'রে উঠতে পার, কিন্তু নিঃসংশয়িতভাবে যা মহৎ, যা কল্যাণপ্রদ, তা এ দেশের মানুষের মনের কাছে ন্যায্য শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা একদিন পাবেই।

প্রতুল বললে, দেশের শাসন-ব্যবস্থা দেশের নেতাদের করায়ত্ত হতে চলেছে। বড় বড় নীতি ও আদর্শের ভনিতা ক'রে শাসনতন্ত্রও রচিত হবে। কিন্তু হাতে-কলমে কাজ শুরু করলেই নেতারা দেখতে পাবেন, শক্তিমান বনিক ও জমিদারদের কায়েমী স্বার্থ পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে। আইন-কানুন ক'রে, উপদেশ বর্ষণ ক'রে, তাদের কাবু করতে তাঁরা পারবেন না। ভারতের মানুষ অন্য দেশের মানুষের থেকে আলাদা নয়, যতই সনাতন ধর্মবুদ্ধি ও সংস্কৃতির বড়াই কর। কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহারে তার প্রমাণ হয়ে গেছে। তারা যখন দেখবে, দেশের পুঁজিপতিদের কংগ্রেস শায়েস্তা করতে পারছে না, বরং তাদের স্বার্থের পোষক হয়ে উঠেছে, তাদের জীবন-যাত্রা সুগম হওয়া সুদূরপরাহত, তাদের মন উঠবে তিক্ত হয়ে; তাদের মনের মধ্যে জ'মে উঠবে বিদ্বেষ ও বিরোধের বারুদ; ভাল ভাল কথা ব'লে তাদের আর শান্ত ক'রে রাখা যাবে না; তখন একটি আগুনের কণার স্পর্শে সারাদেশব্যাপী বিস্ফোরণ হয়ে যাবে।

সমরেশ বললে, এসব বোঝবার মত বুদ্ধি কংগ্রেসের নেতাদের আছে। যদি আইন-কানুন ক'রে, উপদেশ দিয়ে কোন কাজ না হয়, তা হ'লে যাতে কাজ হবে, তার ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। কংগ্রেসের

হাতে শাসন-ক্ষমতা এলেই যে রাতারাতি স্বর্গরাজ্য এসে যাবে—এ কথা তাঁরা কখনও বলেন নি। ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম আমাদের শেষ হয়েছে, কিন্তু শত্রুর শেষ হয় নি। শত্রু ঘরে ও বাইরে। এদের নির্মূল করতে হ'লে দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ থাকা চলবে না; কংগ্রেসের পেছনে দাঁড়িয়ে সকলকে সমবেতভাবে সংগ্রাম করতে হবে। কলের মালিক বা জমিদাররা যতই শক্তিমান হোক, সমগ্র দেশবাসীর সঙ্কল্পিত আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

প্রতুলের মা এলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বললেন, হ্যাঁ রে, কিছু খাবি না?

প্রতুল বললে, খাব তো মা। কিন্তু দেবে কে? তুমি তো জপ করছিলে; আর শৈলী এক কাপ ক'রে চা ধ'রে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

মা বললেন, ওর কথা ছেড়ে দে বাছা। তুই-ই তো ওর মাথা খেয়েছিস। কি যে ভূত ঘাড়ে চাপিয়েছিস?

সমরেশ গিয়ে প্রণাম করতেই, মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, ছেলেটিকে চিনলাম না।

প্রতুল বললে, আমাদের সমরেশ।

মা বললেন, তোমার নাম অনেকদিন থেকে শুনেছি, দেখা হয় নি।

সমরেশ বললে, আপনারা প্রায়ই বিদেশে থাকতেন; আর আমারও আপনাদের কাছে গিয়ে আলাপ করবার সুযোগ হয় নি।

মা বললেন, সারাজীবন জেলে কাটালে মা-ছেলেতে দেখা কি ক'রে হয়, বল? তা আর তো জেলে যেতে হবে না। এবার বে-থা ক'রে সংসারী হও। তোমার বন্ধুটিকেও তাই করতে বল।

প্রতুল বললে; ওর জেলে থাকা শেষ হয়েছে; আমার তো হয় নি।

মা বললেন, ওসব ছেড়ে দে বাবা। আমার যা শরীরের অবস্থা হয়েছে, বেশিদিম আর নয়। মরবার আগে তোকে যদি সংসারে বেঁধে দিয়ে যেতে না পারি, তো ম'রেও শান্তি পাব না।

প্রতুল বললে, কিন্তু তার তো দেরি আছে মা। কি খাবার কথা বলছিলে যে?

হ্যাঁ, যাই বাছা, আনিগে।—ব'লে মা ঘরের ভিতর চ'লে গেলেন।

খাওয়া শেষ হ'লে প্রতুল বললে, আমাকে একবার যেতে হবে শৈলীদের ওখানে। যাবে নাকি? চল না। কি করবে বাড়ি গিয়ে এত তাড়াতাড়ি?

সমরেশ বললে, আমার যাওয়া মেয়েরা পছন্দ করবেন কেন?

প্রতুল বললে, তুমি কংগ্রেসী ব'লে? শুনে আশ্বস্ত হতে পার যে, নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘ শহরের সমস্ত মেয়েদের প্রতিষ্ঠান। শুক্তি, শৈলী এটা চালায় বটে; কিন্তু সাহায্য আসে শহরের সব মেয়েদের কাছ থেকে। কোন বিশেষ মতবাদের এখানে স্থান নেই। তোমার মত একজন অভিজ্ঞ দেশসেবকের সাহায্য ও পরামর্শ তারা সাগ্রহে নেবে। তা ছাড়া একটা মতলব আছে আমার। তপনকে যদি না পাওয়া যায়, তোমাকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব।

সমরেশ আতঙ্কে ব'লে উঠল, সে আবার কি!

প্রতুল হেসে বললে, তুমি তো আগে রবি ঠাকুরের গান খুব গাইতে!

সমরেশ বললে, সে সব ভুলে গেছি।

প্রতুল বললে, তা বেশ করেছ। তা হ'লেও চল না আমার সঙ্গে। বেশি দেরি হবে না। তা ছাড়া শুক্তি আছে সেখানে। ওর সঙ্গে তো তোমারও পরিচয় ছিল। আলাপ ক'রে আসবে।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

পণ্ডিত

পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলধার পাত্র?
এই ভাবিয়া সারারাত্রি চুলকায়েছি গাত্র।
ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মরূপে দয়ার কোথা ঠাঁই?
এই ভাবিয়া পাপচক্ষে নিদ্রা আসে নাই।
টাকা হ'ল মাটি, এবং মাটি হ'ল টাকা—
নিখিল ভুবন পূর্ণ রহে ট্যাকটি কেবল ফাঁকা।
সর্বনাশের মুখে ছেড়ে দিলাম আধেকটাই!
বাকি আধেক আপনি গেল; দাঁড়াই কোথা ভাই?

অসিতকুমার

ধামা ও স্কাউণ্ড্রেল

ধামা

অতীত যুগে যে অজ্ঞাতনামা শিল্পী ধামার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাকে আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ করি। গৃহস্থের নিত্য ব্যবহারের জন্য এমন একটি বস্তু আর হয় না। চাল ডাল ইত্যাদি রাখিতে এমন শস্যাধার আর দ্বিতীয়টি নাই। নিমন্ত্রণাদিতেও ধামা ধামা লুচি মণ্ডা ইত্যাদি ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করিতে কি আরাম আর সুবিধা! এই ধামা না হইলে গৃহস্থের কিছুতেই চলে না।

গৃহস্থের প্রয়োজনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ধামা মানুষের আরও অনেক প্রয়োজনে লাগিতেছে। ধনী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের ধামা ধারণ করিয়া বহু লোক সাংসারিক অসচ্ছলতা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইংরেজ-আমলে রাজপুরুষদের ধামা ধরিয়া বহু লোক নিজেদের এবং স্বজনবর্গের ভরণপোষণের সুব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। কৌশলে ধামা ধরিয়া অনেকে ইংরেজ-শাসকদের আস্থাভাজন হইয়া পদবী লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এখনও দেখিতেছি, প্রভুস্থানীয়দের মণ্ডলীর মধ্যে যে হতভাগ্যের মামার জোর নাই, সেও ধামার জোরে বেশ কিছু কামাইয়া লইতেছে। যে সকল সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদী বলিয়া জানিতাম, সে সংবাদপত্রগুলিও ধামা ধরিয়া কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিয়া লইতেছেন।

কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষও আজ ধামার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধামা ধরিবার জন্য লোকের অভাব নাই। ঘন ঘন প্রেস-কন্‌ফারেন্স করিয়া বহু সংবাদপত্রকে ধামাধারী করা হইতেছে। আজকাল কংগ্রেস-সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য যে আবেদন শুনিতে পাই, তাহা অনেক ক্ষেত্রে ধামা ধরিবার জন্যই আমন্ত্রণ বলিয়া মনে হইতেছে। আজ প্রভুদের ধামা ধরিতে না পারিলে নিন্দিত হইবার আশঙ্কা আছে।

ধামার আর একটি প্রয়োজন হইতেছে উহাকে চাপিয়া দেওয়া। সমাজের অনেক কলঙ্ক-কাহিনী ধামা-চাপা দিয়া রাখা হইয়া থাকে।

এই প্রকারে অনেক অপ্রীতিকর অবাঞ্ছিত অবস্থার অসুবিধা হইতে কিছুকালের জন্য নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বর্তমান কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষও ধামা-চাপা দেওয়ার এই পদ্ধতিটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে লাগাইতেছেন। দেশের লোক যখন কোন সংস্কারের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করে, অথবা কোন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য গোলমালের সৃষ্টি করিতে থাকে, তখন বিষয়টি ধামা-চাপা দিবার জন্য কমিটী কন্‌ফারেন্স কমিশন প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া সংস্কার-প্রতিকারের কার্য বিলম্বিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

বর্তমান কর্তৃপক্ষ ধামা-চাপার কৌশলে অনেক নিপুণতা অর্জন করিয়াছেন। মন্ত্রীগণের মধ্যে অসাধুতা দুর্নীতি, রাষ্ট্রের কর্মচারীদের মধ্যেও অসততার অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু সে সমস্তই ধামা-চাপা দেওয়া হইতেছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-গঠন কংগ্রেসের পুরাতন নীতি। কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রভুস্থানীয় নেতৃবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বিষয়টি ধামা-চাপা দেওয়া হইতেছে। ধামা-চাপা দিয়া ধনী, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীগণের শোষণকার্য অব্যাহত রাখা হইতেছে।

কিন্তু কতদিন ধামা-চাপার কাজ চলিবে? ধামা যখন কেহ উল্টাইবে, তখন প্রভুদের কি অবস্থা হইবে তাহাই ভাবিতেছি।

স্কাউণ্ড্রেল

কিছুদিন পূর্বে গণ-পরিষদে একটি সদস্য ভারতের ভাবী আইন-সভায় সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র লোকই যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়া বলেন, বর্তমানে অনেক নির্বাচনপ্রার্থী এবং নির্বাচিত সদস্য—স্কাউণ্ড্রেল।

কথাটি অভদ্র বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছিল। স্কাউণ্ড্রেল কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ ঠিক কি হইলে মনের মত হয় জানি না। একখানি অভিধানে আছে—স্কাউণ্ড্রেল মানে পামর, পাজি লোক, দুরাত্মা, বদমায়েস। ইহার মধ্যে কোন্ বিশেষণটি কাহার উপর প্রয়োগ করিলে যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপিত হয় বলা কঠিন। জর্জ বার্নার্ড শ তাঁহার

'What is what in Politics' পুস্তকখানির ৩৩২ পৃষ্ঠায় স্কাউণ্ড্রেল কথাটির একটি অতিশয় মোলায়েম সংজ্ঞা দিয়াছেন এইরূপ—

'A scoundrel is a person who pursues his or her own personal gratifications without regard to the feelings and interests of others"—অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের মনের ভাব এবং স্বার্থের কথা চিন্তা না করিয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের অন্বেষণ করে, সেই ব্যক্তিই স্কাউণ্ড্রেল। শ'এর এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করিলে সদস্য মহাশয় স্কাউণ্ড্রেল কথাটির খুব যে অপপ্রয়োগ করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। নানা প্রদেশের আইন-সভায় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত লোকেদের মধ্য হইতে স্কাউণ্ড্রেল খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশি অনুসন্ধান করিতে হয় না। ইহা আক্ষেপের বিষয় হইলেও সত্য কথা। কিন্তু সত্য কথা বলা এখন অবাঞ্ছনীয়, যদিও "সত্যমেব জয়তে" আমাদের রাষ্ট্রের বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ-রূপ মহৎ কর্ম যাহাতে স্কাউণ্ড্রেলদের হস্তে গিয়া ব্যর্থ না হয়, উক্ত সদস্য মহাশয়ের প্রস্তাবে সেই সদুদ্দেশ্যই নিহিত ছিল। কিন্তু তাহা গৃহীত হইল না। আমরা সরকারী আপিসের এবং আইন-সভার বাহিরে থাকিয়া বুঝিতে পারিতেছি, রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যবস্থাই স্কাউণ্ড্রেলদের হাতে পড়িয়া অব্যবস্থায় পরিণত হইতেছে। দেশবাসীর দুঃখকষ্ট কমিতেছে না। ইহাও পরিষ্কার বুঝিয়াছি, রাষ্ট্রের শাসক ও কর্মচারী গোষ্ঠী স্কাউণ্ড্রেল-বিমুক্ত না হইলে দেশের কল্যাণ নাই।

এই প্রসঙ্গে বহু বৎসর পূর্বে প্রকাশিত আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অলিভার ওয়েন্ডেল হোম্‌সের একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

God give us men. A time like this demands
Great hearts, strong minds, true faith and
willing hands.
Men whom the lust of office does not kill,
Men whom the spoils of office cannot buy,

Men who possess opinions and a will,
Men who have honour, men who will not lie.

কবিতাটির সঠিক বাংলা অনুবাদ করিতে পারিলাম না। ভাবটা এই—হে ভগবন্, আমাদের মানুষ দাও। এ সময়ে এমন মানুষ চাই, যাঁর হৃদয় প্রশস্ত, মন দৃঢ়, বিশ্বাস আন্তরিক, কর্মে যিনি উৎসাহী, পদগর্ব যাঁকে নষ্ট করতে পারে না, পদের ঐশ্বর্য যাঁকে ক্রয় করতে পারে না। যে মানুষের "মত" আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে, সততা সম্ভ্রমবোধ আছে—আর চাই সেই মানুষ যিনি মিথ্যা কথা বলেন না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

প্রশ্ন

বন্ধু, এখন শ্মশান-বাসরে বল কোন্ গান গাই ?
ভস্মরেখায় বল কোন্ ছবি আঁকি ?
কোন্ হাতিয়ার হাতে নিয়ে বল মৃত্যুর মুখে চাই ?
কোন্ আশা নিয়ে আজও বুক বেঁধে থাকি ?

বন্ধু, বিলাপ করেছি অনেক, করেছি তো হাহাকার ;
সত্যের পাঠ পড়েছি শান্ত মনে—
আজকে তবুও ঘরে ও বাহিরে ক্ষুব্ধ অন্ধকার
মৃত্যুর দূত মুক্ত গৃহাঙ্গণে।

বন্ধু, কালের কুচক্রান্তে যখন সর্বহারা ;—
সব দিয়ে লাভ হয়েছে সর্বনাশ
আত্মা যখন সর্বস্বান্ত, প্রাণ আশ্রয়হারা ;
দস্যুর পায়ে লাঞ্ছিত ইতিহাস ॥

বন্ধু, তখন জীবনের কাছে দেব কোন্ উত্তর ?
কি আছে বলার ইতিহাস বিধাতাকে ?
ধ্বক্ ধ্বক্ করে হৃৎপিণ্ডটা, হৃদয় নিরুত্তর
হানে মহাকাল অসহায় আত্মাকে ॥

অসিতকুমার

জমি-শিকড়-আকাশ

৪

ছোট শহরে হুলস্থুল্ পড়িয়া গেল সকালবেলায়। বলেন্দু প্রকাণ্ড বাঘ মারিয়া আনিয়াছে। সকাল হইতেই অবিরাম লোক আসিতেছে বলেন্দুর বাড়ি। বলেন্দু অমায়িক হাসিমুখে দেখাইতেছে এবং শিকার-কাহিনী বর্ণনা করিতেছে।

প্রদীপের সঙ্গে দীপিকাও আসিয়া দেখিয়া গেল। একবার বাঘ, আর বার বলেন্দুর দিকে তাকাইতে দীপিকার চক্ষে যাহা ফুটিয়া উঠিতেছিল, বলেন্দু দেখিয়াছে এবং বিজয়ী বীরের প্রাপ্য জয়মাল্যের মত হেলায় গ্রহণ করিয়াছে।

প্রদীপ ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ-বাঘ নাকি বলেনদা?

বলেন্দু জোরে হাসিয়া উঠিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিল, না, মেয়ে-বাঘ। —বলিয়া দীপিকার চক্ষু দুইটি দখল করিয়া ফেলিল।

দীপিকার মনে হইল, মৃত বাঘটা সে নিজেই।

ফিরিবার পথে প্রদীপ বলিল, শক্তিমান পুরুষ বলেনদা।

দীপিকা কোন জবাব দিল না।

বীরেশদাও তো ছিলেন সঙ্গে?—খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া প্রদীপ আবার বলিয়া উঠিল, তাঁকে তো দেখলাম না?

দীপিকা মৃদুস্বরে বলিল, ঘুমুচ্ছেন বোধ করি এখনও। নয়তো বই নিয়ে বসেছেন এতক্ষণ।

চল্, দেখে যাই বীরেশদাকে। যাবি?

কি হবে?—দীপিকা হতাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল।

প্রদীপ আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

নিজের উপর রাগ হইল দীপিকার। অর্থহীন। মুহূর্তে বদলাইয়া বলিল, চল, যাই।

সর্বেশ্বরের গীতাপাঠের শব্দে বীরেশ্বরের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গেল। অতৃপ্ত চক্ষে জ্বালা এবং ক্লান্তি লইয়াও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দুই হাতে চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

শুনিতে ভালই লাগে সংস্কৃত শ্লোক। যুক্তিকে অসার করিয়া দেয় এত জোরের সঙ্গে বলা, এত কবিত্ব!—বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিল বীরেশ্বর।

হঠাৎ যেন তাড়া খাইয়া ধাবিত হইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাজে সময় নষ্ট করার কাজগুলি সারিয়া আসিয়া বীরেশ্বর বই খুলিয়া বসিয়া গেল।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিল চক্ষু। চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ মন আর চক্ষুর ধস্তাধস্তির পরে অবশ মাথাটা নিঃশব্দে টেবিলের উপর পড়িয়া গেল। ঘুমে।

ঘণ্টাখানেক পরে সুনয়না ডাকিতে আসিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া গেলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে প্রদীপ আর দীপিকা আসিয়া পৌঁছিল।

দীপিকা ডাকিয়া লইয়া আসিল সুনয়নাকে। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে দীপিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেশ্বর জাগিয়া উঠিয়াই শশব্যস্তে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। পরক্ষণে হাসির শব্দটা কান হইতে মস্তিষ্কে আঘাত করিল, যখন মুখ তুলিয়া দেখিল সকলকে। চমকিয়া একটু যেন গুটাইয়া গেল। অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিল প্রদীপদের।

দীপিকা বলিল, আমি দাদাকে বলেছিলাম, হয় ঘুমুচ্ছেন, নয়তো পড়ছেন। দেখছি, আপনি দুটোই করছেন।

ও, হ্যাঁ।—বীরেশ্বর সলজ্জ জবাব দিল।

সুনয়না বলিলেন, ইচ্ছে ক'রে তো ঘুমোয় না। চোখ ভেঙে পড়লে ঠাকুরপো কি করবে?

বাঘ দেখে এলাম বীরেশদা।—প্রদীপ প্রথম কথা বলিল।

ওঃ! তোমরা বাঘ দেখতে বেরিয়েছ বুঝি?—বীরেশ্বর বই বন্ধ করিয়া ফেলিল। তাই বল।—দীপিকার দৃষ্টি খুঁজিতে লাগিল—বৃথা। দ্বিতীয়বার বলিল, তাই বল। হ্যাঁ, বলেন্দুবাবুর হাত খুব ভাল। এক গুলিতেই শেষ করেছেন অত বড় বাঘটাকে।

প্রদীপের শরীরটা যেন চনচন করিয়া উঠিল।—সত্যি, কি হাত!

বীরেশ্বর কঠিন কণ্ঠে বলিল, শুধু হাত নয়; গায়ে বলও আছে বলেন্দুবাবুর। অসাধারণ!

দীপিকা এবার জানালার দিক হইতে ফিরিয়া তাকাইল। সুনয়না তাহার হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে গল্প করব, চল। কাজ করব আর গল্প করব।

বীরেশ্বর আরও কিছু বলিবার জন্য গুছাইতেছিল। বলা হইল না। সুনয়না দীপিকাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

বীরেশ্বর নীরব হইল। প্রদীপ আলমারির বইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বীরেশ্বর হঠাৎ উঠিয়া বলিল, আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে প্রদীপ। তোমরা বউদির সঙ্গে গল্প কর।

একসঙ্গেই যাচ্ছি, চলুন না।—প্রদীপ বলিল, দীপিকা আসুক।

আমার সময় নেই যে।—পায়চারি করিতে করিতে বলিল বীরেশ্বর, তা ছাড়া আমি অন্য দিকে যাব। তুমি ব'স প্রদীপ।

বীরেশ্বর বাহির হইয়া গেল।

প্রদীপ অবাক হইয়া মুহূর্তকাল মূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিয়া দীপিকাকে ডাকিল। সুনয়না এবং দীপিকা উভয়ে ছুটিয়া আসিল।

বীরেশদা চ'লে গেলেন।—প্রদীপ অসহায়ের মত বলিল।

চ'লে গেল?—সুনয়না ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।—দেখেছ? না খেয়েই চ'লে গেল।

জরুরী কাজ আছে বোধ করি।—বলিয়া দীপিকা আলমারির কাছে গিয়া বই দেখিতে আরম্ভ করিল।

তোমরা কিন্তু ব'স ভাই।—সুনয়না বলিলেন, আমি এক্ষুনি আসছি।

সবই প্রায় নতুন বই।—দীপিকা বলিয়া উঠিল।

সুনয়না ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, যা রোজগার করে, অর্ধেক টাকাই তো বই কিনতে যায় ঠাকুরপোর।—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বীরেশদা ও-রকম ক'রে চ'লে গেলেন কেন বুঝলাম না।—প্রদীপ বলিল।

কি রকম?—দীপিকা প্রশ্ন করিল।

মনে হ'ল যেন—। কথাবার্তা নেই, হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন।

প্রদীপের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল দীপিকা। মুখ টিপিয়া হাসিল একটু আড়ালে। বলিল, কিছু ব'লে গেলেন না?

শুধু বললেন, বেরুতে হবে, কাজ আছে।

দীপিকা কোন কথা না বলিয়া একটার পর একটা বই খুলিয়া একটু দেখিয়া রাখিয়া দিতে লাগিল।

প্রদীপ তাড়া দিল, চল্। আর দেরি করছিস কেন?

বীরেশদার বউদি বসতে বললেন যে। জলখাবার করছেন।

কেন রে?

না খেয়ে যেতে দেবেন না।—বলিয়া দীপিকা ঘুরিয়া আসিয়া বসিল।

মাস্টার মশাই আসছেন।—প্রদীপ দেখিতে পাইয়া বলিল।

সর্বেশ্বর আসিয়া প্রদীপদের দেখিয়া দরজার সম্মুখে থামিলেন। বলিলেন, বীরেশ নেই বুঝি?

না।—বলিয়া প্রদীপ ও দীপিকা উভয়েই দাঁড়াইল।

ব'স, ব'স।—সর্বেশ্বর বলিলেন। আরে, তোমরা দেখ নি, বলেন্দু মস্ত বড় বাঘ মেরে এনেছে একটা?

হ্যাঁ, দেখে এসেছি আমরা।—দীপিকা বিনীত জবাব দিল।

আমিও দেখে এলাম। মস্ত বড় বাঘ। রয়াল বেঙ্গল বোধ হয়। বলেন্দু ভাল শিকারী হয়ে উঠেছে তো!—সহর্ষে বলিতে বলিতে সর্বেশ্বর ভিতরের দিকে গেলেন।

পরক্ষণে আচমকা বীরেশ্বর আসিয়া প্রবেশ করিল ঘরে। কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া আক্রোশের সুর বাহির হইল। বলিল, কাছেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাসায় নেই এখন। পরে যেতে হবে।

বলা শেষ হওয়ামাত্র মুখমণ্ডল আরও কুঞ্চিত হইল বীরেশ্বরের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া লইল, দীপিকা হাসিতেছে কি না! ধরিতে পারিল না।

ভাল হয়েছে।—প্রদীপ বলিল, বউদি আমাদের ঘরে বন্ধ ক'রে কোথায় যে চ'লে গেলেন! চুপচাপ ব'সে আছি আমরা।

তাই নাকি?—বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল, আচ্ছা, ডেকে আনছি আমি।

দীপিকা বলিল, আপনি বসুন না। উনি আসবেন এখুনি। আপনার তো কিছুই খাওয়া হয় নি এখনও? বলছিলেন বউদি।

শান্ত দৃষ্টিতে তাকাইল বীরেশ্বর। দীপিকাও চক্ষু সরাইয়া লইল না এবার।

সুনয়না আসিয়া তিনজনকেই ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বিদায় লইয়া পথে নামিয়া দীপিকা হঠাৎ বলিল, বই লিখছেন।

কে?—প্রদীপ বোকার মত প্রশ্ন করিয়াই পরক্ষণে সংশোধন করিয়া লইল।—ও, বীরেশদা?

দীপিকা শুধু ঘাড় নাড়িল।

হ্যাঁ।—প্রদীপ বলিল, দেখেছি খাতা।

দীপিকা একটু মধুর হাসি মিশাইয়া বলিল, ঐ রকম পাগলাটে কবি-কবি গোছের মানুষ তো! বড় লেখক হবেন আমার মনে হয়।

কিন্তু কবিতা তো লিখছেন না! কি মাথামুণ্ডু লিখছেন, এক লাইনও বোঝা যায় না।

দীপিকা সগর্বে হাসিয়া বলিল, বোঝা যায় না?

খুব উঁচু দরের লেখা হচ্ছে বোধ হয়।—প্রদীপ সমর্থন করিল ভাবটা।

৫

পিতৃহীন প্রদীপ ও দীপিকার মাতা শান্তিলতাই এখন তাহাদের অভিভাবিকা। দীপিকার খেলা দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাবে তিনি আপত্তি করিলেন।—মেয়েছেলে আবার ফুটবল-খেলা দেখে কি?

বাঃ!—দীপিকা ভয়ে অস্বস্তিতে বলিল, দাদার সঙ্গে তো যাচ্ছি। তা ছাড়া বলেনবাবু অত ক'রে অনুরোধ ক'রে গেছেন, না গেলে অসন্তুষ্ট হবেন না?

শান্তিলতা দমিয়া গেলেন। কিন্তু কথা বন্ধ করিলেন না।—বড়লোকের মেয়েরা যায়, তাদের শোভা পায়। গরিবের মেয়ে, ফুটবল-খেলা দেখে! কর্‌গে যা খুশি।—বকিতে বকিতে সরিয়া গেলেন।

খেলার মাঠে যাওয়ার রাস্তার ধারে এক চা-কোম্পানির অফিসের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল বীরেশ্বর। দীপিকার সঙ্গে অনিবার্যভাবে চোখাচোখি হইল।

প্রদীপ ডাকিতে গিয়া দীপিকার তর্জনীর মৃদু আঘাতে থামিয়া গেল। বীরেশ্বর তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। দীপিকার শরীর এবং চক্ষু সঙ্কুচিত হইয়া এতটুকু হইয়া গেল যেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বীরেশ্বরের ক্ষেত্রসীমা পার হইয়া গেলে আবার সাহসী হইল দীপিকা। ফিরিয়া চাহিতে দেখিল, বীরেশ্বর তখনও তাকাইয়া আছে। একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল দীপিকার শরীর।

ধীরে ধীরে অফিসের মধ্যে প্রবেশ করিল বীরেশ্বর।

কি মশায়?—প্রৌঢ় ভদ্রলোক কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া দরাজ আওয়াজে বলিয়া উঠিলেন, বেশ, আর পাত্তাই নেই আপনার?

নিমেষের মধ্যে যাদুমন্ত্রের ক্রিয়া হইল কথা কয়টিতে। পেটের তলা হইতে যেন বীরেশ্বর' চমৎকার এক বীরেশ্বরকে বাহির করিয়া দিল। সুরে সুর মিলাইয়া সে বলিল, আর বলবেন না সুবোধবাবু। নানান ঝামেলায় আর আসতেই পারি নি। কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে সুবোধবাবু।

মনে থাকলেই ভাল।—সুবোধবাবু প্রবোধ মানিলেন না।

মনে আছে ঠিক। ভুলব কেন? আবার আসতে হবে না? ব্যবসা ক'রে খাই যখন? এক দিনের তো কাজ নয়?—বীরেশ্বর পাকা ব্যবসায়ীর মত বলিয়া গেল।

সেই তো ভাবি।

পাই নি, বুঝলেন না? পার্কার ফিফ্‌টিওয়ান কারও স্টকে নেই। অর্ডার দিয়ে রেখেছি আমি।

অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথাগুলি বলিয়া গেল বীরেশ্বর। সুবোধ লাহিড়ীর সঙ্গে নাড়ীর যোগসূত্র বাঁধা আছে যেন! মনে হইল তার।

কি যে বলছেন, মশায়!—সুবোধ লাহিড়ী ধাপ্পা দিল, কালকে আমি নিজে দেখলাম টাউন স্টোর্সের দোকানে।

বীরেশ্বর হাঁফ ছাড়িল। টাউন স্টোর্সের খবরটা সৌভাগ্যক্রমে তাহার জানা ছিল। আনন্দে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, এটা তো ভুল কথা বললেন সুবোধবাবু। আমি আজও ওদের কাছে খবর নিয়েছি। এক মাস হ'ল ওদের স্টক ফুরিয়ে গেছে।

কোথায়?

টাউন স্টোর্স।

আরে, না না।—সুবোধ তাড়াতাড়ি সংশোধন করিলেন। টাউন স্টোর্স কে বললে? দাস ব্রাদার্স। দাস ব্রাদার্সের দোকানে।

দাস ব্রাদার্স?—বীরেশ্বর একটু অনিশ্চিত কণ্ঠে বলিল, ওদের ঐ যে, কি নাম ওর? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বললে যে এখনও আসে নি?

কবে?

তবে হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম পরশু দিন। কাল যদি এসে থাকে বলতে পারি নে। আজকেই খোঁজ নেব আমি।

এসেছে।—সুবোধ লাহিড়ী বলিলেন, অনেক নতুন কলম এসেছে ওদের। অবশ্য ঠিক ফিফ্‌টিওয়ান আমি দেখি নি—বুঝলেন না।

বুঝেছি।—বীরেশ্বর গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিল, আচ্ছা, আজকেই দেখব আমি।

একটু থামিয়া নীচু গলায় বলিল, সুবোধবাবু, কোদালি আর ছুরির অর্ডারটা কিন্তু আমাকে করিয়ে দিতে হবে।

আপনাকে দিয়ে আমার লাভ কি মশায়?

কেন?—বীরেশ্বর কালো মুখে বলিল, আপনার প্রাপ্য তো আমি কোনদিনই ফাঁকি দিই নি।

না না। তা আমি বলছি নে।—সুবোধ পরম বিবেচকের মত

বলিলেন, তা ছাড়া দর-কষাকষি ক'রে চশমখোরের মত প্রাপ্য আদায় করা আমার স্বভাব নয়, তা তো জানেন!

তা তো জানি।

বন্ধুবান্ধবের উপকার করব একটু, এর আবার দরাদরি কি?

তা তো বটেই।

আরে মশায়, আর সকলের মত তাই যদি পারতাম, তবে বাড়িতে এদ্দিন অট্টালিকা উঠে যেত।

হেঁ—হেঁ।

গলা আরও ছোট করিয়া সুবোধ লাহিড়ী বীরেশ্বরকে বিশ্বাসের ভাগী করিয়া বলিলেন, জানেন, জটুবাবু আমাকে সিক্স পার্সেণ্ট অফার দিয়ে গেল এই অর্ডারের জন্তে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু আমি ব'লে দিয়েছি যে, তা পারব না। সব কাজই আপনাকে দিয়ে দেব—আর কাউকে দেখতে হবে না? সকলের সঙ্গেই যখন একটা ভালবাসা হয়েছে।

তাই তো। সেই তো কথা।—বীরেশ্বর অনুভব করিল নাড়ীর সেই যোগসূত্রটা ক্রমশ ছিন্ন হইয়া আসিতেছে। বাক্‌শক্তি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি আবার বলিল, তা ছাড়া আপনার প্রাপ্য তো আমিও—মানে, দেবই। আচ্ছা, উঠি এখন। কাল আবার আসব।

বাহির হইয়া বীরেশ্বরের মুখ দিয়া প্রথম চাপা শব্দ নির্গত হইল, বদমাস!

পথিক একজন থমকিয়া দাঁড়াইল।

আপনাকে নয়।—বলিয়া বীরেশ্বর অগ্রসর হইল।

পথিক পিছন হইতে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল।

চোর!—কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আবার বলিল বীরেশ্বর।

বলিয়াই চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল এবার। কেহ শুনে নাই।

মিনিট পাঁচেক চলিবার পর আবার দাঁড়াইতে হইল বীরেশ্বরকে। এটা খেলার মাঠের রাস্তা। যে রাস্তায় দীপিকা গিয়াছে।

সবেগে ঘুরিয়া বিপরীত দিকে ধাবিত হইল।

কিন্তু এ পথে আসিয়াও মারাত্মক ভুল করা হইয়াছে, বীরেশ্বর বড় বিলম্বে বুঝিতে পারিল।

রাস্তার পাশের এক দোকান-ঘর হইতে কে একজন ডাকিয়া উঠিল, ও মশায়! শুনে যান।

ঘরে ঢুকিতে বীরেশ্বরের দেহটা যেন লজ্জায় ছোট হইয়া গেল। কিন্তু নির্লজ্জের ভঙ্গীতে বলিল, আমি বড় লজ্জিত কুঞ্জবাবু।

কিন্তু আমি আর কদ্দিন লজ্জা করব বলুন?

কঠিন কথায় বীরেশ্বরের সহজ হইয়া আসিল অবস্থাটা। বলিল, কি করব বলুন? পুরো টাকা অ্যাড্ভান্স করেছি। আজ কাল ক'রে ক'রে শেয়ারগুলো দিচ্ছে না। না ঠকলে তো লোক চেনা যায় না। যাই হোক, আর দুটো দিন সময় দিন কুঞ্জবাবু। যা হয় একটা ব্যবস্থা করবই। না হয় তো আপনার টাকাই আমি ফেরত দিয়ে যাব।

এটা কি কোন কথা হ'ল বীরেশবাবু? আপনি বলুন, টাকা দিয়েছি টাকা ফেরত নিতে?

না না। তা তো নয়ই. তা তো নয়ই। আচ্ছা, তিন-চার দিনের মধ্যেই আমি ব্যবস্থা করছি। আপনি ভাববেন না।

আবার তিন-চার দিন হয়ে গেল?—তীক্ষ্ণধী কুঞ্জবিহারী প্রশ্ন করিলেন।

ঐ দু-তিন দিন আর কি। আচ্ছা—

বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। অত্যন্ত ক্রোধে এবার নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। একটা বোঝাপড়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এই যে, বীরেশবাবু। চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক।

কোথায়?—আগে চকিত প্রশ্ন করিয়া পরে চাহিয়া দেখিল বীরেশ্বর।—কে, মাস্টার মশায় নাকি?

হ্যাঁ। ছুটা বাজে; মিত্তির-বাড়ি যাচ্ছেন নিশ্চয়ই?—এক মুখ হাসিলেন মাস্টার মশাই।

বীরেশ্বরের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু হাসিতেও হইল। বলিল, হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয় ওখানে রোজই, 'না' বলি কি ক'রে বলুন?

দেখা হবেই। আমারও যে এ বছর অন্তত পঁচিশটে টাকা না বাড়ালেই চলছে না। আর বাড়াতে পারে হিরণ মিত্তির।

রোজ ঘণ্টাখানেক দিতে পারলে হয়ে যাবে আপনার। আমি যে আধ ঘণ্টার বেশি পারছি নে। তাও তো রেগুলার নয়।

রেগুলার হওয়া চাই। ইতিহাস দেখুন না। চোখের সামনে কজন হুড়হুড় ক'রে উঠে গেল। কিন্তু রেগুলার অন্তত ঘণ্টা খানেক চাই।

বীরেশ্বর এবার সহজভাবে প্রাণ খুলিয়া হাসিল।

হিরণ মিত্রের বাড়ির গেটের সামনে আসিয়া বীরেশ্বর হঠাৎ বিদ্রোহ করিল। বলিল, আপনি যান মাস্টার মশাই। আমি আজ পারব না। শরীরটা ভাল নেই।

গা ঘিনঘিন করছে? ভাল কথা নয়। আসুন না, কথাবার্তা বিশেষ না বলতে পারেন, শুধু হেঁ-হেঁ ক'রে যাবেন।

বীরেশ্বর হাসিল।—তাও পারব না। অবশ্য না যাওয়া পর্যন্ত আমার পেমেণ্টের অর্ডার পাব না তাও জানি। কিন্তু—। আচ্ছা, নমস্কার।—বীরেশ্বর আর দাঁড়াইল না।

ক্লান্ত দেহটা আর টানিতে অক্ষম হইয়া বীরেশ্বর একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করিল বিশ্রামের আশায়। অন্তত মনের বিশ্রাম। কোন্‌টা যে বেশি ক্লান্ত বিচার করিতেও আলস্য বোধ হইল যেন। শূন্যমনে চায়ের বাটিতে আরামে চুমুক দিতে দিতে নিঃশেষ করিয়াও খালি বাটিটার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল।

চমক ভাঙিল বলেন্দুর নামোচ্চারণে। কে একজন বলিতে বলিতে আসিল, বলেন্দু একাই তিনটে দিয়েছে।

তিনটে?—আর একজন।

এখনও মিনিট পনরো আছে তো। শুধতে পারে।—তৃতীয়।

দূর। শুধবে কি? কটা খায় আরও, দেখ না।

কিচ্ছু না, বাজে টীম।

না হ'লে হাফ টাইমে তিনটে গোল খায়?

তিনটে কোথায়? চারটে খেয়েছে তো। বলেন্দু তিনটে আর বিষ্টু একটা।

পচা টীম।

টীম খুব পচা নয়। কিন্তু হাফ-ব্যাক নেই যে।

হাফ-ব্যাক নেই কেন?

আছে। কিন্তু না থাকাই ভাল ছিল।

বীরেশ্বর হঠাৎ উঠিয়া চায়ের পয়সা দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল রাস্তায়। ছুটিতে ছুটিতে তৎক্ষণাৎ করণীয় নানা কাজের তালিকায় মনটাকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিতে লাগিল।—সাগরমল! এখুনি একবার যাওয়া দরকার। ভাববে কি? নিশিকান্ত! নিশিকান্তের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। আজকেই। শেয়ার সে দেবে কি না! আর তারিখ নয়। আজকেই চাই। হিরণ মিত্রের সঙ্গেও একবার দেখা করা খুব উচিত ছিল। টাকা পেতে দেরি হ'লে সাগরমল ফ্যাসাদ করবে।

সশব্দে চিন্তা করার অপূর্ব কার্যকারিতায় বীরেশ্বর খুশি হইল। সুর করিয়া শাস্ত্রপাঠের উপকারিতা আছে বোধ হয়, হঠাৎ মনে হইল। সামান্য বিড়বিড় শব্দেও মন অনেকখানি কাবু থাকে।

কিন্তু নীরব হইলে চলিবে না। ফাঁক পাইলেই বলেন্দু, ফুটবল আর—

সত্রাসে আবার বিড়বিড় করিতে আরম্ভ করিল বীরেশ্বর। কোন-ক্রমে রাস্তাটুকু শেষ করিয়া তালিকামত কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

সাগরমল—

নিশিকান্ত—

নিশিকান্তের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া হইয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়া বীরেশ্বর চলিয়া আসিল।

হিরণ মিত্তির—

রাত্রি দশটায় বীরেশ্বর বাড়ি ফিরিল।

খাওয়ার পরে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের নায়কের মত দেখাইতেছিল তাহাকে। ঘরের মধ্যে যেন একটা বিষণ্ণ শোকের ছায়া পড়িয়া গিয়াছে।

যন্ত্রচালিতের মত বীরেশ্বর বইখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

কখন বই বন্ধ করিয়া উঠিয়াছে বীরেশ্বরের খেয়াল নাই। অস্থির পায়চারির সঙ্গে রুদ্ধ বাষ্প যেন ক্ষণে ক্ষণে এক-একটা চাপা শব্দের সাহায্যে বাহির হইতেছে।—অ্যাব্‌সার্ড!—কিছুকাল বিরাম।—নো।—আবার বিরাম।—টাকা চাই নে আমার।—বিরাম।—অসম্ভব। ম'রে যাব।—এবার কিছু বেশি সময় বিরাম। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল মুখের কোণে। আশ্চর্য:—হুঁ। ধর্মের ষাঁড়!—তাই চায় ওরা!—আরও কঠিন হইয়া উঠিল।—আর আমি? ভণ্ড—ভীরু—মূর্খ!—বাস্।—আর নয়।—শেষ!—ক্লোজ্‌ড্!

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার কি? আমি—আমি বৈজ্ঞানিক—আমি দার্শনিক—দর্শক। আমি গ্রেট!—গ্রেট! তুচ্ছ একটা—অতি তুচ্ছ।

অবশেষে পরম শান্তিতে বীরেশ্বর নিদ্রা গেল।

৬

সকালবেলায় গৌড়ানন্দ তখন প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেছিলেন। বীরেশ্বরকে সমাদরে বসিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলেন।

কি ভাই, এত সকালে?

হ্যাঁ।—বলিয়া বীরেশ্বর একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। গৌড়ানন্দের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি যেন অপ্রত্যাশিতভাবে শেষের প্রস্তাব গোড়াতেই টানিয়া বাহির করিল।—আমাকে আপনার আশ্রমে একটু স্থান দেবেন?

গৌড়ানন্দ প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কেন? কি হয়েছে খুলে বল তো সব।

কিছু হয় নি। এমনই।

এমনই ?

না, এমনই নয়। মানে—সংসারে আমি আর খাপ খাওয়াতে পারছি নে।

কোন্ সংসারে ? সর্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ?

বীরেশ্বর এবার হাসিল।—না না। দাদার সঙ্গে কোন কথাই হয় নি। আমি চেষ্টা করলাম অনেক। পারলাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের দরুন একটু বিলম্ব হইল। বলিল, একমাত্র আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন।

গৌড়ানন্দ খুশি হইলেন। তাড়াতাড়ি জবাব দিতে পারিলেন এবার।—এ কথা ভুল বীরেশ্বর। নিজেকে নিজে ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারে না। ঈশ্বরও না। তিনি পারেন, কিন্তু করেন না।

বীরেশ্বর হঠাৎ যেন ভয় পাইয়া গেল। ঈশ্বর ? অনেকখানি সংকুচিত হইয়া গেল মনটা। ঈশ্বর সংক্রান্ত যাবতীয় বাধ্যতামূলক দায়িত্বের ছবি ভাসিয়া উঠিল।

গৌড়ানন্দ বলিতেছিলেন, কিন্তু আলো জ্বেলে দেন পথে। নইলে সম্পূর্ণ একা তিরিশ বছর বয়সে এই আশ্রম করতে পারতাম না। মাত্র পনরো বছরের আশ্রম আমার—আজ যা দেখছ তোমরা। লোকে আজ ভালবেসে স্বামীজী বলে আমায়।—বলিয়া সগর্ব বিনয়ে বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া প্রাপ্য শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় ফুটিয়া উঠিবার সময় দিলেন।

বীরেশ্বর বাধ্য হইয়া আশানুরূপ ভঙ্গীতে চাহিয়া রহিল।

গৌড়ানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, আলো দেখান তিনি, যে দেখতে চায় তাকে। কিন্তু চলতে হবে নিজেকেই। জানি না, কিসের থেকে রক্ষা পেতে চাও তুমি।

কাদা থেকে।—তাড়াতাড়ি বলিল বীরেশ্বর, ভেবেছিলাম, পড়াশুনা নিয়ে থাকব আমি। টাকার জন্যে শরীরটা একটুখানি কাদায় নামালে ক্ষতি হবে না কিছু। কিন্তু হ'ল না। মনটাও তলিয়ে যাচ্ছে।

গৌড়ানন্দ একটু হাসিলেন। বলিলেন, কাদাই বটে। কিন্তু টাকার এত কি দরকার তোমার?

একটা ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিল বীরেশ্বর।—টাকার কত কাজ! বই কিনতে টাকা লাগে। নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বেড়াতে টাকা লাগে। তা ছাড়া দাদাকে সাহায্য না করলেও চলে না।

এসব সমস্যা তো তোমার র'য়েই গেল?

না। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো, লেখাপড়া—এসব যার জন্যে প্রয়োজন তাকেই যদি আগে হারিয়ে ফেলি, টাকা আমার কোনও কাজেই লাগবে না। আশ্রম-জীবনে যতটুকু সম্ভব, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারব। থাকতে হবে। হ্যাঁ, দাদার সমস্যাটা থেকেই গেল। কি করব? আমি নিরুপায়।

কিন্তু সর্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা উচিত।

করব। আপনি আশ্বাস দিলে করব। তিনি বুঝতে পারবেন আমার মনের অবস্থা।

গৌড়ানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল কথাটাই যে ভুল হচ্ছে বীরেশ্বর। জীবন থেকে পালাবার একটা আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করছ আশ্রমটাকে।

তাই তো সকলেই করে।—বীরেশ্বর বলিয়া ফেলিল।

না। তা করে না। গৌড়ানন্দ লাল হইয়া উঠিলেন।—যারা করে—

ক্রুদ্ধ গৌড়ানন্দ শেষ করিতে পারিলেন না। বীরেশ্বর অনুশোচনায় কথাটা ফিরাইয়া লইবার সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।

গৌড়ানন্দ পাল্টা আক্রমণের কঠিন শব্দ খুঁজিতেছিলেন। নিষ্ফল প্রয়াসে বলিলেন, এই যদি তুমি বুঝে থাক আশ্রমকে, ভয়ানক ভুল করেছ বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর মনে মনে একটু না হাসিয়া পারিল না। দুঃখের সুরে কহিল, আমাকে ভুল বুঝবেন না স্বামীজী। 'সকলেই' মানে—অনেকেই আর কি। আপনার মত আশ্রমকে জীবন ক'রে গ্রহণ করে কজন? সাধারণ যাঁরা, সংসার থেকে পালিয়েই আসেন বেশির ভাগ।

কিন্তু আমার বলবার কথা এই যে, তাতেই বা দোষ কি? যে ক'রেই হোক, আশ্রমের ভেতর দিয়ে মানুষের সেবায়, সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ তো তাঁদের মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না!

গৌড়ানন্দ মহাদেবের মত তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, সত্য, সকলের উপরে ধর্মের সেবা। এর কোনটাই মিথ্যে হয়ে যায় না।

আবার সংকুচিত হইল বীরেশ্বর। গৌড়ানন্দ লক্ষ্য করিলেন। পুনর্বার কহিলেন, ধর্মের সেবা। একটু থামিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, এসব ভাল লাগবে তোমার?

জবাব দিতে কিছু বিলম্ব হইল বীরেশ্বরের। গৌড়ানন্দ কহিলেন, সব কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখ। তাড়াতাড়ির কিছু নেই। শুধু বিতৃষ্ণা সম্বল ক'রে এ পথে চলা যায় না বীরেশ্বর, তুমি যাই বল। অল্পদিনেই হাঁপিয়ে উঠবে তুমি। জীবনের সঙ্গে ফাঁকি বেশি দিন চলতে পারে না।

বীরেশ্বর চিন্তাই করিতেছিল। শেষের কথাটায় শশব্যস্তে বলিল, না, ফাঁকি আমি দিতে চাই নে। কিন্তু জীবন আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে। সেইটে বন্ধ করতে চাই। আমি পারব স্বামীজী। আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব আমি খুশি মনেই পালন করতে প্রস্তুত। তার বদলে আমি মুক্তি পাচ্ছি।

গৌড়ানন্দ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, কোন্ মুক্তির কথা বলছ তুমি?

মনের, দেহের।

বীরেশ্বরের উচ্ছ্বাসের চাপে গৌড়ানন্দ কিছুক্ষণ থামিয়া রহিলেন।

বীরেশ্বর বলিয়া চলিল, আশ্রমের কাজ করব। বাকি সময় লিখব, পড়ব। সাগরমল নাই, হিরণ মিত্তির নাই, সুবোধ লাহিড়ী নাই, নিশিকান্ত নাই, আর—আর—কেউ নাই। কে—উ নাই।

সর্বেশ্বরবাবু তো রইলেন?—গৌড়ানন্দ অগত্যা প্রশ্ন করিলেন।

হ্যাঁ।—আচমকা মাটিতে নামিয়া আসিল বীরেশ্বর।—দাদা রইলেন। আমি বুঝিয়ে বলব দাদাকে। তিনি কোনদিন আমার বাধা হবেন না।

আশ্রম-কর্মী নিত্যানন্দ আসিয়া দাঁড়াইতেই গৌড়ানন্দ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল?

দিলেন না।—নিত্যানন্দ শুষ্ক কণ্ঠে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কি বললেন? আজ দেবার কথা বলেছিলেন যে?

হাতে নেই। সামনের সপ্তাহে যেতে বললেন।

আবার সামনের সপ্তাহে?

হ্যাঁ।

গৌড়ানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন।

আর একটা প্রস্তাব দিলেন।—নিত্যানন্দ নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিলেন।

কি?

বললেন, তিন হাজার টাকার একটা ডোনেশন দিতে পারেন।

বেশ তো।

কিন্তু একটা পাকা গেট ক'রে তাঁর স্ত্রীর নাম খোদাই ক'রে দিতে হবে।

কোথায়?

গেটের মাথায়। ললিতাসুন্দরী গেট।

ললিতাসুন্দরী গেট!—গৌড়ানন্দ যেন ভেঙাইয়া উঠিলেন। এক গেটে কজনের নাম দেব?

আমার মনে হয়—। নিত্যানন্দ বৈষয়িক বুদ্ধির পরামর্শ দিলেন, যার অফার বেশি, তার স্ত্রীর নামই বিবেচনা-যোগ্য।

বীরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।

সে তো বুঝলাম।—গৌড়ানন্দ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। একটা ডোনেশনে তো চলবে না আমার।—হঠাৎ এতক্ষণে বীরেশ্বরকে খেয়াল করিলেন।—আচ্ছা, দেখা যাক। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বীরেশ্বরকে বলিলেন, কোন ভাল কাজের স্থান এ দেশ নয়, বুঝলে বীরেশ?

বীরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

আচ্ছা, তোমার কাজে যাও। নিত্যানন্দকে বিদায় দিলেন গৌড়ানন্দ। নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন, আশ্রমেও টাকা লাগে বীরেশ্বর।

টাকা তো লাগবেই।—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বীরেশ্বর জবাব দিল।

গৌড়ানন্দের চক্ষু দুইটি সহসা যেন তেজোময় হইয়া উঠিল। বলিলেন, এটুকুও সাধারণ লোক করবে না? কেন করবে না? ভারতের জ্ঞানের আলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার ব্রত নিয়েছি আমি। অবশ্য আমার যতটুকু সাধ্য—। আমার আশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব দেশকে নিতে হবে। নইলে ভারতের ঐতিহ্য, তার জ্ঞান, যে কারণে ম'রে যেতে বসেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হবে আবার।

বীরেশ্বরের বিদ্রোহী অংশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

গৌড়ানন্দ বলিলেন, আমি সমগ্রভাবে বলেছি কিন্তু। শুধু আমার কথা নয়। আমিও একটা ক্ষুদ্র অংশ, এইমাত্র। যত ক্ষুদ্রই হোক।

আমি বুঝেছি।

গৌড়ানন্দ বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া থামিয়া রহিলেন।

বীরেশ্বর সম্পূর্ণ চাপিয়া গিয়া বলিল, কিন্তু লোকে মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে তো!

তা যাচ্ছে।—গৌড়ানন্দ একটু হাসিয়া পরিবর্তিত কণ্ঠে বলিলেন, একটু আধটু মতলব-গোছের যাই করুক, হ্যাঁ, চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার কি তবে—? বীরেশ্বর মনে মনে তর্ক করিতেছিল, আমাকে নামতে হচ্ছে না তো? কিন্তু—। মনে মনে হাসি পাইল আবার। ললিতাসুন্দরী গেট!

গৌড়ানন্দ মোড় ফিরাইয়া হঠাৎ বলিলেন, তুমি লিখছ শুনলাম?

আত্মপ্রসঙ্গে বীরেশ্বর অপ্রতিভ হইয়া পড়ে। মৃদু জড়িত কণ্ঠে বলিল, ঠিক লিখছি বললে ভুল হবে। লিখতে চাই বরং। সময় পাই নে। যেটুকু পাই—হ্যাঁ, লিখি মাঝে মাঝে।

কি লিখছ? গল্প—উপন্যাস?

বীরেশ্বর অবজ্ঞার ভঙ্গীতে বলিল, নাঃ, গল্প উপন্যাস আমি লিখি নে। এই ভঙ্গীতে বীরেশ্বর আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। একটু হাসিয়া বলিল, ওই যে বললেন আপনি, জ্ঞানের আলো—বিষয়বস্তু আমারও তাই।

ওঃ, বেশ বেশ। তোমাদের বয়সে—, বেশ, শুনে বড় সুখী হলাম।

তবে, আমি কিন্তু বাংলায় লিখছি।

বেশ তো।

যদি আলো জ্বলে।—হাসিয়া উঠিল বীরেশ্বর।—পাবে সবাই। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্বামীজী, প্রচণ্ড শ্মশানের আলোতে চোখ ধেঁধে আছে। আর কোন আলোই আর পৌঁছুবে না। প্রাচীন ঐতিহ্য, জ্ঞান শুধু আমাদেরই একচেটিয়া নয়। আরও অনেকের ছিল। মিউজিয়মের কঙ্কাল সংগ্রহ হয়ে আছে সব। আমার মতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেওয়াই মঙ্গল। একেবারে নতুন ক'রে আরম্ভ করা সম্ভব হবে। নিষ্ফল আলো নিয়ে অযথা ঠোকাঠুকি করা বিড়ম্বনাই হবে।

কি বলছ, বীরেশ?

ঠিকই বলছি, স্বামীজী। এ বলবে আমারটা ভাল, ও বলবে আমার ভাল। হাজার কয়েক বছর পেছন থেকে আবার শুরু করা। ফল তো একবার দেখাই গেছে। আমি তাই শ্মশানের কাজেই সাহায্য করব স্থির করেছি। তার থেকেই নতুন জ্ঞানের আলো দেখা দিতে পারে।

সব পুড়িয়ে দেওয়াই তোমার মত?

পুড়ে তো যাবেই সব। তাড়াতাড়ি করতে চাই।

তাই বল। ধর্ম তুমি বিশ্বাস কর না?—ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন গৌড়ানন্দ।

করি হয়তো। কিন্তু এতটুকু তার মূল্য আছে ব'লে বিশ্বাস করি নে।—বীরেশ্বর একটু ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে আবার বলিল, মানব-দেহটা এখনও তৈরি হয় নি স্বামীজী। এর পরের স্তরে কাঠামোটা সম্পূর্ণ বদলে না উঠলে কোন আশাই নেই।

তার মানে? তুমি বলতে চাও, দেহটা এখনও ধর্মের যোগ্য হয়ে ওঠে নি?

না।

গৌড়ানন্দ ক্ষণকাল হতবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুরে বলিলেন, ও, তোমার নিজের কথা বলছ?

বীরেশ্বর অনুতপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নে সঙ্গে সঙ্গে আবার তাতিয়া উঠিল। বলিল, সকলের কথাই বলছি। সারা-

জীবন তপস্যা ক'রে বিশ্বামিত্রের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখুন না। মেনকাকে খুব বেশিক্ষণ নাচতে হয় নি। দুর্বাসার লাইনেও অনেক আছে। অনেক আছে। আপনি হয়তো বলবেন—

আমি কিছুই বলব না। তোমার পছন্দমত উপাখ্যানের বাইরে যদি আর কিছুই না পেয়ে থাক—

সেই কথাই বলছিলাম।—বীরেশ্বর শেষ করিতে দিল না।—সারা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে কজনের কথা আপনি বলতে পারেন, ঈশ্বরদ্রষ্টা, জ্ঞানী, অবতার, তাঁরা একই জ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন দেখলেন, কেন? ঐ, শরীর।

গৌড়ানন্দ এবার উত্তেজিত না হইয়া উন্নত হাস্যের সঙ্গে বলিলেন, ভিন্ন নয়। তবু তোমার কথাই ধ'রে নিলাম। কিন্তু শরীর তো একই ধাতুতে গঠিত? তা হ'লে ভিন্ন দেখা সম্ভব হবে কেন?

চেহারা ভিন্ন যে! চেহারার মতই মনেরও স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ওইটুকুই। কাঠামোর সীমার মধ্যে।

গৌড়ানন্দ শান্তকণ্ঠে বলিলেন, তোমার মতেরও স্বাধীনতা আছে, আমি স্বীকার করি।

কিন্তু তবু তাঁদের আমি মহামানব মনে করি।—হঠাৎ গভীর শ্রদ্ধার সুরে বীরেশ্বর নিজের কথার জের টানিল।—কাঠামোটাকে অনেকখানি ভেঙে অনেকখানি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তাঁরা। তাঁদের আমি কম শ্রদ্ধা করি নে স্বামীজী।

বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তোমার কথা।

কেন? কোথায়?—বীরেশ্বর একটু যেন দমিয়া গেল।

গৌড়ানন্দ হাসিলেন।—শ্রদ্ধাও করছ, বিদ্রূপও করছ!

বীরেশ্বর আহতের মত বলিয়া উঠিল, না না না। বিদ্রূপ করি নি আমি। হয়তো ঠিকমত বলতে পারি নি। তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন, তাঁরা নমস্য। কিন্তু—তাঁরাই শুধু। বাকি মানুষকে তাঁরা এতটুকু এদিক ওদিক নিতে পারেন নি।

শোন বীরেশ্বর।—গৌড়ানন্দ কিছুক্ষণ থমকিয়া থাকিয়া পা-ঝাড়া দিয়া শক্ত হইয়া বসিলেন এবার।—অদ্ভুত তোমার মত। মত নয়,—কি বলব? উক্তি। দায়িত্বহীন অসংলগ্ন অসত্য উক্তি।

অসত্য ?

হ্যাঁ, কিন্তু তর্ক করতে প্রস্তুত নই আমি। মানুষকে তাঁরা কতখানি টেনে তুলেছেন, সেটা ঐতিহাসিক সত্য।

বীরেশ্বর তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াই থামিয়া গেল।

শ্মশানের আলোর কথা যা বললে তুমি, তাঁদের ভুলে যাবার ফল। সে কথা থাক্‌। এ প্রসঙ্গে তর্ক করা আমার ইচ্ছা নয় বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর অত্যন্ত লজ্জিত হইল।—ঠিক তর্ক হিসেবে আমি বলি নি। আচ্ছা, নমস্কার।—উঠিয়া দাঁড়াইল বীরেশ্বর। নত মস্তকে ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল। গৌড়ানন্দ অবাক হইয়া পিছন হইতে নীরবে তাকাইয়া রহিলেন।

বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আসল কথাটা বীরেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল।—আশ্রমের কথাটা ? আশ্চর্য! এখন ফিরে যাওয়া সম্ভব ? দূর, হাসবেন স্বামীজী। আর কোন লাভ হবে না।

বীরেশ্বরও হাসিল।—কি সব বললাম! এতটা কোনদিন ভাবিও নি বোধ করি। গড়গড় ক'রে বেরিয়ে গেল, কি করব ? কিন্তু মিথ্যে বলি নি।

আর একদিন আসা যাবে। চলিতে আরম্ভ করিল বীরেশ্বর। স্বামীজী ভুল বুঝেছেন।

ললিতাসুন্দরী গেট! ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল বীরেশ্বরের।

ক্রমশ

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

আগে-পিছে

সাধারণ মূর্খ তারা—আগে চুরি করে,
তারপরে জেল খেটে দুঃখ পেয়ে মরে।
স্বদেশ-প্রেমিক দল আগে জেলে যায়,
ফিরে এসে লেগে পড়ে চুরি-ব্যবসায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

গঙ্গা-স্তোত্র

নমি নারায়ণী পতিতপাবনী
তুমি পুরাতনী সারাৎ সারা,
বিষ্ণু-প্রসাদে হরজটা বাহি
মরতে ঢালিলে অমিয়ধারা।
তোমার মহিমা আমি কি গাহিব,
আমি মা যে দীন মূর্খ কবি,
তোমার স্নিগ্ধ সলিলে নাহিয়া
খেয়ানে রচি মা তোমারি ছবি।
কবে ভগীরথ তপস্যা-বলে
এনেছে তোমায় ধরায় টানি,
মহামিলনের পুণ্য ভূমিতে—
শিশুকাল হতে আমরা জানি।
কত যোগী ঋষি তব তীরে আসি
হোমানল জ্বালি আহুতি ঢালে,—
চিতার ভস্ম পবিত্র মানি
কুড়াইয়া মাথে অঙ্গে ভালে।
সকল তীর্থ সার ও তীর তো
সুরাসুর নর মাথার মণি
বেদের মন্ত্র মুখরিত করি
কলকল নাদে উঠিছে ধ্বনি।
কত পাপী তাপী মুক্তি লভিছে
এক ফোঁটা বারি পরশ করি,
ভক্তেরা লয় বহি শিরে শিরে
গৃহে গৃহে রাখে কলস ভরি।

বহিছ মা তুমি যুগ যুগ হেথা
ছড়াইয়া পথে করুণারাশি,
হিমালয় হতে গঙ্গা-সাগর
শ্যাম-সম্পদে উঠিছে হাসি।
শুষ্ক মহীরে করিছ সজল
ফুলে ফলে কত দিতেছ ভরি,
শ্রান্ত পথিকে বুকে টানি ল'য়ে
সকল ক্লান্তি নিতেছ হরি।
কত না মায়ের নয়নের নিধি
তব তটে বুকে ঘুমায় সুখে
কত মানুষের অশ্রু ঝরিয়া
আছাড়িয়া পড়ে তোমার বুকে।
রাজায় প্রজায় নাহি ভেদাভেদ
শূদ্র বা দ্বিজ তোমার কাছে,
অন্তিমে সবে তোমারি অঙ্কে
'হরি হরি' ব'লে শরণ যাচে।
বন্দি মা আজি চরণপদ্মে
অয়ি কৃপাময়ি ত্রিকালজয়ি,
জয় জাহ্নবী ভাগীরথি সতি
দেবি সনাতনি অমৃতময়ি।
হিমগিরিবালা মুক্তাধবলা
ভগবতি ভবি সুরেশ্বরি
ইহজীবনের শেষ সম্বল
প্রতিদিন যেন তোমায় স্মরি।

শ্রীশান্তি পাল

—

নিরুপায়

মুখপোড়া বাঁদরের সারা মুখ কালো,
সে মুখে লাগাবে কালি কোথা আর ভালো।
সর্বাঙ্গ ভরিয়া গেছে দগদগে ঘায়,
প্রলেপ কোথায় দেবে বল তো আমায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

ওভার ডোজ

বৈঠক ছোট হ'লেও তর্কের বিষয়বস্তু নেহাত ছোট ছিল না। অনাথশরণের বাইরের ঘরে আড্ডা বসেছিল। রবিবার, কাজেই অবসর ছিল অখণ্ড আর চায়ের যোগানও ছিল নিরবিচ্ছিন্ন। অত্যন্ত জটিল সমস্যা—নতুন ক'রে স্বাধীনতার ভিত পত্তন করতে গিয়ে নাদিরশাহী সংস্করণের তাণ্ডব চলেছে সংখ্যালঘুদের ওপর।

অনাথশরণ একেবারে অনাথ হয়ে পড়ছেন। মানুষকে তিনি ভালবাসেন, বিশ্বাসও করেছেন বরাবর—সেই মানুষ আজ কোথায় নেমে যেতে বসেছে? অন্যায়, অত্যাচার, পাপ অনেক কিছুই দেখেছেন, হয়তো স্বীকারও করেছেন, তবুও অভিজ্ঞতার গ্রহণযন্ত্রে এ সমস্তকে ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য কিছুই মনে করেন নি কোনদিন।

বুঝলে অনাথদা, দলে দলে লোক—মেয়ে পুরুষ, ছেলে মেয়ে দিনের পর দিন কত কষ্ট ক'রে যেমনই বানপুর, নয় বনগাঁ এসে পৌঁছুচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাত-পা একেবারে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। কতখানি অত্যাচারের ভয়ে মানুষ এতটা মরিয়া হয়ে উঠতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।—প্রত্যক্ষদৃষ্ট বর্ণনায় অনাথশরণের কল্পনা কিন্তু অসাড় হয়ে গেল। ছেলেবেলায় ভুগোলের ভেতর দিয়েই বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় গ'ড়ে উঠেছিল—অখণ্ড বাংলা, বাঁকুড়া-বীরভুমের শালের জঙ্গল থেকে আরম্ভ ক'রে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, চাটগাঁ, চন্দ্রনাথের সমুদ্র, পাহাড় পর্যন্ত। সেই দেশ আজ কি দুঃখে ফতুর হয়ে যাচ্ছে বেনাপোল আর দর্শনার খিড়কি-দরজায় এসে? অনাথশরণের মাথা ঝিমঝিম করে। আর ভাবতে পারেন না তিনি। না পারলেও তাঁকে আজ ভাবতে হবে। বহুমুখী সমস্যা—ভুগোল, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, অধর্ম, সব কিছু জড়িয়ে তার গোষ্ঠী।

. সান্তাহারে আসাম মেলের চারখানা বগি একেবারে সাফ, একটা প্রাণীও বাঁচে নি।—পরিতোষ মন্তব্য করলে।

হরিবল্!—অনাথশরণের রক্ত জ'মে এল, ভয়ে না হ'লেও বীভৎসতায়।

নারীধর্ষণের রেকর্ড ওয়েস্ট পাঞ্জাবকেও ছাড়িয়ে গেছে।

না, অনাথশরণ আর বাঁচতে চান না। এভাবে বেঁচে থেকে কোন লাভও নেই। জায়াস্থানে বৃহস্পতি উচ্চে থাকায় স্ত্রীভাগ্যে তিনি ঈর্ষাস্থানীয় ছিলেন। এই সৌভাগ্যকে কেন্দ্র ক'রে সমস্ত মনটি তাঁর ঘুরে বেড়াত। সেই মন আজ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে চারদিকের এই সব অত্যাচারের কাহিনী শুনে।

এসব থার্ড পার্টির কারসাজি, আড়াল থেকে কেমন কলকাঠি নাড়ছে।—সূক্ষ্মদর্শী বন্ধুটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অনাথশরণ।

থার্ড পার্টির দোষ দিলে হবে কেন? ক্যাপিট্যালিস্টরাই তো এসব করাচ্ছে। এর মধ্যেই সোনা কিনতে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক ব'সে গেছে।

সব তো বুঝলাম, এখন উপায় কি বল দেখি?—অনাথশরণ আর সহ্য করতে পারছেন না।

উপায়? এক্স্চেঞ্জ অব পপুলেশন। এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই।—একাক্ষরী মন্ত্রের মত ছোট্ট একটু ইঙ্গিত—এই কটি কথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীর বাঁচবার সন্ধান।

কিন্তু এ দিকে যে সেকুলার স্টেট—সে গুড়েও যে বালি।—অনাথশরণ যেন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—নিবিড়, নিশ্ছিদ্র, কোন দিকে কোন পথ নেই, পথ পাবার আশাও নেই।

বরাবর বলেছি, এখনও বলছি, ওয়ার হচ্ছে একমাত্র পথ।—টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে দ্বিধাশূন্য অভিমত জানিয়ে দিলেন একজন।

ওয়ার? সর্বনাশ! ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল পরেই বর্ডার। দু-চারটে বোমা ফেলে ফিরে গিয়ে চা-বিস্কুট খেয়ে এসে আবার ফেলবে। অনাথশরণ শিউরে উঠলেন।

আরও দিনকতক পরে। সর্বহারা আশ্রয়প্রার্থীর দল দেশ ভ'রে ফেলছে। শিয়ালদহে, রানাঘাটে পা বাড়াবার জায়গা নেই। সমস্ত

রেস্ট্ক্যাম্প ভর্তি। অনাথশরণ ছুটির আখড়া উঠিয়ে দিয়েছেন, বন্ধুবান্ধবদের আর ভাল লাগে না। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন অবসরে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে রোমন্থন করেন সবাই। ট্রামে, বাসে, আপিসে, রাস্তায়, ঘাটে, খবরের কাগজের সকাল সন্ধ্যা সংস্করণে একই কাহিনী নানাভাবে গাঁজিয়ে উঠছে।

বিকেলবেলা আপিস থেকে ফিরে একেবারে শয্যা নিলেন অনাথশরণ। সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে যেন স্টীমরোলার চ'লে গেছে। হতভাগ্য দু-চারজন সংখ্যালঘুর ওপর পীড়নের নমুনা আজ তাঁর চোখে পড়েছে। অত্যাচারের এই প্রত্যক্ষ রূপটা তাঁর কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল এতদিন। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের যুগের হত্যালীলা নিষ্ঠুর হ'লেও কতকটা বীরত্বধর্মী ছিল, বেশ একটু উদ্ধত রক্তের আস্ফালন ছিল তাতে। কিন্তু এ কি?

পত্নী প্রীতিলতা ডাক্তার আনালেন। নার্ভাস ব্রেকডাউন। সংক্ষিপ্ত আহার আর কড়া গোছের একটা ব্রোমাইড মিক্শ্চারের ব্যবস্থা করলেন তিনি।

অনাথশরণের বিধ্বস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর দেখা-অদেখা অসংখ্য রকমের আবেদন এসে পৌঁছচ্ছে। বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলে প্রীতিলতাকে ডাকলেন তিনি।

সামনের বস্তি থেকে মেয়েমানুষের গলায় কে কাঁদছে না?

এক মুহূর্ত উৎকর্ণ থেকে স্বামীর অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করলেন প্রীতিলতা।

কোথায়? ঘুমুবার চেষ্টা কর, ওসব কিছু নয়।

লতা!—প্রীতিলতাকে একেবারে কাছে টেনে নিলেন অনাথশরণ।

আচ্ছা, আজ যদি অবস্থার ফেরে আমরা এখানে সংখ্যালঘু হতাম—? মূল বক্তব্যটা উচ্চারণ করতে বাধ-বাধ ঠেকছে অনাথশরণের।

আবার ঐ সব ভাবছ? ঘুমোও, ঘুমোও বলছি।

প্রীতিলতা তা হ'লে কিছুই ভাবে না! অগণিত নারীর লাঞ্ছনার ছোঁয়াচ কি অলক্ষ্যে তার গায়েও লাগছে না?

ধর, যদি তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যেত ?

ধরলেই হ'ল আর কি !

অন্ধকারের মধ্যেই মনে হ'ল অনাথশরণের, প্রীতিলতার মুখখানায় কি এক রকমের হাসি দেখা দিয়েছে।

খুব বেঁচে গেছ—এ কথা ঠিক, তা ব'লে এ নিয়ে ঠাট্টা করা কি ভাল ?

তুমি ঘুমুবে কি না বল দেখি ?

ঘুম আসছে না। আবার আলো জ্ব'লে উঠল। অনাথশরণকে ওষুধ খাইয়ে আলো নিবিয়ে দিলেন প্রীতিলতা।

স্বামীকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন প্রীতিলতা। সামনের বস্তিটা থেকে চীৎকারের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। শেষ তাঁর পাড়াতেই এই সব আরম্ভ হ'ল! মানুষকে আর তিনি বিশ্বাস করেন না,—না, কাউকে নয়। আজ যাদের ওপর অত্যাচার চলেছে, সুবিধা পেলে তারাই কাল তাঁর টুঁটি কাটতে একটুও দ্বিধা করবে না। অথচ সেই মানুষের সঙ্গেই একতালে স্পন্দিত হচ্ছে তাঁর জীবন, নিয়মিত হচ্ছে দয়া ধর্ম, সৎ অসৎ সমস্ত প্রবৃত্তি, হয়তো সংক্রামিত হচ্ছে রক্তলালসার বিষাক্ত স্পৃহা—

ঈশ্বর, আমাকে মৃত্যু দাও। ফিরিয়ে নাও তোমার জীবন—বিচ্ছিন্ন ক'রে দাও এই পাপের সংস্রব থেকে।

অনাথশরণের প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল। নরহত্যা, নারীধর্ষণ, বাস্তুহারা-সমস্যা স্বপ্নের মত মিলিয়ে এল। প্রীতিলতার কাল্পনিক নিগ্রহ-চিন্তায় মন তাঁর আর সন্ত্রস্ত হয় না। কিছুদিন এই রকমেই কেটে গেল। তারপর কিছু চাঞ্চল্য, কিছু গতি, কি এক রকমের আলোড়ন লক্ষ্য করলেন তিনি চারপাশে। এ গতি কি ছিল, না, নতুন ক'রে জন্মাচ্ছে ? ঘুম থেকে ওঠার মত চোখ দুটিকে শানিয়ে নিলেন অনাথশরণ। আলো-অন্ধকারের মধ্যে আবছা কতকগুলো কি—ঈথার, না, ছবি, না, ছায়া, কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। ছায়াগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল—অনেকটা রক্তমাংসের স্মৃতিচিহ্নের মত।

কে তোমরা ?—জিজ্ঞাসা করলেন অনাথশরণ।

বাস্তুহারা।

সর্বনাশ! কোথায় এসেছেন তিনি? বিস্মৃত বেদনা, তবুও বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠল।

কোন্ গাঁয়ে আপনার বাড়ি? কত টাকা ঘুষ দিয়ে আসতে পেরেছেন?

ঘুষ দিয়ে আমাকে আসতে হয় নি।—চাপা এক রকমের আলোচনায় চারদিক গজগজ ক'রে উঠল।

আপনাকে এ জায়গাটা ছাড়তে হবে।

অর্থাৎ?

দশ জনের জায়গা দখল ক'রে রেখেছেন আপনি।

তা না হয় ছাড়লাম। কিন্তু কোথায় যাব, ব'লে দিন।

তা আমরা জানি না। বাংলা-পার্টিশনের পক্ষে যখন ভোট দিয়েছিলেন, আমাদের কথা তখন ভেবেছিলেন কি?

অনাথশরণ কক্ষচ্যুত হলেন। অভিযোগের ভাষায় অনেক কিছু মনে পড়ল তাঁর। মনে পড়ল, কোথায় কোন্ মীটিঙে শোনা 'মাভৈঃ'-মন্ত্রের আশ্বাসবাণী। সমস্তটা না হ'লেও, কিছু কিছু মনে পড়ে এখনও। মনে পড়ে,—

নিজেরা বাঁচবার জন্যে এস্‌কেপ করিডর চাই না আমরা। আমরা চাই সংগ্রাম, আর সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্য হবে আমাদের সমস্ত ভাই-বোনদের রক্ষা করা; আমাদের ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা; আমাদের দেবমন্দিরগুলির পবিত্রতা বজায় রাখা; ইত্যাদি। মনে পড়ল, দু হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিলেন বিভেদের প্রস্তাবে—অকম্পিত স্বাক্ষর দিয়েছিলেন পার্টিশন মেমোরাণ্ডামে। কোন্ মুখে আজ বিশ্বাস দাবি করবেন তাদের কাছে?

ঘুরতে ঘুরতে শেষে পরিশ্রান্ত হলেন অনাথশরণ। ভুল-ভ্রান্তির বোঝা একলা আর কত বইবেন তিনি? তাঁকে সমর্থন করতে কি কেউ নেই এখানে? প্রীতিলতা, বন্ধু-বান্ধবদের কিসের জন্যে ছেড়ে এলেন তিনি?

এখানে একলাটি ব'সে কি ভাবছ মুরুব্বী? কাস্তেখানাও সঙ্গে আনতে পার নি বুঝি?—আর একদল ছায়ামূর্তি তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

তোমরা কে?—অনাথশরণ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ দলটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।—একে একে সবাই যেন স'রে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছ তোমরা?—জিজ্ঞাসা করলেন অনাথশরণ।

বড্ড বেকায়দায় পেয়ে গিছলে কর্তা, কি আর বলব?

পলায়নপর দলটি ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনাথশরণ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। আকাশ-বাতাস, আলো-ছায়ার শীর্ষাশ্রয়ী হয়ে জ'মে রয়েছে পুঞ্জীভূত অবিশ্বাস আর বিদ্বেষের বিষ, মানুষের নিজ হাতে রচা কলঙ্কের মহাভারত। এই শাস্ত্রের প্রক্ষিপ্ত বেদব্যাস হয়তো তিনিও একজন। তবে কি আর কোন উপায় নেই!

ঈশ্বর, এ গ্লানি থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

তা হয় না অনাথশরণ, মুক্তি অর্জন করতে হয়, কেউ কাউকে দিতে পারে না।

তবে আবার আমাকে মৃত্যু দাও।

তাও হয় না।

তবে আমার জীবন ফিরিয়ে দাও।

বেশ একটু বেলায় ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ল অনাথশরণের, রাগের ঝোঁকে দু দাগ ব্রোমাইড একসঙ্গে খাইয়ে দিয়েছিলেন প্রীতিলতা।

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চাশে

পাড়ে যখন ভাঙন ধরে, নদী কি তার খবর করে,
পেছন ফিরে চায় না পাছে হারিয়ে বা যায় বালুর চরে।
আমার পাড়ে ধরল ভাঙন—টুটল আগল টুটল আগুন,
সামনে চেয়ে তাই তো ভাবি, মিশব কবে কোন্ সাগরে?

স্টেশনে

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।
অতীত বর্তমান ছিল,
ভবিষ্যৎ বর্তমান হবে।
এই তিনটে স্টেশনে যাওয়া-আসা করছে
আমার আশা-নিরাশার,
আমার অভিজ্ঞতার গাড়ি।
প্রথম প্রথম ভাবতাম,
আমি নিজেই একটা ছোট্টখাট্ট স্টেশন,
মধ্যবিত্ত মাঝরূপসী
ক্ষণিকের জন্যে থেমেছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মত।
আবার অনেক ধনীর ললনা—
'হাই হীল' গটগটিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ঘসঘস ক'রে গেছে চ'লে,
ভালবাসার সিগ্ন্যাল
অনেকবার 'আপ-ডাউন' হ'ল আমার স্টেশনে।
এখন দেখছি আমি নই—
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎই স্টেশন,
আমার আশা-নিরাশার,
আমার অভিজ্ঞতার গাড়ি ছুটে চলেছে এই তিনটে স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আজকে আবার আমার গাড়ি ছুটে চলেছে ভবিষ্যতের পানে
সেই গাড়িতে চলেছে একজনা,
যিনি আমার অপরিচিতা—
কিন্তু একদিন তিনি পরিচিতা হবেন আমার পরিচয়ে।
যার সুখ-দুঃখের অশ্রুর ধারা
মিশে যাবে আমার সাগরে।
বেশ লাগছে,
চিনি না অথচ হবে অতি চেনা,
বাতাসে-ভেসে-আসা অজানা ফুলের গন্ধ যেন,
কিছুদিন পরে

আমার ফুলদানিতেই শুকিয়ে ঝ'রে যাবে।
আশার গাড়ি ছুটে চলেছে
হুলে হুলে ছন্দে ছন্দে,
একটি কামরায় রয়েছে আমার সেই অপরিচিতা।
এই অপরিচিতার বর্তমান পরিচয়
ফুটে উঠেছেন দেওঘরে অনেক তরুণের মনের বাগানে।
সেখানকার আমার পরিচিত একজন
(যার মনের জমিতে এখন বাগান নয়, পাটের চাষ হচ্ছে)
তিনিই উঠে-প'ড়ে লেগেছেন আমাদের মিলনের সেতু-নির্মাণে।
আমি আর বন্ধু সঙ্কল্প করেছি, দেওঘরে যাব সেই পরিচিতের দ্বারে
আমার সেই অজানিতাকে জানব না-জানিয়ে।
জিনিসপত্র গুছিয়ে ব'সে আছি বন্ধুর অপেক্ষায়,
যাব স্টেশন—দেওঘরের উদ্দেশ্যে।
স্টেশন,
অগণিত জনতা।
এদের মাঝে অণুকাকে দেখে চমকে উঠলাম,
অণুকা—
আমার প্রাক্তন প্রেয়সী,
আমার অনেক কবিতার মিত',
আমার অনেক বিরহের উৎস,
সেই অণুকা—
পরনে কালো ব্লাউজ, কালো শাড়ি,
ব'সে আছে স্যুটকেসের ওপর
অপরাজিতা ফুলের মত।
অনেক যাত্রীর মন-ভোমরা গুনগুন ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে।
ঠিক আগের মতই আছে অণুকা
যৌবন যেন ওর তনুতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।
আমাকে দেখে এক রকম চেঁচিয়েই বললে, তুমি!
আমার সমস্ত অতীতটা কালবৈশাখী ঝড়ের মত
ঝাঁপিয়ে পড়ল বর্তমানের ওপর।

ভবিষ্যৎটা যেন দূরের সিগ্‌ন্যালের কাছাকাছি এসে লজ্জায়
গা-ঢাকা দিলে।

সেই কাঁপা গলায় কথা বলা
বুক দুরুদুরু
মান অভিমান
মনে এল গেল,
কালবৈশাখীর ঝড় থেমে গেল।
অণুকার দিকে চেয়ে দেখলাম,
তাঁর মাথার সিঁথি এখনও
মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটা পথের মত
তকতক ঝকঝক করছে।
প্রজাপতি-কর্পোরেশনের সিঁদুরের সুরকি পড়ে নি তার ওপর।
অনেক কথা হ'ল।
তারপর অণুকা নিজেই প্রশ্ন করলে, কেন ফিরে গেলে ?
উত্তর দিলাম, তুমি রূপ নিয়েছিলে বিজয়িনীর,
আমরা স্বভাবগত অজেয়,
সমধর্মীর মিলনের পরিণতি চির-বিরহ।
একটু থেমে আবার সে বললে, কোথায় চললে ?
দেওঘর।
চল না আমার সঙ্গে, টিকিট বদলে ফেল।
হেসে বললাম, জীবনে অনেকবার টিকিট বদল করেছি ;
এখন নিজেই গেছি বদলে।
অভিমান হ'ল অণুকার।
এই পরিবর্তনশীল জগতে তুমি কিন্তু মূর্তিমতী অপরিবর্তন।
চারিদিক চেয়ে দেখলাম,
বন্ধুটি দূরে সিগারেট টানছে,
জনতার মধ্যে অনেকে দৃষ্টির হুল হানবার চেষ্টা করছে।
হঠাৎ ব'লে উঠল অণুকা,
আমাকে তোমার কেমন লাগে ?
তোমাকে আমার আগের মতই লাগে।

বললাম, দেখ অণুকা—
আমি দিন, তুমি রাত্রি—
দুজনের দেখা হ'ল দুবার।
একবার তারুণ্যের উষায়,
আর একবার যৌবনের গোধূলিতে।
খানিকক্ষণ ভেবে বললে সে,
উপমাটা বড় কাব্যিক হ'ল।
পানের দোকানে দেখেছ নারকোলের দড়ির আগায়
জ্বলে আগুন
জনে জনে ধরিয়ে নেয় বিড়ি-সিগারেট—
তুমি হচ্ছ সেই দড়ি,
অনেকে ক্ষণিকের আনন্দের সিগারেট
তোমার আগুনেই ধরিয়ে নিয়েছে।
উত্তর দিলাম সঙ্গে সঙ্গেই,
এবারে নিবিয়ে দিয়েছি আমার আগুন
এখন সেই দড়ি দিয়ে ঘর বাঁধব।
বললাম দেওঘরের সেই অপরিচিতার কথা।
চুপ ক'রে রইল।
অণুকার ট্রেন এসে গেল,
গাড়িতে উঠে আমায় ডাকল,
কাছে যেতেই আপন অনামিকার অঙ্গুরীটি
আমার হাতে দিয়ে বললে,
এটি ছিল আমার সুখ-দুঃখের সাথী—
আজ এটি তাকেই দিলাম, যে হবে তোমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী।
এই ব'লে একটু হাসল অণুকা।
অণুকার অন্য কিছু বদলায় নি, বদলেছে হাসি।
আগে
অণুকার ওষ্ঠের আকাশে বিজলীর হাসি খেলত,
এখন সেই হাসি—

ওষ্ঠের শিখর থেকে ঝরনার মত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।
ট্রেন ছেড়ে গেল।
হঠাৎ আংটিটায় লক্ষ্য করলাম,
আমার নামের আদ্য অক্ষরটি রক্তিম মীনার বক্ষে জলজল করছে,
চৌরঙ্গীর ট্রাফিকের লাল আলো দেখার সঙ্কেতের মত
আমার সমস্ত অনুভূতি থমকে থেমে গেল।
আমার সামনে দিয়ে একটা একটা ক'রে কম্পার্টমেণ্ট স'রে যাচ্ছে,
মনে হচ্ছে, আমার অতীত জীবনের এক-একটা পাতা উল্টে যাচ্ছে।
হঠাৎ বন্ধু এসে কাঁধে হাত দিতেই
নিমেষেই উড়ে গেল চিন্তার পতঙ্গ।
বন্ধু বললে, আমাদের ট্রেন আসছে।
দূরের সিগ্‌ন্যালটার দিকে তাকালাম,
সেখানে কিন্তু লাল আলো নয়—
সেখানকার সবুজ আলো আহ্বান করছে
আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে
আমার আগামীর জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্তন

এই সেদিন ঢাকার দাঙ্গার পরে এক সেবা-সমিতির সঙ্গে যাচ্ছিলাম ঢাকায়। স্টীমারে পরিচিত হ'লাম বিহারবাসী একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, তিনি সপরিবারে বিহার ত্যাগ ক'রে বিক্রমপুরের উদ্দেশে চলেছেন চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের বাসনা নিয়ে।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বিহারে তো এখন কোনও গোলমাল নেই, তবু বিহার ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন কেন?

না, দাঙ্গার ভয়ে চ'লে যাচ্ছি না। নোয়াখালির দাঙ্গার পরে

বিহারে যখন দাঙ্গা বেধেছিল, তখনও আমি বিহার ছেড়ে কোথাও যাই নি।

তা হ'লে এখন যাচ্ছেন কেন?

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, আমাদের গৃহে রক্ষিত বহুদিনের পুরানো দলিলপত্রের মাঝে কয়েক শতাব্দী আগের একখানা অতি জীর্ণ ভোজপত্রে লিখিত আমাদের বংশ-পরিচয় এবং আদি নিবাস প্রভৃতির সন্ধান পেয়েছি ব'লেই আজ চলেছি ঢাকা বিক্রমপুরে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে প্রকৃত বিষয়টি অনুধাবন করতে না পেরে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যা বলতে চান তা আমি বুঝতে পারি নি। তাই বললেন, শুনুন তা হ'লে, আপনাকে খুলেই বলি রহস্যটি। ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, আজ থেকে সাত শো বছর আগেকার কথা। আমার এক পূর্ব-পুরুষ বাঙালী কায়স্থ। পদবীতে তিনি ছিলেন মিত্র। ছাত্রজীবনে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপর চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যুবক বয়সে যোগদান করেছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর একদিন ইখ্‌তিয়ারের তলোয়ারে নালন্দা কেঁপে উঠল, পুড়ে ছারখার হ'ল পাঠানের অনলে সে যুগের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। ইতিহাসের চাকা বদলে গেল, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হ'ল, রূপান্তরিত হলেন আমার পূর্ব-পুরুষ বৌদ্ধপণ্ডিত মৌলভীতে। বহু যুগের সঞ্চিত সেই জীর্ণ ভোজ-পত্রখানি হপ্তা দুয়েক আগে দৈববাণীর মত আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল—আমি কে, কার সন্তান, কোথায় আমার পিতৃপুরুষের মাটি। সাত শো বছর আগে আমার আত্মা বৌদ্ধ হয়ে যে মাটি ত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল, আজ সাত শো বছর পরে আমার সেই আত্মা মুসলমানরূপে সে মাটিতে আবার ফিরে চলেছে।

ভদ্রলোকের কথাগুলি তন্ময় হয়ে শুনলাম, উত্তরে কিছু বললাম না। স্টীমার থেকে প্রমত্তা পদ্মার চওড়া বুকের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, মন ভোলে নি মাটিকে, মাটি ভোলে নি মনকে।

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

রাত্রি এক ঘটিকা বাজিয়া গেল। এ-পাশ ও-পাশ করিতেছি। অসম্ভব। এদের গুলি করিয়া মারা উচিত। চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইয়াছে। এতক্ষণ 'ছি-ছি এত্তা জঞ্জাল' চলিতেছিল। বালিশটা কানের ওপর চাপিয়া শুইয়া দেখা যাক। এবার জপ করিয়াছি। চালাও অ্যাম্প্লিফায়ার-সহযোগে রেকর্ড-সঙ্গীত। কুছ পরোয়া নাই। আমি নিদ্রার আবাহন শুরু করিয়া দিতেছি। এক হইতে একশো। আবার একশো হইতে এক। দুই নম্বর প্রক্রিয়া। কালো ভেড়া এক, দুই, তিন,...উনিশ...উনপঞ্চাশ। বাস্, চোখ বুজিয়া আসিয়াছে। জয় মা কালী!

'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম"—তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বালিশটা একটু সরিয়া যাওয়াতে এই বিভ্রাট। এদিকে মাথায় বালিশ চাপা দেওয়াতে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। এই গরমে নিউমোনিয়া না হয় আবার। দূর—। গেঞ্জিটা গায়ে চড়াইয়া পার্শ্ববর্তী দোকানে আসিয়া হাজির হইলাম।

আজ পয়লা বৈশাখের দিন, পড়শীদের আনন্দ বিতরণ করা আপনার উদ্দেশ্য ছিল। আপনি কৃতকার্য হইয়াছেন। মূর্খ আমরা বুঝিতে না পারিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন। এবার সদয় হউন। কাল আবার মর্নিং শিফ্‌টের ক্লাস আছে।

আপনি উপহাস করিতেছেন? আপনি জানেন, পনেরো টাকা নগদ গুনিয়া দিয়া অ্যাম্প্লিফায়ার ভাড়া করিয়া আনিয়াছি চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদে? এখন মাত্র রাত্রি দুই ঘটিকা। ভোরে সাত ঘটিকায় আরম্ভ করিয়াছি। অতএব পাঁচ ঘণ্টা এখনও বাকি।

অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে তাহাই বটে। আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, যদি এখনও রেহাই দেন, ঘণ্টা দুয়েক চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।

বাবা, মা সেই কমিকটা দিতে কইলেন—'প্যাটে খাইলে পিঠে সয়'।—দোকানীর ছেলে আসিয়া নিবেদন করিল। দোকানী আমার দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্য করিলেন।

তবে কি কোনও উপায় নাই?—অসহায়ভাবে দোকানীর দিকে তাকাইয়া মাত্র বলিয়াছি, উত্তর পাইলাম অপ্রত্যাশিতভাবে পর্দার আড়াল হইতে।

ছোট্‌না, কইয়া দে, পয়সা খরচা কইর‍্যা গান দিমু, হেইয়াও লোকের জ্বালায় বন্ধ কইর‍্যা দিতে অইব? ক্যান্, দ্যাশে কি আইন নাই? আরও কইয়া দে, আমাগো যা খুশি হেইয়া করুম, লোকের ক্যান্ চউখ টাটায়? অসুবিধা অইলে য্যান্ যায় গিয়া অন্য পাড়ায়। তুই কত্তারে লাগাইতে ক 'প্যাটে খাইলে'টা।

ছোট্‌নার বলিতে হইল না। দোকানীকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। সিভিক সেন্স বা সামাজিক নীতিবোধ ইত্যাদি অর্থহীন কথা তুলিয়া লাভ কি?

* * *

ব্যক্তি-স্বাধীনতা। আমার খুশি, উৎসবের অঙ্গহিসাবে অ্যাম্‌প্লিফায়ার-সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করিব। মনে রাখিবেন, আপনারা পাইতেছেন 'মুফত'। তাহাও আপনাদের সহ্য হইল না? আমাকে রেকর্ড চালনা বন্ধ করিবার পরামর্শ দিবার সাহস রাখেন? আশ্চর্য! দেশে কি আইন নাই নাকি?

ভদ্রমহিলা ঠিক কথাই বলিয়াছেন, দেশে আইন আছে বলিয়াই তাঁহার পতিদেবতা রাত্রি দুইটা পাঁচ মিনিটের সময় "আদায় আর কাঁচকলায় মিলন" কমিক শুনিতে বা শুনাইতে বসিয়াছেন। হয়তো এই চীৎকারের ঠেলায় পাড়ার এখন-তখন কেস এক-আধটা এখনই হইয়া গেল। কিন্তু দোকানী নাচার।

আপনি সকালবেলা সদ্য পাট-ভাঙা কাপড় পরিয়া চলিয়াছেন হনহন করিয়া। হয়তো আপনারও সকালের শিফ্‌ট। হঠাৎ দেখিলেন, বোঁ করিয়া ময়লা-ভর্তি কাগজের ঠোঙা আসিয়া আপনার সম্মুখেই পড়িল। আপনি তেতলার জানালায় তাকাইতেই দেখিলেন, নন্দন-কাঁখে একটি নারীমূর্তি সরিয়া গেল। হয়তো উক্ত নন্দন-জননীর ছায়া আছে বলিয়াই আপনাকে দেখা দিলেন না। যদি আপনাকে

দেখাইয়াই ছুঁড়িতেন, আপনার বলিবার কিছু ছিল কি? পাবলিক রোড। 'আমার খুশি'-থিয়োরি অনুসারে তিনি ঠিকই করিয়াছেন।

অথবা শনিবারের সন্ধ্যায় রেশনের সুপারফাইন ধুতির লম্বা কোঁচা দোলাইয়া আদ্দির পাঞ্জাবি চড়াইয়া 'আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত' গুনগুন করিয়া গাহিয়া চলিয়াছেন। উদ্দেশ্য—লেকাঞ্চলে একটু বেড়াইবেন। হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে মৃদু শীতলানুভূতি হওয়াতে বাঁ হাত চালাইয়া দিয়া দেখিলেন, লালে লাল হইয়া গিয়াছে হাত। আশেপাশের লোক মুখ-টেপাটেপি করিয়া হাসিতেছে। আপনি দোতলার জানালায় তাকাইতেই দেখিলেন, একখানা সুন্দর রমণী-মুখ জানালার পাশ হইতে চলিয়া গেল। মনে হইল, তাঁহার ওষ্ঠাধর রঞ্জিত? ঠিকই দেখিয়াছেন। তিনি পানের পিক ফেলিয়াছিলেন এবং তাহা আপনার অসতর্কতাহেতু আপনার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

এস্‌প্ল্যানেড চলিয়াছি। পার্ক স্ট্রীটের মোড় হইতে ট্রাম ছাড়িতেই দেখি, যাত্রীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়াছে। সকলেই কোঁচার খুট অথবা রুমাল হস্তে লইয়া যেন কিসের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এ কি! সকলের দেখি নাক-সিঁটকানোর ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিতে দেখি, বাঁ ধারের খোলা ড্রেনের দুধারে ভিন্‌দেশবাসী ভ্রাতাগণ ইউরিন্যাল এবং লেভেটরি হিসাবে ব্যবহার করেন, সেই সাক্ষ্য বর্তমান। দুই-একজনকে কর্মরত অবস্থায় দেখা গেল। পুলিস আছে কাছেই। কিন্তু হইলে কি হইবে, দেশোয়ালী ভাই, একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো! পাঁচ আইন অনুসারে উক্ত কার্য ফৌজদারিতে সোপর্দনীয় বটে। কিন্তু এই আইন মানা অপেক্ষা ভাঙাতেই সম্মানিত।

ফুটপাথ। ডিক্‌শনারির অর্থ—পায়ে চলার পথ। চলতি অর্থ হকার্স কর্নার। এখানে বাবুরা ছে পয়সা, '৪'াড়ে চার আনা, ছে আনায় বিক্রীত হইতেছেন। ("বাবু '৪'াড়ে চার আনা")। ক্ষুধা পাইয়াছে? টিফিন করিবেন? আসুন। কি চাই? চানা, লুচি আলুর-দম, দহি-বড়া, পকৌড়ি, ঠাণ্ডা শরবত, আঁখের রস? কিছু চাই না? খাদ্যদ্রব্য উন্মুক্তাবস্থায়, ধূলিধূসরিত, মাছি ভনভন করিতেছে।

আরে বাপ্‌স! বাঙ্গালীবাবু স্বাস্থ্যরক্ষার লিকচার দিচ্ছেন! আপনি সংবাদপত্র মারফৎ আন্দোলন চালাইতে মনস্থ করিলেন: কলিকাতায় যখন কলেরা বসন্ত টাইফয়েড মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে, তখনও কর্পোরেশন এবং পুলিস কর্তৃপক্ষের ফুটপাথে এইরূপ খোলা অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করিবার কোনও পরিকল্পনা দেখা যাইতেছে না। কর্পোরেশন-কর্তৃপক্ষ 'ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স' প্রতি সপ্তাহে বিজ্ঞাপিত করেন। তাঁহাদের নিশ্চয়ই ইহা অজ্ঞাত নয়, এই চিত্রগুপ্তের লিষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার সাহায্য করে এই সব খাদ্যদ্রব্যের ভেণ্ডরগণ। এই সব অশিক্ষিত, অজ্ঞ লোকে যখন লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন-সংকট করিয়া তুলিয়াছে, কর্পোরেশন ও পুলিস কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা অমার্জনীয়। ক্রিমিন্যাল! তাঁহারা জানেন কি, ফুটপাথ এন্‌গেজ্‌ড দেখিয়া পথচারীদের মধ্যে যাঁহারা রাজপথের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাঝে মাঝে ভবলীলা সাঙ্গ করেন অতর্কিতে? কারণ, যাহা স্বাভাবিক তাহাই। অ্যাক্‌সিডেণ্ট। এই সব সংখ্যা কিন্তু উপরোক্ত চিত্রগুপ্তের খতিয়ানের বাহিরে।

আর রক্ষা নাই। কে এই সমাজবিরোধী ব্যক্তি? এতগুলি মেহনতি লোককে নিশ্চিত বেকারত্বের মুখে ঠেলিয়া দিতেছেন রুজি-রোজগারের একমাত্র পথ বন্ধ করিয়া!

রাস্তায় চলিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলেন, পার্শ্ববর্তী পূতিগন্ধময় কর্দমাক্ত স্থানে মহিষকুল শুইয়া বসিয়া সর্বাঙ্গ শীতল করিবার প্রয়াস পাইতেছে। পাশেই গাভী আপন বৎসের দেহ চাটিয়া দিতেছে। আহা, মাতৃস্নেহ! এই সকল স্থানকেই কলিকাতার বিখ্যাত "খাটাল" বলা হইয়া থাকে। অতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখানে বিহার-প্রদেশবাসী গোয়ালা ভাইগণ যে দুগ্ধ দোহন করেন, তাহাই আগামী কল্য প্রাতঃকালে আপনার গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। মূল্য টাকা টাকা সের। 'জলে দুগ্ধ, না, দুগ্ধে জল' ইত্যাদি তর্ক তুলিবেন না। এ সব নৈয়ায়িকদেরই সাজে যাঁহারা অতীতে 'পাত্রাধার তৈল, না, তৈলাধার পাত্র' তর্কজাল তুলিয়া অসীম ধৈর্যের সহিত ঘণ্টার পর

ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিতে পারিতেন। মীমাংসা অবশ্য কোনকালেই হইত না। আপনার, আমার—ছাপোষা মানুষের অত কথার কচকচিতে কাজ কি? মোদ্দা কথা, ঘুম হইতে উঠিলেই ছেলেমেয়েগুলি চ্যাঁ-চ্যাঁ করিতে থাকিবে। কিছু গেলানো চাই। সাদা তরল পদার্থ একটা কিছু হইলেই হইল।

শহর হইতে দূরে এই সব 'খাটাল' তুলিয়া লওয়ার জন্য আন্দোলন চালাইবেন? বহিয়া গেল। আপনি নিজেকে কি ভাবিতেছেন? আমার জমি, আমি খাটাল করিতে দিয়াছি। মাস মাস ভাড়া পাই। কর্পোরেশনে লিখিবেন? আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নই, বা কর্তাব্যক্তিদের ভজাইবার মত উপকরণ নাই আমার? আপনাদের বাড়ির সম্মুখভাগ নোংরা হইয়া থাকে? রাস্তায় লোকচলাচলের অসুবিধা হয়? আমার বহিয়া গেল? সিভিক সেন্স? আপনি যে মশাই বাল্যশিক্ষার কথা তুলিলেন!

অন্ধকারে চলিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলেন, ষাঁড়পুঙ্গব আপনার সম্মুখে শিঙ উঁচাইয়া আছে। একটি চুলের জন্য এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। অতঃপর সাবধানে চলিবেন।

অন্ধকারে চলিয়াছেন, কারণ আপনার পাড়ায় গ্যাস্-লাইট। যদি বলেন, ইলেক্‌ট্রিসিটির যুগেও কলিকাতা মহানগরীতে এই অ্যানাক্রনিজ্‌ম কেন? উত্তর, দেশী ইণ্ডাষ্ট্রিজ রক্ষা। আপনি মুচকি হাসিতেছেন, ভাবার্থ এই যে, রাস্তায় গ্যাসালোক বন্ধ করিয়া বিদ্যুতালোকের বন্দোবস্ত করিতে গেলে কায়েমী স্বার্থে আঘাত পড়িবে, তাই সরকার চুপ করিয়া আছেন। আপনি ফপরদালালি করিবেন না। অভ্যাস-ই আপনাদের খারাপ হইয়া গিয়াছে। কেবল সরকারের ছিদ্র অন্বেষণ। দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা চালাইতে গেলে, এক কথায় স্বাবলম্বী হইতে গেলে, একটু কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। এই যে চিনির কেলেঙ্কারি সম্পর্কে পত্রিকাওয়ালারা হৈ-চৈ করিতেছে! কি করিয়াছে সুগার সিণ্ডিকেট? কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়া মাঝে মাঝে এক-আধশো কোটি টাকা মুনাফা নেওয়া, এই তো? আপনাদের এই টাকাটা থাকিলেই বা কি হইত আর যাওয়াতেই বা কি একেবারে

ফতুর হইয়া গিয়াছেন তা তো বুঝি না। অথচ চিনির কলের মালিকদের হাতে টাকাটা আসাতে তাঁহারা টাকাটা বিজ্‌নেসে খাটাইতে পারিবেন। কাপড়ের কলওয়ালাদের সম্পর্কেও এই কথা খাটে। বাহির হইতে চিনি আমদানি করিলে পাঁচ-সাত আনা সেরে চিনি পাওয়া যায় মানিলাম। কিন্তু মালিকদের অবস্থা কি হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? কালো বাজার, কালো টাকা—চতুর্দিকে একটা রব উঠিয়াছে। এখনই হয়তো বলিবেন সরিষা-তৈলের কথা। শিয়ালকাঁটা-মিশ্রিত তৈল ব্যবহারে কত লোক ড্রপ্‌সিতে আক্রান্ত হইয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে, কত লোক চিরকালের জন্য জখম হইয়া রহিলেন, এবং ভবিষ্যতে কত লোকের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিল, কে বা তাহার হিসাব রাখে, কাহারই বা তার জন্য মাথা-ব্যথা? কেন, আপনাদের ম্যুন্সিপ্যাল আইনই তো আছে। ইহা তো আর রাষ্ট্রবিরোধী কার্য নয় যে বি. সি. এল.-এ বা ভারতরক্ষা আইনে ফেলিবেন। শ তিনেক টাকা জরিমানা দিয়া এবং দুই-চার টিন তৈল বিনষ্ট করাইয়াও আপনাদের শান্তি হইল না? সরিষার সঙ্গে শিয়ালকাঁটাবীজ মিশ্রিত, সে কি আর এখানকার বিজ্‌নেসম্যানের দোষ? উত্তর প্রদেশ হইতে মাল আসে, তাহাদের বলুন না, ইঁহাদের পশ্চাতে লাগিয়া লাভ কি? বেশ, শিয়ালকাঁটা ছাড়াও সরিষার তৈল হয়। আসল মাল। নেবেন? সের প্রতি চার আনা বেশি। আসুন। এ কি, মুখখানা যে গম্ভীর হইয়া গেল? ভাবিতেছেন, দাঁও বুঝিয়া মণ প্রতি দশ টাকা তুলিয়া লইতেছেন। আজ্ঞে তা না, পড়তা পোষায় না। আপনারা তো জানেন না। তবুও আপনাদের এক কথা। যান যান, মশাই, দক্ষিণাঞ্চলীয়দের মত তিল-তৈল খান, সরিষার তৈল আপনার জন্য নয়।

ক্যানিং স্ট্রীটের কয়েকটি ব্যবসায়ী ধৃত হইয়াছেন—হরলিক্স ও গুঁড়াদুগ্ধের আসল শিশি ও টিনে নকল মাল ভর্তি করিয়া বিক্রয় করিবার অপরাধে। হঠাৎ রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছিল, এইসব দুগ্ধ খাইয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ভেদবমি শুরু হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রেই হতভাগারা ছোট ছোট হাত-পা কিছুক্ষণ ছুঁড়িয়া ভবযন্ত্রণা শেষ করিয়াছে। আসলে, ক্রেতাদেরই অন্যায় হইয়াছে। বাচ্চাদের এইসব

দুগ্ধ না খাওয়াইয়া বাচ্চাদের বাপ-মাকে খাওয়ানোই উচিত ছিল। তা ছাড়া বিজ্‌নেস ইস বিজ্‌নেস। বিজ্‌নেস করিতে গেলে অত সতী-সাধ্বী সাজিয়া থাকা চলে না। আপনি ম্যাক্সিমাম শ-তিনেক টাকা ফাইন করিতে পারেন; কিন্তু মনে রাখিবেন, ইহার কয়েক শো গুণ উক্ত ব্যবসায়ীবৃন্দ কামাইয়া লইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও কামাইবার বাসনা রাখেন।

বড়বাজার ক্লাইভ স্ট্রীট গেলে কে থাকে; বড়বাজার ক্লাইভ স্ট্রীট থাকিলে কে যায়? অতি খাঁটি কথা। এই যে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে লাখ তিরিশেক লোক অক্কা পাইল, ইহাতে কি আসিল গেল? বড়বাজারী ধনী ব্যবসায়ীরা থাকাতেই না ওইসব লোকদের খিচুড়িটা ঘ্যাটটা খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-এন্‌কোয়ারি কমিশনের যে মন্তব্য, মৃত প্রতি হাজার টাকা মুনাফা লুঠিয়াছেন চাউল-ব্যবসায়ীরা, এ আসলে নেহাত—। যাক, জজ সাহেবদের উক্তি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন হইবে না। আজ তাকাইয়া দেখুন, শিয়ালদা, রাণাঘাট, বনগাঁ কোথায় তাঁহারা নাই? সেই মন্বন্তর-মার্কা খিচুড়ি, ঘ্যাঁট পরিবেশন করা হইতেছে ইঁহাদেরই দৌলতে। এবং ইঁহাদেরই সুবিধার্থ যে কয়লা-পাট লইয়া এত কাণ্ড হইয়া গেল পূর্ববঙ্গে, সেই পাট-কয়লার অচল অবস্থা দূর হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে করাচী-সম্মিলনে। আশা করা যায়, এই সম্মিলন পাক-ভারত বন্ধুতা ও বাণিজ্যিক সৌভ্রাত্র বহন করিয়া আনিবে। ক্লাইভ স্ট্রীট বড়বাজার থাকিলে আবার সব হইবে। তাহা হইলে কি দেখা যাইতেছে? এই যে লোকে বলে, ভারতরক্ষা আইনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, এই সব অভিযোগ বিলকুল ঝুটা। আসলে আমরা কি দেখিতেছি? আপনি, আমি, পাঁচজনে বেশ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি, যাহার যাহা খুশি করিতেছি, কেহ তো আমাদের পথ রুখিয়া দাঁড়াইতেছে না? ব্যক্তি-স্বাধীনতা আগেও যেমন ছিল, ঠিক এখনও তেমনই আছে। তবে হাঁ, কুচক্রী লোক যদি থাক কোথাও, সাবধান! রাষ্ট্রবিধ্বংসী-কার্যে কেহ লিপ্ত আছ প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রমাণ-ট্রমাণ বুঝি না, যদি সন্দেহ হয়, তবে তোমার

রেহাই নাই। সরকার যদি মনে করেন তাহা হইলেই হইল। কিন্তু ইহার জন্যই এত গোরগোল? কালাকানুন বলিয়া বিদ্রূপ? আসলে লোক ক্ষেপাইবার মতলব। ভয়ানক মতলববাজ লোক এসব, এদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। সরকার যাহা করেন ভালর জন্যই করেন। মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান সরকার ঝুনা জ্ঞানবৃদ্ধ ভদ্রলোকদের ষাট সত্তর আশী লইয়া গঠিত। আপনি বলিতেছেন, সরকার-ই তো সুপার অ্যানুয়েশনের বয়স বাঁধিয়া দিয়াছেন পঞ্চান্ন বৎসর। ম্যাক্সিমাম গোটা পাঁচেক এক্সটেনশন দিলেও তো রিটায়ার করিবার বয়স ইঁহাদের উতরাইয়া গিয়াছে। আপনি দেখি, সিভিল সার্ভিস রেগুলেশন্‌স কোট করিতেছেন! রসিকতার একটা সীমা থাকা উচিত। এই তো সবে ইঁহারা চাকুরিতে ঢুকিয়াছেন, এখনই রিটায়ার করিবার কথা বলিতেছেন? বলিহারি যাই। এত সহজেই ভুলিয়া গেলেন, একদা ইঁহারাই জনগণের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, পাব্‌লিক মেমরি কি নটোরিয়াস্‌লি শর্ট! কি ভাল কি মন্দ ইঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আপনি শিয়ালকাঁটা-মিশ্রিত তৈল নাসিকাতে দিয়া নিশ্চিতে নিদ্রা দিন তো। কি বলিলেন, না মশাই, মেমরি শর্ট হইলেও এতটা নয় যে ভুলিয়া যাইব, গদি-আরোহণপর্বের আগে বর্তমান কর্ণধারগণ কি বলিয়াছিলেন—নিকটবর্তী ল্যাম্প-পোস্টকেই যূপকাষ্ঠ হিসাবে ব্যবহার করিয়া কালোবাজারী রক্তখেকোদের বলি দেওয়া হইবে। কাকস্য পরিবেদনা, যথাপূর্বং তথাপরম্‌, আমরা ফ্লিস্‌ড্‌ হইতেছি। দেখুন তো কন্‌টেক্স্‌ট ছাড়া একটা কথা বলিলেন। এই সব কথা হইল প্রাক্‌-স্বাধীনতা পর্বের কথা, উনিশ শো তেতাল্লিশের মন্বন্তর সম্পর্কিত কথা। এই সব পুরানো কাসুন্দী ঘাঁটিয়া লাভ কি, বলুন? সরকার হেন করিলেন না, তেন করিলেন না—বলিয়া ফ্যাচ-ফ্যাচ করিবেন না। আপনার ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষয় থাকিবে। বেদান্তের দেশে জন্ম। একটু বৈদান্তিক মনোবৃত্তি কাল্‌চার করিতে শিখুন। বৈদান্তিক নির্লিপ্ততা অর্জন করুন, দেখিবেন 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ,' আত্মা দ্বারাই আত্মার সন্তুষ্ট থাকার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবেন।

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

শ্রীভগবান উবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

(হে পার্থ, যখন মানুষ মনে উত্থিত সকল কামনা ত্যাগ করে ও আত্মা দ্বারাই আত্মায় সন্তুষ্ট থাকে, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।)

টিপ্পনী—আত্মা দ্বারাই আত্মায় সন্তুষ্ট থাকার তাৎপর্য, আত্মার আনন্দ ভিতর হইতে খোঁজা, সুখ-দুঃখদানকারী বাহিরের বস্তুর উপর আনন্দের আশ্রয় না রাখা।

অ্যাম্প্লিফায়ার-সহযোগে কর্ণপটহবিদীর্ণকারী সঙ্গীতই হউক, পথিপার্শ্বের 'ন্যুইসেন্স'ই হউক; ফুটপাথের কাটা ফলই হউক, শিয়ালকাঁটা-মিশ্রিত সর্ষপ তৈলই হউক; কালো-বাজারী চিনিই হউক আর সাদা-বাজারী ধুতিই হউক; পূর্ববঙ্গের 'পরিস্থিতি'ই হউক, কি দিল্লীর অনৈতিহাসিক সন্ধিই হউক; আপনি কিছুতেই বিচলিত হইবেন না। আপনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। অর্থাৎ জাগতিক অর্থে আপনি মৃত। মৃতের আবার সুখ-দুঃখ কি?

শ্রীবিভূরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

স্বাধীন ভারতবর্ষে সম্প্রতি নানা দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; যে দুর্লক্ষণ দেখা দিয়া বার বার ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করিয়াছিল, সেই ভয়াবহ গৃহবিবাদও আবার প্রকাশ পাইয়াছে; এবার আর পথে-ঘাটে মন্দিরে-মসজিদে বনে-বাদাড়ে নয়—খোদ কেন্দ্রীয় শাসনের ভৈরবী-চক্রে ভাঙন ধরিয়াছে—দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে চিড় খাইয়াছে। আপাত-প্রত্যক্ষ কারণ হিন্দুস্থান-পাকিস্তান অর্থাৎ নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি। কিন্তু গুণীজন বলিতেছেন, বিবাদের আসল তত্ত্ব নিহিতং গুহায়াং—অতি গভীরে তাহার মূল প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ইতিহাস-cum-কাহিনীর জয়চন্দ্র-পৃথ্বিরাজ এবং ইতিহাসের মানসিংহ-প্রতাপসিংহের ঘটনা পুনরাবর্তিত হইয়া এবারেও নাকি প্রমাণ করিতেছে, ইতিহাসের পুনরাবর্তন স্বাভাবিক। পণ্ডিত নেহরুর গান্ধীপন্থী-আদর্শবাদ শ্যামাপ্রসাদ-ক্ষিতীশ-মোহনলাল-জন এই চারি শিষ্য-কথিত সুসমাচারের প্রভাবে জনসাধারণের চক্ষে কাপুরুষের তোষণ-নীতিরূপেই প্রতিভাত হইতেছে; তিনি জয়চন্দ্র-মানসিংহের সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া ক্রুশবিদ্ধ হইবার ভয়ে যে কাবুল-কান্দাহার পিনাঙ-প্রাম্বানাম্ করিয়া বেড়াইতেছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাঁহার সে চালও ধরিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পর মেক্সিকো হইয়া মস্কো যাইবেন এমনও আভাস তাঁহারা দিতেছেন। ডালমিয়া বিড়লার দিকে আঙুল দেখাইতেছেন; মাথাই, ন্যাশনাল প্ল্যানিং এবং ইণ্টারন্যাশনাল এম্বেসিগত মেনন্‌লিনেসের বিরুদ্ধে সশব্দে মাথা খুঁড়িতেছেন, ফলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট হইতে কালোবাজার-লাঞ্ছিত জনসাধারণের স্বাধীন-ভারত-সরকারের প্রতি পুঞ্জীভূত সন্দেহ সংশয়-শূন্য হইবার অবকাশ পাইতেছে। কাজের হিসাব আর কাহারও নজরে পড়িতেছে না, লোকে একক অথবা দলবদ্ধ হইয়া খবরের কাগজের চোখ দিয়া দেখিতেছে—কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপতি অথবা মন্ত্রীমণ্ডলী এবং বিভাগীয় প্রদেশপাল ও মন্ত্রীরা স-সচিব সারা পৃথিবী এবং সমগ্র ভারতবর্ষ বিমানযোগে চষিয়া বেড়াইতেছেন, পরিকল্পনার উপর পরিকল্পনা করিতেছেন, কমিশনের পর কমিশন বসাইতেছেন এবং যেখানে যত আত্মীয়-বান্ধব ও অনুগৃহীত জীব আছেন চাকুরিতে-কণ্ট্রাক্টে-অর্ডারে-পারমিটে তাঁহাদের তোষণ ও পোষণ করিয়া স্বদেশ ও রাষ্ট্রকে অকাতরে জাহান্নামে পাঠাইতেছেন। শুনিয়া শুনিয়া আমাদেরও সন্দেহ হইতেছে। আগামী নির্বাচনের সুবিধা-সুযোগের জন্য মুক্তহস্তে প্রসাদ-বিতরণ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লোভের বস্তু সকলের সমান করায়ত্ত হইতেছে না বলিয়া গৃহবিবাদ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। গজনীর মামুদ যে রন্ধ্রপথে ভারতে এবং মহামান্য আকবর যে ছিদ্র দিয়া রাজপুতানায় প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন, সে ছিদ্র আবার ভারতরাষ্ট্রে প্রকট হইয়াছে, এবার

কোন্ শনি সেই রন্ধ্র পথে প্রবেশ করিবে আমরা তাহা ভাবিয়াই আকুল হইতেছি এবং আত্মাভিমান-স্ফীত সাধু পণ্ডিত জওহরলালের জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি।

* * *

যে সর্বনাশা চুক্তির জন্য পণ্ডিত জওহরলালের এই হেনস্থা, তাহার গতিকও মোটেই সুবিধার নয়। সাত সমুদ্র পারে আকস্মিক বিস্ফোরণের কথা ভাবিয়া এ কথা বলিতেছি না, অস্ত্রোপচার ব্যপদেশে সস্ত্রীক আমেরিকা গিয়া জনাব লিয়াকৎ আলি যে সকল গরম গরম সন্দেহজনক বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাও আমাদের লক্ষ্য নহে—আমরা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞাত হইতেছি যে, এই চুক্তি সফল হইবার পথে নয়, বরঞ্চ ইহার গতি সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের অভিজ্ঞতা দৈনিক সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত হইতেছে। গত ৮ এপ্রিল অর্থাৎ মাত্র ২ মাস ৪ দিন পূর্বে চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর আজ (১২. ৬. ৫০) পর্যন্ত কলিকাতার মাত্র দুইটি ভাষা-পত্রিকায় চুক্তিভঙ্গের যে সকল লঘু ও গুরু প্রমাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দুই হাজারের উপর। অর্থাৎ প্রত্যহ গড়পড়তায় ৩০টি করিয়া পূর্বপাকিস্তানী গাফিলতির দৃষ্টান্ত আমাদিগকে দেখানো হইতেছে। উদ্বাস্তু-শিবিরে-শিবিরে ভ্রাম্যমাণ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সচিত্র ওজস্বী ভাষণ আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিদিন প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞাপন করিতেছে—ঘরছাড়াদের ঘরে ফিরিবার আর ইচ্ছা নাই, যাহারা বাধ্য হইয়া সেখানে আছে তাহারাও পলাইয়া আসিতে পারিলে বাঁচে। আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করিতেছে নারীনিগ্রহ ও নারীহরণের বীভৎস কাহিনীগুলি। অপর পক্ষে বিমান-সফরী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী অথবা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বিবৃতি ও ভাষণযোগে চুক্তি-মহিমা জোরগলায় সর্বত্র প্রচার করিতেছেন, বেতার-মারফৎ চুক্তি মানিয়া চলার বহুবিধ সুযুক্তি ঠিকা ব্যক্তিরাও প্রত্যহ দিয়া চলিয়াছেন, বেতারে ও সংবাদপত্রে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ ও সংখ্যা প্রতিদিন ঘোষিত হইতেছে; কিন্তু এগুলি উত্তেজিত জনতার মনে তেমন দাগ কাটিতেছে না, বরং শ্যামাপক্ষের ব্যাখ্যাগুণে এগুলির হাস্যকরতা ও অবিশ্বাস্যতা আরও প্রকট হইতেছে।

এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সর্বজনবিশ্বাসী বিশ্বাস মহাশয়ও এই দো-আঁশলা চুক্তিতে নামিয়া বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার গতকল্যকার (১১. ৬. ৫০) বিবৃতিও খুব আশাপ্রদ নয়। মোটের উপর, চুক্তি লইয়া সরকারী ও বেসরকারী দুইটি দল দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এবং যেহেতু বেসরকারীরা সংখ্যায় বেশি—সরকার পক্ষের লাঞ্ছনার অন্ত নাই।

শ্যামাপক্ষের কথা আর শুধু বিবৃতি ও বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গতকল্য ১১ জুন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সভায় তাহা সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদের সভাপতিত্বে সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।" দিল্লীর লাড্ডুর মত দিল্লীর চুক্তিও যে ভুয়া হইয়া গিয়াছে, নামকরা বক্তারা তাহা ওজস্বী ভাষায় ব্যক্ত করেন। চুক্তিকর্তাদের একজন ইন্দোনেশিয়ার সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য দেখিতেছেন, অন্য জন উত্তর-আমেরিকার সুসজ্জিত হাসপাতাল-কক্ষে সু-সুন্দরী নার্সদের সেবা ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া উপরোক্ত প্রস্তাবের বিরূপ বা অনুরূপ ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমরা, অর্থাৎ জনসাধারণ, যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিব।

* * *

রাজাপক্ষ ও শ্যামাপক্ষ ছাড়াও আর এক পক্ষ কিন্তু থাকিবার কথা। ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহারা একজনও আর আছেন বলিয়া মনে হয় না। যদি থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের বক্তব্য কি হইত, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত খাঁটি পয়ারে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। এই মতে পণ্ডিতপক্ষ ও শ্যামাপক্ষ দুই পক্ষকেই দুয়ো দেওয়া হইয়াছে। ম্যামথ-জাতীয় অতিকায় জীবেদের মতো সম্পূর্ণ নিঃশেষিত এই পক্ষের কথা অর্থাৎ সেনগুপ্ত-কবির কবিতাটি শুধু ঐতিহাসিক সম্পূর্ণতার জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

ফিরে চল্

প্রাণ আর মান যদি বাঁচাইতে চাও
লাথে লাথে পলায়ো না, ঘুরিয়া দাঁড়াও।

প্রাণ যদি দিতে হয় দুঃখ কি রে ভাই ;
শেষতক ল'ড়ে দেব—পণ কর তাই।
মানও যদি দিতে হয় বুক পাতো সোজা,
পুঁটুলি বাঁধিলে পিঠে মান হয় বোঝা।
পথের বিড়ালছানা অতি ক্ষীণপ্রাণ
তেড়ে এল তারে এক অ্যালসেশিয়ান,
ফ্যাঁস ক'রে সেই শিশু দাঁড়াইল রুখে,
থমকিয়া মহাবীর দূর হতে শুঁকে ;
বুঝিল সে নয় এ তো সামান্য শাবক,—
লেলিহান প্রাণশিখা জ্বলন্ত পাবক!
বেগতিক দেখে বীর গুটায় লাঙুল,
বেহিসাবী বিড়ালের রহে দুই কুল।
যা পারে বিড়ালছানা তোরা না পারিস,
দেশ জুড়ে ছড়াইলি ভীরুতার বিষ।
ভুলে গেলি অত্যাচারী চিরকাপুরুষ,
সে শুধু নোয়ায় শির ভেটিলে মানুষ।
উহারা তাড়াতে চায় তোমরা পলাও,—
হেন সহযোগ কেহ দেখেছে কোথাও,
বিনা রণে এত বড় অধর্মের জয়
সারা দুনিয়ায় কভু না হবে না হয়।
এত বড় পলায়ন হেন অনায়াসে
লিখিত হয় নি আজও মানবেতিহাসে।
ওরে বরিশালী ভাই ঢাকাই বাঙাল,
এ সঙ্কটে হ'লি তোরা প্রাণের কাঙাল!
তোরাই কি জিনে এনেছিলি স্বাধীনতা ?
এ দেখি দিনের সাপ রাতে হ'ল 'সূত.'!
পণ্ডিতের নিরামিশ থোড়-বড়ি-খাড়া,
শ্যামার প্রসাদী ওই তালপত্রী খাঁড়া,
এ দুয়ের কোনটাই বাঁচাবে না তোরে

বাঁচিতে যে জানে বাঁচে আপনার জোরে।
আপনি না রাখ যদি আপনার মান,
চাঁদা ক'রে মান তোরে কে করিবে দান ?
পলাতে থাকিবি তুই ভুলে দিগ্বিদিক—
জয় ক'রে দেবে দেশ গুর্খা ও শিখ ?
সে ফাঁকি চলে না ভাই, চলে না সে ফাঁকি
বিধাতা বুঝিয়া লবে কড়া গণ্ডা বাকি।

যা হবার হয়েছে রে চল্ ফিরে চল্,
দুই পাশে দুই বাহু করিয়া সম্বল।
দেশ তোর ভিটে তোর, তুই চল্ আগে,
যে মায়ে ফেলিয়া এলি সে তোরেই মাগে।
যারা সেথা ভয়ে কাঁপে বল্ উচ্চৈঃ—
এসেছি এসেছি ওরে মাভৈঃ মাভৈঃ !
ভেবে দেখ্ তোর দেশে দেড় কোটি তোরা,
গুনিস নে কয় কোটি অমানুষ ওরা।
হেন রাজা হেন রাজ্য না হয় কখন
দেড় কোটি মরিয়ায় মানাবে শাসন।
তোর দেশে তোরা না করিলে প্রতিরোধ
এত বড় অন্যায়ের কে লইবে শোধ ?
বেছে নে বেছে নে ওরে বীরের যে পথ
সে পথেই মা-বোনেরও রবে ইজ্জৎ।
সাহসে বাঁধিলে বুক নিজে ভগবান
রাখেন ন্যায়ের আর বীরের সম্মান।
কেঁদে আর চাঁদা দিয়ে কাজ সারে যারা
প্রাণের পিছনে প্রাণ ডালি দিবে তারা !
ফিরে চল্ দলে দল ফিরে চল্ ভাই,
এবার চাহিলে প্রাণ বিনিময় চাই।
না মেরে মরিয়া গান্ধী হইল অমর,

সে পথ কঠিন যদি, বীর হয়ে মর্।
কান পেতে শোন্ ওই মাটির আহ্বান
এ কালিমা ঘুচাইতে চাই লাখ প্রাণ।
সে প্রাণ দিতেই হবে. স্থির কর্ মন—
আমরণ মরিবি, না, মরিবি এখন ?

এ পক্ষের মনস্তত্ত্ব যাহাই হউক, একজনেরও অস্তিত্ব থাকিলে ইঁহাদের কাজ নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির অনুকূল হইত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক গুরুতর বিপদ হইতে আশু রক্ষা পাইতেন। কিন্তু যাহা হইবার নয়, তাহা লইয়া আশা বা আপসোস করা বৃথা।

—

বঙ্গদেশের এই নিদারুণ সঙ্কটকালে দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে আমরা গতবারে যে আক্ষেপ নিবেদন করিয়াছিলাম, তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে আক্ষেপ দূর করিয়াছেন। তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। হতাশ জনের চিত্তে আশার সঞ্চার করিবার জন্য অসুস্থ শরীরে তিনি যে ছুটাছুটি ও পরিশ্রম করিতেছেন, নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া বাঙালী নেতারা সে পরিশ্রম করিতে আর অভ্যস্ত নন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্মপ্রেরণা নিশ্চয়ই সে মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়।

আমরা চাহিয়াছিলাম, বাংলার শ্যামাপ্রসাদ কম্বুকণ্ঠে বাঙালী তরুণদের আহ্বান করিবেন, দেশের সঙ্কটত্রাণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবেন। তিনি নিজে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিচ্ছিন্ন শতধাবিভক্ত বাঙালী জাতিকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন করিবার সাধু সংকল্প লইয়া কাজে নামিয়াছেন, বাংলার যুবশক্তিকেও সেই পথে আকর্ষণ করিবেন। কিন্তু হঠাৎ মেদিনীপুরে বাংলার সাহিত্যিকদিগকে সরাসরি এই কাজে আহ্বান করিয়া তিনি আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়াছেন। সংবাদপত্রে দেখিতেছি—

"ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাংলার সাহিত্যিগণকে এই অনুরোধ জানান যে, পূর্ববঙ্গের যে বিরাট সমস্যা আজ দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা যেন তাহার সমাধানের প্রকৃত পথ অনুসন্ধান করেন। ডাঃ মুখার্জি বলেন, সঙ্কটের সময় দেশের

সাহিত্যিকগণ যে চিন্তাধারার দ্বারা দেশকে প্লাবিত করেন, আজ যেন তাঁহারা সেইরূপ চিন্তাধারার দ্বারা দেশে নূতন যুগের সৃষ্টি করেন এবং বর্তমান সঙ্কট অতিক্রম করিয়া নূতন পথে দেশকে পরিচালিত করেন।"

তবেই হইয়াছে। এই বিষয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা ভাবিবেন বা বলিবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই তাহার সমর্থন করিবেন না, এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কখনই তাহা কাজে লাগাইতে অগ্রসর হইবেন না! পাশাপাশি থাকার দরুন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একমত হইলেও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রামপদ মুখোপাধ্যায় বাগড়া দিতে পারেন; রাজশেখর বসু ও বুদ্ধদেব বসু একপথে চলিতে চাহিলেও মনোজ বসু কখনই সে পথে চলিবেন না। মোটের উপর প্রেমেন্দ্র মিত্র নরেন্দ্র মিত্র, উপেন গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুবোধ ঘোষ অমরেন্দ্র ঘোষ, অজিত দত্ত সরোজ দত্ত এবং বারেন্দ্রকুলতিলক প্রবোধকুমার প্রমথনাথ ও সতীনাথ প্রত্যেকেই যে স্বতন্ত্র মত পোষণ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সাহিত্যিকাদের উল্লেখ করিলাম না; কারণ সকলেই জানেন, তাঁহাদের বারো জনের তেরো হাঁড়ি।

তাহা ছাড়া সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে সাহিত্যিক সম্প্রদায় আশু কোনও সমাধান দিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর কোনও দেশের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দেয় না। তাঁহারা বার্নার্ড-শ'য়ী ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে অথবা রবি-ঠাকুরীয় হৃদয়াবেগে যে পথ নির্দেশ করেন, এক পুরুষ দুই পুরুষ বাদে লোকে সেই পথে চলে। রুশো ভল্‌টেয়ার এবং ফরাসী বিপ্লব; পুশকিন লারমনটফ গোগল টলস্টয় তুর্গেনিভ ও রুশ বিপ্লব; বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বদেশী আন্দোলনের দূরত্বই এই উক্তি প্রমাণ করে।

আমরা গান বাঁধিতে পারি, "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্‌" বা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে" অথবা "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ" বলিয়া সোরগোল তুলিতে পারি এবং "চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌" বলিয়া হাঁক পাড়িতে পারি; কিন্তু কাজ করিবেন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা দেশের তরুণদের সহায়তায়।

শ্যামাপ্রসাদকে সেই দিকেই অবহিত হইতে বলি। সাহিত্যিকরা প্রত্যক্ষ সঙ্কটের কালে কাজের বার, তাঁহাদিগকে মিছামিছি ডাক দিয়া তিনি বৃথা সময়ক্ষেপ করিবেন না।

শ্যামাপ্রসাদের দেখাদেখি আরও অনেকে সাহিত্যিকদের ঘন ঘন ডাক দিতেছেন। মেদিনীপুরে শ্যামাপ্রসাদের সহযাত্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য দেশের বেদনাকে সাহিত্যে রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্ত সাহিত্যিককে ডাক দিয়াছেন। ভাল কথা, কিন্তু তাহাতে আপাতত লেখক ও প্রকাশকের লাভ ছাড়া কাহারও লাভ নাই—লাভ যখন হইবে, তখন উদ্বাস্তু-সমস্তা আর থাকিবে না, হয়তো অন্য সমস্যা দেখা দিবে। ওদিকে কলিকাতার "সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রে" আচার্য নরেন্দ্র দেবও "দৈন্যমুক্ত শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যিকের সর্বশক্তি নিয়োগের দায়িত্ব" ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। সাহিত্যিকরা যেন "প্রকৃত সমাজবাদ" প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন, কারণ, "দারিদ্র্যমুক্ত শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠাই এ যুগের সাহিত্যিকদের প্রধান দায়িত্ব।" কঠিন দায়িত্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্ধ অন্ধের দায়িত্ব লইতে পারে কি না আচার্যদেব তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। অনেকটা কাজের কথা বলিয়াছেন এই মেদিনীপুরে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি রামায়ণ মহাভারত কাব্য উপন্যাসকে দায়িত্ব হইতে রেহাই দিয়া সংবাদপত্র-সাহিত্যকেই যুগসাহিত্যের মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রামায়ণ মহাভারত নিয়া সময় কাটাইবার সময় মানুষের আজ নাই। দ্রুত ধাবমান কালের সুর বর্তমান সংবাদপত্রের ভিতর পাওয়া যায়।" বিবেকানন্দবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি অনেককেই বাঁচাইয়া দিয়াছেন। বিপন্ন শ্যামাপ্রসাদকে আর বেশি হাতড়াইতে হইবে না।

"দ্রুত ধাবমান কালের সুর বর্তমান সংবাদপত্রের ভিতর পাওয়া যায়" কেমনভাবে এবং কতখানি, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা গতকল্যকার (১১. ৬. ৫০) 'যুগান্তরে' পরিবেশন করা হইয়াছে। উক্ত পত্রে কোনও সাহিত্যিক নাড়ুগোপাল (স্টাফ রিপোর্টার) "উদ্বাস্তু তরুণীদের পাপ-জীবনে প্রলুব্ধ করার বেদনাময় কাহিনী" লিপিবদ্ধ করিয়া একসঙ্গে সমাজ-সেবা ও উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদ

দেখিয়া পুলকিত হইবেন, তাঁহার মেদিনীপুরের আহ্বান বিফলে যায় নাই; তাঁহারই সহবক্তা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়-প্রোক্ত "দ্রুত ধাবমান কালের সুর" কি অপরূপভাবে এই লেখাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিবেন। অর্থকরী যৌনবিজ্ঞানের বইয়ে যে সকল গালগল্প শোভা পায়, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্রে সেগুলি মুদ্রিত করিয়া কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ আঘাতে সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পঙ্গু করিবার এই চেষ্টা নিশ্চয়ই ভদ্র সাংবাদিকতা নয়—সাহিত্য এইরূপ হইলে দেশের সর্বনাশ। গুপ্তচর-সম্রাট এই ব্যক্তিটির সমক্ষেই যাবতীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ধর্ষিতা মেয়েরা মনের ব্যথা প্রকাশ করিতে চাহিলেই উনি তাহা শুনিবার জন্য পাশে হাজির থাকেন। ইনি সর্বত্রগামী ও সর্বজ্ঞ বিধাতার মত সবই লক্ষ্য করেন। যথা—"কলিকাতার অন্যতম বিদেশী কায়দার হোটেলে বসিয়া আহার্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি বরিশালের জেলা মহকুমার এক গণ্ডগ্রামের মেয়ে শ্রীমতী……দত্ত বৈদেশিক কায়দায় কাঁটাচামচ ব্যবহারে আমার সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টি আজও উগ্র হয় নাই। তাই আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব দিতে সে ইতস্ততঃ করিয়াছে। কিন্তু ধীরে ধীরে শ্রীমতী……রায় [গালগল্পে 'দত্তে'র 'রায়' হইতে বাধা কি!] তাহার যে ইতিহাস আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে, এই প্রতিষ্ঠানের সে নূতন শিকার। সুরেন ব্যানার্জি রোডের কোন মদের রেস্তোঁরায় যাইয়া প্রথম দেহদানে বাধ্য হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করিতে তাহার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি সে ঘটনাগুলি গোপন করে নাই, কারণ আজও গৃহের শান্ত-জীবন সে বিস্মৃত হয় নাই। এই তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের কর্তার নির্দেশে ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশের লোক তাহাকে উপভোগ করিয়াছে তাহার কদর্য ইতিহাস বর্ণনা করিয়া পাঠকের রুচিবোধে আঘাত করিতে চাই না।"

কি সংযম! কি রুচিবোধ! এই বিকৃত যৌনবিকারগ্রস্ত উন্মাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট আরও অনেক চিত্তচাঞ্চল্যকর বিবরণ ইহাতে আছে। কোনও প্রত্যক্ষ চার্জ না দিয়া এক ঝাপটায় যাবতীয় সেবা-প্রতিষ্ঠান-গুলিকে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা এই প্রচ্ছন্ন লম্পট করিয়াছে—

মহিলা-প্রতিষ্ঠানগুলিও বাদ পড়ে নাই। 'যুগান্তর'কেও বলিহারি যাই! রোমাঞ্চকর অশ্লীল কাহিনী ছাপিয়া কাগজ বিক্রয়ের এই ফন্দি আর যাহাই হউক সাহিত্যসম্মত নয়—'যুগান্তর'-কর্তৃপক্ষকেও তাহা বলিয়া দিতে হইলে লজ্জার কথা। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার "ছোটখাট ব্যবসায়" নিবন্ধে এই 'যুগান্তরে'ই যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই ঠিক। তথ্যটি এই—

"একখানা যুগান্তর কাগজে আট থেকে বারটি ঠোঙা হয়।"

এই ঠোঙাকেও মাঝে মাঝে অস্পৃশ্য করিয়া তোলা হয়, ইহাতেই আমাদের আপত্তি।

—

সম্প্রতি ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হয়, তখন আমরা ইহার কিঞ্চিৎ ভ্রমপ্রমাদ ও অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। দেখিয়া আনন্দিত হইলাম ডক্টর সেন সেগুলি ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে ঋণপাশে জড়াইয়াছেন। ফলে আমাদের একটা দায়িত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তাই যখন দেখিলাম, সেন মহাশয় ১৩৫০ হইতে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা-সাহিত্য-বিষয়ক অনেকগুলি বই—বিশেষ করিয়া পরিষৎ-প্রকাশিত ৭৮ খণ্ড "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত সম্পাদিত ও রচিত কয়েকটি পুস্তকের নূতন সংস্করণ না দেখার দরুন কিছু কিছু ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি দ্বিতীয় সংস্করণেও থাকিয়া গিয়াছে, তখন সেগুলির উল্লেখ কর্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করিলাম। আশা করি, ডক্টর সেন পূর্ববৎ উদারতার সঙ্গে পরের সংস্করণে এগুলি গ্রাহ্য করিবেন।

বইখানি যদি খাঁটি ইতিহাস হইত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নীরব থাকিতাম; কারণ সে ক্ষেত্রে মতামত ও সাহিত্য-বিচারের প্রশ্ন উঠিত। এ বিষয়ে লোকভেদে রুচি ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ডক্টর সেনের বইখানি আসলে উনবিংশ শতকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের একটি তালিকা; কোনও নির্দিষ্ট পাঠাগারের পুস্তক-তালিকা নয়, ইহা অনেকটা পাদরি লঙের ক্যাটালগ-জাতীয়। ইহাতে বইয়ের নাম,

গ্রন্থকারের নাম এবং সন-তারিখই প্রধান। তবে সুকুমারবাবু আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এই নিছক পুস্তক-তালিকাকে একটি কাহিনীর আকারে সাজাইয়াছেন, বড়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে। অনেক খবর আছে, অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কথাও আছে, পড়িতে পড়িতে মনেই হয় না যে তালিকা পড়িতেছি। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। যাহা হউক, নাম সন তারিখ প্রধান বলিয়াই এই বইয়ে সে সব বিষয়ে অসঙ্গতি থাকা সমীচীন নয়। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ডক্টর সেন নির্ভুল হইবার জন্য "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" প্রভৃতি দেখিলেন না কেন? ইহার জবাবে আমরা বলিতে পারি, ইহা ব্যক্তিগত খেয়ালের কথা। আমরা এরূপ একজন খেয়ালীর কথা জানি, যিনি হাওড়া ব্রীজের উপর রাগ করিয়া আজীবন নৌকায় স্টীমারে গঙ্গাপার হইতেন, ভাসমান পুল ব্যবহার করিতেন না। তেমনই কিছু ব্যাপারই হইবে, সে বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন নাই।

ক্যাটালগ দেখিয়া ক্যাটালগ করিতে গিয়া সুকুমারবাবু কয়েক ক্ষেত্রে গোলযোগে পড়িয়াছেন, সেগুলিও ঠিক করিয়া দেওয়া দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ছাত্র সার্জেন্ট (J. Sargent)। ভর্জিলের এনেইদ (Aeneid) কাব্যের প্রথম সর্গের অনুবাদ ইনি করিয়াছিলেন। তাহা ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হইয়াছিল।" J. Sargent নয়, H. Sargent হেনরী সার্জেন্ট; লং তাঁহার তালিকায় ভুল করিয়াছেন, সেন মহাশয় যদ্দৃষ্টং লিখিতে গিয়া সুতরাং ভুল করিয়াছেন—তালিকা-নকলে এইরূপ হয়, অথচ তিনি যে "হেনরী সার্জেন্ট" জানেন না তাহা নয়। ৪২৯ পৃষ্ঠায় "পুনশ্চ" অধ্যায়ের প্রথম শিরোনামাই হইতেছে—"হেনরি সারজেন্টের শ্রীমদ্ভাগবত"—পৃ. ১২-র ক্রস রেফারেন্সও আছে। ইহা নিশ্চয়ই অনবধানতাপ্রসূত হইয়াছে।

যাহা হউক, নাম ও সন-তারিখের ভুল যাহা চোখে পড়িয়াছে, আপাতত তাহার আংশিক তালিকা দিলাম; আগামী বারে আরও দিব। ছাত্রেরা পরীক্ষা-পাসের জন্য এই বই পড়ে; আশা করি, তাহারা সংশোধনের সুযোগ লইবে—পুনঃসংস্করণ না হওয়া পর্যন্ত।

পৃ. ১১ : "ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১২৩০) ও 'নববাবুবিলাস,' অজ্ঞাতনামা লেখকের 'নববিবিবিলাস'..."। 'নববাবুবিলাস'ও ছদ্ম নামে প্রচারিত হয়, কিন্তু তাহার লেখক যে সে-যুগের সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহা সুকুমারবাবু জানেন; জানেন না কেবল 'নববিবিবিলাসে'র প্রকৃত রচয়িতা কে। 'নববিবিবিলাস' ১৭৫৪ শকে (ইং ১৮৩২) গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছদ্ম নামে প্রকাশিত হইলেও, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই উহার লেখক। সুকুমারবাবু তাঁহার গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠায় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২) নামক পুস্তিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; পুস্তিকাখানির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই যে 'নববিবিবিলাসে'র লেখক, তাহা জানিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না; রঙ্গলাল লিখিয়াছেন:—"ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবুবিলাস বিবিবিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে।"

পৃ. ৩৬ : সুকুমারবাবু ডাঃ দুর্গাদাস করের 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক' (১৮৬৩) সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"প্রকাশকের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে নাটকখানি ১২৬২ সালের দিকে বরিশালে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল।" কিন্তু নাটকখানি যে "অভিনীত হইয়াছিল"ই, এমন কথা প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে নাই; উহাতে আছে:—"প্রায় আট বৎসর অতীত হইল কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়।...ঢাকা ১২৭০ সাল...।" প্রকৃত পক্ষে ১২৬২ সালে তো দূরের কথা, পুস্তক-প্রকাশের ১৪ বৎসর পরে, ১২৭৬ সালে নাটকখানি প্রথম বরিশালে অভিনীত হয়। ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৭৯)

পৃ. ১৩১ : সুকুমারবাবু বলদেব পালিত-লিখিত 'কর্ণার্জ্জুন কাব্যে'র ভূমিকার এই অংশ—

"সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা পদ্যে সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু এতদ্দেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে, ঐ সকল ছন্দ সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার 'ভর্ত্তৃহরি কাব্যই' ইহার

দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণবশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায় আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না।"

উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিতেছেন:—"অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ললিত-কবিতাবলী'-তে (১৮৭০) ও 'কাব্যমালা'-য় (১৮৭১) সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বই দুইটি বলদেব পালিতের লেখা বলিয়া মনে করেন। উপরে উদ্ধৃত বলদেবের কথাই এই অনুমানের বিরুদ্ধে যায়।"

"উপরে উদ্ধৃত বলদেবের কথা" ১৮৭৫ সনে লিখিত, কিন্তু 'কাব্যমালা' (প্রকাশকাল ১৮৭০, —১৮৭১ নহে) ও 'ললিত কবিতাবলী' (১৮৭০) উহার পাঁচ বৎসর পূর্বে, এমন কি 'ভর্তৃহরি কাব্যের'ও পূর্বে, সংস্কৃত ছন্দে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথাই 'কর্ণার্জ্জুনে'র ভূমিকায় বলিয়াছেন। 'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী' যদি 'ভর্তৃহরি কাব্য' (১৮৭২) বা 'কর্ণার্জ্জুন কাব্যে'র পরে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলেই সুকুমারবাবুর যুক্তি খাটিতে পারিত।

'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী' একই লেখকের রচনা, কারণ 'ললিত কবিতাবলী'র আখ্যাপত্রে আছে—"কাব্য-মালা-রচয়িতৃপ্রণীত ও প্রকাশিত"। 'ললিত কবিতাবলী' সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত তালিকায় আছে—"Pub. by Baldeb Palit of Bankipoor," সুতরাং 'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী' যে বলদেব পালিতেরই রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৃ. ১৯০: সুকুমারবাবু লিখিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' প্রকাশিত হয় "পুস্তিকা-আকারে (১৮৭৫)।" ইহা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৭ ও ১৮৮১ সনে প্রকাশিত 'উপকথা'র সহিত দুই বার 'রাধারাণী' মুদ্রিত হয়। ১৮৮৬ সনে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসে' ইহা ৩য় সংস্করণ-রূপে মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের এই অংশই স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রথম বাহির হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, —১৮৭৫ সনে নহে।

পৃ. ১৯৪: শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে'র প্রথম প্রকাশকাল ১৩২৫ সাল,—"১৩২৫" নহে।

পৃ. ১৯৭: "দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুরুচির কুটীর' (১২৯১)।" সুকুমারবাবু বোধ হয় জানেন না যে, এই উপন্যাসখানি দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল; প্রথম ভাগের প্রকাশকাল—মাঘ ১২৮৬; দ্বিতীয় ভাগের ১২৯১ সাল।

পৃ. ২৫৩ : "অজ্ঞাতনামা লেখকের 'বীরনারী' (১৮৭৫)।" এই অজ্ঞাতনামা লেখক 'সুরুচির কুটীর'-প্রণেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিই যে ইহার লেখক, তাঁহার একখানি পত্রেও তাহার উল্লেখ আছে ('জন্মভূমি,' পৌষ ১৩০৪)।

পৃ. ২৬১ : "'জনৈক ডাক্তার প্রণীত' 'ডাক্তার বাবু নাটক' (১৮৭৫)।" এই "জনৈক ডাক্তার" যে প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ ভুবনমোহন সরকার, বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত পুস্তক-তালিকায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা ১৩৫২ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৬২ : "বঙ্গবিলাস মজুমদারের 'হাতে হাতে ফল' (১৮৮২)।" সুকুমারবাবুর জানিয়া রাখা ভাল যে, ইহা ছদ্ম নাম। প্রহসনখানি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্মিলিত রচনা। ইন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মকথায় বলিয়াছেন :—"সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসাতেই অক্ষয় দাদা আর আমি দুই জনে 'হাতে হাতে ফল' নাম দিয়া এক প্রহসন লিখিয়াছিলাম।"

"'বিষ্ণুশর্ম্মা'র 'কপালে ছিল বিয়ে' (১৮৭৮)" নাটিকাখানি 'হেলেনা'-কাব্যের লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র 'বিষ্ণুশর্ম্মা' এই ছদ্ম নামে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত,' পৃ. ২৪৬ দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৯০ : "অমৃতলালের অপর নাটক...'হরিশ্চন্দ্র' (১৩০৬)।" 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক অমৃতলাল বসুর রচনা নহে ; উহার লেখক সে-যুগের খ্যাতনামা নাট্যকার কবিরাজ নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন ('জন্মভূমি,' আষাঢ় ১৩০৫, পৃ. ৯৯)। সুকুমারবাবু প্রথম সংস্করণের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক চোখে দেখেন নাই বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই ; আছে কেবল—"শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্তৃক প্রকাশিত।" রচয়িতা হইলে অমৃতলাল কখনও এরূপ ভাবে নিজের নাম দিতেন না। নাটকখানির পরবর্তী সংস্করণগুলিতে "প্রকাশক" গ্রন্থকারে রূপান্তরিত হইয়াছেন ; তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রে আমরা দেখিতেছি—"শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্তৃক প্রণীত।" এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ১৩৫৪ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩০২ : সুকুমারবাবু বলেন, "হরিরাজ অমরেন্দ্রনাথের লেখা না হওয়াই সম্ভব।...হরিরাজের লেখক সম্ভবত নগেন্দ্রনাথ বসু।" 'হরিরাজে'র

লেখক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বা নগেন্দ্রনাথ বসু কেহই নহেন—ইনি নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণের পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় গ্রন্থকার-রূপে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নাম পাওয়া যাইতেছে। আমরা ৪র্থ সংস্করণের 'হরিরাজ' (১৩১৭) দেখিয়াছি; উহার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার-রূপে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নাম মুদ্রিত আছে।

পৃ. ৩২৬: এইবার সুকুমারবাবুর একটি মারাত্মক ভুলের উল্লেখ করিব। এত দিন আমাদের জানা ছিল, ১৮৭৫ সনে নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সুকুমারবাবু ইহা মানিতে নারাজ; তিনি বলিতেছেন, 'পলাশির যুদ্ধে'র ১ম সংস্করণের প্রকাশকাল— ১৮৭৬ সন; কেন না, গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে তিনি "মাঘ ১২৮২" (ইং ১৮৭৬) এই তারিখ পাইতেছেন। সুকুমারবাবু নিশ্চয়ই ১ম সংস্করণের 'পলাশির যুদ্ধ' চোখে দেখেন নাই; সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে উহা আছে (নং ১৩৬৮৭); পাতা উল্‌টাইলেই দেখিবেন, উৎসর্গ-পত্রে "১লা মাঘ" নাই; আছে—"১লা বৈশাখ," অর্থাৎ এপ্রিল ১৮৭৫। প্রকৃতপক্ষে তিনি ১৮৭৭ সনে ঢাকায় মুদ্রিত ২য় সংস্করণ (পুস্তকে সংস্করণের উল্লেখ না থাকিলেও বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় আছে) 'পলাশির যুদ্ধ' দেখিয়াছেন; উহাতে এবং পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ভুলক্রমে উৎসর্গ-পত্রের তারিখটি "১লা বৈশাখ" স্থলে "১লা মাঘ" ছাপা হইয়া আসিতেছে। এই ছাপার ভুলই সুকুমারবাবুকে ভ্রান্ত করিয়াছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করিলে তিনি এই ভুল এড়াইতে পারিতেন। 'পলাশির যুদ্ধ' ১২৮২ সালের মাঘ মাসে (ইং ১৮৭৬) প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, উহার সমালোচনা ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'আর্য্যদর্শনে,' আষাঢ় মাসের 'জ্ঞানাঙ্কুরে' ও কার্তিক মাসের 'বঙ্গদর্শনে' (প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বেই) কেমন করিয়া প্রকাশিত হয়? প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় 'পলাশির যুদ্ধে'র সঠিক প্রকাশকাল—১৫ এপ্রিল ১৮৭৫ দেওয়া আছে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার

(পূর্বানুবৃত্তি)

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে অনবধানতা

কোন কোন গ্রন্থকার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পুস্তক ধরাইবার অভিপ্রায়ে লেখেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক বিষয়ের পরীক্ষক; কেহ লেখেন, তিনি অমুক অমুক কলেজের সেই বিষয়ের অধ্যাপক; কেহ স্বীয় নামের পরে প্রাপ্ত উপাধির তালিকা দেন। মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের এক পাঠ্যপুস্তকে দেখিলাম, গ্রন্থকার তাঁহার গুণাবলী ও চরিতাবলী বর্ণনা করিয়া আধ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এইরূপে কেহ কেহ সম্ভ্রম হারাইতেছেন। মাতৃকা-পরীক্ষার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় দুই-তিনটি বিষয়ে নিজের সংগ্রহ-পুস্তক ব্যতীত অপরাপর বিষয়ের নিমিত্ত গ্রন্থকারদিগের লিখিত পুস্তক অনুমোদন করিয়া থাকেন। এক এক বিষয়ে ১৫।২০ খানা করিয়া পুস্তক অনুমোদিত হইয়াছে। অনেক গ্রন্থকার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে স্ব স্ব গ্রন্থ উপহার পাঠাইয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় সে সকল উপহৃত পুস্তকমধ্যে একখানা বাছিয়া লইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারাও গ্রন্থকার-প্রতিপালনের দ্বিতীয় দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একই বিষয়ের সমুদয় অনুমোদিত পুস্তক উনিশ-বিশও নয়। সকল পুস্তক অনুমোদনযোগ্য বলিতে পারা যায় না। শিক্ষাধিকর্তার নিযুক্ত এক পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন-সংসদ (Text Book Committee) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করেন। তাঁহারা সকল পুস্তক পড়িয়া, বুঝিয়া অনুমোদন করেন কিনা, আমার সন্দেহ হইতেছে। একটা উদাহরণ দিই। তাঁহারা ভূগোলের পুস্তক অনুমোদন করিবার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট ভূগোল পাঠ্যপ্রপঞ্চ (Syllabus) পড়িয়া থাকেন কি? আমার কৌতূহল হইয়াছিল। ভূগোলের তিনখানি পুস্তক দেখিয়াছি। দুইখানি প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার, একখানি ৬৫০ পৃষ্ঠার। কেমন করিয়া ভূগোলের কলেবর এত স্ফীত হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে দেখিলাম, শিক্ষাপ্রপঞ্চের অতিরিক্ত অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আর, যে কথা পাঁচ-সাতটি বাক্যে বলিতে পারা যায়, তাহা বলিতে এক পৃষ্ঠা গিয়াছে। তথাপি অস্পষ্টতা দূর হয় নাই। আর, স্থানে স্থানে ভুল ব্যাখ্যা যে না হইয়াছে, এমনও নয়। আমার বিবেচনায়, পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন-সংসদ পুস্তকের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বিষয়ে দৃঢ়মত নহেন। যে বই যত বড়, সে বই তত ভাল, এই অবসিদ্ধান্ত সংসদের বিচার-শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তই সত্য। যে বই যত ছোট, সে বই তত ভাল। কারণ, ছোট বই অনেকবার পড়িতে পারা যায়, মনে থাকে। আর স্বল্পবাক্যে যে তথ্য ব্যক্ত হয়, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। সুস্পষ্ট, ললিত ও গাঢ় রচনায় গ্রন্থকারের গুণপনা। ইংরেজীর অনুবাদ করিলে, কিংবা ইংরেজীতে ভাবিয়া বাংলা ভাষায় লিখিলে রচনা স্বল্প, সুখবোধ্য, সংযত ও লঘু হয় না। যে পুস্তকের এই চতুর্বিধ গুণ আছে এবং যাহার মূল্য অল্প, সে পুস্তকই পাঠ্য হওয়ার যোগ্য। এই বিধি প্রবর্তিত হইলে উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচিত হইতে থাকিবে এবং শিক্ষার ব্যয় লাঘব হইবে।

মাতৃকা-পরীক্ষার নিমিত্ত অসংখ্য বই

নবম ও দশম বর্ষের পাঠ্য-সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হয়। আমি এখানকার জেলা ইস্কুলের দশম বর্ষের পাঁচটি ছাত্রকে ডাকিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম ছাত্র ছিল, অধম কেহই ছিল না। সকলেই বলিল, "আমরা ইংরেজী ছাড়া আর সকল বিষয় বাংলায় পড়িতেছি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজীতে প্রশ্ন করেন। আমরা সকলে সে প্রশ্ন বুঝিতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অব্যবস্থার জন্য আমাদের কেহ কেহ ফেল হয়, কেহ কেহ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ না হইয়া তৃতীয় বিভাগে হয়। যদি ইংরেজীতেই প্রশ্ন করিতে হয়, আমাদের ইংরেজী পড়িতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। এখন দুইটা ভাষায় পরিভাষা শিখিতে হইতেছে। তাহাও সোজা ভাষা নয়।"

"কোন্ বই তোমাদের কঠিন মনে হয়?"

"বাংলা ব্যাকরণ ভীষণ!"

কেহ বলিল, "ইহা বি. এ ছাত্রদের জন্য, আমাদের জন্য নয়।"

অপর একজন বলিল, "আমি ব্যাকরণের মাত্র সন্ধি ও সমাস পড়ি।"

ভূগোল সম্বন্ধে বলিল, "ভূগোল পরীক্ষার পূর্ণমূল্য ৫০ অঙ্ক। কিন্তু সেজন্ত চার-শ, পাঁচ-শ পৃষ্ঠার বই পড়িতে হইতেছে। সকল পাঠ্যের পরীক্ষার পূর্ণমূল্য ৮০০ শত। তন্মধ্যে ভূগোলে ৫০। অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল জ্ঞানের মূল্য এক আনা ধরিয়াছেন। কিন্তু পাঠ্য বইখানি বিপুলায়তন। কাজেই আমরা 'Sure Success' পড়ি, আর স্বচ্ছন্দে পাসও হই।"

এখানকার এক বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঁচটি বালিকাকে ডাকিয়া উক্ত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহারাও ইংরেজীতে প্রশ্নহেতু দুঃখ করিতেছিল। আর, ব্যাকরণ অপেক্ষা ইংরেজীর বই কঠিন বলিল।

ছাত্রেরা "Sure Success", আর অসংখ্য "Help", "Made Easy", "Notes" ইত্যাদি পড়ে। কেহ কেহ এই সকল বহির প্রচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া থাকেন। আমি কিন্তু মনে করি, এই সকল বই শিক্ষকের পরম সহায় হইয়াছে। তাঁহারা ছাত্রকে যাহা শিখান নাই, পাঠ্যগ্রন্থে যাহা অল্পবাক্যে স্পষ্ট হয় নাই, তাহা ছাত্রেরা এই সকল বই হইতে পাইতেছে। শুধু বিদ্যালয়ে নয়, মহাবিদ্যালয়ে বি. এ পরীক্ষার্থী ছাত্রেরাও নোটবই দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতেছে। বি. এ পরীক্ষার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ইতিহাসের পুস্তক-সংখ্যা এত অধিক যে, কেহ সে সমুদয় পড়িতে পারে না ও চক্ষে দেখেও না। 'পাঠ্যসহায়'ই প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠা। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম, অধিকাংশ ছাত্র notes পড়ে; পাসও হয়। এই অবস্থায় পাঠ্যসহায় ও 'বোধিকা'র প্রয়োজন অস্বীকার করিলে অবিবেচনার কাজ হইবে। শিক্ষক মহাশয় 'বোধিকা' বাছিয়া দিবেন, স্মরণ রাখিবেন, যে বই যত বড় সে বই তত ভাল নয়।

এখানে বাঁকুড়া জেলা ইস্কুলের দুই ছাত্রকে তাহাদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠসংখ্যা গণিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। একজন এইরূপ দিয়াছে,—

বিষয়	পৃষ্ঠসংখ্যা	মূল্য
ইংরেজী :—		
১। Select Reading from English Prose	৫৪	

	বিষয়	পৃষ্ঠসংখ্যা	মূল্য
২।	Notes on English Prose	৩৬৬	
৩।	David Copperfield	৯৯	
৪।	Notes on David Copperfield	৬৩০	
৫।	Practical English Grammar & Composition	৩২৩	
৬।	Lahiri's Select Poems	৩২	
৭।	Notes on English Poems	৩২৪	
৮।	Matriculation Translation	৫৩৬	
৯।	Precis, Substance & Letter-writing	২১২	
১০।	Oriental Tales	৯৩	
১১।	Heroes through the Ages	১৫২	
		মোট ২৮২১	।/০

বাংলা :—

১।	Matriculation Bengali Selections	১৫০	
২।	Notes on Bengali Selections	৪১৬	
৩।	বাংলা ব্যাকরণ	৩৭৪	
৪।	ছেলেবেলা	৬৩	
৫।	বাংলার মনীষী	১৬৮	
৬।	বাংলা রচনা প্রবেশিকা	৫০০	
		মোট ১৬৭১	।০

গণিত :—

১।	পাটিগণিত	৭৬৫	
২।	বীজগণিত	৫৫৭	
৩।	জ্যামিতি	৩২২	
		মোট ১৬৪৪	৵০

বিষয়		পৃষ্ঠসংখ্যা	মূল্য
সংস্কৃত :—			
১।	Matric Sanskrit Selections	৭৪	
২।	ব্যাকরণ কৌমুদী	৭৫০	
৩।	সংস্কৃত গদ্যের 'বোধিকা'	৪৮৮	
৪।	সংস্কৃত পদ্যের 'বোধিকা'	২৩১	
		মোট ১৫৪৩	৶০
ইতিহাস :—			
১।	ভারতের ইতিহাস	৪৩৮	
২।	ব্রিটেনের ইতিহাস	৩৫০	
		মোট ৭৮৮	৶০
ভূগোল :—	... ...	৩১৩	/০

মোট পৃষ্ঠসংখ্যা ৮৭৮০ ; পূর্ণমূল্য ১৲

দ্বিতীয় ছাত্রের লিখিত পৃষ্ঠসংখ্যা ১০০৪৯। দুইজনের কোন কোন 'বোধিকা' এক না হওয়াতে পৃষ্ঠসংখ্যায় প্রভেদ হইয়াছে। উপরে ভূগোল ৩১৩ পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ ভূগোল ৪৫০ পৃষ্ঠা। ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠসংখ্যা দিয়াছে; পাঠ্য অংশ কিছু কম হইবে। তৎসত্ত্বে দেখা যাইতেছে, ছাত্রকে দুই বৎসরে অন্তত ৮০০০ হাজার পৃষ্ঠা পড়িতে হয়। আর সে আট হাজার পৃষ্ঠার বারো আনা মুখস্থ না করিলে নয়। সকল শিক্ষকই জানেন, যে ছাত্রের স্মৃতিশক্তি প্রখর, সে কিছু না শিখিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে।

ইহার কুফল

এত ইংরেজী ও বাংলা বই পড়িয়াও ছাত্রের ইংরেজী ও বাংলা ভাষাজ্ঞান কেমন হয়, তাহা বলিতে হইবে না। দুইটি কারণে তাহাদের জ্ঞান হয় না। (১) ইংরেজী ও বাংলার পাঠ্যপুস্তক ভাষা-শিক্ষোপযোগী না হইয়া সাহিত্য-সংগ্রহ হইয়াছে। প্রয়োজন ভাষাজ্ঞান। সাহিত্য নয়, ভাষা, ভাষা, ভাষা। (২) পাঠ্য যত

অধিক, বিদ্যা তত উন। ইংরেজী ও বাংলার আড়ম্বর কমাইয়া দাও, ভাষা শিখাইবার চেষ্টা কর, দেখিবে ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বাড়িয়াছে; শুদ্ধ ভাষায় লিখিতে ও কহিতে পারিতেছে। এত পাঠ্যপুস্তক, সব মুখস্থ-বিদ্যা! মুখস্থ-বিদ্যার গুণ আছে, কিন্তু প্রয়োগের সময়ে কুলায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবী ছাত্রের নিমিত্ত একটা অতিরিক্ত বিষয় ছাত্রের ইচ্ছাধীন পাঠ্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে সামান্য বিজ্ঞান প্রথম স্থানে আছে। দুইখানি বিজ্ঞানের বই দেখিয়াছি; বড় বড় পণ্ডিতের রচনা। কিন্তু অল্প পণ্ডিত বালকদের সহিত মিশিয়া থাকেন এবং তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া থাকেন। যাহাঁদের এই অভিজ্ঞতা থাকে না, তাহাঁদের রচিত বালপাঠ্য পুস্তকে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিপ্রায় অনুসারে প্রত্যেকখানিতে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, জীবন-বিদ্যা, ভূত-বিদ্যা (পদার্থ-বিদ্যা) ও কিমিতি-বিদ্যা (রসায়ন) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পাঠ্য পরিপাটী দেখিলে মনে হয় যে, পাঠ্য-নির্বাচন-সংসদ (Board of Studies) পৃথক্ পৃথক্ পাঠ্য নির্দেশ করিয়াছেন; সকলে মিলিত হইয়া সংস্থাপনা (Co-ordination) করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় দেখিতেছি, প্রাণী-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা ও জীবন-বিদ্যা চিত্রদ্বারা শিখাইতে হইবে। কেবল ভূত-বিদ্যা ও কিমিতি-বিদ্যায় ছাত্রেরা কিছু কিছু পরীক্ষা দেখিবে। ইহা হইতে বোধ হইতেছে, ছাত্রেরা প্রথম তিন বিদ্যা বই পড়িয়া শিখিবে। তাহা হইলে এই সকল বিদ্যার নিমিত্ত রচনা-প্রণালী ভিন্নরূপ করিতে হইবে। আমার বিবেচনায়, বিজ্ঞানের পাঠ্য-প্রপঞ্চের কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যক।

প্রাকৃতিক ভূগোল ও সামান্য বিজ্ঞানের আবশ্যক পরিভাষা সম্বন্ধে অনেক কথা মনে আসিতেছে। কিন্তু এখানে বলিতে গেলে পালা শেষ হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা-সংসদ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে পরিভাষা কেমন হইয়াছে, আমি জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত সংসদ-নির্মিত পরিভাষা বাংলা ভাষায় চালাইতেছেন, বাংলা

ভাষায় অঙ্গীভূত হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা অবশ্যকর্তব্য। একটা সামান্য উদাহরণ দিই। বহুকাল পূর্বে থার্মমিটার বাংলায় 'তাপমান' হইয়াছিল। ফলে, যে যন্ত্র বাস্তবিক তাপমান, তাহার বাংলা শব্দ পাওয়া যায় নাই। এইরূপ, Geometry-র বাংলা নাম 'জ্যামিতি' হইয়াছে। কিন্তু জ্যা শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ধনুর জ্যা বা গুণ। ইহা পূর্ণ-জ্যা। আর অর্ধ-জ্যা শব্দের অর্থ ইংরেজী Sine of an angle. ইহা হইতে কোটির জ্যা, উৎক্রম-জ্যা ইত্যাদি আসিয়াছে। বাংলায় ত্রিকোণমিতি লিখিতে হইলে কোণের জ্যা, কোটির জ্যা ইত্যাদি অবশ্য লিখিতে হইবে। তখন জ্যামিতি নাম কোথায় দাঁড়াইবে? Geometry-র পূর্বনাম ক্ষেত্রতত্ত্ব ছিল। কোন একটা শব্দ চলিয়া সেটা ভুল হইলেও চিরকাল রাখিতে হইবে, এমন কথা নয়। সে যাহা হউক, সামান্য ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচনে গ্রন্থকারেরা সম্যক অবহিত হইতেছেন না। বাংলা ভাষা 'বৃহৎদিবা', 'ক্ষুদ্ররাত্রি,' 'নদীর কারুকার্য,' 'কঠিন ও কোমল জল' ইত্যাদি শব্দ কিছুতেই সহিতে পারিবে না।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভূত সপ্তবিদ্যার মধ্যে ছাত্রেরা দুই-তিনটি বিদ্যা পড়ে। অপর বিদ্যা পড়া বিদ্যা, মনে রাখিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে না। ছাত্রেরা নানা বিষয়ের নাম শুনিতেছে, কিন্তু তাহাদের জ্ঞান জন্মিতেছে না। পড়া বিদ্যা দুই দিনেই লুপ্ত হয়। অল্প হউক, যেটুকু শিখিবে, সেটুকু সম্যক বুঝিবে ও মনে রাখিতে পারিবে, ইহাই শিক্ষাবিদ্‌গণের কাম্য। ইহা বর্তমান বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে দুর্লভ।

পাঠ্যের পরিবর্তন আবশ্যক

বিদ্যালয়ের পাঠ্যের কি পরিবর্তন চাই, এক্ষণে লিখিতেছি। যাবতীয় উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় একই প্রকৃতির হওয়াতে কয়েকটি দোষ ঘটিয়াছে।

(১) সকল বালক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য মনে করা হইতেছে; বস্তুতঃ তাহা নহে।

(২) কেবল বিদ্বান্ দ্বারা সমাজ চলে না, সমাজে অন্য নানাবিধ

কর্মের নিমিত্ত নানাবিধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আমার 'শিক্ষাপ্রকল্পে' বিদ্যালয় ও শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি। আরও একটি কথা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় বালক-বালিকার ভবিষ্যৎ কর্মভেদ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে উভয়কে সমান বিবেচনা করিয়া অপর বিষয়ে পৃথক্ ভাবিতে হইবে, এবং তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিধান করিয়াছেন যে, ছাত্রকে ইংরেজী ব্যতীত অপর সকল বিষয়ের উত্তর বাংলা, আসামী, হিন্দী ও উর্দু, এই চারি ভাষার মধ্যে যে কোনও একটা ভাষায় লিখিতে হইবে। অতএব, বুঝিতে পারা যাইতেছে, সকল বিষয়ের বইও এই চারি ভাষায় রচিত হইয়াছে। সে সকল বই কেমন হইয়াছে, জানি না। কিন্তু বুঝিতেছি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এক হয় নাই। এই চারি ভাষার মুখ চাহিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজীতে প্রশ্ন করেন। চারি ভাষায় অভিজ্ঞ তিন-চারি পরীক্ষক উত্তর বিচার করেন। কিরূপে সমতা রক্ষিত হয়, জানি না। আর, এই চারি ভাষার জন্যই ছাত্রকে ইংরেজী পরিভাষা শিখিতে হইতেছে। ইহা এক বিষম ব্যাপার হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই বিধান করা উচিত, যে ছাত্র বঙ্গদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রার্থী হয়, তাহাকে বাংলা ভাষা অবশ্য শিখিতে হইবে এবং বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে। ইহা না করিলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ও পরীক্ষার সমতা রক্ষিত হইবে না। বঙ্গে বাঙ্গালীর বাস। বাংলা তাহাদের মাতৃভাষা। ইহা হিন্দী বা উর্দুভাষীর দেশ নয়। এখন আর আসামীর চিন্তাও করিতে হইবে না, আসামে পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কতজন অধিবাসীর মাতৃভাষা হিন্দী অথবা উর্দু?

(৪) পাঠ্যপুস্তক-অনুমোদন-সমিতিতে অন্ততঃ অর্ধেক সামিতিক বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক হইবেন। শিক্ষকেরাই ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার লইয়াছেন। কোন্ পুস্তক ছাত্রের উপযোগী, তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই সমিতি পুস্তকের রচনারীতি, ভাষা ও পৃষ্ঠসংখ্যা বিষয়ে অবহিত হইবেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন, ছাত্র মধ্য বাংলা বা বৃত্তি

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; পাটিগণিতের অনেক শিখিয়াছে; ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও মোটামুটি জানিয়াছে। তাহারা মাতৃকা-পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের অধিকাংশ শিখিয়াছে। যাহা শিখিয়াছে, তাহা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন কি? ভূগোলের গোলত্বের চতুর্বিধ প্রমাণ কতবার শিখিবে?

(৫) ছাত্র বিদ্যালয়ে সপ্তম বর্ষে ইংরেজী আরম্ভ করিবে। চারি বৎসরে সোজা ইংরেজী ভাষা, যেমন Æsop's Fables, অক্লেশে শিখিতে পারা যায়। অতি অল্প বয়সে আরম্ভ করে বলিয়াই ছয় সাত বৎসর লাগে। সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের ইংরেজী ও বাংলা বই পরিবর্তিত হইবে। অন্য সকল বিষয়ের পুস্তক চারি বৎসর পড়িবে।

(৬) চিত্র-লিখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু এমন অবহেলিত আর একটি বিষয়ও নাই। সামান্য চিত্র-লিখন অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত অবশ্যক করিতে হইবে।

(৭) শিক্ষা-পরিপাটী নিম্নলিখিত-রূপ হইবে,—

১। বাংলা।

(ক) বাংলাভাষা-শিক্ষার উপযোগী প্রবন্ধমালা।

(খ) বাংলা ব্যাকরণ। এমন ব্যাকরণ চাই, যদ্দ্বারা বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে ও কহিতে পারা যায়।

(গ) পত্র লিখিবার ধারা।

২। সংস্কৃত (অথবা আরবী কিংবা ফারসী)।

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ।

(খ) পঞ্চাশটি চাণক্য-শ্লোক।

(গ) সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ কৌমুদী।

৩। গণিত।

(ক) পাটিগণিত। (খ) বীজগণিত। (গ) পরিমিতি (পৃষ্ঠফল ও ঘনফল নির্ণয়)।

৪। ভূগোল বিবরণ।

৫। ভারতের ইতিহাস। ইহাতে প্রজাতন্ত্র ভারতের শাসন-ব্যবস্থা থাকিবে।

৬। স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

৭। বিজ্ঞান। প্রকৃতির সহিত চাক্ষুষ পরিচয়। এ বিষয়ের পুস্তক শিক্ষকের প্রতি উপদেশ-স্বরূপ হইবে। ইহাতে কিছু কিছু শ্রৌত পরিচয়ও থাকিবে। ছাত্র যাহা দেখিবে, যথাসম্ভব তাহা চিত্রে লিখিবে।

৮। ইংরেজী।

(ক) ভাষা শিক্ষার উপযোগী ছোট গল্প।

(খ) ছোট ব্যাকরণ।

বালিকারা পরিমিতির পরিবর্তে গৃহস্থালী শিক্ষা করিবে। সে গৃহস্থালী ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ নয়, বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহস্থালী, ইহার মধ্যে সূচিকর্ম অবশ্য থাকিবে। বিশ্ব-কলালয়ে প্রবেশের নিমিত্ত আমার 'শিক্ষাপ্রকল্পে' যে পাঠ্য-পরিপাটী দিয়াছি, তাহাই পর্যাপ্ত হইবে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা-বিভীষিকা

পূর্বে লিখিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়কে মাতৃকা-পরীক্ষার গুরুভার হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগের দ্বৈতশাসনের পরিবর্তে মধ্যশিক্ষা-সংসদ কর্তৃত্ব করিবেন। তাঁহাদের বিবেচনার নিমিত্তই বর্তমান বিদ্যালয়ের ও মাতৃকা-পরীক্ষার সমালোচনা করিলাম। এখন মাতৃকা-পরীক্ষা, এই নাম পরিত্যাগ করিয়া মধ্য পরীক্ষা এই নাম রাখা সমীচীন হইবে। আর একটি গুরুতর বিষয় আছে। সেটি ভীষণ বার্ষিক পরীক্ষা, যাহার ভয়ে বালক-বালিকারা সর্বদা উদ্‌বিগ্ন থাকে। তাহাদের আহারে, নিদ্রায়, খেলায়, কৌতুকে সুখ থাকে না। আর, মাতৃকা-পরীক্ষার পূর্বে তাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া শুখাইয়া আধখানি হইয়া যায়। উচ্চতর শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীরও সেই দশা ঘটে। তাহাদের মুখ দেখিলে দয়া হয়। মনে হয়, থাক্‌ পরীক্ষা, থাক্‌ পাস। এখানে যাহা বলিতেছি, তাহা সকল বিদ্যালয়ের প্রতি প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। দুই মাস অন্তর পরীক্ষা। বঙ্গদেশে গ্রীষ্মকাল স্বাস্থ্যকর। সে সময়ে বিদ্যালয়ে ছুটি হইবে না। বর্ষাকালে দেড় মাস, পূজার ছুটি এক মাস, আর ছোটখাট পূজাপার্বণে ১৫ দিন; এই তিন মাস ছুটি। অবশিষ্ট নয় মাসে অন্তত ছয়টি

পরীক্ষা। আর, বর্ষশেষে একটি অন্ত্য-পরীক্ষা। দেড় মাসে বালক-বালিকা যতটুকু পড়িবে, শুধু ততটুকুর পরীক্ষা হইবে। এক ঘণ্টায় উত্তর লিখিবে। তিন দিনে সমুদয় বিষয়ের পরীক্ষা হইবে। কভু শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিবেন, তিনিই উত্তর দেখিবেন। কভু অন্য শিক্ষক উত্তর দেখিবেন এবং প্রধান শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন। বালক-বালিকা প্রত্যহ যেমন বিদ্যালয়ে যায়, তেমনই যাইবে। পরীক্ষার নিমিত্ত বিশেষ কিছুই আয়োজন করিতে হইবে না। প্রথম প্রথম তাহারা দেখাদেখি করিতে পারে; ইহা নিবারণের নিমিত্ত দুই বর্ষের বালককে দুই পৃথক্ ঘরে বসাইতে হইবে। এক শ্রেণীর ১, ৩, ৫ ইত্যাদির মধ্যে অন্য শ্রেণীর ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমে বসিবে। বোধ হয়, পরে ছাত্রেরা দেখাদেখির লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য ২৪ অঙ্ক। বর্ষশেষের অন্ত্য-পরীক্ষায় সমগ্র পাঠ্যের পরীক্ষা হইবে। এই পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য ৮০ অঙ্ক। ছাত্রেরা তিন ঘণ্টায় সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিবে এবং ছয় দিনে পরীক্ষা সমাপ্ত হইবে। এই সকল পরীক্ষার ফল একখানি বহিতে লিখিত থাকিবে এবং অন্ত্য-পরীক্ষার ফলের সহিত যুক্ত হইয়া ছাত্রের শিক্ষার পরিমাণ নিরূপিত হইবে। শতকে ৪০ অঙ্ক না পাইলে কোনও ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না। ছাত্র ৫০ অঙ্ক পাইলে দ্বিতীয় বিভাগ ও ৬০ অঙ্ক পাইলে প্রথম বিভাগ ধরা হইবে। বিদ্যালয়ের অন্ত্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিজ্ঞানালয়ে এবং শিক্ষালয়ের অন্ত্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র বিশ্ব-কলালয়ে প্রবেশের অধিকার পাইবে।

দুই মাস অন্তর পরীক্ষার রীতি প্রবর্তিত হইলে পরীক্ষার জন্য ছাত্রের ভয় কমিয়া যাইবে এবং শিক্ষক কোন্ ছাত্র কোন্ বিষয়ে কাঁচা, তাহা অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। এখন বর্ষান্তে "তুমি ফেল হইয়াছ, প্রমোশন পাইবে না, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারিবে না," এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনাইয়া ছাত্রের মর্মান্তিক বেদনা জন্মাইতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রচনা

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য অবলোকন করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অভিপ্রেত শিক্ষাকার্য ছয় শাখাতে (Faculties) বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—(1) Arts, (2) Science, (3) Law, (4) Medicine, (5) Engineering, ও (6) Commerce. এই কার্য-বিভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, Science বহুকাল পরে যুক্ত হইয়াছে। কারণ, Medicine ও Engineeringকে Science-এর বহির্ভূত করা হইয়াছে। অল্পদিন হইল Commerce শাখা নূতন যুক্ত হইয়াছে। এতদিন ইহা Arts-এর মধ্যে ছিল।

এই ছয় শাখা পাঠ্য নির্ধারণের নিমিত্ত বাইশটি বিষয়ে বাইশটি পাঠ্য-নির্ধারণ-সমিতি (Boards of Studies) গঠন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পঞ্জিকায় এই বাইশটি বিষয়ের নাম আছে। এই পঞ্জিকা ১৯৩৮ সালে সংশোধিত হইয়াছিল। ইহার পরে আরও দুই-তিনটা নূতন বিষয় যুক্ত হইয়াছে। বিষয়ের নামগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কি বিপুল ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন! এই ২৫।২৬টি বিষয়ে ছাত্রদিকে পারগ করিতে গিয়া অসংখ্য Professor, Reader, Lecturer ইত্যাদি নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাদের বেতন দিতে কত যে অর্থব্যয় হইতেছে, তাহা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু দেখিতেছি, নানাপ্রকারে ছাত্রদের নিকট হইতেই অধিকাংশ অর্থ আদায় হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত পাঠ্য-পুস্তকের মূল্য অত্যধিক মনে হয়। আর, ছাত্রদিকে কতরকম উপায়ন (fees) দিতে হয়, তাহাও চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, উচ্চশিক্ষা অতিশয় দুর্মূল্য হইয়াছে। এত উপায়ন দিয়াও ছাত্রেরা কৃতবিদ্য ও কৃতকর্মা হইতেছে না, বহু অর্থব্যয় করিয়া সমুদ্রপারে গিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মধ্যে বৃহত্তম বটে, কিন্তু অত্যুত্তম নহে।

মানুষের তিন এষণা

বহুকাল পূর্বে চরক লিখিয়াছিলেন, "মানুষের তিন এষণা আছে,—প্রাণৈষণা, ধনৈষণা, পরলোকৈষণা। এই তিন অনুসরণ করিতে

হইবে। তন্মধ্যে প্রাণরক্ষার চেষ্টা সর্বাগ্রে কর্তব্য। প্রাণ নষ্ট হইলে সবই নষ্ট। যে উপায়ে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারা যায়, প্রথমে সেই উপায় অন্বেষণ কর্তব্য। তারপর ধনৈষণা, ধনোপার্জনের চেষ্টা। ধন না হইলে প্রাণরক্ষা হয় না, সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাপন করিতে পারা যায় না। ইহার পর পরলোকৈষণা। যাহাতে ইহলোকে সুখ ও শান্তি ভোগ হয় ও পরলোকে সদ্গতি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। পরলোক সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ এই যে, পরলোক ও পুনর্জন্ম অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষবাদীরা এইজন্ত নাস্তিক্যমত অবলম্বন করেন। কিন্তু এ সংসারে প্রত্যক্ষ অল্প, অপ্রত্যক্ষই অধিক। আগম, অনুমান ও যুক্তি দ্বারাই অপ্রত্যক্ষের উপলব্ধি হয়। আর, যে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হয়, তাহারাই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। আমাদের দেহ জড়দ্বারা নির্মিত, কিন্তু জড়ের সংযোগ-বিয়োগে কখনও চৈতন্তের উদ্ভব হয় না। আমাদের শরীরে জড়ত্ব ও চৈতন্য, উভয়ই আছে। অতএব দেহের অতিরিক্ত এই চৈতন্তের উৎপত্তি কোথা হইতে হয়, তাহা চিন্তা করিলেই নাস্তিক্যবাদ খণ্ডিত হইবে।”

বর্তমান পাশ্চাত্ত্য সভ্য দেশে নাস্তিক্যবাদ প্রবল। কোন কোন বিচক্ষণ প্রত্যক্ষদর্শী অনুমান করেন, তথায় শতকে নব্বই জন নাস্তিক। আমরা এ-যাবৎ সেই নাস্তিক দেশের শিক্ষাই পাইয়া আসিতেছি। ইহা ভারতীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের শিক্ষানীতিতে ভারতীয় আদর্শকে স্তম্ভ করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বালকদিকে ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। আমার ‘শিক্ষাপ্রকল্পে’ এই আদর্শের ও নয়াভ্যাসের পরিকল্পনা আছে। নয়াভ্যাস শিষ্টাচার ও বিনয়াভ্যাস।

আমাদের দেশে ধনের নিদারুণ অভাব, বর্ণনা করিতে হইবে না। লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন্মৃত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের অভিযোগ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিকে বিদ্বান্ করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের প্রাণৈষণার উপায় চিন্তা করিতেছেন না। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি,

আমরা এ যাবৎ বিদেশীর নিকটে হাত পাতিয়া বসিয়াছিলাম। এখন আমরা স্বাধীন. আমাদের ভিক্ষোপজীবী হইলে চলিবে না। ভারত প্রাকৃতিক সম্পত্তিতে অতুলনীয়। এখন চারিদিকে রব উঠিয়াছে, আর সে সম্পত্তিকে অবহেলা করিলে চলিবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যক্ষভাবে ইহার কোনও বিধান করেন নাই। আমরা বিদ্বান্ পাইতেছি, সরস্বতীর আরাধনা করিতেছি, কিন্তু লক্ষ্মীর করি নাই। আমার 'শিক্ষাপ্রকল্পে' লক্ষ্মীর আরাধনার অনুষ্ঠানের সূচনা দেখাইয়াছি। আমি সেখানে বিদ্যালয় ও শিক্ষালয়, এই দুই ভাগ করিয়া শিক্ষালয়ের শিক্ষা-পরিপাটী (Courses of Study) সংক্ষেপে দেখাইয়াছি।

শিক্ষাসৌধকে চারি স্কন্ধে ভাগ করিয়াছি। (১) আদ্যশিক্ষা = Primary or Basic Education, ছাত্রছাত্রীর বয়স ১২ বৎসর পর্যন্ত। (২) মধ্যশিক্ষা = Secondary Education, ৩ বৎসরে সমাপ্য। (৩) অন্ত্যশিক্ষা = College Education, ৩ বৎসরে সমাপ্য। ইহার পরে অধিশিক্ষা = Post-Graduate Study, বিষয় অনুসারে এক, দুই, তিন অথবা চারি বৎসরে সমাপ্য। এখন দেখিতেছি, মধ্যশিক্ষায় চারি বৎসর, অন্ত্যশিক্ষাতেও চারি বৎসর দিতে হইবে। প্রত্যেক স্থলেই শিক্ষা-পরিপাটী (Curriculum of Studies) এমন হইবে যে, ছাত্র জীবন ধারণের নিমিত্ত যথাসম্ভব জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। আদ্যশিক্ষার পর কেহ আর অগ্রসর হইতে না পারিলেও কোন না কোন কর্মের ও শিক্ষার যোগ্য হইবে। এইরূপ মধ্যশিক্ষায় ও অন্ত্যশিক্ষায়।

শিক্ষণীয় বিষয়ের দুই ভাগ কল্পনা

এখন বিজ্ঞানের দিন। যে বিজ্ঞানের 'বি'ও জানে না, সেও বিজ্ঞান খুজিতেছে। আর, বিজ্ঞান শব্দের ভূরি ভূরি অপ-প্রয়োগ ঘটিতেছে। 'পৌরবিজ্ঞান,' 'ধন-বিজ্ঞান,' 'দর্জি-বিজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দ ছাপায় দেখিয়াছি। আর, 'কলা-বিদ্যা' ও 'কলা-বিজ্ঞান' যে কত দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলা-বিদ্যা বা কলা-বিজ্ঞান বলিলে বুঝি, কলার অন্তর্নিহিত বিদ্যা বা বিজ্ঞান। কেহ কেহ সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কেহ বা কলা ও বিজ্ঞান, এই দুই ভাগে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় বিভক্ত

করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় সাহিত্য শব্দ ব্যর্থ। ইহা দ্বারা কেহ রসাত্মক রচনা, কেহ বা যাবতীয় গদ্য-পদ্য-রচনা বুঝেন। কোন্ লক্ষণ দেখিয়া ভূগোল-বিবরণকে সাহিত্য বলিব? কোন্ লক্ষণ দেখিয়াই বা ইহাকে কলা বলিব? কোন কর্মের দক্ষতা না থাকিলে কলা হয় না। ভূগোল বিবরণ দ্বারা আমাদের জ্ঞানলাভ হয়, দক্ষতা হয় না। Arts শব্দের ভাবানুবাদ না করিয়া শব্দানুবাদ করাতেই এই প্রমাদ ঘটিয়াছে। এইজন্য এই বিভাগ অপেক্ষা আমি মনে করি, বিদ্যা ও বিজ্ঞান, এই দুই নাম যুক্তিসঙ্গত। বিদ্যার ভাগ-কল্পনা দুরূহ। তথাপি বোধ হয়, বিদ্যা ও বিজ্ঞান, স্থূলতঃ এই দুই ভাগ করা যাইতে পারে। বিদ্যার উচ্চ নিম্ন স্তর আছে, বিজ্ঞানেরও আছে। শুক্রনীতি বিদ্যা ও কলা, এই দুই ভাগে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় ভাগ করিয়াছেন। বিদ্যা বাঙ্ময়ী, কলা মূকও শিখিতে পারে। বিদ্যা মানসিক, বিজ্ঞান প্রাকৃতিক। কলা দুই প্রকার। গীতবাদ্যাদি কান্তকলা (Fine Arts) আর গৃহ-নির্মাণাদি স্থূলকলা (Material Arts)। বিজ্ঞানের এক স্তরে কলা (Art & Manufactures), ইহারও উচ্চ-নিম্ন স্তর আছে। অতএব শুধু বিদ্যায় চলিবে না, শুধু বিজ্ঞানে চলিবে না, প্রাণৈষণার নিমিত্ত ধনোপার্জনের চিন্তা করিতে হইবে।

তিন বিশ্ব-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা

অতএব বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যালয় রাখিয়া বিশ্ব-বিজ্ঞানালয় ও বিশ্ব-কলালয়, এই দুই পৃথক্ শিক্ষায়তন করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়, ইহার অর্থ এমন নয় যে ইহাতে বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে না। সাধারণত অর্ধেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। যাহাতে তাহারা ভারত-প্রজার উপযুক্ত হইতে পারে, যে সহস্র সহস্র কাজ পড়িয়া আছে সে সকল কাজের যোগ্য হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তাহারাও ট্রামে-বাসে, রেলে-স্টীমারে চড়িতেছে, তাড়িত পাখার বাতাস পাইতেছে, তাড়িত দীপালোকে পাঠাভ্যাস করিতেছে, রেডিওর গান শুনিতেছে; আর, ঘরে-বাহিরে সহস্র কর্মে সামান্য বিজ্ঞান না জানিলে অন্ধ হইয়া থাকিতেছে। তাহাদিকে সেই সামান্য বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে। সে বিজ্ঞান মূর্ত-

বিজ্ঞান (Applied Science)। আমার 'শিক্ষাপ্রকল্পে' বিশ্ব-কলালয়ে প্রবেশের নিমিত্ত ছাত্রকে যোগ্য করিবার শিক্ষা-পরিপাটী কল্পিত হইয়াছে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে।

বিশ্ব-বিজ্ঞানালয়ের দুই ভাগ থাকিবে। এক ভাগে বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ভাগের কৃতী ছাত্রেরা ক্রমশ উচ্চতর বিজ্ঞানের ছাত্র হইবে। ইংরেজীতে বলিতে হইলে এই ভাগে প্রধানত Theoretical Science বা অমূর্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় ভাগে বিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রধান লক্ষ্য হইবে; অর্থাৎ Applied Science বা মূর্ত-বিজ্ঞানকে ইহার মূল করিতে হইবে।

বিশ্ব-কলালয়ের দুই-তিন স্তর থাকিবে। প্রাকৃতিক পদার্থের রূপান্তরকরণের নাম কলা। উচ্চ-স্তরের ছাত্রেরা Technologist বা কলাবিৎ, এবং নিম্নস্তরের ছাত্রেরা Technician বা কারু। মোটর ও বেতারযন্ত্র মেরামত, গাছের ফল-বর্ধন, ফল-সংরক্ষণ, আকর-কর্ম ইত্যাদি কারুদের কাজ। বর্তমানে এই দুই প্রকার কলা-শিক্ষিতের বহু অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাদের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই। এখানে আমি শিল্প ও কলায় প্রভেদ করিতেছি। শিল্প Engineering; আর, কলা Manufacturing.

উক্ত তিন আলয়ের অধীনে অনেক মহা-বিদ্যালয় (Arts College), মহা-বিজ্ঞানালয় (Science College) ও মহা-কলালয় (Technical or Industrial College) থাকিবে। তিন বিশ্ব-আলয়ের প্রত্যেকেই স্বাধীন। রাজানুগৃহীত, অতএব কিয়ৎ-পরিমাণে রাজার অধীন। বর্তমানে Senate, Syndicate আছে। প্রকৃতপক্ষে Syndicate-ই কর্তা, Senate-এর অধিকাংশ সভ্য শোভাবর্ধক। এই সব আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া উক্ত তিন বিশ্ব-আলয় তিন সংসদ দ্বারা পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক সংসদে ১২জন সদস্য। তন্মধ্যে একজন আলয়-পতি (President), আর একজন শিক্ষাধিকর্তা (Director of Public Instruction)। অপর দশজন পর্যায়-ক্রমে প্রতি দুই বৎসরে দুইজন করিয়া পরিবর্তিত হইতে থাকিবেন। গত দশ বৎসরের মধ্যে

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব বিভাগের প্রতিনিধিস্বরূপ সদস্য নির্বাচন করিবেন। বিশ্ব-কলালয়টি নূতন। সম্প্রতি শিল্পবিদেরা (Engineers) বিশ্ব-কলালয়ের সংসদ নির্বাচন করিবেন।

উপাধির নাম

কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, নামে কি আসে যায়? ইহা এক ভ্রমাত্মক ধারণা। নাম দ্ব্যর্থ কিংবা অস্পষ্টার্থ হইলে বিষয়টা সুস্পষ্ট হয় না। আর, বিষয় সুস্পষ্ট না হইলে লক্ষ্য স্থির থাকে না। Convocation শব্দে 'সমাবর্তন' ও Graduate শব্দে 'স্নাতক' বলা কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নয়। ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য করে না, আর স্নান করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশও করে না। Convocation = সমাহ্বান, মন্দ হইবে না। সংস্কৃত টোলের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্র তীর্থ উপাধি পায়। Graduate-কেও তীর্থ বলা যাইতে পারে। এইরূপে কেহ বিদ্যা-তীর্থ (Bachelor of Arts), কেহ বিজ্ঞান-তীর্থ (Bachelor of Science), কেহ কলা-তীর্থ (Bachelor of Industrial Arts) হইবে।

অধিশিক্ষা

যাহারা তীর্থ উপাধির পর অধি-শিক্ষা পাইতে চাহিবে, তাহাদের নিমিত্ত তিন বিশ্ব-আলয়কেই তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখিয়া ব্যবস্থা। এই অধি-শিক্ষার ব্যয় অত্যন্ত অধিক। দুই-একজন শিক্ষার্থীর নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমন বিদ্যা নাই, যাহার নিমিত্ত অধি-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই। দরিদ্র দেশে আমরা এত টাকা কোথায় পাইব? যে বিদ্যার সহিত আমাদের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এবং যাহার অভাব আমাদিকে পূরণ করিতে হইবে, তিন বিশ্ব-আলয়কে তাহার অধি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই প্রথম প্রথম সন্তুষ্ট হইতে হইবে। যদি কেহ হিব্রু, সীরিয়, তেলুগু, কিংবা এইরূপ কোনও বঙ্গদেশে অনাবশ্যক বিদ্যায় পারগ হইতে চায়, তাহার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় বিশ্ব-আলয় ব্যয় করিতে পারিবে না।

এই নিয়ম অন্ত্যশিক্ষা (College Education) ও মধ্যশিক্ষায়- (Secondary Education)ও প্রযোজ্য। বিষয় অনুসারে অধি-শিক্ষা এক বৎসরেও সমাপ্ত হইতে পারে, আর কোন বিষয়ে তিন-চারি বৎসরও লাগিতে পারে। অধি-শিক্ষিত যুবকেরা মহাতীর্থ (M. A. বা M. Sc.) উপাধি পাইবে। ইহার পরে যাহারা গবেষণায় কৃতী হইবে, তাহারা গোস্বামী (Doctor) উপাধি পাইবে। কিন্তু গবেষণার গুরুত্ব ও মৌলিকত্ব না থাকিলে কেহ গোস্বামী হইতে পারিবে না। কোনও যুবক অনুকরণ বা সমাহরণ করিয়া গোস্বামী উপাধি পাইবে না। গোস্বামী উপাধি অতিশয় দুর্লভ। কেবল পরিশ্রম দ্বারা লভ্য হইবে না।

শিক্ষকদের নাম

শিক্ষকদের কি নাম হইবে? ইস্কুলের শিক্ষক হইলেই শিক্ষক, আর তিনিই কলেজে গেলে অধ্যাপক হইতেছেন; ইহা দ্বারা শিক্ষকদের সম্মানের লাঘব করা হইতেছে। সকলেরই শিক্ষক, এই নাম থাকিবে। কেহ আদ্য-শিক্ষক, কেহ মধ্য-শিক্ষক, কেহ অন্ত্য-শিক্ষক (Lecturer), কেহ অধি-শিক্ষক (Professor), এই মাত্র প্রভেদ। অধি-শিক্ষক, এই নাম অতিশয় গৌরবজনক। অন্তত পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পূর্বে কেহ এই নাম পাইবার উপযুক্ত হন না।

বিশ্ব-শিক্ষালয়সমূহের স্থান-নির্বাচন

এই তিন বিশ্ব-আলয় কোথায় স্থাপিত হইবে? কলিকাতায় নহে। কারণ, কলিকাতার জনসংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়াছে। আর, সেখানে চিত্ত-বিক্ষেপের নানাবিধ কারণ জুটিয়াছে। যতপ্রকার রাজনীতি, দলাদলি, ধর্মঘট, মারামারি, নগর-যাত্রা কলিকাতায়। ছাত্রেরা প্রত্যহ এই সকল দেখিতেছে, শুনিতেছে, আলোচনা করিতেছে ও বিভ্রান্ত হইতেছে। তাহারা যে ছাত্র, অন্য কিছু নহে, তাহা ভুলিয়া যাইতেছে। কলিকাতার ঢেউ দূরবর্তী নগরেও আসিয়া পহুঁছিতেছে। বিনয়ের অভাব ইহার পরিণাম। এ সকলের উপরে পাড়ায় পাড়ায় সিনেমা; আর, সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত রেডিওর বার্তা।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায়

শতবর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন যে কলিকাতা, এখন সে কলিকাতা নহে। তখন যত ছাত্র ছিল, এখন তাহার বহুগুণ বাড়িয়াছে। তখনকার ধারণা ছিল, বাড়ীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় হইবে, কলেজ হইবে, আর সেখানে যুবকেরা পাঠ লইয়া বাড়ীতে ছাত্রতুল্য আচরণ করিবে। কিন্তু এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন লণ্ডনের দৃষ্টান্ত চলিবে না। এখন আমাদের পূর্বকালের মঠ আনিতে হইবে। নালন্দা বিহার মগধে নয়, রাজগৃহে নয়, রাজগৃহ হইতে দশ-বারো মাইল দূরে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নির্মিত হইয়াছিল। সেখানে সহস্রাধিক ছাত্র বাস করিত। ইহাই আমাদের ভারতীয় ধারা। সেই ধারা পুনর্বার প্রবাহিত করিতে হইবে। নচেৎ ছাত্রকে কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়া তাহার মানসিক বল, চিত্তের সংযম, দৃঢ়তা, পৌরুষ ও পরাক্রম লব্ধ হইবে না। কলিকাতাবাসী মনে করেন, কলিকাতা অমর-ধাম। কিন্তু একটু ছুটি পাইলেই কেন তাঁহারা বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করিতে থাকেন? প্রকৃতির সহিত সম্পর্কহীন কলিকাতায় কেবল বাড়ী, গাড়ী ও মানুষের অরণ্য। বায়ু আর্দ্র ও সমল; দোতলার ঘরের মেঝে দুই-একদিন না পুঁছিলে পাথুরিয়া কয়লার কালি, বস্ত্রাদির ছিন্ন অংশু, আর যে কত প্রকার ধূলি জমা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাত্রিকালে নির্মল আকাশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। শীতকালে লক্ষ লক্ষ উনান জ্বালিবার ধুঁয়া উপরে উঠে না, নীচেই থাকে। দিবাভাগে তাড়িতালোকে পাঠনা চলিতেছে। এই অস্বাভাবিক অবস্থার যত শীঘ্র অবসান হয়, ততই মঙ্গল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত ডাক্তার মহাশয়দিগের বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ছাত্রদের প্রতি অত্যাচার চলিতেছে। এই যুবা বয়সে কৃত্রিম অবস্থায় রাখিলে ছাত্রদের জীবনটাই ব্যর্থ হয়। গৃহের অভাব, খাদ্যের অভাব, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব; তথাপি তাহাদিকে কলিকাতায় রাখিতে হইবে? তাহাদের তুল্য উদার-চরিত, ত্যাগী, কবি, অভিমানী আর কে আছে? কে জানে, কে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের নেতা, পাতা, মঙ্গল-বিধাতা হইবে? আর, আমরা সেই মানুষগুলিকে লইয়া খেলা করিতেছি! বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়াইলে চিত্তের

প্রসার আপনিই হয়, সেজন্য কবিতা লিখিতে হয় না। আর পায়রা-খোপে থাকিলে চিত্তও পায়রা-খোপের তুল্য সঙ্কুচিত হয়।

ক্রমশ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

নিষ্ফলের স্বপ্ন

(১)

তোমরা ধরেছ ঠিক : কথার জাহাজ নিয়ে আমি
জীবন-বন্দরে কোন্ বিনিময় করেছি প্রত্যাশা
সে কথা ভুলিয়া গেছি—সমুদ্রের জল গেছে নামি,
চড়ায় বেধেছে পোত ; জোয়ারে ভাটায় যাওয়া-আসা
কতশত তরণীর ; মহার্ঘ পণ্যের প্রলোভনে
বাণিজ্য-বাহিনী লক্ষ্মী নিত্যনব মহাবণিকের
গলে দেন বরমাল্য—আমি শুধু নিশ্চেষ্ট নয়নে
চেয়ে দেখি লোকযাত্রা, শেষ নেই ক্লান্ত নিমেষের।
চেয়ে দেখি আর শুধু অন্যমনে বালুকা-বেলায়
ছড়াই বিফল পণ্য—শিশুরা শুক্তির অন্বেষণে
কিছু নিয়ে যায় এসে, সমুদ্র কিছু বা নিয়ে যায়—
ছড়াই বিফল পণ্য—চেয়ে দেখি ঈশানের কোণে।
ঝড়ের আশায় থাকি। সমুদ্রের তরঙ্গ-আঘাতে
রুদ্ধগতি তরণীর মুক্তি হবে, আমি যাব সাথে।

(২)

সেই ঝড় এল বুঝি ; সূর্য নিবে গেল অকস্মাৎ
দ্বিপ্রহরে ; কালো মেঘ আঁধারের জয়ধ্বজা তুলে
মুছে দিল মহাকাশ ; কালান্তের পৈশাচিক রাত
বিষাক্ত ফুৎকারে তার নিবাইল প্রাণের দেউলে
বিশ্বাসের সন্ধ্যাদীপ—বিদ্যুৎ-কটাক্ষে বার বার
কে যেন ছলনা করি অট্টহাস্যে গেল বজ্র হানি—
চূর্ণ চূর্ণ পৃথিবীর দেহশেষ প্রলয় ঝঙ্কার
প্রেতোৎসবে মিশে গেল ; রুদ্ধগতি মোর তরীখানি

মাটির বন্ধন ছিঁড়ে ফিরে গেল অকূল সাগর ;
জীর্ণ সে তরণী—সিন্ধু-শ্বাপদের শিকার-খেলাতে
ছিন্নভিন্ন হ'ল আর অকস্মাৎ অবনী-অম্বর
ঝলসি উঠিল যেন প্রলয়ের শেষ বজ্রাঘাতে।

তারপর জেগে দেখি সন্ন্যাসী মৃত্যুর কোলে শুয়ে
নব সূর্যালোকে মোর আঁধার আকাশ গেছে ধুয়ে।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ভারতের বাণী

আজকাল কথায় কথায় "ভারতের বাণী"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশে অনেক বহুমূল্য জিনিস সস্তা হইয়াছে, আবার অনেক সস্তা জিনিস বহুমূল্য হইয়াছে। বাণী, জয়ন্তী প্রভৃতি সেই বহুমূল্য জিনিস সস্তা হওয়ার এক-একটি উদাহরণ। এখন সকলেই ইচ্ছা করিলে বাণী দিতে পারেন, বন্ধুরা উদ্যোগী হইলে সকলেরই জয়ন্তী হইতে পারে। পূর্বে এ সব এত সস্তা ছিল না অর্থাৎ অধিকার-নিরপেক্ষ ছিল না। বাণী দেওয়ার অধিকার সকলের ছিল না, জয়ন্তীও সকলের হইত না। কিন্তু সাধু-সন্তরা বাণী যদি কেহ দিতেন, তবে তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, সকলে তাহা মুখস্থ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। সুরদাস, দাদু, কবীর প্রভৃতির, সাম্প্রতিক কালে পরমহংসদেবের বাণী ওই-জাতীয়। কিন্তু আজকাল বাণী দেওয়ার লোকসংখ্যা বেশি, শ্রোতার সংখ্যা কম। ফলে বাণী খবরের কাগজের পাতাতেই বিরাজ করে, কাহারও কণ্ঠে উঠিয়া আসে না। সময়ের পরিবর্তনে এরূপ হইয়াছে, সেজন্য দুঃখ করা বৃথা। কেবল পূর্বের সঙ্গে বর্তমান কালের তুলনা করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম।

ভারতের বাণীও নিশ্চয় একটা আছে। ভারত সমগ্র জগৎকে কিছু দিতে পারে এ কথাও প্রায় বলা হয়। কিন্তু কি দিতে পারে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া কোন নির্দেশ কম লোকেই দিয়া থাকেন।

আজিকার দিনে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা পাইয়াছে, তখন সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের নিজস্ব মহত্ত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা না জানিলে অপরকে তাহা দান করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

কাহারও কাহারও মনে ধারণা আছে, ভারতের বাণী নৈতিক (moral); অর্থাৎ ভারতবর্ষ নীতির দিক দিয়া পৃথিবীকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে। যথা, ভারতবর্ষে যেমন সত্য কথা বলার আদর হইয়াছে, এমন আর কোন দেশে নয়; ভারতবর্ষে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের রীতি প্রকাশ্যভাবে নাই বা যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদের সমাজের চক্ষে উচ্চস্থান দেওয়া হয় না; ভারতবর্ষে যৌথ পরিবারে বাস করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, যাহা অপর দেশে নাই। ইহার ফলে পরিবারের কোন অসমর্থ বা অকর্মণ্য ব্যক্তি অনাহারে মারা যায় না, ইত্যাদি। সমাজ-জীবনে এই সব নীতি মানিয়া চলার ফলে জাতি অধিকতর ত্যাগ-স্বীকার করিতে সমর্থ হয় এবং তাহার মহত্ত্বের পথ প্রশস্ত হয়। তাঁহারা মনে করেন, ভারতের বিশেষত্ব এই নীতির রাজ্যে। তাঁহাদের এই ধারণা সত্য নয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি এখন সমাজ-জীবনে বিরল হইয়াছে। উদাহরণগুলি হয়তো কোথাও আছে, হয়তো কোথাও নাই, কিন্তু বক্তব্য সে দিক দিয়া নয়। বক্তব্য এই যে, উপরের ওই ক্ষেত্রে অন্য কোন দেশের পক্ষে ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর; কিন্তু এমন একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অপর কোন দেশ ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সেইখানে ভারতের বিশেষত্ব নিহিত—সে হইল অধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্র (spirituality)। এখানে ভারতবর্ষ একেবারে একক (solitary)।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং জাতি নিজেদের কামনা বাসনা পরিপূরণের জন্য বস্তুকে চাহিয়াছে। মানুষের স্বভাবে সুখের এবং শান্তির জন্য নিরন্তর একটা চাহিদা রহিয়াছে, সে কি নিদ্রায় কি জাগরণে সুখ খোঁজে, শান্তি চায়। কিসে সুখ হইবে, কিসে শান্তি পাইবে, ইহা সে আবিষ্কার করিতে পারে না বলিয়া হাতড়ায়। আত্মতৃপ্তির জন্য,

আপনাকে আরও বিস্তার করিবার জন্য সে ধন জন বস্ত্র সামগ্রী প্রভৃতির প্রার্থী হয়, সেই সব সংগ্রহ করে। জাতি ও আপনার অধিকার আরও বিস্তৃত করিবার জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়া পরের দেশ গ্রাস করিবার চেষ্টা করে। তখন আরম্ভ হয় লালসার দ্বন্দ্ব এবং জাতিতে জাতিতে বিরোধ। মানুষ এবং জাতি, ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সকলেই এই লালসার দ্বন্দ্বে রক্তাক্তকলেবর, বিরোধের কশাঘাতে জর্জরিত। কারণ কামনা-বাসনার শেষ নাই, তাহার বল্‌গা ঢিল করিয়া দিলে সে উদ্দাম গতিতে ছুটিবেই। যাহার এক হাজার টাকা বেতন তাহার মনে শান্তি নাই, সে দুই হাজার টাকা প্রাপ্তির পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম। যাহার একখানি মোটর গাড়ি আছে, সে কি করিয়া দুইখানি মোটর গাড়ি সংগ্রহ করিতে পারিবে সেই স্বপ্নে মশগুল। জাতিকে বড় করিবার অছিলায়, তাহার সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে পরিসরক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করিবার অজুহাতে এক জাতি নিজের দেশ এবং ঐতিহ্যের সীমানা লঙ্ঘন করিয়া অপরের দেশে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহার ভয়াবহ ফল আমরা গত জার্মান-যুদ্ধে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ সমস্তই কিন্তু ওই সুখ এবং শান্তি খুঁজিবার প্রয়াস। দুঃখ এবং অশান্তি কেহ পারতপক্ষে চায় না। কিন্তু এ পথে সুখ এবং শান্তি কোনদিন আসিবে না। কারণ অন্বেষণের এ পথ ভ্রান্ত।

ভারতবর্ষ তাহার সভ্যতার প্রারম্ভ হইতেই এই ভুল আবিষ্কার করিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে, বস্তুতে সুখ এবং শান্তি নাই, সুখ ও শান্তি আছে ভগবানে। তাই বস্তুর পরিবর্তে সে ভগবানকে চাহিয়াছে। বস্তুতে যে সুখের এবং শান্তির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণিক, তাহা ভগবানেরই সুখ-শান্তির প্রতিভাস বা ছায়া মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থায়ী সুখ-শান্তি আছে কেবলমাত্র এক ভগবানে। তাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিলে তবেই সুখ-শান্তির দিকে সত্যকারের অগ্রসর হইয়া যাওয়া হয়। অন্যথা সুখ-শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, ইহাই হইল ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের পক্ষে কেবলমাত্র কথার কথা নয়, কল্পনা-বিলাস নয়। এই সিদ্ধান্ত তাহার সভ্যতাকে এক বিশিষ্ট রূপ এবং রঙ

দিয়াছে, তাহার সন্তানকে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য দিয়াছে। কারণ ভগবানকে প্রাপ্তিই যে সুখকে প্রাপ্তি (ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি) এই সত্য তাহার বহু সন্তানের অনুভূতিগোচর হইয়াছে (realised) —ইহা লোক-দেখানো ফাঁকা কথায় পর্যবসিত হয় নাই।

এইখানেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভেদ—প্রাচ্যদেশীয় এবং পাশ্চাত্যদেশীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং ব্যবহারেরও এইখানে পার্থক্য। আমাদের অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়দের ঐহিক-সুখবিতৃষ্ণা (otherworldiness) বলিয়া একটা অখ্যাতি আছে। এখানেও একটা বুঝিবার গোল হয়। ঐহিক সুখে বিতৃষ্ণার মানে ইহা নয় যে, আমরা ঐহিক সুখ চাহি না বা তাহার মূল্য বুঝি না বা তাহাকে অগ্রাহ্য করি। ঐহিক সুখে বিতৃষ্ণার অর্থ—ঐহিক সুখ সেই সুখের বস্তুতে আছে, এ কথা আমরা মনে করি না। প্রকৃত সুখ বস্তুনিরপেক্ষ, তাহা ওই বস্তুতে নাই, অপরপক্ষে ওই বস্তুকে যিনি প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাতে আছে। সমস্ত বস্তুর পশ্চাতে যে সত্তা বর্তমান থাকিয়া সেই সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর পিছনে যে অখণ্ড অস্তিত্ব, তিনিই ভগবান এবং সুখ-শান্তি তাঁহাতে। সেই কারণে উপদেশ হইল এই যে, সুখ-শান্তি যদি কামনা কর তবে যেখানে সেখানে খুঁজিও না, ব্যর্থ হইবে। কিন্তু সুখ যেখান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, যিনি সুখের কারণ এবং কর্তা, তাঁহাকে জানিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা কর। সুখের সন্ধান পাইবে।

কোন জাতি যদি এই মনোভাবাপন্ন হয়, তবে তাহার জীবনযাত্রার প্রণালী অন্য জাতির সহিত এক হইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে যাহারা বস্তুকেই বড় এবং একান্ত বলিয়া মনে করে, তাহারা জীবন ধরিয়া বস্তুর পর বস্তু সংগ্রহ করিয়াই চলে। যত বস্তুর সংখ্যা বা ভার বাড়ে ততই তাহারা মনে করে যে, সুখ বাড়িতেছে। শেষে একদিন বস্তু ধ্বংস হইয়া গিয়া প্রমাণ করিয়া দেয় যে, সুখ তাহার মধ্যে ছিল না, বস্তুর পশ্চাতে যিনি অবস্তুরূপে বিরাজিত, সুখ-শান্তির অন্বেষণ সেইখানে করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে সেই কারণে টাকার উপর টাকা, বাড়ির উপর বাড়ি,

চাকরের উপর চাকর জড়ো করিয়া চলা হয়। সেখানে সুখের প্রমাণ এই সবের যোগফলে। সুতরাং বস্তুর প্রয়োজনীয়তা সেখানে অপরিহার্য। কিন্তু ভারতের লোক শুনিয়াছে যে, সুখ বস্তুর অন্তর্নিহিত এক বিরাট সত্তায় বিধৃত। সেই কারণে বস্তু তাহার পক্ষে একান্ত নয়, বস্তুর প্রতি তাহার লোভ এবং আসক্তিও অশোভন। ইহা কিন্তু বস্তুর প্রতি তাচ্ছিল্য নয়, কারণ বস্তু থাকিলে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, আবার না থাকিলে তাহার জন্য আক্ষেপ করিবারও কোন হেতু নাই। ভগবান যদি দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে রাখিয়া মানুষকে চালাইয়া লইয়া যান তবে তাহাও উত্তম, আবার যদি দারিদ্র্য এবং অভাবের মধ্যে রাখিয়া চালাইয়া লইয়া যান তবে তাহাও উত্তম। কোন অবস্থার জন্যই নালিশ করিবার কথা মনে উঠিবে না। এই হইল ভারতীয় মনোভাব। ভাষান্তরে বলা যায়, এখানে ভগবান হইলেন মুখ্য, বস্তু গৌণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তরের কথা ঠিক ইহার উল্টা। সেখানে বস্তু মুখ্য, ভগবানের কোন আসন মানুষের হৃদয়ে নাই। পাশ্চাত্য দেশ সেই কারণে আমাদের মনোভাব বুঝিতে বা তাহার ব্যাখ্যা (interpret) করিতে পারে না। তাহারা মনে করে যে, আমরা পারমার্থিক চিন্তায় এমনই বিভোর যে আমরা আর্থিক চিন্তাকে অবজ্ঞা করি। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তাহা নয়। আমরা জানি আর্থিক এবং পারমার্থিক চিন্তা দুইটি আলাদা বস্তু নয়, দুইটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তবে সার্থকতার মানদণ্ড অবশ্য দুই দেশে বিভিন্ন। পাশ্চাত্য দেশের মানদণ্ড-অনুযায়ী সেই ব্যক্তির জীবন হইল সার্থক, যাহার ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা আছে, বাড়িতে গাড়ি ঘোড়া মোটর আছে, সমাজে প্রতিপত্তি আছে, চাকরিতে সুনাম আছে ইত্যাদি। প্রাচ্য দেশ কিন্তু এই সকল থাকা সত্ত্বেও কোন মানুষের জীবন অসার্থক মনে করিতে পারে, যদি সে ব্যক্তি ভগবানকে না চায়, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার আকাঙ্ক্ষা যদি তাহার না থাকে। অপর পক্ষে ধন জন সম্মান প্রতিপত্তি না থাকিয়াও কোন ব্যক্তির জীবন সার্থক হইতে পারে, যদি সে ভগবানকে চায় এবং ভগবানের প্রতি তাহার প্রেম যদি সত্য হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আসিয়া এবং দেড় শত পৌণে দুই শত বৎসরের পরাধীনতার ফলে আমাদের এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এ কথা মানিব। বিজেতার সভ্যতা, শিক্ষাপদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী, ধর্ম্মবুদ্ধি সবই আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম, যেহেতু আমরা পরাজিত। বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার যুক্তি এবং বাহিরকার আলেয়ার আলো আমাদের মনে এবং চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিল। আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি উপলব্ধিপ্রধান, পাশ্চাত্যের যুক্তিপ্রধান। সেই কারণে আমাদের আদর্শকে অনুভূতির দ্বারা গ্রহণ না করিলে কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

আমরা, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা মোহাবিষ্ট হইয়া আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছি, ইহা বহু ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই আদর্শ যে আমাদের সমাজকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। একদা এই আদর্শ সমাজ-জীবনের উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া ছিল। সমাজের উচ্চ স্তর পাশ্চাত্য সভ্যতার ধাক্কা খাইলেও নিম্ন স্তর অপরিবর্তিত আছে। একটি-দুইটি উদাহরণ দিব। এক নমঃশূদ্রের বাড়িতে রামায়ণ-গান হইতেছিল। তখন গৃহস্বামীর একটি পুত্র মুমূর্ষু। সেই সময় গৃহস্বামী কেবল এই প্রার্থনাই জানাইতেছিল যে, তাহার পুত্রটি যেন খানিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, যেন রামায়ণ-গানের পালাটা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়, যেন মাঝপথে পুত্রের মৃত্যু বা এই রকম কোন দুর্ঘটনা দ্বারা রামায়ণ-গানের পালা বাধাগ্রস্ত না হয়। এইখানেই প্রাচ্য আদর্শের বৈজয়ন্তী। পাশ্চাত্য সভ্যতার রস দ্বারা পুষ্ট মানুষ কল্পনাই করিতে পারিত না যে, পুত্রের জীবন যখন বিপন্ন, তখন বাড়িতে রামায়ণ-গানের আসর বসানো হইবে। বাড়িতে তখন যদি কেউ ভিড় করে, তবে সে ডাক্তার, পালাগায়ক নয়। নমঃশূদ্রের মনোভাবের মর্ম্মকথা হইল এই যে, রামায়ণ-গানের ভিতর দিয়া যে ভগবান প্রকাশিত হইতেছেন, তিনি আগে,—পুত্র আগে নয়। ভগবানের সেবা আগে হউক, তাহাতে কোন ত্রুটি না থাকে; তারপরে পুত্রকে বাঁচাইবার বা মারিবার মালিক যিনি, তিনি যাহা বোঝেন তাহাই করিবেন—রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিতে হয় মারিবেন।

এই বুকের বল সংগ্রহ হইল কোথা হইতে? বলা বাহুল্য, ভগবানের উপর বিশ্বাস এবং নির্ভরই ইহার একমাত্র কারণ। আর একজন নিম্নজাতীয় সাইকেল-রিপুকারক-(Cycle repairer)-কে দেখিয়াছিলাম। তাহার বাড়ির প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সজিনার গাছ ছিল এবং তাহাতে ডাঁটা ঝুলিতেছিল। একদিন দেখিলাম, গাছগুলির সব ডাল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ডাঁটা অন্তর্হিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, লছমন, একদিনের মধ্যে সব ডাঁটাগুলি কোথায় গেল? লছমন বলিল, বাবুজী, ডাঁটাগুলি সব বিলাইয়া দিয়াছি। আমি বলিলাম, এত ডাঁটা, সব বিলাইয়া দিলে? কিছু কিছু করিয়া নিজেরা খাইতে পারিতে, না হয় কাহাকেও জমা করিয়া দিলে কিছু পয়সা পাইতে। লছমন জিব কাটিয়া বলিল, বাবুজী, খাওয়ার জিনিস, তাহা কি পারি? সকলে খুশি হইয়া খাইয়াছে, সেই ভাল হইয়াছে। এই নীচুজাতীয় লছমন সাইকেল সারিয়া দিনপাত করে। খাওয়ার জিনিসের বদলে প্রাণ ধরিয়া পয়সা লইতে পারে নাই। অথচ শিক্ষিত সমাজে ভাইয়ে ভাইয়ে এক হাত জমি লইয়া মোকদ্দমা করিতে দেখিয়াছি, বাড়ির একটা ফলপাকড় হাতে করিয়া কাহাকেও দিতে পারে না দেখিয়াছি। লছমনের মন এখনও বিলাতী সভ্যতার যুক্তিতে সায় দেয় নাই। সে জানে, নিজে এবং অপরে সকলেই ভগবানের সন্তান, নিজেরা খাইলেও যে তৃপ্তি, অপরে খাইলেও সেই তৃপ্তি।

ইহাই ভারতবর্ষের বাণী, ভগবানকে সব বলিয়া জানা এবং সবকে ভগবান বলিয়া জানা। এই সত্য ব্যতীত অপর কোন সত্যকে ভারতবর্ষের বাণী বলিয়া প্রচার করা যাইবে না। ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগ হইতে এই সত্য টিকিয়া আছে, কখনও কখনও ম্লান হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু নিঃশেষ হইতে দেখা যায় নাই। ভারতীয় সাধক এই সত্যকেই উপলব্ধি করিতে সাধনা করিয়াছেন, ভারতীয় সাহিত্যিক এই সত্যেরই জয়গান করিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ এবং কালজয়ী করিয়াছেন। অন্য কোন ছোট আদর্শ, যৌন আবেদন, বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতার 'জিনিয়াসে'র বিরুদ্ধে, তাহা ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় স্থায়ী হইবে না। দাদু কবীরের দোঁহা, সুরদাসের

মীরার ভজন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী এ দেশে চিরঞ্জীব হইয়া বিরাজ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথেও এই সুর, তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি গাহিয়াছেন—

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।"

* * * *

"চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই—
এই কথাটি সদাই মনে
বলতে যেন পাই।"

* * * *

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।"

সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যমণি এক—কেন্দ্র এক—শ্রীভগবান।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

কল্যাণ-সঙ্ঘ

৪

শহরের একটা বড় রাস্তা থেকে একটা গলি সোজা চ'লে গেছে পশ্চিম দিকে। কতকটা গিয়ে সেটা বেঁকেছে উত্তর দিকে। সেই বাঁকটার মাথাতেই বাঁ-হাতি একটা ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়িতে ঢুকলেই অপ্রশস্ত উঠোন। উঠোনে দাঁড়ালেই বাঁ দিকে পাশাপাশি মাঝারি আয়তনের দুটো কুঠুরি; ওপাশে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি; সামনে দুটো কুঠুরি; সব কুঠুরিগুলোর সামনে একটানা অপ্রশস্ত বারান্দা। সামনে শেষ কুঠুরিটায় রান্নাঘর। উঠোনের অন্য দু পাশে

উঁচু দেওয়াল। রান্নাঘরের ওপাশে কুয়ো ও ছোট স্নানের ঘর। কুয়ো থেকে কতকটা দূরে উঠোনটার এক কোণ ঘেঁষে পায়খানা। দোতলায় দুটো শোবার ঘর। কতকটা খোলা ছাদ। নীচের রান্নাঘরের উপরেই দোতলার রান্নাঘর—টিনের ছাউনি।

খোলা ছাদটায় শতরঞ্জি পাতা হয়েছে। তার ওপরে বসেছে নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘের সভা। প্রায় কুড়িজন নানাবয়সী মেয়ে গোল হয়ে বসেছে। সামনেই দেখা যাচ্ছে সভানেত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী রায়কে। ফরসা রঙ, দোহারা গঠন। বয়স পঁয়ত্রিশ পার হয়ে গেছে; কিন্তু দেহের আঁটসাট বাঁধন একটুও টসকায় নি। পরনে সূক্ষ্ম জরির পাড়ওয়ালা সিল্কের শাড়ি; গায়ে সাদা সিল্কের ব্লাউজ। হাত দুটি নিরাভরণ। ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গলায় একগাছি লিকলিকে সরু হার। চোখে সোনার ডাঁটিওয়ালা রিম-লেশ চশমা। চশমায় মুখখানি বেশ ভরাট দেখাচ্ছে। শাড়ির সোনালী পাড়টি এক গাল বেয়ে উঠে, এলো খোঁপাটি বেড়ে, আর এক গাল দিয়ে নেমে গেছে। সীমন্তে সিঁদুর নেই। বৎসর কয়েক আগে বৈধব্য ঘটেছে তাঁর। খাড়া হয়ে ব'সে, মুখে বেমানান গাম্ভীর্য ফুটিয়ে, সভার কাজ পরিচালনা করছেন মৃণালিনী রায়।

মিসেস রায়ের পাশেই বসেছে শুক্তি গুপ্তা। মাঝারি গঠন। রঙ উজ্জ্বল-শ্যাম। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। পরনে ফিকে সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি, ওই রঙেরই ব্লাউজ। হাতে দু গাছি ক'রে চুড়ি। বাঁ হাতের মণিবন্ধে ছোট রিস্টওয়াচ। মাথার চুলে পারিপাট্য নেই; কোনমতে খোঁপায় জড়ানো। পঁচিশ বৎসর বয়সেই এর দেহের লাবণ্যে টান পড়েছে; দেহের যৌবনসুলভ সুগোলতা, মুখের সুডৌলতা নাই। গুরু দায়িত্বের দুশ্চিন্তা মুখের ওপর গাঢ় ছাপ এঁটে দিয়েছে। শুক্তিই নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘের সেক্রেটারি। ওর চেষ্টাতেই সমিতির স্থাপনা হয়েছে। শহরের ভদ্রলোকদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মাসে মাসে চাঁদা আদায় ক'রে আনে ও-ই। ভদ্রলোকদের মেয়েদের বুঝিয়ে-শুঝিয়ে সমিতির সভ্য-সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা ওকেই করতে হয়। মোট কথা, প্রধানত

ওরই চেষ্টায় সমিতির নানা কাজ চলছে। সম্প্রতি সমিতির আর্থিক সঙ্কট শুরু হয়েছে। চাঁদা নিয়মিত আদায় হচ্ছে না। ভদ্রলোকদের গৃহিণীরা বিশেষ আমল দিতে চাচ্ছে না। বাড়িতে গেলে মৌখিক আপ্যায়নের ত্রুটি করে না; তবে ভাবে-ভঙ্গীতে জানিয়ে দেয়, এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদ হয়েছে বাবা! মাছ-তরকারি কেনবার পয়সা নেই, তার ওপরে মাসে মাসে অর্থদণ্ড! ন দেবায় ন ধর্মায়। ফলে সমিতির কাজ অচল হয়ে উঠেছে। অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে আজকের অধিবেশন। এ সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য একখণ্ড কাগজে লিখে রেখেছে শুক্তি। সেইটাই সভ্যাগণকে প'ড়ে শোনাচ্ছে।

শুক্তির পাশে বসেছে শৈলী। সমিতির সহকারী সেক্রেটারি ও। সমিতির কাজে বরাবর ও সাধ্যমত সাহায্য করে শুক্তিকে। শৈলীর মুখেও নেমেছে গাঢ় ছায়া। স্থিরভাবে ব'সে শুক্তির পাঠ শুনছে বটে, কিন্তু ওর মন এখানে নেই। বাইরে একটি বিশেষ কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায় ওর মন উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে।

শুক্তির সামনাসামনি ব'সে আছে নীরজা গুহ। দীর্ঘাঙ্গী। শ্যামবর্ণ। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। পরেছে জমজমাট পাড়ওয়ালা নীলাম্বরী শাড়ি, ঝলমলে সোনালী রঙের ব্লাউজ। হাতে এক হাত ক'রে সোনার চুড়ি। কানে দুল। চুল বেঁধেছে কায়দা ক'রে। মুখের চেহারাটি মন্দ নয়। সামনের দুটি দাঁত একটু বড়। ওপরের ঠোঁট দিয়ে দাঁত দুটিকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে মাঝে মাঝে। বসেছে আসন-পিঁড়ি হয়ে। সামনে দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। পীনোন্নত বুক থেকে কাপড় খ'সে পড়ছে মাঝে মাঝে; সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে কাপড় ঠিক করছে। ঘামছে না, অথচ রুমাল দিয়ে মাঝে মাঝে আলগাভাবে মুখ মুছছে। ভয়, মুখের ওপর নিপুণ হাতে যে পাউডারের প্রলেপ লাগিয়েছে, ঘামে পাছে তা নষ্ট হয়ে যায়। সভার কাজে ওর বিশেষ মন আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। সভার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হ'লে ও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

মিসেস রায়ের ও-পাশে ব'সে আছে রোসেনারা। টকটকে ফরসা রঙ। মাঝারি গঠন। টিকলো নাক। চতুর চটুল চোখ। বয়স

প্রায় বাইশ। পরনে টকটকে লাল রঙের শাড়ি। গাঢ় নীল রঙের বুটিদার ব্লাউজ। হাতে সোনার কঙ্কণ, চুড়ি। গলায় হার। বাঁ হাতে সোনার রিস্টওয়াচ। মাথায় সুরচিত কবরী। গম্ভীর মুখে ব'সে আছে। মাঝে মাঝে চোখ কুঁচকোচ্ছে। দাঁত দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ কাটছে। মাঝে মাঝে মিসেস রায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি বলছে, যা শুনে মিসেস রায়ের ঠোঁটে হাসির ঈষৎ আভাস ফুটে উঠছে। রোসেনারা বড়লোকের মেয়ে। বাবা মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, বাড়ি, গাড়ি রেখে গতায়ু হয়েছেন। রোসেনারা পিতৃসম্পত্তির একমাত্র মালিক। মা বেঁচে আছেন। লোকত তিনিই রোসেনারার অভিভাবিকা। কিন্তু যে মেয়ে ছেলেদের কলেজে পড়ে বি. এ. পাস করেছে, সহপাঠী ছেলেদের সঙ্গে অবাধে মিশেছে, নানা বিষয়ে বই পড়েছে, নানা চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তার পক্ষে প্রাচীনপন্থী মায়ের পছন্দমত চারদিকে পর্দা-আঁটা অন্দর মহলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভব নয়। কলেজে পড়তে পড়তেই রোসেনারা প্রতুলের কল্যাণ-সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও সে যোগ রক্ষা করেছে। নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘের সে একজন বিশিষ্ট সভ্য। পৃষ্ঠপোষকও। মোটা চাঁদা দেয় মাসে মাসে। সমিতির পক্ষ থেকে, প্রায় নিজের খরচেই সে একটা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বার করেছে। কাগজের সম্পাদিকা সে নিজে। নেহাৎ কৃপাপরবশ হয়ে, শুক্তিকে সহ-সম্পাদিকা ক'রে রেখেছে। কিন্তু তাকে পত্রিকার পাশ ঘেঁষতে দেয় না কখনও।

রোসেনারার পাশে ব'সে আছে, শ্বেতাঙ্গিনী গাঙুলী। মোটা-সোটা, নাদুস-নুদুস, বেঁটে-খাটো চেহারা। রঙ ফরসা। গোলমত মুখ। খ্যাঁদা নাক। বয়স প্রায় ত্রিশ। বিধবা। পরনে নরুনপাড় ধুতি ও শেমিজ। এই শান্ত গোবেচারী মেয়েটির পিছনে একটু ইতিহাস আছে। শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে এক পাড়াগাঁয়ে কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহিণী ছিল। দুর্ভিক্ষের বৎসরে স্বামী সন্তান সহায় সম্পদ হারিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। বানে-ভাসা নৌকার মত এ-ঘাটে ও-ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে এই শহরে এসে হাজির হয়। জনৈক

হাকিমের গৃহিণীর কাছে এসে কান্নাকাটি ক'রে আশ্রয় প্রার্থনা করে হাকিম-গৃহিণীর দয়া হয়। স্বামীকে ব'লে, শহর থেকে কিছুদূরে এক গ্রামে, সরকারী অনাথ-আশ্রমে ব্যবস্থা ক'রে দেন। অচিরে আশ্রমের কর্তার নেকনজর পড়ে মেয়েটির উপরে। অনুগ্রহের আতিশয্যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে মেয়েটি পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় শহরে। হাকিম-গৃহিণীর কাছে আবার কেঁদে পড়ে। আশ্রমের কর্তাটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের একান্ত অনুগত ও অনুগৃহীত ব্যক্তি। প্রতি রবিবার কুঠিতে এসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, ভেট নিয়ে আসে, হৃদয়ের নিখাদ শ্রদ্ধাই নয়, আশ্রম-জাত তরি-তরকারি, আশ্রমের তাঁতের তৈরি বিছানার চাদর, পর্দার কাপড় ইত্যাদি, আর ছেলে-মেয়েদের জন্যে আশ্রমের শিল্পীদের তৈরি খেলনা। এ-হেন ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বামীকে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে অভিযোগ করিয়ে লাভ নেই। হাকিম-গৃহিণী মেয়েটিকে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠলেন। হঠাৎ মনে পড়ল শুক্তির কথা। মাসে মাসে আসে চাঁদার জন্যে, বই বিক্রির জন্যে। স্বামীকে লুকিয়ে হাকিম-গৃহিণী মাসে কিছু ক'রে দেন। মেয়েটিকে মন্দ লাগে না তাঁর। এই বয়সের মেয়ে, কোথায় বে-থা ক'রে স্বামী সংসার ও সন্তানের সোনার শিকলে বাঁধা পড়বে, তা নয়। বাপ মা ছেড়ে বিদেশে বিভুঁয়ে একলা প'ড়ে আছে, যার-তার সঙ্গে মিশছে, যেখানে-সেখানে যাচ্ছে, যা মন চায় ক'রে বেড়াচ্ছে। ভাল নয়। অন্তত হাকিম-গৃহিণী এসব পছন্দ করেন না। তবু মেয়েটা এলে ফেরাতে পারেন না। মিষ্টি মিষ্টি হাসে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, গরিব-দুঃখীদের কথা শোনায়, দেশ-বিদেশের নানা গল্প করে, এবং তিনি যে একজন পদস্থ ব্যক্তির গৃহিণী, অতএব অঘটনঘটনপটিয়সী, আকারে ইঙ্গিতে তাও জানায়। কাজেই কিছু কিছু দিতে হয় মেয়েটাকে। ওর স্কন্ধেই মেয়েটাকে চাপিয়ে দেবার সঙ্কল্প করলেন তিনি। ডেকে পাঠালেন শুক্তিকে। শুক্তি অনতিবিলম্বে দেখা করল। হাকিম-গৃহিণীর প্রস্তাবে রাজি হ'ল, বললে, আপনারা পিছনে থাকলে কোন কাজ করতে পিছ-পা হব না আমরা। মেয়েটির ভার নিলাম। সেই থেকে শুক্তির কাছে মেয়েটি আছে। শুক্তির কাছেই কাজ-চলা-গোছের

লেখা-পড়া, সেলাই-বোনা শিখেছে। স্টেশনের কাছে কুলি-বস্তিতে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য যে পাঠশালা খোলা হয়েছে, সেখানে শিক্ষা দেওয়ার ভার তার উপরে। এঘাট-ওঘাট করা থেকে মেয়েটি নিষ্কৃতি পেয়েছে। পেয়েছে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবার সুযোগ। মেয়েটি চরিতার্থ হয়ে গেছে। একটি শান্ত তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে।

শ্বেতাঙ্গিনীর সামনাসামনি বসেছে পদ্মা। ছোটজাতের মেয়ে। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। রঙ ফরসা। মুখ চোখ নাক মন্দ নয়। সাজগোজ ক'রে, ভব্যিযুক্ত হয়ে ভদ্রলোকদের মেয়েদের মাঝে বসলে, একে বোঝা যায় না ছোটজাতের মেয়ে ব'লে। এই জাতের মধ্যে এর মত মেয়ে অনেক আছে, যাদের চেহারা গড়ন গায়ের রঙ ভদ্রলোকদের মেয়েদের মত। এর কারণ এই সমাজ আবহমান কাল ধ'রে ভদ্র সমাজের কাছাকাছি বাস করেছে। এদের পুরুষ ও মেয়েরা সেবা করেছে ভদ্র গৃহস্থদের। অবনত ও উন্নত সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের যা অনিবার্য পরিণাম, তার ফলে এদের রক্তধারার সঙ্গে মিশেছে ভদ্র সমাজের রক্ত। পদ্মাও হয়তো কোন ভদ্রলোকের ঔরস-জাতা। অল্পবয়সে এর বিয়ে হয়েছিল ওদের সমাজেরই একটি যুবকের সঙ্গে। যুবকটির ভাগ্যে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার সৌভাগ্য ঘটে নি। পূর্ববঙ্গের এক ভদ্রলোক এ শহরে রঙের কারবার শুরু করে। অন্যান্য অনেক মেয়ের সঙ্গে পদ্মা ওই রঙের কারখানায় কাজ করতে থাকে। ক্রমে ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। শেষে রক্ষিতা হিসাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে বাস করতে থাকে। বৎসর খানেকের মধ্যে ওর একটি মেয়ে হয়। বৎসর কয়েক পরে ভদ্রলোকের কারবারের পড়তি শুরু হ'ল। শহরের এক ধনী মাড়োয়ারীকে গোপনে কারখানা বিক্রি ক'রে দিয়ে, কোন এক অছিলায় শহর থেকে স'রে পড়ল। আর ফিরল না। মারোয়াড়ী শুধু কারখানার দখল নিয়েই ছাড়ল না; ফাউ হিসাবে পদ্মাকেও চাইল। পদ্মা প্রথমে রাজি হ'ল না। সে স্থির করলে, মেয়েকে নিয়ে তার বিধবা বৃদ্ধা মায়ের কাছে ফিরে যাবে, কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ ক'রে সদ্ভাবে

জীবন যাপন করবে। কিন্তু বৎসর কয়েক ভদ্রলোকের সঙ্গে বাস করে, যে ধরনের জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তা ছেড়ে পূর্বজীবনের কুৎসিত দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে যেতে তার মন চাইল না। মাড়োয়ারীর আশ্রয়েই বাস করতে লাগল সে। মাড়োয়ারী তার জন্যে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করল না। শহরের এক টেরে একটা বাড়িতে তাদের রাখল। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব উপকরণ যোগান দিতে লাগল মুক্ত হস্তে অকুণ্ঠিত চিত্তে। পদ্মার মাকেও নিরাশ করল না। তার ঘরটি মেরামত ক'রে দিল, তা ছাড়া তার জন্যে মাসহারার ব্যবস্থা ক'রে দিল। এমনই ক'রেই বছর কয়েক কাটল। তারপর এল শুক্তি। কোন এক সূত্রে তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল পদ্মার। ফলে জীবনযাত্রার মোড় ফিরে গেল তার। মাড়োয়ারীর আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে চ'লে এল মায়ের কাছে। মাড়োয়ারী বুড়ী মাকে দিয়ে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করল। পদ্মা দৃঢ় হয়ে রইল নিজ সঙ্কল্পে। মা চেঁচামেচি করল, গালাগালি করল, কান্নাকাটি করল, তার পায়ে মাথা ঠুকে রক্তপাত করল। মেয়েকে কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে তাকে বললে, এ বাড়িতে থাকতে পাবি না তুই; যারা তোর মাথা বিগড়ে দিয়েছে তাদের কাছেই চ'লে যা। পদ্মা মেয়েকে নিয়েই শুক্তির কাছে চ'লে গেল। ভদ্র গৃহস্থদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ ক'রে নিজের ও মেয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে লাগল। শুক্তির কাছে কিছু লেখাপড়াও শিখল সে। এখন সে কল্যাণ-সঙ্ঘের একজন ভাল কর্মী। দুর্ভিক্ষের বছরে লঙ্গরখানায় খুব ভাল কাজ করেছিল। মেথরপাড়ায় বাউরীপাড়ায় কলেরার সময়ে সে প্রত্যেকবার প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে। যে সব মেয়ে কলে কারখানায় কাজ করে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার ভার দেওয়া হয়েছে তাকে। এ কাজটি সে নিষ্ঠার সঙ্গে করছে।

পদ্মা স্থির হয়ে ব'সে আছে, শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে; সাগ্রহে তার পাঠ শুনছে। শুক্তির উপরে তার শ্রদ্ধার অন্ত নাই। শুক্তি তাকে পূতিগন্ধময় পঙ্ক-কুণ্ড থেকে তুলে এনে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবনে স্থাপন করেছে। শুক্তির কোন কাজের জন্যে প্রাণ দিতেও পিছ-পাও হবে না সে। তার চোখে মুখে তার মনের ভাব ফুটে উঠেছে।

পদ্মার পাশে ব'সে আছে আর একজন ওই জাতের মেয়ে—রাধা। বয়স আঠারো-উনিশ। শ্যামবর্ণ। চেহারা চলনসই। রাধার জীবন-কাহিনী পদ্মার মতই। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে। স্বামী মাধব কোন এক বাস-সার্ভিসে কাজ করত। সারাদিন গাড়ির সঙ্গে থাকত। সন্ধ্যের পর ছুটি হ'লে সোজা চলে যেত মদের ভাটিতে। মদে চুর হয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরত রাত-দুপুরে। একটা ছেঁড়া কাঁথা বা তালাই যদি হাতের কাছে পেল তো ভালই, না হ'লে মাটির উপরে শুয়ে প'ড়ে অঘোর ঘুমে কাটিয়ে দিত সারারাত। রাধার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কম। রাধার শ্বশুর ছিল না। ছিল শাশুড়ী আর দুজন ননদ। ওদের পাড়ার পাশেই মুসলমান-পাড়া। একজন মুসলমান ব্যবসাদারের বাড়িতে শাশুড়ী ঝিয়ের কাজ করত। ননদ দুজন কাজ করত কলে। ওদের বয়স ছিল কম। উপরি রোজগারের জন্যে রাত্রে দেহের ব্যবসা চালাত। তাদের দেখাদেখি রাধাও তাই শুরু করল। শাশুড়ীর এতে আপত্তি ছিল না। নিজের যৌবনকালের কথা ভেবে সে আপত্তি করবেই বা কোন্ মুখে? ভূভারতে এদের সমাজের মেয়ে কেউ কোন দিন ছিল কি—ভদ্রলোকদের সঙ্গে, বড়লোকদের সঙ্গে, যার যৌবনে দেহের কারবার হয় নি? শাশুড়ী বরং খুঁতখুঁত করত এতদিন, বউ যৌবনটা হেলায় নষ্ট করছে ব'লে। রাধার মতি-গতির সুলক্ষণ দেখে সে পুলকিত হয়ে উঠল। নিজে নিয়ে গিয়ে মুসলমান ব্যবসাদারের কাছে একদিন গছিয়ে দিয়ে এল তাকে। এতে সংসারের আয় বাড়ল, তা ছাড়া তারও কদর বাড়ল মনিবের কাছে। এমনই ক'রে দিন চলতে লাগল। তারপর শুক্তি কাজ শুরু করল এ পাড়াতে। পদ্মাও যোগ দিল তার সঙ্গে। পাড়ার অনেক মেয়েই পাশ ঘেঁষতে চাইল না। যে দু-চার জন এল, শুক্তির সাহচর্যে যাদের শুদ্ধি হ'ল, জীবনের চেহারা গেল বদলে, রাধা তাদের একজন। রাধাকে সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল শুক্তি। সুযোগ ঘ'টে গেল। মাধব পড়ল গুরুতর অসুখে। বাঁচবার আশা ছিল না। রাধা আর পদ্মা দুজনে সেবা ক'রে তাকে বাঁচিয়ে তুলল। চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করল প্রতুল। সেরে ওঠবার পরে প্রতুল তাকে আর

কাজে যেতে দিল না। যতদিন না ওর শরীর সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠল, ততদিন তাকে নিজের কাছে রাখল। শহরের একজন বড় ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে শুক্তির আলাপ ছিল। তাঁকে ধ'রে ডাক্তারবাবুর গাড়ির কাজে ঢুকিয়ে দিল মাধবকে। এখনও সেখানেই আছে সে। তবে গাড়ি ধোওয়ার কাজ থেকে তার উন্নতি হয়েছে। এখন গাড়ি চালায় সে। প্রথম প্রথম তার মাইনেটা শুক্তি নিজে গিয়ে নিয়ে আসত। দরকারমত তাকে দিত। না কুলোলে নিজে থেকে দিয়ে চালিয়ে দিত। তারই জমানো টাকা থেকে শুক্তি তাদের একটি ঘর ক'রে দিয়েছে। মাটির ঘর। খড়ের ছাউনি। শাশুড়ীর কাছ থেকে স'রে গিয়ে রাধা স্বামীকে নিয়ে সেই ঘরেই বাস করছে।

রাধা লেখাপড়া শেখে নি। শুক্তি চেষ্টা করেছিল ওকে লেখাপড়া শেখাতে। রাধার হাব-ভাব দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ওসব ভাল লাগে না রাধার। ভদ্রলোকের মেয়েরা যেমন স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করে, তেমনই ভাবে সংসার করা তার চিরদিনের সাধ। স্বামীর ছন্ন-ছাড়া ব্যবহারের জন্যে সে ঘর-ছাড়া হতে বসেছিল। শুক্তির দয়ায় সে ঘর আবার তার পাতা হয়েছে। তার কাছে শুক্তি সামান্যা মানবী নয়, দেবী। তাই ঘরের কাজকর্ম সেরে রোজ সন্ধ্যেবেলায় দেবী-দর্শন করতে আসে। না হ'লে শুক্তির কোন কাজের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘের নামেমাত্র সভ্যা সে। আজও সে এসেছে সমিতির অধিবেশন ব'লে নয়; এসেছে খানিকক্ষণ শুক্তির সঙ্গ-সুখ ভোগ করতে, ওকে দেখতে, ওর কথা শুনতে, ওর সস্নেহ দৃষ্টিতে স্নান করতে। প্রতি মুহূর্তে ওর ভয় হয়, পাছে পিছলে আবার কাদার মধ্যে গিয়ে পড়ে। শুক্তির কাছে এলে ও প্রাণে সাহস পায়, বুকে বল পায়, মনে উৎসাহ পায়।

রাধা পা দুটি মুড়ে বাঁ হাতে ভর দিয়ে বসেছে। শুক্তির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। শুক্তি যা বলছে তা কিছু বুঝছে না, বুঝবার চেষ্টাও করছে না। শুক্তির ম্লান গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাধা ভাবছে, কিসের অভাব হয়েছে ওঁর? ওর সর্বস্ব দিয়েও কি সে অভাব মেটানো যায় না?

তা ছাড়া ব'সে রয়েছে আরও চোদ্দ-পনেরো জন মেয়ে। স্কুল-কলেজের মেয়ে। সবাই সমিতির সভ্য নয়। থিয়েটারের রিহার্সেলের জন্যে তাদের আনা হয়েছে। ওদের কেউ কেউ শুক্তির কথা শুনছে। বাকি সকলে একটু দূরে স'রে ব'সে ফিসফিস ক'রে গল্প করছে।

৫

সমরেশ ও প্রতুল দুজনে নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘের আপিসের দিকে চলল। বাউরীপাড়ার ভিতর দিয়ে, পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তা। দু-পাশে বাউরীদের ছোট ছোট মেটে খড়ের ঘর। ঘরের চালগুলো যেন হুমড়ি খেয়ে মাটি পর্যন্ত নুয়ে পড়েছে। মাথা নীচু ক'রে ঘরে ঢুকতে হয়। এক-এক গৃহস্থের একটি ক'রে ঘর। দরজা একটি ক'রে আছে। জানলা নাই, আছে দু-একটি ক'রে ঘুলঘুলি। ওই ঘরের এক পাশে রান্না-বান্না হয়, হাঁড়ি-কুঁড়ি সংসারের প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিস-পত্র যা আছে সব থাকে। ওই ঘরেই স্বামী-স্ত্রীরা ছোট-বড় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঠাসাঠাসি হয়ে রাত্রে শুয়ে থাকে। প্রত্যেক ঘরের সামনে এক টুকরো ক'রে উঠোন। চারদিকে দেওয়াল নেই। কাজেই আবরু ব'লে কিছুই নেই। রাস্তা থেকে ওদের সংসার-যাত্রার খুঁটিনাটি সব দেখা যায়। এক বাড়ির লোকের কাছে আর এক বাড়ির লোকদের কিছুই গোপন থাকে না। প্রেমালাপ বা কলহ দুটি মাত্র নরনারীর ব্যাপার নয়, সর্বজনীন ব্যাপার।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মেয়েরা ডিবরি জ্বেলে রান্না করছে ঘরের ভিতরে। উলঙ্গ ছোট ছেলেমেয়েরা উঠোনে হুড়োহুড়ি করছে। যুবতী মেয়েরা সেজেগুজে পাড়া থেকে বেরিয়ে গেছে। পুরুষরা এখনও ফেরে নি। এ পাড়ায় মিউনিসিপ্যালিটির আলোর ব্যবস্থা নেই। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। হোঁচট খেতে খেতে সতর্ক হয়ে চলতে লাগল দুজনে।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, কতদূর হে?

প্রতুল বললে, বেশি দূর নয়। একটু দেখে শুনে চল; যা রাস্তা!

সমরেশ বললে, তোমরা তো এদের ভাল করবার জন্তে চেষ্টা করছ। মজুরি বাড়িয়েছ। কিন্তু এদের জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি তো বদলায় নি!

প্রতুল বললে, ও এত তাড়াতাড়ি হয় না। ক্রমে হবে। যারা আমাদের সম্পর্কে এসেছে, তাদের কিছু উন্নতি হয়েছে বইকি! তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চালচলন অনেকটা রুচি-সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে দু-দশজনের উন্নতি সমগ্র সমাজের আবহমানকাল ধ'রে অনুসৃত জীবনযাত্রা-পদ্ধতিকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে? ধর, কোন গৃহস্থের একটি ছেলে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। তার রুচি বদলেছে, নীতিবোধও জন্মেছে। কিন্তু তার বাপ-মা, ভাই-বোন পুরাতনভাবেই চলেছে। নিজের রুচিমত চলতে হ'লে আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে তাকে পৃথকভাবে বাস করতে হবে। এতখানি মন বা মতের জোর তাদের হয় নি। আমাদেরই কি হয়েছে? আমরা তো অনেকদিন ধ'রে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো পেয়েছি। মনে ও মতে উদার হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমাদের বাড়ির মধ্যে প্রাচীন মত অবাধে চলছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা মনে পড়ে? বলতেন, বড় বৈজ্ঞানিকের বাড়ির গৃহিণীও গ্রহণের দিনে হাঁড়ি ফেলেন, গঙ্গাস্নান করেন; বৈজ্ঞানিককে তাঁর বিজ্ঞানের জ্ঞান নিয়ে চুপ ক'রে থাকতে হয়।

দুজনে নীরবে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, বাড়িটা বুঝি নারী-কল্যাণ-সমিতি ভাড়া নিয়েছে?

প্রতুল বললে, নারী-কল্যাণ-সমিতির নিজের বাড়ি-টাড়ি নেই। বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন এক ভদ্রলোক। দোতলা বাড়ি। ভদ্রলোক নীচের তলায় থাকেন। দোতলার দুটো ঘর শুক্তিরা ভাড়া নিয়েছে।

ভদ্রলোক কি সপরিবারে বাস করেন?

না, একা থাকেন। 'পরিবার' বলতে ভদ্রলোকের কিছুই নেই।

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রতুল বললে, ভদ্রলোকের কলকাতায় বাড়ি। নাম বিশ্বম্ভর। তুমি ওকে দেখে থাকবে বোধ হয়। শুক্তির কাকা যে বাড়িতে থাকতেন, তার মালিক ছিল ও। দোতলায়

থাকত। তখন ওর স্ত্রী ছিল, একটি মেয়ে ছিল। টাইফয়েড হয়ে স্ত্রী আর মেয়ে মারা যায়। শুক্তিদের সঙ্গে ওদের বেশ সম্প্রীতি ছিল। ওর স্ত্রী ও মেয়ের অসুখের সময় শুক্তি খুব সেবা করেছিল। স্ত্রী মারা যাবার পরে বিশ্বম্ভর অথৈ জলে পড়ল। ক্যাবলা-গোছের লোক, অত্যন্ত অগোছাল, কাজেই হাতে পয়সা থাকতেও নিজের একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারল না। শুক্তি এ সময়ে ওকে অনেক সাহায্য করল। ওর অচল গৃহস্থালীটাকে চালু ক'রে দিল। তা ছাড়া নিজেও একটু সময় পেলেই খোঁজখবর করতে লাগল। ক্রমে শুক্তি যেন ওর অভিভাবিকা হয়ে উঠল। ও-ও শুক্তির অত্যন্ত অনুগত হয়ে উঠল। শুক্তির বোনেরা ঠাট্টা করতে লাগল শুক্তিকে—কি দিদি! বিশুবাবুকে বিয়ে করবে নাকি? একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার মতলব করেছ বুঝি? শুক্তি জবাব দিত না, একটুখানি হাসত শুধু। ওই অসহায় বোকা-সোকা লোকটার ওপরে ওর যেন কেমন মায়া ব'সে গিয়েছিল। পোষা জন্তু-জানোয়ারের ওপরে লোকের যেমন মায়া হয়। বিশ্বম্ভর অবশ্য শুক্তিকে বিয়ে করতে পেলে ব'র্তে যেত। শুক্তির ওপর ওর মনোভাব ওর চোখে-মুখে কথায়-বার্তায় প্রকাশ পেত। কিন্তু শুক্তির কাছে কিছু বলতে সাহস করত না। শুক্তির গম্ভীর প্রকৃতির জন্যে ওকে ও ভয় করত; শুক্তির শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে অত্যন্ত সমীহ করত। হঠাৎ কলকাতায় বোমা পড়ল। শুক্তিরা দেশে চ'লে গেল। বিশ্বম্ভরও যেতে চাইল ওদের সঙ্গে। শুক্তির কাকীমা আপত্তি করলেন। পাড়াগাঁয়ে একজন অনাত্মীয়কে ঘরে রাখা চলে কি ক'রে? আমাকে ভার দিল শুক্তি, এখানে ওর থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিবার জন্যে। আমি এসে ওই বাড়িটা ওর জন্যে ভাড়া নিলাম। বিশ্বম্ভর এখানে এসে ওই বাড়িটায় বাস করতে লাগল।

বছর খানেক পরে আমি এখানে এসে দেখলাম, বিশ্বম্ভর নিজের বাড়িতে একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেছে। লোকজনে বাড়ি জমজমাট। সে সময়ে কলকাতা থেকে অনেক লোক এখানে চ'লে এসেছিল। বিশ্বম্ভর কৃপণ মানুষ। একা এতগুলো টাকা ভাড়া গুনবে কেন মাসে মাসে? কলকাতার এক ভদ্রলোককে অর্ধেকখানা

বাড়ি ভাড়া দিল। ভাড়াটে জাঁদরেল ব্যক্তি; ততোধিক জাঁদরেল তাঁর গৃহিণী। একপাল ছোট-বড় ছেলেমেয়ে। তিন-চারজন সধবা ও বিধবা মেয়েমানুষ। সমস্ত দোতলা ও একতলার অর্ধেকটা জুড়ে বসলেন। আমিষ-নিরামিষ রান্নার জন্যে দোতলার দুটো রান্নাঘর অধিকার করলেন। বিশ্বম্ভর কোনমতে মাথা গুঁজে থাকতে লাগল, বারান্দার এক পাশে তোলা-উনুনে হাত পুড়িয়ে রান্না ক'রে খেতে লাগল।

কলকাতার অবস্থার একটু সুরাহা হতেই ভাড়াটে ভদ্রলোকটি সপরিবারে কলকাতায় ফিরে গেলেন। বিশ্বম্ভর হাত-পা একটু ছড়াতে পেরে বাঁচল। ওর কৃপণ মনটা অবশ্যি খুঁতখুঁত করতে লাগল, এতগুলো টাকা মাসে মাসে খরচ! আবার ভাড়াটে বসাবার জন্যে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে শুরু করল। এমন সময়ে এল শুক্তি আর একটি মেয়ে নীরজা। আমি দোতলাটায় ওদের ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। শুক্তিকে কাছে পেয়ে বিশ্বম্ভর হাতে স্বর্গ পেল। শুক্তির কাছ থেকে ভাড়া নিতে চাইল না। শুক্তি ওর কথায় কান দিল না। নিজের ন্যায্য ভাড়া মাসে মাসে মিটিয়ে দিতে লাগল। বিশ্বম্ভর মুখে আপত্তি করত, অথচ হাত পেতে নিতও। এখনও সেই ব্যবস্থাই চলছে। নারী-কল্যাণ-সমিতি শুরু হবার পর থেকে শুক্তি হ'ল ওর সেক্রেটারি। প্রথম থেকেই সমিতির সব কাজ ওই বাড়িতেই হয়। ঝামেলা যে হয় না, তা নয়। বিশ্বম্ভর কোন আপত্তি করে না। শুধু শুক্তির খাতিরে নয়। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর একটা দুর্বলতা আছে। ওদের সঙ্গ ওর ভাল লাগে। মেয়েরা ওখানে গেলেই ও ওদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। ওদের একটু তোয়াজ, ওদের কোন কাজ ক'রে দিতে পারলে ও যেন ব'র্তে যায়।

একটু মুচকি হেসে প্রতুল বলতে লাগল, তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার হয়েছে। [illegible]ঙ্গিনী ব'লে একটি মেয়ে শুক্তির কাছে থাকে। স্বামী-সন্তান হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মেয়েটি। শুক্তি তাকে আশ্রয় দিয়েছে। মেয়েটি বিধবা। বয়স হয়েছে। বিশ্বম্ভরের ভারি ইচ্ছা মেয়েটিকে বিয়ে করে। অন্যান্য মেয়েরা ওকে আশা

দিয়েছে বিয়েটা ঘটিয়ে দেবে ব'লে। শুক্তির কাছ থেকে কোন আশ্বাস না পেয়ে আমাকে ধরেছিল। আমার আপত্তি নেই। লোকটার পয়সা আছে। আয়ও আছে। কলকাতার বাড়িটা ভাড়া খাটে। তা ছাড়া লোকটা অসৎপ্রকৃতির নয়। শ্বেতাঙ্গিনীর পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। জীবনে সাংসারিক জীবনের স্বাদ পেয়েছে; আবার সংসার পাততে ওর আপত্তি নেই। আমি আশা দিয়েছি বিশ্বম্ভরকে। আগে ও আমাকে খাতির করত, এখন রীতিমত ভক্তি করে। আমাদের পার্টিতে নাম লিখিয়েছে। পার্টির কাজের জন্যে টাকাকড়ির দরকার হ'লে দেয়। অবশ্য বিয়ে হয়ে গেলে ও কি করবে বলা যায় না।

ইতিমধ্যে ওরা বাউরীপাড়া পার হয়ে আর একটা রাস্তায় পড়েছে। অপ্রশস্ত রাস্তা। বাউরীপাড়ার রাস্তাটার মত খারাপ নয়। মিউনিসিপ্যালিটির কৃপাবর্ষণ ঘটে এক-আধবার। রাস্তার পাশে আলোর খুঁটিও রয়েছে দু-একটা। আলো জ্বলছে না অবশ্য। রাস্তাটা চ'লে এসেছে মুসলমানপাড়ার মধ্য দিয়ে। দু পাশে বাড়ি, অধিকাংশ মাটির, টিনের বা খড়ের ছাউনি। দু-একটা পাকা বাড়ি আছে। এ পাড়ায় পঞ্চাশ ঘর মুসলমানের বাস। অধিকাংশেরই সাংসারিক অবস্থা অসচ্ছল। দু-চার ঘর মুসলমান জুতোর ও চামড়ার ব্যবসা ক'রে বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠেছে। এখানটা মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টি-পরিধির ভিতরে। রাস্তার ধারে একটা জলের কল রয়েছে। রাস্তার দুপাশে পাকা ড্রেন, অবশ্য আবর্জনায় ভর্তি। রাস্তার চেহারাটাও অনেকটা ভদ্রগোছের। রাস্তাটা আরও কতকটা গিয়ে ডান দিকে মোড় ফিরেছে। এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে হিন্দুপল্লী।

এ শহরে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি অনেকদিন বাস করছে। শুধু শহরে কেন, এ জেলার অনেক পাড়াগাঁয়েও। সাম্প্রদায়িক বিরোধ কোনদিন হয় নি। ব্যক্তিগত ভাবে মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে, কলহ-বিবাদ হয়েছে; আপোসে বা আদালতের সাহায্যে মিটমাট হয়ে গেছে। সমগ্র একটা সমাজ, সমগ্র আর এক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষে বিষাক্ত হয়ে ওঠে নি কখনও। মুসলমানদের মসজিদ

ও হিন্দুদের মহামায়া-মন্দিরের মধ্যে দূরত্ব বেশি নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহামায়ার মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজেছে; মসজিদ থেকে উঠেছে আজানের উদাত্ত ধ্বনি। দুই-ই একসঙ্গে সন্ধ্যার আকাশকে তরঙ্গিত করেছে। কোন পক্ষ থেকে এতদিন কোন প্রতিবাদ হয় নেই। প্রতিবাদ উঠতে আরম্ভ করেছে বৎসর কয়েক। হিন্দুদের দিক থেকে নয়, মুসলমানের দিক থেকে। কিন্তু এখানে হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের জন্য ওদের আপত্তি কোন গুরুতর আপদের সৃষ্টি করতে পারে নি। কলকাতার হাঙ্গামার পর থেকে এ শহরে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠেছে। হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিম-লীগ দু দলই কোমর বাঁধতে শুরু করেছে, আস্ফালন শুরু করেছে একে অপরের উদ্দেশে। দু সমাজের মানুষের মনে জমতে শুরু করেছে বিস্ফোরক বাষ্প; চাপের মাত্রা বাড়ছে দিন দিন। রাজকর্মচারীরা তিলমাত্র অসতর্ক হ'লে এতদিন বিস্ফোরণ ঘ'টে যেত।

রাস্তাটা বরাবর গিয়ে পড়েছে শহরের একটা বড় রাস্তায়। এরই মাঝখানে একটা জায়গায় একটা ছোট গলি বেরিয়ে গিয়ে শহরের দিকে গেছে। এইখানেই শুক্তিদের বাড়ি।

দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়তেই কিছুক্ষণ পরে খুলল। যে খুলে দিল, সে মেয়েমানুষ নয়, পুরুষ। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে সম্ভবত। হৃষ্টপুষ্ট, নধর দেহ। মেটে রঙ। মাকুন্দে মুখ। মাথায় এলোমেলো বড় বড় চুল। পরেছে ধুতি, কোঁচাটি পেটের নীচে গোঁজা। গায়ে ফতুয়া। প্রতুলকে দেখে, দাঁত বার ক'রে হেসে, সবিনয়ে বললে, এত দেরি হ'ল? সভার কাজ শেষ হয়ে গেল এই মাত্র।

প্রতুল বললে, ও তো মেয়েদের ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে—

লোকটি মাথা নেড়ে ব'লে উঠল, তাই বটে। আমাকেও শুক্তি তাই ওখানে থাকতে মানা করলে। সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, এঁকে চিনলাম না!

প্রতুল বললে, ওকে চিনতে পারলেন না? শুক্তিদের ওখানে দেখেন নি ওকে? চোখ কপাল কুঁচকে ভাবতে লেগে গেল লোকটি। প্রতুল বললে, আমার বন্ধু। নাম সমরেশ। এম. এ. পাস। মস্তবড়

দেশসেবক। সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, এঁরই নাম বিশ্বম্ভরবাবু; এঁরই কথা বলছিলাম তোমাকে। আমাদের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। এই বয়সে এতখানি প্রগতিশীলতা দেখি নি আমি। বিশ্বম্ভর পরম আত্মপ্রসাদে এক গাল হেসে, মাথা চুলকতে চুলকতে বললে, কি যে বলেন! পৃষ্ঠপোষক! কি আর করেছি আমি! প্রতুল বললে, সব মেয়েরা এসেছেন? রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেছে? বিশ্বম্ভর গম্ভীর হয়ে উঠে বললে, প্রায় সবাই তো এসেছেন দেখলাম। গান শেখানো হচ্ছে।

গান শোনা গেল। মেয়ে-গলার গান। মাঝে মাঝে পুরুষের মোটা গলারও। হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলার সঙ্গত চলছে গানের সঙ্গে। বিশ্বম্ভর প্রতুলের হাতটা খামচে ধ'রে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে, একটা কথা। শ্বেতাঙ্গিনীকে একটা পার্ট দেবার জন্যে ব'লে দিন। বেচারা মুখ শুকনো ক'রে এক পাশে ব'সে থাকে। দেখে ভারি কষ্ট হয় আমার। আমি বরং ডবল চাঁদা দোব। প্রতুল বললে, আমাকে বললে কি হবে? ওদের বলুন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, শুক্তিকে বলেছেন? ঘাড় নেড়ে বিশ্বম্ভর বললে, ওকে বলতে পারব না। আপনি ব'লে দিন। প্রতুল বললে, অন্য মেয়েদের বলুন তা হ'লে। এত পার্ট রয়েছে, একটা পার্ট আর দেওয়া যাবে না শ্বেতাঙ্গিনীকে? আচ্ছা, আমি ব'লে দোব অখন। চলুন, ওপরে যাই। সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, এস হে। বিশ্বম্ভর ঘাবড়ে গিয়ে বলল, উনিও যাবেন? প্রতুল হেসে বললে, যাবেন বইকি! মান্য অতিথি। ওঁকে ফেলে রেখে যেতে পারি!

মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বিশ্বম্ভর বললে, আমিও যাব নাকি?

বেশ তো, চলুন না। শহরের অনেক ভদ্রঘরের মেয়েরা এসেছেন তো। সেইজন্যে শুক্তি নিষেধ করেছে হয়তো। চলুন, একটু পরে চ'লে আসবেন।

ওরা দোতলায় পৌঁছতেই শৈলী ছুটে এল; সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, তপনবাবু আসবেন?

প্রতুল বললে, আজ ওকে পাওয়া যাবে না। শৈলী ঔৎসুক্যভরা

কণ্ঠে বললে, কাল আসবেন? প্রতুল বললে, কি ক'রে বলব? কাল একবার গিয়ে ব'লে দেখব। শৈলীর মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, উনি যদি না আসেন তো এ সব বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভাল। মিছিমিছি লোক হাসিয়ে লাভ কি? শুনছ তো রবীন্দ্রনাথের গান কেমন গাওয়া হচ্ছে? গানটাকে জবাই করছে ভদ্রলোক।

শুক্তি এল। প্রতুল সমরেশের পরিচয় দিয়ে বললে, একে চিনতে পারছ তো? আমাদের সঙ্গে পড়ত। তোমাদের বাড়িতেও গিয়েছিল একবার। শুক্তি এক ফোঁটা হেসে বললে, চিনতে পেরেছি। সমরেশকে বললে, কেমন আছেন? কবে এলেন? সমরেশ নমস্কার ক'রে বলল, কাল সকালে। আপনি কেমন আছেন?

শুক্তি প্রতি-নমস্কার করল। সমরেশের কুশল-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে, বসবেন চলুন।

শৈলী ব'লে উঠল, এ সব বন্ধ ক'রে দিন শুক্তিদি। তপনবাবু খুব সম্ভব আসবেন না। ওর কণ্ঠে ক্ষোভ ও অভিমানের সুর বেজে উঠল।

শুক্তি প্রতুলের দিকে চেয়ে বললে, তপনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি?

প্রতুল বললে, হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল। একেবারে আসবে না, এ কথা অবশ্য মুখে বলে নি। তবে আমার মনে হয়, ও আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক কাটাবে।

শৈলীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। উদ্বেগের স্বরে বললে, তোমায় কে বললে দাদা?

প্রতুল বললে, কেউ বলে নি। এমনই আমার মনে হচ্ছে। এ সত্য না হতে পারে। যাকগে, চল, বসা যাক।

শুক্তি বললে, জোর ক'রে তো আমরা কাউকে রাখতে চাই নে। ওঁর যদি স'রে যেতে ইচ্ছে হয়, যাবেন।

শৈলী তীক্ষ্নস্বরে বললে, তা তো বলছ শুক্তিদি। কিন্তু কাজের কত ক্ষতি হবে বল দেখি?

শুক্তি মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলে, উপায় কি ভাই! ক্ষতি সহ্য করতে

হবে। কারও অভাবে কোন জিনিস অচল হয়ে যায় না। চ'লে যায় একরকম ক'রে। এই যেমন আমাদের থিয়েটার। তপনবাবু যদি আসেন তো সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে। যদি না আসেন, হয়ে যাবে একরকম ক'রে।

শৈলী ঠোঁট উল্‌টে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, ও-রকম না হওয়াই ভাল শুক্তিদি।

শুক্তির ঘরে ঢুকল সবাই। ছোট ঘর। দু পাশে দুখানি চৌকি। চৌকির উপরে সামান্য শয্যা পাতা। ডান দিকের চৌকির পায়ের দিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটি ছোট টেবিল, তার সামনে একটি হাতলহীন ছোট চেয়ার। টেবিলটি টেবিল-ক্লথ দিয়ে ঢাকা। টেবিলের উপর কয়েকখানা বই, খাতা, লেখবার সাজসরঞ্জাম সাজানো। চৌকির মাথার দিকে, একটি দেওয়ালে-আঁটা কাঠের আলনা। তাতে কয়েকখানি শাড়ি, শেমিজ ও ব্লাউজ ঝুলছে। পাশেই মেঝের উপরে দেওয়াল ঘেঁষে একটি ছোট ট্রাঙ্ক, তার উপরে একটি চামড়ার সুটকেস। বাম দিকের চৌকির মাথার দিকে একটি কাঠের আলনায় একখানি নরুনপাড় ধুতি, শেমিজ ও একখানি সাদা চাদর ঝুলছে। চৌকির নীচে একটি কম-দামের রঙ-করা টিনের তোরঙ্গ। ডান পাশের চৌকিটাতে থাকে শুক্তি, বাম পাশেরটাতে শ্বেতাঙ্গিনী।

প্রতুল ও সমরেশ শ্বেতাঙ্গিনীর চৌকিটাতে বসল। প্রতুল বললে, এক কাপ ক'রে চা পাওয়া যাবে নাকি? ব'লে শুক্তির দিকে তাকাল। সমরেশ আপত্তি করলে, এইমাত্র তো চা খেয়ে এলে। আবার ওঁদের কষ্ট দেওয়া কেন?

না না, কষ্ট কি! চায়ের ব্যবস্থা করছি।—ব'লে শুক্তি বিশ্বম্ভরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি একটু দেখুন না। আমাদের উনুন বোধ হয় নিবে গেছে। আপনারটায় যদি আঁচ থাকে, তা হ'লে একটু ব্যবস্থা ক'রে দিন দয়া ক'রে। বিশ্বম্ভরের যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তার ইচ্ছা, শ্বেতাঙ্গিনীর পার্ট সম্বন্ধে শুক্তির সঙ্গে প্রতুলের কথাবার্তাটা তার সামনেই হয়ে যায়। অথচ শুক্তির অনুরোধ অবহেলা করাও তার সাধ্য নয়। সে প্রতুলকে বললে, আমি তা হ'লে যাচ্ছি। প্রতুল তার

দিকে মুখ ফেরাতেই বললে, আপনি তা হ'লে সেই কথাটা—। ব'লেই চোখের ইঙ্গিতে বক্তব্য শেষ করলে। প্রতুল হেসে বললে, আচ্ছা আচ্ছা, বলব এখন। বিশ্বম্ভর যাবার উপক্রম করতেই শুক্তি বললে, আমি পদ্মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ও গিয়ে চা করবে। বিশ্বম্ভর বললে, পদ্মাকে কেন? শ্বেতাঙ্গিনীকে বরং—

শুক্তি বললে, ও বেচারা এই মাত্র রান্নাবান্না সেরে গা ধুয়ে এসেছে। ওকে আর না। পদ্মাই যাচ্ছে।

বিশ্বম্ভর চ'লে গেল। শুক্তি গেল পদ্মাকে ডাকতে।

রোসেনারা এল। এসেই সমরেশের দিকে এক চোখ তাকাল। মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। এ আবার কে? দলে নূতন লোক ঢুকল বুঝি! প্রতুলের দিকে তাকাল না মোটেই। শৈলীর কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, তপনবাবুর খবর কি? আসবেন তো?

শৈলী ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে জানাল, দাদাকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রতুল বললে, তপন আসে নি। ও না এলে কি খুব অসুবিধে হবে?

রোসেনারা তপনের ছাত্রী। তপন যখন কলেজে কাজ করত, তখন সে বি. এ. ক্লাসে পড়ত। তখনই তপনের কল্যাণ-সঙ্ঘে যোগ দেয়। এখনও যোগ কাটায় নি।

প্রতুলের দিকে না তাকিয়েই বললে, অসুবিধে হবে বইকি। গান সুবিধে হবে না। শৈলীকে বললে, তুমি কি বল?

শৈলী বললে, আমিও ওই কথাই বলছি।

তখনও গান চলছিল। প্রতুল বললে, গান তো মন্দ হচ্ছে না। আমার তো ভাল লাগছে।

রোসেনারা প্রতুলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললে, আপনার ভাল লাগবে বইকি। শুক্তিদিদিরও শুনছি, ভাল লাগছে। বিদ্রূপের স্বরে বললে, দুজনেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মস্ত সমঝদার তো।

প্রতুল বললে, হ্যাঁ হে সমরেশ, আমরা না হয় কিছু বুঝি না। তুমি তো বোঝ। কি রকম হচ্ছে বল দেখি?

সমরেশ বললে, আমিও বেশি কিছু বুঝি না। তবে, খুব ভাল হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

রোসেনারা বললে, শুনলেন?

প্রতুল বললে, শুনলাম তো! কি করা যায় বল দেখি? তা এক কাজ কর না। ওঁকে বিদেয় ক'রে দিয়ে নিজেরাই এক রকম ক'রে চালিয়ে নাও না।

রোসেনারা বললে, রবীন্দ্রনাথের গান আবার কোন রকম ক'রে চালিয়ে নেওয়া যায় নাকি?

প্রতুল সমরেশকে বললে, তুমি একটু সাহায্য কর না এদের।

আমি ভুলে গেছি, বললাম যে!

রোসেনারা বললে, যা হচ্ছে, তার চেয়ে ভাল পারবেন নিশ্চয়। কণ্ঠস্বরে আবদারের রেশ মেশাল রোসেনারা।

প্রতুল বললে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। আমি শুনেছি ওর গান। বেশ ভাল লাগত। শুক্তিও শুনেছে।

শৈলী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, এ রকম জোড়া-তাড়া দিয়ে একটা জগা-খিচুড়ি তৈরি করার চেয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভাল।

শুক্তি এল। প্রতুল তাকে বললে, শুক্তি, তুমি সমরেশের রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোন নি? তোমাদের ওখানে গেয়েছিল বোধ হয়। কেমন লাগত?

শুক্তির খুব সম্ভব মনে ছিল না। তবু বললে, বেশ লাগত।

রোসেনারা মিষ্টি হেসে বললে, তা হ'লে সমরেশবাবু, একটু কষ্ট করুন আমাদের জন্যে।

সমরেশ বললে, আপনাদের কষ্টের কথা ভেবে কষ্ট করতে সাহস হচ্ছে না।

রোসেনারা বিস্ময়ের ভঙ্গী ক'রে বললে, আমাদের কিসের কষ্ট?

সমরেশ বললে, আমার গান সহ্য করার কষ্ট; তার ওপরে একজন ভদ্রলোককে ভদ্রতা বজায় রেখে বিদেয় করবার উপায় বার করবার কষ্ট।

পদ্মা এল। দু হাতে দু কাপ চা। প্রতুল ও সমরেশকে দিল।

পদ্মা বললে প্রতুলকে, শহিদ এসেছে বাসুদেবপুর থেকে। আপনার সঙ্গে কি দরকার আছে।

প্রতুল উৎসুক কণ্ঠে বললে, তাই নাকি? কোথায় সে?

পদ্মা বললে, আমাদের আপিসে আছে।

বিশ্বম্ভরবাবু এল। প্রতুলকে বললে, চা পেয়েছেন তো?

প্রতুল বললে, হ্যাঁ, ধন্যবাদ। তার পরেই রোসেনারার দিকে তাকিয়ে বললে, তোমাদের পার্ট সব বিলি হয়ে গেছে নাকি?

রোসেনারা মুখ টিপে হেসে বললে, আপনি খুব তাড়াতাড়ি খবর নিচ্ছেন তো?

প্রতুল বললে, বাঃ রে! এসব তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি খবরদারি করতে যাব কেন?

রোসেনারা বললে, ওঃ, তাই। তা হ'লে এখনই বা খবর নিচ্ছেন কেন?

প্রতুল বললে, সবাই পার্ট পেয়েছে কি না জেনে নিচ্ছি।

রোসেনারা তীক্ষ্ণস্বরে বললে, যারা পারবে, তাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছে। শুক্তিদিকেও বলা হয়েছিল পার্ট নিতে। ও ইচ্ছে ক'রেই নেয় নি।

প্রতুল বললে, যাদের পার্ট নেবার ইচ্ছে আছে, এমন কেউ বাদ যায় নি তো?

বিশ্বম্ভর বললে, বাদ গেছে। শ্বেতাঙ্গিনীকে পার্ট দেওয়া হয় নি।

প্রতুল রোসেনারার দিকে তাকিয়ে বললে, তা হ'লে দেখ তোমাদের একটা ভুল হয়েছে। শ্বেতাঙ্গিনীকে একটা পার্ট দেওয়া তোমাদের উচিত ছিল।

রোসেনারা বিশ্বম্ভরকে বললে, আপনি বুঝি প্রতুলবাবুকে মুরুব্বি ধরেছেন?

বিশ্বম্ভর বললে, মুরুব্বি ধরা আবার কি? আনন্দের ব্যাপার যখন একটা হচ্ছে, সবাই মিলে করা উচিত।

শুক্তি বললে, শ্বেতাঙ্গিনী ওসব পারবে না বলেছে। বিশ্বম্ভরবাবু, আপনি নীচে যান।

বিশ্বম্ভর মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে, যাচ্ছি।

বিশ্বম্ভর চ'লে গেল। প্রতুল হেসে বললে, বেচারীর মনটি খারাপ হয়ে গেল। দিলেই হ'ত একটা পার্ট।

রোসেনারা তীক্ষ্ণস্বরে বললে, আপনি আর ওঁর হয়ে সুপারিশ করবেন না। ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে দিন দিন।

শুক্তি বললে, শহিদের কাছে তো একবার যাওয়া দরকার।

প্রতুল ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, সত্যি। সমরেশকে বললে, আমি এখনই ফিরে আসছি। তুমি একটু ব'স এখানে। দু-একখানা গান যদি দেখিয়ে দিতে পার তো দাও। ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

যথা বাধতি বাধতে

"গাড়ি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন"—এ লেখা দেড় বছর আগে ট্রাম গাড়িতে প্রথম দেখি। এটা যে অশুদ্ধ বাংলা তখন তা মনে হয়েছিল। এখন যেন এ ভুলটা অনেকের অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

আমরা বলি, "কাজের শেষ পর্যন্ত বা কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর," "ট্রেন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, এখন যেও না," "ট্রেন থামা পর্যন্ত অপেক্ষা কর," "ট্রাম থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।" ট্রাম না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলাটা ভুল।

অথবা বলা যেতে পারে—"যতক্ষণ গাড়ি না থামে, ততক্ষণ অপেক্ষা করুন" অর্থাৎ যতক্ষণ গাড়ি চলে, ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

ট্রাম গাড়ির হিন্দী লেখাটি ঠিক আছে, "গাড়ি জব তক ন রুকে ঠহরিয়ে"। ইংরেজীতে আছে—Wait until car stops। Until আর till ইংরেজীতে প্রায় সমার্থক, এদের পার্থক্য শুধু প্রয়োগে। Until-কে not till এই ভুল অর্থ ধ'রে বাংলা অনুবাদ করবার সময়ে কেউ একটা অনাবশ্যক "না" দিয়ে লিখেছেন—"গাড়ি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।" Till-এর অর্থ হচ্ছে "পূর্ববর্তী বা বর্তমান কাল থেকে পরবর্তী কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত"। "গাড়ি থামা পর্যন্ত" বললেই until car stops-এর অর্থ ঠিক হয়।

বিদেশী ট্রাম কোম্পানির অজ্ঞতাপ্রসূত ভুলটির প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব-ফলাশূন্য "উজ্জলা" চিত্রগৃহ-কর্তৃপক্ষের জেদের কথা বলছিলেন। অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তাঁরা নাকি উজ্জ্বলা বানানে ব-ফলা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেন। বানানে এ ধরনের স্বেচ্ছাচার অসঙ্গত। জ্বল্ ধাতুটি থেকে উজ্জ্বলা, সমুজ্জ্বল প্রভৃতি বহু শব্দ গঠিত হয়েছে। এমন কি ভাষার প্রয়োজনে এখনও জ্বল্ থেকে নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে। মূল ধাতুটির অর্থ থেকে এই শব্দগুলোর সম্পূর্ণ অর্থবোধ হয়। উজ্জ্বলার কর্তৃপক্ষ যেমন করেছেন, সে রকম ক'রে জ্বল্ ধাতুর ব-ফলা বাদ দিয়ে 'জল জল করা,' 'জলে যাওয়া' প্রভৃতি লিখলে অর্থবিভ্রাট হবে না কি? 'জালা' আর 'জ্বালা', 'জালামুখী' আর 'জ্বালামুখী', 'জলা' আর 'জ্বলা' এক নয়।

কথার জ্বলুনি, কাটা ঘায়ের জ্বালা, জ্বল জ্বল করা, জ্বালামুখ আর উজ্জ্বলা, এই পৃথক শব্দগুলো যে এক জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, শব্দের ষোল আনা অর্থবোধের জন্যও এ জ্ঞানটুকু থাকা প্রয়োজন। আর এর জন্যই ওই ছোট ব-ফলাটার অস্তিত্ব অব্যাহত রাখাও দরকার। তারপর উজ্জ্বলা প্রভৃতি শব্দে ব-ফলা থাকলে 'জলকণ্টক, জলমসি, জলতা, জলদ, জলা' প্রভৃতি শব্দগুলো যে অন্যশ্রেণীর তা বোঝা যায়। আর অপ্রচলিত অজানা শব্দ হ'লেও 'জলত্রা' বললে 'জল থেকে যা ত্রাণ করে, যেমন ছাতা বা কোন আচ্ছাদন' এ রকম একটা অর্থ অনুমান করাও যেতে পারে। 'জলমসি', 'জলকণ্টকে'র অর্থ যদি ঠিক করা কঠিন হয়, আগুন, তার দীপ্তি বা দাহ প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ না থেকেও শব্দ দুটোর সম্বন্ধ বরং জলের সঙ্গে সেটুকু অন্তত বেশ বোঝা যায়। আলো বাচক 'উজ্জ্বলা' যে 'নির্জলা, সজলা' প্রভৃতি জলবাচক কোন জিনিস নয়, আশা করি বর্তমান 'উজ্জলা'-চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষ ব-ফলাটুকু ফিরিয়ে এনে তা বুঝিয়ে দেবেন। পথে ঘাটে বিজ্ঞাপনের কাগজে কাগজে 'উজ্জলা' বড় দৃষ্টিকটু। একজন শিক্ষিত বাঙালী, গুজরাটী বা মারাঠী ভদ্রলোক 'উজ্জলা' শব্দটির বানান শুনলে মনে করবেন যে, এটি কোন নতুন তৈরি পরিভাষা, সম্ভবত এর অর্থ হবে কোন 'উঁচু জায়গায় অবস্থিত জলা বা বিল'।

শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখুজ্জে মশাই

তখন আমরা ছোট, সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছি। আমাদের বৈঠকখানায় সন্ধ্যাবেলা একটা আড্ডা হ'ত। পাড়ার অনেকে সেখানে জমায়েৎ হয়ে প্রত্যহ বিস্তর রাজা-উজির নিপাত করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সংগ্রামসিংহ মুখুজ্জে মশাই। রোগা কালো মানুষটি, মাথার চুল খুব পাতলা হয়ে এসেছে, সর্বদা সিগারেট টানতেন আর মুচকি হাসতেন। হাসিটি ছিল দেখবার মত। তিনি কথা বলতেন খুব আস্তে আস্তে, প্রায় শোনাই যেত না। কিন্তু শোনবার জন্য আমরা ছেলের দল তাঁর আশেপাশে থাকতাম, তাঁর কথাবার্তা শুনতে আমাদের এত ভাল লাগত!

এটা অসহযোগ-আন্দোলনের গোড়ার দিকের কথা। খদ্দর পরা, সুতো কাটা, এ সব খুব প্রচলিত হয়েছে। নতুনকাকা তো ছাদের টব থেকে গাঁদাফুলের গাছ তুলে ফেলে তাতে তুলোর বিচি লাগিয়ে দিয়েছেন, তুলো ফললেই চরকা কাটতে শুরু করবেন।

নতুনকাকাই একদিন সংগ্রামবাবুকে চেপে ধরলেন, হ্যাঁ, মশাই, আপনাকে তো খদ্দর পরতে দেখি নে কখনও!

মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে সংগ্রামবাবু ধীরে ধীরে তার ছাই ঝাড়লেন। তারপর পুড়ন্ত সিগারেটটার দিকে সস্নেহে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, পরেছিলাম তো একদিন!

কালী মাস্টার বললেন, একদিন! আর পরেন নি? কেন?

সংগ্রামবাবু বললেন, একটা বিপদে প'ড়ে গিয়েছিলাম ব'লে।

গাঙ্গুলীখুড়ো অমনই আগ্রহভরে বললেন, অ্যাঁই! পুলিস এল তো বাবাজী? হবেই তো। সায়েবরা হ'লগে তোমার যাকে বলে রাজার জাত, তার সঙ্গে মামদোবাজি কি আমাদের সাজে? যত সব, হ্যাঁঃ।

সংগ্রামবাবু মাথা নাড়লেন, না, পুলিস নয়। বলছি শুনুন। দেশের বাড়ির পুকুরে স্নান করতে নেমেছিলাম খদ্দর প'রে। প্রথমটায় বুঝতে পারি নি, ওঠবার সময় টের পেলাম। কাপড় সুদ্ধু আর উঠতে পারি না। খাঁটি খদ্দর কিনা, ডাঙায় ছিলেন পাঁচ পো, এখন আধ মণ, জল শুষে হয়েছেন জগদ্দল পাথর একখানা। কাপড় ছেড়ে দিয়েও উঠতে

পারি না, আশপাশে লোক চলাচল করছে। ডাকাডাকি শুনে তাদেরই একজন এসে টেনে তোলে, তবে উঠি।

মিস্টার সিন্‌হা অমনই ব'লে উঠলেন, দেয়ার ইউ আর। আমিও তো তাই বলি। দেশোদ্ধার ইজ অ্যান এক্‌সেলেণ্ট থিং, বাট দেয়ার্স এ লিমিট। কংগ্রেস অ্যাটেণ্ড কর, নিউজ পেপারে লেটার লেখ, কিন্তু খদ্দর পরা? ও মাই!

আর একদিনের কথা। কথাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র কথা উঠল। বইখানা তখন সবে বেরিয়েছে, কিন্তু নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সকলে পড়তে পায় নি। হীরুমামা পড়েছিলেন, তিনিই বলছিলেন গল্পটা। সংগ্রামবাবু কৌচে এলিয়ে প'ড়ে চোখ বুজে সিগারেট টানছিলেন। গল্পের মাঝামাঝি জায়গায় তিনি হঠাৎ আলগোছে ব'লে ফেললেন, এতদিনে তা হ'লে শরৎবাবু কাহিনীটা লিখেছেন দেখছি।

কে একজন ব'লে উঠল, তার মানে?

উদাসভাবে সংগ্রামবাবু জবাব দিলেন, গল্পটা শরৎবাবু আমার কাছেই পেয়েছিলেন কিনা, তাই বলছি।

এবার সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, সে কি কথা? শরৎবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'ল কবে?

সেই অপূর্ব হাসিটি ফুটে উঠল সংগ্রামবাবুর মুখে। তিনি চোখ না খুলেই বললেন, না, পরিচয় কখনও হয় নি। তা হ'লে গল্পটা তিনি আমার থেকে পেলেন কি ক'রে, এই কথা বলবে তো? শোন তবে। বছর তিনেক আগেকার কথা। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছি। খাওয়াদাওয়ার পর গল্পগুজব চলছে, কথায় কথায় আমার নিজের জীবনের কয়েকটা অভিজ্ঞতার কথা বললাম।

নতুনকাকা জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলো কি? গল্পই, না, গুজব?

সে প্রশ্নে কান না দিয়ে সংগ্রামবাবু বললেন, একটি অচেনা ভদ্রলোক কাছেই ব'সে ছিলেন। তিনি খুব মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনলেন, প্রশ্নও করলেন দু-একটা। ভদ্রলোক চ'লে যাওয়ার পর একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, তিনিই শরৎবাবু।

হীরুমামা বললেন, এ কথার সঙ্গে 'পথের দাবী'র কি সম্পর্ক ?

কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে আস্তে আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সংগ্রামবাবু বললেন, 'পথের দাবী' আমারই জীবনীর এক অংশ, আমিই ডাক্তার। সংগ্রাম মুখুজ্জের নামের শুধু প্রথম অক্ষরগুলিই রেখেছেন শরৎবাবু। ডাক্তারের নাম শৈল মল্লিক বললে না ?

বাস্! নতুনকাকা, হীরুমামা, সিঙ্গি সায়েব, সব একঘায়ে ঠাণ্ডা, আর স্পীকটি নট। কেবল কালী মাস্টার একটা ঢোক গিলে কষ্টে-সৃষ্টে বললেন, কই, আমরা তো কখনও—

সংগ্রামবাবু আবার চোখ বুজে এলিয়ে প'ড়ে বললেন, তোমরা কবে জানতে চেয়েছ, বল ?

ঠিক এই রকম একটা কথার পরই নদীতে প'ড়ে যাওয়ায় 'কপালকুণ্ডলা'র গল্পটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সংগ্রামবাবুর গল্প শুরুই এ কথার পর।

সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন, বুড়াবালাং নদীর তীরের সেই ঘটনাটার পরে—

দত্ত মশাই চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ! যতীন মুখুজ্জের—

বাধা দিয়ে সংগ্রামবাবু বললেন, ঠিক তাই। ঘটনাটার পরে এ দেশে পুলিস এমন হুলুস্থুল লাগাল যে, আমার পক্ষে আর লুকিয়ে থাকাও অসম্ভব হয়ে পড়ল। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই ঠিক করলাম। কোকনদ বন্দরে এসে সুযোগও জুটে গেল একটা। শুনতে পেলাম যে একখানা মালের জাহাজ সুমাত্রা যাবার জন্যে তৈরি, কিন্তু জাহাজের বাবুর্চির হঠাৎ গুরুতর অসুখ হয়ে পড়ায় আর একজন বাবুর্চি না পাওয়া পর্যন্ত জাহাজ ছাড়তে পারছে না। অমনই গিয়ে জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করলাম।

সিঙ্গি সায়েব ব'লে উঠলেন, মাই সেইণ্টেড আণ্ট! আপনি কি শেফের কাজও জানেন নাকি ?

একটু থেমে সংগ্রামবাবু বললেন, সহজেই পেয়ে গেলাম কাজটা—গরজ বড় বালাই কিনা! নাম বললাম পেড্রো, দেশ বললাম গোয়ায়।

নতুনকাকা বললেন, তা যেন হ'ল। চেহারা দেখে অবশ্য তাতে সন্দেহ হবার কথা নয়। কিন্তু পাসপোর্ট-টোট লাগল না?

হীরুমামা ধমকে উঠলেন নতুনকাকাকে, আঃ! এটা কি ইতিহাসের ক্লাস ভেবেছ রামপদ? গল্প শুনতে ব'সে অত খুঁতখুঁতে হ'লে চলে কখনও? চুপ ক'রে শুনে যাও।

সংগ্রামবাবু আবার শুরু করলেন, আঠারো দিনে জাহাজ সুমাত্রার বেঙ্কুলেন বন্দরে পৌঁছল। কিন্তু সন্ধ্যার আগে বন্দরে ঢুকতে না পারায় জাহাজখানা বার-সমুদ্রেই থাকল সে রাতটা। আমি দেখলাম যে, এই সুযোগ। বন্দরে নামলে কি বিপদ হয় কে জানে! তাই শেষরাতে সব যখন নিঝঝুম, তখন সমুদ্রে নেমে পড়লাম নোঙ্গরের শিকল বেয়ে। তারপর মাইল তিন-চার ঘুরে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বন্দর থেকে একটু দূরে এসে ডাঙায় উঠলাম।

কালী মাস্টার আর পারলেন না, ব'লে উঠলেন, শা—

হীরুমামা গম্ভীরভাবে বললেন, ফের!

কালী মাস্টার আমতা-আমতা ক'রে বললেন, আমি তো মন্দ কিছু বলি নি, সাবাস বলতে যাচ্ছিলুম।

নতুনকাকা বললেন, তুমি থাম। তারপর মুখুজ্জে?

সংগ্রামবাবু একটু অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। বললেন, তারপর? তোমাদের 'পথের দাবী'খানা প'ড়ে নিও, তা হ'লেই হবে।

আর কিছু বললেন না। তাঁর মুখে ফুটে উঠল সেই হাসি, তাতে যেন একটু বিদ্রূপের আভাস। আমাদের মনে ধাঁধা লেগে গেল, যা শুনলাম তা কি গল্প, না, সত্যি?

তারপর আর অনেকদিন তাঁকে দেখি নি, কারণ এর কিছু দিন পরেই তিনি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। তার বছর চার-পাঁচ বাদে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একেবারে অদ্ভুতভাবে।

এম. এ. পরীক্ষার পর বেড়াতে বেড়াতে রাজপুতানার দিকে যাই। ভ্রমণকাহিনী-রচয়িতাদের ভাষায় যাকে 'যাযাবর-বৃত্তির প্রেরণা' বলে, তাই এসেছিল বোধ হয়। জয়পুর, আজমীর, চিতোর

দেখে আবু-পাহাড়ে গেলাম। একদিন সেখান থেকে অনধ্রা দেবীর মন্দির দেখতে গিয়েছি, পথে এক সাধুর সঙ্গে দেখা। পরনে গেরুয়া কাপড়, হাতে একগাছা লাঠি, ভস্ম বা জটা কিছু নেই।

আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, বাঙালী?

সসম্ভ্রমে বললাম, জী।

তিনি হেসে বললেন, আমিও বাঙালী।

হাসিটি দেখেই ভুলে-যাওয়া কথা যেন মনের মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মত ফুটে উঠল। তবু, ব্যাপারটা এমন অবিশ্বাস্য যে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললাম, মাপ করবেন, আপনি কি সিং—

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক ধরেছ। এখন তাই বটে। তুমি পলটু তো?

পলটু আমার ডাকনাম। বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাধু আবার বললেন, তোমার প্রোফাইল দেখেই চিনেছি।

আর সন্দেহ রইল না, কারণ আমার যশুরে-কইয়ের মত মাথার সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করতে হ'লেই সংগ্রামবাবু বলতেন, প্রোফাইল। ছেলেবেলায় অনেকবার সে কথা শুনেছি।

প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু। তারপর চ'লে গেলেন। আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

কিন্তু আমি তাঁকে অত সহজে ছাড়লাম না। সঙ্গ নিলাম। তিনি ফিরে দেখলেন, কিন্তু বারণ করলেন না।

নিঃশব্দে অনেকটা পথ এলাম। পথে খালি একবার বললেন, কৌতূহল হয়েছে, না? চল তবে।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক দূর চ'লে এসে এক জায়গায় থেমে সাধু বললেন, এই আমার আশ্রম।

ছোট একটা গুহার মুখ দেখতে পেলাম। তার বাইরেই একখানা পাথরের উপর তিনি বসলেন। আমাকে বসতে বললেন।

তারপর শুরু হ'ল তাঁর এ ক বছরের কাহিনী।

কলকাতায় কি ক'রে যেন এক কাবুলী মেওয়াওয়ালার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁর। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল যে, কিছুদিন গিয়ে তাদের

দেশে বেড়িয়ে এলে মন্দ হয় না। সংসারের কোনও বন্ধনই তো ছিল না। অমনই চ'লে গেলেন কাবুলী বন্ধুটির সঙ্গে। জেলালাবাদে তার বাড়ি। সেখানে কয়েকদিন থেকে তারপর বের হলেন দেশটা দেখতে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি রুশ সীমান্তে এসে বাধা পেলেন। আর এগোতে না পেরে তাঁর নাকি রোখ চ'ড়ে গেল। রাত্রির অন্ধকারে সীমান্ত পার হয়ে তুর্কোমানিয়ার এক গ্রামে ঢুকলেন। গা-ঢাকা দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে সারাদিন পর এক গৃহস্থের বাড়ি অতিথি হলেন। তার থেকেই হোক অথবা অন্য কোনও উপায়েই হোক, খবর পেয়ে পুলিস এসে সে রাত্রিতেই বাড়ি ঘেরাও করে।

বাড়িটার ঠিক পিছনেই ছিল একটি খরস্রোত পাহাড়ী নদী। কাঠের ব্যবসায়ীরা গাছ কেটে তাতে ভাসিয়ে দিত, সেগুলি স্রোতে ভেসে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছলে আর একদল লোক সেগুলি তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করত।

পুলিসের সাড়া পেয়েই সংগ্রামবাবু খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অন্ধকার রাত্রি। তারই আড়ালে তিনি পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল বেয়ে নদীর বুকে নেমে এসে নিঃশব্দে জলে দিলেন গা ভাসিয়ে। স্রোতের টানে কোনও পাথরে আছাড় খেয়ে হয়তো চূর্ণ হয়ে যেতেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে খানিক পরেই হঠাৎ পেয়ে গেলেন ভেলার মত ক'রে বাঁধা কয়েকটা গাছের গুঁড়ি। তার ওপরে ব'সে সারারাত কাটল। রাত্রির অন্ধকারে কখন সীমান্ত পার হয়েছেন জানেন না, সকাল হতেই ধরা প'ড়ে গেলেন কাঠওয়ালাদের লোকের হাতে। দিনকতক লাঞ্ছনা ভোগের পর জেলালাবাদ থেকে মেওয়াওয়ালা বন্ধু এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁকে আর নিজের কাছে রাখতে ভরসা পেলেন না, বিদায় ক'রে দিলেন। পাথেয় কিছু দিয়েছিলেন হাতে। তাই নিয়ে তিনি ঘরমুখো হলেন।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তাঁকে টেনে নিয়ে গেল অন্যপথে। ফেরবার পথে ট্রেনে তাঁর আলাপ হ'ল একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তার ফলে তাঁর এ জ্ঞান জন্মাল যে, পরমার্থ ছাড়া আর কোনও অর্থই অনুধাবনের যোগ্য নয়। তাঁরই সঙ্গে চ'লে এলেন এখানে, আরাবল্লী পর্বতের অর্বুদশিখরে

নির্জনতার সন্ধানে। থাকেন এই পাহাড়ের ফাটলে, করেন কেবল পরমার্থচিন্তা। কিছু সংগ্রহ হয়ে যায় তো খান, না হয় তো তাতেও ভাবনা নেই। অশান্ত জীবন শান্ত ক'রে আনছেন।

সাধু চুপ করলেন। পাহাড়ে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখে আমি একটু পরেই বিদায় নিয়ে চ'লে এলাম।

তার পরদিনই আবু-পাহাড় ছেড়ে আসি।

আর একবার দেখা হয়েছিল। আবার কলকাতায়, এই ঘটনার সাত-আট বছর পর। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে শুনলাম যে, কে যেন একজন আমার কাছে এসেছিল। ব'লে গেছে যে, স্বামী অকিঞ্চনানন্দ আমাকে দেখতে চান, বাগবাজারের একটা ঠিকানায় আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

কোনও সাধুসন্তের তোয়াক্কা রাখতাম না, তাই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না যে, ইনি কে এবং আমাকে এঁর কি দরকার! জানব কি ক'রে? আবু পাহাড়ের সাধুকে তো তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করি নি।

তবু গেলাম। ঠিকানায় পৌঁছে দেখি যে, মুখুজ্জে মশায়ই স্বামী অকিঞ্চনানন্দ। আরও রোগা হয়েছেন, কিন্তু শান্ত চেহারাটি কমনীয়তায় অপরূপ। আমাকে দেখে স্মিতমুখে বললেন, এস পল্টু, ব'স।

কাজের কথা যে কিছু ছিল, তা নয়। বললেন যে, শরীর খুব খারাপ হয়ে এসেছে, তাই একবার দেশে এসেছেন সকলের সঙ্গে দেখা করতে। আর, সম্ভব হ'লে দেশের মাটিতেই দেহ রাখতে। জন্মভূমির আকর্ষণ সন্ন্যাসের নির্লিপ্ততার উপর জয়ী হয়েছে বুঝলাম। যে মাটির মায়ের ভালবাসা একদিন তাঁকে ঘড়ছাড়া ক'রে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ঘুরিয়েছে, আজ সেই ভালবাসাই তাঁর জীবনে জয়ী হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মায়ের কোলে, একমাত্র যে মাকে তিনি চিনেছিলেন।

কিছুক্ষণ কথা বলবার পর উঠে এলাম। বিদায়-বেলার হাসিটি তাঁর ভুলব না কখনও। হাসি নয়, সমস্ত মুখে সে যেন এক জ্যোতির উল্লাস।

সেই-ই শেষ দেখা। কেন না, তিনি এর পরেই তাঁর স্বগ্রামে ফিরে যান। বহুদিন পরে খবর পেয়েছিলাম যে, তিনি মায়ের কোলে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্থান পেয়েছিলেন।

এখনও মধ্যে মধ্যে ভাবি, তিনি যা যা বলেছিলেন, সব কি সত্য? বুঝি না। এখনও ধাঁধা লাগে।

শ্রীঅমলেন্দু সেন

অভিনয়

নিজেকে নিয়ে আমাদের একাধারে অহঙ্কার ও অসন্তোষ। আমরা যা হয়েছি তা ছাড়া আরও কিছু হতে চাওয়াটা আমাদের সহজাত। হয়তো এই প্রেরণাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, অন্তত বাঁচার মানে জুগিয়েছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, যদি পৃথিবীতে নিশ্চয়তা ব'লে কিছু থাকে। পৃথিবীর ও জীবনের সমস্ত কিছুর স্বাদ পেতে চাই আমরা নিজের মধ্যে···নিজেকে একটা অঙ্ক সংখ্যার মত সুনির্দিষ্ট ক'রে রাখতে কষ্ট বোধ হয় আমাদের···তাই কখনও সাজি ভিখারী, কখনও রাজা, কখনও মাতাল, কখনও কবি।

কিন্তু বোধ হয় এটা ঠিক ভাবে বলা হ'ল না। আসল কথা আমরা সর্বদাই একলা, অথচ কোন সময়েই একলা থাকতে চাই না। কেবল নিজের জীবনের সুনির্দিষ্ট সীমাটা আমাদের কাছে গণ্ডী ব'লেই মনে হয়, অন্তত আমাদের মন যদি থাকে সে আরও ছড়িয়ে পড়তে চায়। সে প্রবেশ করতে চায় অন্যের জীবনে, স্বাদ পেতে চায় অন্যের আশা-আনন্দের, এক কথায়,—দাঁড়াতে চায় সে অন্যের জগতে। আত্মকেন্দ্রী-জীবনবৃত্তে আবর্তন সম্ভব কিন্তু প্রসার বা গতি তার বিধিবহির্ভূত। তাই আমাদের সর্বদাই এই, না, শুধু হতে চাওয়া নয়, পেতে চাওয়া, নানা মানুষের নানান জগৎকে, সাদা-কালো, বাঁকা-চোরা, হলদে-সবুজ নানা রঙে রঙিন নানা মানুষের পৃথিবীকে। আশ্চর্য এই পৃথিবী, জানি সে একেবারে আশ্চর্যভাবে একক, তবুও জানি যে, দুশো কোটি মানুষের জন্যে র'য়ে গেছে দুশো কোটি নানান পরিধির জগৎ। আমারও ঠাঁই রয়েছে তার একটিতে, কিন্তু সে একটিতেই মন ভরে না। এক হয়ে যেতে চাই বৃহৎ বিচিত্র জগতে।

অথচ এই পাওয়া কি দুঃসাধ্য, অন্য মানুষের জীবনে বা জগতে প্রবেশ করা কি আশ্চর্যরূপে দুরূহ। অন্তরে-অন্তরে যে অন্তরাল, তার মাপ করবে কোন্ যন্ত্র! তবু পেতে হবে, অন্তত মন চাইবে, পাগলের মত চাইবে পেতে। বাসের মধ্যে ব'সে আছি, পাশেই যে গম্ভীর মুখে লোকটি ব'সে আছে হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকাই; আমি কি কোন রকমে—হ্যাঁ, কোন রকমে তার নিজস্ব জগৎটিতে ঢুকতে পারি না? তার অতীত ভবিষ্যতের একান্ত আপন রূপটি কি আমার চোখে পড়বে? হঠাৎ চোখ প'ড়ে যায় তার চোখের ওপর, বিস্ময় ও বিরক্তি ফুটে উঠছে আমার অসংগত দৃষ্টির আতিশয্যে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিই। কোন্ নিষ্ঠুর বিধাতার অভিশাপ আছে আমাদের ওপর, অন্তরে অন্তরে কি অনন্ত বিস্তৃত অন্তরাল!

কিন্তু তবু—তবু আমাদের পেতে হবে। এর মূলে কৌতূহল নেই, আছে ভালবাসা। ভালবাসাই আমাদের সচেতন করেছে শুধু অন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নয়, অন্যের আত্মা সম্বন্ধে। ভালবাসাই রাজাকে ভিখারী হতে ডেকেছে, সন্ন্যাসীকে হতে বলেছে প্রেমিক। ভালবাসাই আমাদের গণ্ডীবদ্ধ হতে দেয় নি, দেয় নি আত্মকেন্দ্রিক হতে। ভালবাসাই আমাদের অহঙ্কারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ভালবেসেছে ব'লেই না মানুষ প্রবেশ করতে চেয়েছে অন্যের জগতে, অন্যের জীবনে। হয়তো ধাক্কা খেয়েছে, কারণ চাইলেই পাওয়া যাবে বা ভাবলেই করা যাবে এ তো সে জিনিস নয়। জীবন্ত মানুষ যে কঠিন, সে যে অস্থির, তার অস্তিত্বের অজস্র আয়াস ও চাহিদা নিয়ে…তাই প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, সিংহদ্বার খুঁজে পাই না; রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, কোথায় হারিয়ে গিয়েছে অভিজ্ঞান। তবু এই ভালবাসা সত্য; সত্য এই জীবন-পিপাসা, তাই অভিনয় করি, যতটা না অন্যকে ভোলাই, তার চেয়ে ঢের বেশি ভোলাই নিজেকে। দেশ ও কালের ধারায় সুদূরবর্তী কত মানুষের সঙ্গে একাত্ম ক'রে ফেলি নিজেকে, কত অবাস্তব প্রেমের বেদনায় কম্পিত হয় হৃদয়। পৃথিবীর কঠিনতম ব্যবধান যে মানুষে মানুষে, এক মুহূর্তে তাকে একাকার ক'রে, এক রাত্রির জন্য জীবনের দিকে তাকাই অজানা

দৃষ্টিতে। পৃথিবীর কঠিনতম বন্ধন যে আপন পরিধিতে, বন্দী হয়ে থাকার মধ্যে; তার হাত থেকে মুক্তি লাভ করি। নীড়ের অন্ধকার থেকে জীবনের আকাশটা দেখতে পাই যেন।

এই জন্যই অভিনয় আর্ট, মহৎ আর্ট। সহ-অনুভূতির মধ্যে তার জন্ম, আপন সীমার বাঁধন সে ভেঙে দেয়। যে ভালবাসা মানুষকে কবি করেছে, সে-ই তাকে ক'রে তুলেছে অভিনেতা, আত্মার যে অমেয় বিস্তৃতি কাব্যের মহত্তম দান, সেই অভিনয়কে মহৎ করেছে। এই জন্যেই অভিনয় সেইখানেই সার্থক যেখানে সে আর অভিনয় নেই, যেখানে সে জীবনের মত সত্য হয়ে উঠেছে। সেইখানেই সত্য ও মিথ্যার স্থূল প্রভেদটা ঘুচে গিয়ে আশা ও ব্যর্থতার মূল প্রভেদটা ধরা পড়ে। ওথেলো গলির অনেকের চেয়ে অনেক বেশি সত্য হয়ে ওঠে।

এই জন্যই যিনি ভাল অভিনেতা, তিনি নিজের চরিত্রের ব্যাখ্যা করেন না। নিজের প্রকাশ তাঁর কোথাও নেই, অন্যের মাধ্যমে তাঁর যেটুকু আত্মব্যাখ্যা, তিনি যে আত্মার অন্দরমহলে একক অভিযাত্রী, তাই তিনি এত নিঃশব্দগতি। অন্যের পৃথিবীর কাছে তাঁর আত্মদান সম্পূর্ণ, তারই মধ্যে তাঁর আপন আত্মার সঞ্চরণ। মানুষকে বোঝাটাই তাঁর চূড়ান্ত চাওয়া—জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, কিন্তু সব চেয়ে গভীর প্রেমিক তিনিই!

অসিতকুমার

সংঘাত

ধীর মন্থর গতিতে সুব্রত অফিস হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াইয়া হাত দুইখানি মাথার উপর তুলিয়া আঙুলগুলি একটি একটি করিয়া মটকাইল। তাহার পর উদয়শঙ্করী ঢঙে একটা আড়মোড়া ভাঙিয়া রাস্তার দিকে চাহিল। লাস্ট কার চলিয়া গিয়াছে কি না কে জানে!

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নাক চাপা দিয়া সুব্রত শশব্যস্তে খানিকটা দূরে সরিয়া যায়।

একগাদা ছাই আর পচা তরকারির খোসা। তাহারাও গাড়ির

আশায় পড়িয়া আছে। বাস বা ট্রাম নয়, কর্পোরেশনের জমাদারের হাতে-ঠেলা গাড়ি। তবুও তো গাড়ি! অন্যমনস্ক হইয়া সুব্রত ইহারই হাতখানেক দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

গাটা ঘিনঘিন করিতে থাকে। ক্রমাগতই সে থুতু ফেলে আর রুমাল দিয়া মুখ মুছে। একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির লোক সুব্রত। অফিসে এক কাপ চা খাইতে হইলেও সে সাবান দিয়া হাত-মুখ ধুইয়া নেয়। ছোট একটা এটাচিতে সাবান, তোয়ালে, এমন কি জল খাইবার জন্য একটা কাচের গেলাস, পেয়ালা-পিরিচ অফিসেই মজুত করিয়া রাখিয়াছে। এজন্য অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপই তাহাকে সহ্য করিতে হয়। হইলই বা, পরের মন রাখিতে গিয়া সে স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে পারে না।

স্বাস্থ্য লইয়া গর্ব সে করিতে পারে বইকি! নাই বা হইল পালোয়ান সে। আজ দুই বৎসর সে 'দৈনিক বার্তাবহে' কাজ করিতেছে; সামান্য মাথা ধরায় কাতর হইতে তাহাকে কেহ কোনদিন দেখে নাই। ওই দোহারা চেহারা লইয়াই সে যে ভূতের খাটুনি খাটিতে পারে, একটা আড়াইমণী পালোয়ানও তাহা পারিবে না। নিরুপায় হইয়াই তাই সকলে তাহার একটু খাতির করে।

আজ যে এত রাত পর্যন্ত বাড়তি খাটুনি খাটিতে হইল, সেও ওই খাতিরেরই জের। রাত আটটায় তাহার ডিউটি শেষ হইবার কথা। কিন্তু নাইট-শিফটের দুইজন সহযোগী যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই। একজনের পেটব্যথা শুরু হইয়াছিল, অন্যটি অ্যাসপ্রো খাইয়া বুঁদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই সহকারী বার্তা-সম্পাদক মোহিনীবাবু তাহাকে দিয়াই ভূতের ব্যাগার খাটাইয়া লইলেন এই রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত।

মোহিনীবাবুকে লইয়া সত্যই সুব্রত আর পারিয়া উঠে না। যত সব বাজে কাজ তাহার উপর ক্রমাগতই চাপাইতে থাকেন। কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্টের মাঝে গুঁজিয়া দিলেন দাদের মলমের এক বিজ্ঞাপনের কপি। এখনই চাই। আবার মিষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, সুব্রত, দুটো আইন-আদালত ক'রে দেবে হে?

ওই আইন-আদালত দেখিলেই সুব্রতর পিত্ত জ্বলিয়া যায়। কেন যে ওইসব ছাইপাশ ছাপাইয়া বাহির করা হয়! কে তাহার প্রণয়িনীকে খুন করিল, কে কাহাকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল, কোথায় কে দশমবর্ষীয়া এক বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করিল! যত সব কুৎসিত ব্যাপার! মানুষের পশু প্রবৃত্তিটাকে খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া জাগাইয়া তোলা!

তাহার নিজের অন্তরের নারীদেহ-লোলুপ বর্বরটাই তো মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চায়।

নারীসঙ্গবিমুখ হয়তো সে কোনদিনই ছিল না। তাহার জীবনেও বহু বেলা, রেখা, সবিতা ছায়াপাত করিয়াছে; কিন্তু আমল সে কাহাকেও দেয় নাই। উপেক্ষা করে নাই সত্য, কিন্তু আলাপ-পরিচয়ের মাত্রা স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়াইয়া যাইতে দেয় নাই। তাহার ভদ্র মন ও সর্বোপরি তাহার খুঁতখুতে স্বভাবই ইহার জন্য দায়ী। বিবাহের পর অণিমাকে লইয়াই সে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। পাছে দুর্বল মুহূর্তে সে অণিমার প্রতি অবিচার করিয়া বসে, সেই ভয়ে আজকাল সে অতিমাত্রায় সংযত হইয়া চলে।

অণিমা তাহার স্ত্রী। কিন্তু তাহাকেই কি সে নিবিড়ভাবে কাছে পাইয়াছে কোন দিন? বিবাহের পরেই হইয়াছে দেশ-বিভাগ। মাকে ও অণিমাকে লইয়া উঠিতে হইল বিপিনের ওখানে। বন্ধু বিপিনই পরামর্শ দিয়াছিল, অযাচিতভাবেই আশ্রয় দিয়াছিল। একখানি ঘর লইয়া বিপিন থাকে তাহার বোন রেখা ও ভাই অতীনকে লইয়া। পিতৃমাতৃহীন ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করিতে গিয়া বিবাহ করিবার অবকাশ তাহার আজিও ঘটিয়া উঠে নাই। ইহারই মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া তুলিয়াছে সুব্রতর পরিজনদের। উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিল, বাসা একটা জুটিয়া যাইবেই। কিন্তু আজ ছয় মাসেও দুইটি কুঠুরি তাহারা যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিল না।

সুব্রত আর বিপিনকে রাত্রে শুইতে হয় সুব্রতর পুরাতন মেসে। ছোট্ট খাটখানিতে দুইজনের শুইতে কষ্ট হয়। তবুও এটুকুও যে আছে, তাহাই যথেষ্ট।

রাত্রে যখন খাইয়া-দাইয়া দুই বন্ধুতে বাহির হয়, বিপিন প্রত্যহই কোন না কোন অছিলায় আগাইয়া যায়। সদর বন্ধ করিতে আসে অণিমা। দরজার কপাটে হাত দিয়া সুব্রতর মুখের দিকে চাহিয়া একটু ম্লানভাবে হাসে সে। এদিক ওদিক তাকাইয়া সুব্রত খপ করিয়া অণিমার হাতখানি চাপিয়া ধরে। নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করে, একটু আদর করে। অণিমা বাধা দেয় না, একটু হাসে। অত্যন্ত করুণ সে হাসি। দ্রুতপদে বাহির হইয়া যায় সুব্রত। অণিমা দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়াই থাকে। এমনিই চলিতেছে আজ ছয় মাস।

অণিমার স্পর্শ তাহার রক্তের কণায় কণায় আগুন ধরাইয়া দেয়, তাহাকে নিবিড়ভাবে কাছে পাইবার ব্যাকুলতা তাহার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে। ওই ভিড়ের মাঝেও সকলের অগোচরে সে অণিমার দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকে।

অতনু অণিমা। সর্বদাই আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া ধরিবার উপায় নাই। অণিমা নয়, যেন অণিমার ছায়া।

সচকিত হইয়া উঠে সুব্রত। এত লালসা! নারীদেহ-লুব্ধ পশুটার আকুলি-বিকুলি! অণিমার সান্নিধ্য তাহার অন্তরে যে বিহ্বলতা আনিয়া দেয়, তাহা কি কেবলমাত্র অণিমাকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে! যে কোন সুন্দরী তরুণীর সংস্পর্শে সে কি অমনিই আবেশ-বিহ্বল হইয়া পড়িবে না?

ভারি বিপন্ন বোধ করে সুব্রত। কে জানে অন্তরের এই লালসা তাহার চোখে-মুখেও প্রকট হইয়া উঠে কি না? তাহার অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা হয়তো বিপিন, মা, এমন কি ওই রেখারও নজর এড়ায় নাই। তাহার অবিরত মনোযোগে অণিমা হয়তো বিব্রত হইয়া উঠে।

লালসা!

লালসা! স্বামী-স্ত্রীর মিলনাকাঙ্ক্ষা, প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের সঙ্গলাভ করিবার ইচ্ছা কি লালসা? যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম কি অশুচি?

তাহার লুব্ধ মনোবৃত্তি কি সত্যই অণিমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলে? সেও কি তাহার সান্নিধ্য কামনা করে না? তাহার হাসি, ভাসা-ভাসা

চাহনির মাঝে কি কোন আবেদনই নাই? সে যে সর্বদাই আত্ম-সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, হাবে ভাবে ভঙ্গীতে তাহা কি অণিমা প্রতিনিয়তই তাহাকে জানাইতেছে না? নানা ছলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ক্লান্ত শরীরটাকে টানিয়া আনিয়া বিদায় মুহূর্তটিতে সুব্রতর পাশে আসিয়া সে দাঁড়ায় কিসের আশায়?

সুব্রতর মাথা গরম হইয়া উঠে। পাশে বিপিন কোঁসকোঁস করিয়া নাক ডাকিয়া ঘুমায়। সুব্রত উঠিয়া চোখে-মুখে ক্রমাগত জল ছিটাইতে থাকে।

আজও অণিমা নিশ্চয়ই বসিয়া আছে তাহারই ফিরিবার প্রতীক্ষায়। নিভৃত-মিলনের এই সামান্য সুযোগটুকুও সে কিছুতেই হারাইতে রাজী নয়।

আবার ব্যগ্রভাবে রাস্তার দিকে তাকায় সুব্রত। ট্রাম বাস কি সত্যই আজ আর আসিবে না?

চোখ যাইয়া পড়ে আবার সেই ছাই-গাদাটার উপর।

রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছে। আরও দুই পা দূরে সরিয়া যায়।

তাহার সকল রাগ যাইয়া পড়ে মোহিনীবাবুর উপর। কখন সে বাড়ি যাইয়া পৌঁছাইতে পারিত! মোহিনীবাবুই তো বখেড়া জুটাইলেন—ওই আইন-আদালত। কদর্য। আবার কেবলমাত্র রায়টুকু লিখিলেই চলিবে না, "ঘটনার বিবরণে প্রকাশ"ও লিখিতে হইবে। জঘন্য মনোবৃত্তি। সরকার আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিলে সে বাঁচিয়া যায়।

নাঃ, অনেক দুর্ভোগ আছে আজ কপালে! বিপিনকে ডাকিয়া তুলিতেই হয়তো রাত কাটিয়া যাইবে আজ।

একটা ভেঁপু শুনিয়া সে সচকিত হইয়া উঠে। বাসই আসিতেছে একটা। গ্যারাজ [illegible] হইলে রক্ষা। প্রায় মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে হাত তোলে।

বাঃ, বেশ ফাঁকা বাসটা! একটা খালি সীটে হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়ে। ঝাঁকানিতে ঝাঁকানিতে চোখ দুইটি বুজিয়া আসে।

বাসায় এতক্ষণ সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রান্নাঘরে অণিমা একাকী বসিয়া ঢুলিতেছে। তাহার বুভুক্ষু মনটা সহসা সজাগ হইয়া উঠিয়া বসে। অণিমা একা তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছে। অণিমাকে লইয়া দিনকত বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিলে হয় না? নাঃ, অসম্ভব। অফিস হইতে ছুটি মিলিবে না।

অফিস! কত আশা লইয়াই না সে 'দৈনিক বার্তাবহে' ঢুকিয়াছিল! সাহিত্য ও লোকসেবা, অপূর্ব উন্মাদনাময় অনুভূতি! কিন্তু ছয়টা মাস যাইতে না যাইতেই নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। রাশীকৃত অনুবাদের মধ্যে সাহিত্য কোথায়? রাজনীতির ঘূর্ণ্যাবর্তে জনসেবার আগ্রহ তলাইয়া গিয়াছে। সে অনুবাদও ভাবিয়া বুঝিয়া সুন্দর-শোভন করিবার অবসর নাই। ঝড়ের বেগে কলম চালাইতে হইবে। গতি শ্লথ হইলেই তাগাদা আসিবে—কপি চাই, কপি চাই। লাইনো যন্ত্রের সামনে যে মানুষগুলি বসিয়া থাকে, তাহারাও যন্ত্রই বনিয়া গিয়াছে। যন্ত্র-টেলিপ্রিণ্টার খবর ওগ্‌রাইতেছে; যন্ত্র-মানব রুটিন-মাফিক সম্পাদনা করিতেছে, যন্ত্র ছাপিয়া বাহির করিতেছে। সবটাই যন্ত্র। সর্বত্রই গতি-সাম্য রাখিয়া চলিতে হইবে। গতি আর সাম্য এ যুগের বুলি।

লিখিতে সে পারিত, এখনও পারে। সাময়িক পত্রিকায় দুই-একটা লেখা সে এখনও দেয়। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর কোটারি-গণ্ডি ভেদ করিয়া সেখানে স্থান করিয়া লওয়া অসম্ভব। "প্যোলিটিক্যাল ব্রেন" না হইলে দৈনিক কাগজের সম্পাদক-মণ্ডলীতে স্থান পাওয়া যায় না। মোহিনীবাবুর শাগরেদী করিয়াই এ জন্মটা কাটাইয়া দিতে হইবে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে মোহিনীবাবুর পরিত্যক্ত চেয়ারখানি অবশ্য একদিন পাইতে পারে। সেই আশায় সে ঝড়ের গতিতে অনুবাদ করিয়া চলে, দুর্ভিক্ষ, ডলার সঙ্কট, মণিপুরী নৃত্য, বিশ-হাতী অজগর সাপ, এমন কি আইন-আদালতও।

মনের এই অশুচিতায় সময় সময় গাটা ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কিন্তু উপায় কি? দেড় শো টাকা মাহিনার চাকুরি তাহাকে কে আর দিতেছে!

একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ঘাড়ের কাছে কিসের স্পর্শে জাগিয়া

উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তন্দ্রাতুর একটি মহিলা। কখন উঠিয়াছেন সুব্রত টের পায় নাই। তাহার সীটে ঠেস দিয়া বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন। মুখটা দেখা যাইতেছে না। বোধ হয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। চুলগুলি বব্ করিয়া ছাঁটা। রেশমের মত নরম চুলগুলি হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া সুব্রতর ঘাড়ে মুখে লাগিতেছে। গাড়ির দোলানিতে অনাবৃত বাহুর অংশবিশেষ আসিয়া বার বার তাহার কাঁধে ঠেকিতেছে।

বেশ লাগে সুব্রতের।

অন্য সময় হইলে সে হয়তো সরিয়া বসিত। হয়তো দাঁড়াইয়াই থাকিত। আজ সে নড়িল না। ঠেস দিয়া ঝাঁকিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া রহিল সে। রেশমী চুলগুলা তাহার চোখে-মুখে লাগিতেছে। বেশ মিষ্ট একটা গন্ধ। গায়ে গা ঠেকিতেছে বার বার। পাখির পালকের মত নরম সে স্পর্শ। সুব্রতের দেহ-মন মাতাল হইয়া উঠে। অসহ্য আবেগে শরীরটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে। অপূর্ব এক অনুভূতি! সুব্রতের শরীর অবশ হইয়া আসে।

রোথ্‌কে।

মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়ান। সুব্রত চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে। একরাশ কোঁকড়ানো রেশমী চুল কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুর অধিকাংশই অনাবৃত। সিল্কের ফ্রকটি সুডোল শরীরের সঙ্গে একেবারে লেপটিয়া আছে।

রোথ্‌কে, একদম।

ভদ্রমহিলা মুখ ফিরাইলেন। সুব্রত উত্তেজনায় দাঁড়াইয়া পড়িল।

সারাটা মুখে, বুকের অনাবৃত অংশে কুৎসিত শ্বেতরোগে ছাইয়া ফেলিয়াছে।. যেটুকু বাকি আছে লাল ঘায়ের মত তাহা দগদগ করিয়া চাহিয়া আছে।

বীভৎস.!

মাথাটা ঝিমঝিম করিয়া উঠে সুব্রতের। পাথরের মত ধপ করিয়া সে আসনের উপর বসিয়া পড়ে। বোধ হয়, সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবে সে!

অণিমা বসিয়াই ছিল। সুব্রতের সাড়া পাইয়া দুয়ার খুলিয়া কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

জিজ্ঞাসা করিল, এত দেরি যে?

সুব্রত জবাব দিল না। দুই পা সরিয়া গিয়া বলিল, কার্বলিক সাবানখানা, লুঙ্গি আর খোসাটা দাও তো।

বাথ-রুম হইতে বাহির হইল সে প্রায় এক ঘণ্টা পরে। ঘষিয়া ঘষিয়া সারাটা শরীর সে লাল করিয়া ফেলিয়াছে।

অণিমা রান্নাঘরের মেঝেতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সারাটা বাড়িতে জনপ্রাণীও জাগিয়া নাই। নিদ্রিতা অণিমার পাশে দাঁড়াইয়া সে কাঁপিতে থাকে।

টুক করিয়া একটা শব্দ হয়। বোধ হয় ইঁদুর। শশব্যস্তে অণিমা উঠিয়া বসে। মৃদু হাসিয়া গায়ে মাথায় কাপড় টানিয়া দেয়। নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে সুব্রত।

এত রাতে আজ আর কিছু খাব না।

অণিমা উঠিয়া দাঁড়ায়। মুগ্ধনেত্রে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকে। কি সুন্দর দেখাইতেছে আজ সুব্রতকে! কেন খাইবে না জিজ্ঞাসা করিতেও ভুল হইয়া যায়।

অস্বস্তি বোধ করে সুব্রত। বার বার নিজের বাহু-ঘাড়ের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ চলিতে আরম্ভ করে। পিছু পিছু চলে অণিমা। একটা দীর্ঘনিশ্বাসও যেন কানে আসে সুব্রতের।

দুয়ারের পাশে যাইয়া অভ্যাসমত দাঁড়াইয়া পড়ে। তারপর এক নিশ্বাসে বলে, কাপড়জামাগুলো কাল সকালেই লণ্ড্রিতে পাঠিয়ে দিও, লক্ষীটি।

মুখ তুলিয়া তাকায় অণিমা। ডাগর ডাগর দুইটি চোখে যে আবেদন ফুটিয়া উঠে, সুব্রতের তাহা অজানা নয়। যন্ত্রচালিতের মতই নিজের বাহু ও ঘাড়ের কাছটা দেখিয়া লয় সে। তারপরে হনহন করিয়া চলিতে থাকে।

দুয়ার ধরিয়া পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া থাকে অণিমা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জমি-শিকড়-আকাশ

দুই-তিন দিনের মধ্যেই বীরেশ্বর আর একবার মন স্থির করিয়া ফেলিল। একদিন দুপুরবেলায় সুনয়নার ঘুম ভাঙাইয়া ডাকিয়া তুলিল।

এ রকম ঘটনা খুব ঘটে না। সুনয়না অবাক হইয়া বলিলেন, কি ব্যাপার ঠাকুরপো?

ভারি গুরুতর কথা আছে বউদি।—বীরেশ্বর বলিল, তোমার ঘুমই ছাড়ল না ভাল ক'রে। কি বলব?

বল না, শুনছি আমি।

কথাটা হচ্ছে—

হঁ্যা।

শোন, দাদাকে ব'লো না কিন্তু।

না না। তা বলব কেন?

তোমরা দেখে-শুনে একটা মেয়ে ঠিক ক'রে দাও। আমি বিয়েই করব।

সুনয়না হাসিতে হাসিতে যেন লুটাইয়া পড়িলেন।—এই কথা? তারই জন্যে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছ?

এই মাত্র ঠিক করলাম। ভাবলাম, এক্ষুণি ব'লে রাখি।

বেশ করেছ। তা মেয়ে খুঁজতে হবে কেন? মেয়ে তো ঠিকই আছে।

কে?

ও, চেন না বুঝি?

কার কথা বলছ?—নামটা মুখে আনিতে একটু সময় পাওয়ার আশায় অহেতুক প্রশ্ন করল বীরেশ্বর।—ও, দীপিকার কথা বলছ? সে হবে না।

সুনয়না হালকা সুর পরিহার করিলেন। বলিলেন, কেন, কি হয়েছে ঠাকুরপো?

না, হয় নি কিছু।—বীরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।—আমার মত নেই।

সুনয়না বিশ্বাস করিলেন না।

বীরেশ্বর সুনয়নার মুখের দিকে তাকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার বলিল, দীপিকারও মত নেই।

সুনয়না অবিশ্বাসে বলিলেন, ইস্! মিথ্যে কথা। তোমার মত না থাকতে পারে। দীপিকার মত আছে।

প্রসঙ্গটা বীরেশ্বরের অসহ্য বোধ হইল। তাড়াতাড়ি বলিল, বেশ তাই। যাই হোক, দীপিকার হিসেব আর ক'রো না।

বীরেশ্বর চলিয়া গেল। সুনয়না উঠিয়া বীরেশ্বরের ঘরে ঢুকিলেন পিছনে পিছনে। বলিলেন, তোমার কথা কিছু বুঝি নে ঠাকুরপো। আজ যদি প্রস্তাব ক'রে পাঠাই, দিন থাকলে ওরা আজকেই রাজি হয়ে যাবে।

ওরা, কারা?

দীপিকার মা। আর দীপিকা তো এক্ষুনি চ'লে আসতে পারে।

বীরেশ্বর দৃঢ় উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিল, দীপিকা দীপিকা ক'রে কেন অস্থির হচ্ছ বউদি? আর কি মেয়ে নেই সংসারে?

থাকবে না কেন? অনেক আছে।—সুনয়না হাসিয়া বলিলেন, বেশ, দেখা যাবে।

হ্যাঁ, দেখো।—বীরেশ্বর দৃঢ় হাস্যে বলিল, আমি ভেবে দেখেছি। ও সব-মেয়েই সমান।

সব পুরুষের মত?

বীরেশ্বর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।—ঠিক তাই। বড় খাঁটি কথা বলেছ বউদি।

সুনয়না খুশি হইলেন বীরেশ্বরের হাসিতে। কিন্তু নিজে হাসিতে পারিলেন না। বলিলেন, কি জানি, কি তোমার মতলব! বেশ, আমরা মেয়ে ঠিক করছি। শেষে কিন্তু পেছুতে পারবে না, হ্যাঁ।

না, কিছুতেই না।

যাক, বিয়ে তো কর।—সুনয়না অবশেষে খুশির আমেজে বলিলেন, বাঃ বাঃ! শেষ পর্যন্ত সুবুদ্ধি যে হয়েছে, এই ঢের।

সুনয়না চলিয়া গেলে বীরেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অত্যন্ত হালকা বোধ করিল নিজেকে। অসহ্য চাপটা সরিয়া গিয়াছে। একটা

অনৈতিক অসৎ কাজের অনুভূতি আসিয়া গোপন মাধুর্যে মনটাকে ভরিয়া দিল যেন। অসৎ? অসৎ মনে হইল কেন? অবাক হইয়া কারণ খুঁজিতে লাগিল বীরেশ্বর। নিজের সম্পর্কে?

একটা ভ্রূকুটি করিয়া আত্ম-দর্শন হইতে বিরত হইল। অতি সৎ কাজ সিদ্ধান্ত করিয়া শান্ত হইল আবার। কিছুটা পারিপাট্যের সঙ্গে পোশাক ও প্রসাধন শেষ করিয়া বীরেশ্বর লঘুপদে বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তায় নামিয়া হালকা রসের গানের সুর উঠিতে লাগিল বীরেশ্বরের মনে। নিঃশব্দ কণ্ঠস্বরে সেই সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে হাঁটিতে লাগিল।

বাঃ!

বিপরীত দিক হইতে একজন তরুণী একা একা আসিতেছিল। গানের সুর বন্ধ হইয়া গেল বীরেশ্বরের। মনের কোন্ তারে যেন বাজিয়া উঠিল, বাঃ! তরুণীর দেহটা আগাগোড়া দৃষ্টির হাত বুলাইয়া দেখিতে দেখিতে চক্ষুর উপর আসিয়া মুহূর্তের জন্য স্থির হইল। বীরেশ্বরের অনভ্যস্ত ভদ্র চক্ষু লজ্জায় পরক্ষণেই ছিটকাইয়া সরিয়া গেল।

মেয়েটি যেন পরম অবজ্ঞাভরে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া পার হইয়া চলিয়া গেল। বীরেশ্বর পিছন ফিরিয়া আর একবার দেখিবার আশা প্রাণপণে দমন করিতে করিতে ঘাড় শক্ত করিয়া হাঁটিতে লাগিল।

আশ্চর্য! তরুণীও ফিরিয়া তাকাইয়াছে! বীরেশ্বর দেখিতে পাইয়া পুলকিত হইল। তৃপ্ত পৌরুষ সতেজ হইয়া উঠিল। দীপিকা! দীপিকার চেয়ে হাজার গুণে ভাল দেখিতে! পিছন হইতে যেন আরও চমৎকার! মনে মনে হিসাব করিতে করিতে প্রফুল্ল মনে অগ্রসর হইল।

আজ আর কোন কাজ নয়।

মেয়ে-ইস্কুলের সম্মুখের রাস্তা ধরিয়া নদীর পাড় দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শহরের একমাত্র বেড়াইবার স্থানটা বেড়াইয়া ফিরিল।

সিনেমার সময় আছে এখনও। তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট করিয়া সিনেমার ঘরের সামনে টাঙানো ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। এত লোকের মধ্যে ইংরেজী ছবির সাঁতারের পোশাক পরা প্রায়-উলঙ্গ নারী-মূর্তি সোজাসুজি দেখা সম্ভব নয়। বীরেশ্বর আড়চোখে দেখিতে লাগিল।

বিরামের সময় আলো জ্বলিলে বীরেশ্বর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। এক কোণে নত মস্তকে রামমোহনও বসিয়া ছিলেন। বীরেশ্বর খুশি হইয়া মুচকিয়া হাসিল।

বাহির হইয়া ভিড়ের সঙ্গে চলিতে চলিতে কিছু দূরে ভিড়টা যখন ক্রমে পাতলা হইয়া উঠিল, তখন আবার রামমোহনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল বীরেশ্বরের। কাহারও তরফে অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না।

কেমন আছ বীরেশ?—রামমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাল আছি।—বীরেশ্বর জবাব দিল।

সিনেমা ভাঙল বুঝি? সিনেমায় গিয়েছিলে তো?

হ্যাঁ।

কি ছবি হচ্ছে?

বাজে একটা ইংরেজী ছবি।—অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া জবাব দিল বীরেশ্বর।

মিনিট খানেক আর কোন কথা হইল না।

কদিন থেকে তোমার কথা ভাবছিলাম।—রামমোহন আরম্ভ করিলেন, তুমি গৌড়ানন্দের আশ্রমে যাবার প্রস্তাব করেছিলে?

ওঃ, হ্যাঁ, করেছিলাম।—নিতান্ত বোকার মত জবাব দিল বীরেশ্বর।

তিনি অস্বীকার করেছেন?

ঠিক অস্বীকার নয়। তার আর দরকার হয় নি আর কি। অসম্ভব বুঝে আমি আগেই চ'লে এসেছিলাম।

ও, কিন্তু স্বামীজী বলছিলেন—

তিনি মিথ্যে বলেন নি। অস্বীকারই করতেন।

যাক, ভাল হয়েছে। ও-রকম খেয়াল হ'ল কেন তোমার হঠাৎ?

জবাব দিতে একটু সময় লইল বীরেশ্বর। অত্যন্ত অনিচ্ছা বোধ

করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, ভাল লাগছিল না। ভাবলাম, আশ্রমে নির্ঝঞ্ঝাটে লেখাপড়া নিয়ে থাকতে পারব।

খুব ভুল ভেবেছিলে।—রামমোহন জোরের সঙ্গে বলিলেন, অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে প'ড়ে ছটফট ক'রে বেড়াতে হ'ত তোমাকে।

হ্যাঁ।—বীরেশ্বর হাসিয়া বলিল, তাই মনে হ'ল।

আমার সঙ্গে তর্ক হয় স্বামীজীর।—রামমোহন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।—পুরনো পুঁথি ঘেঁটে কিচ্ছু ফল হবে না দুনিয়ার। এথিক্স্! হঠাৎ ধমক দিয়া উঠিলেন।—ব্রড ইউনিভার্সাল এথিকাল প্রিন্সিপ্‌লের উপরে মানুষকে দাঁড়াতে হবে। যদি বাঁচতে চায় মানুষ।

কিন্তু সে রাস্তাও খুব পরিষ্কার নয়। রিলেটিভিটির আইন আছে। ইউনিভার্সাল কিছু হবে কি ক'রে?

রামমোহন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, হবে। যা মিথ্যা, যা অসত্য, যা অন্যায়—এই সব বাদ দিলে যা থাকবে, তাই ইউনিভার্সাল সত্য।

বীরেশ্বরের হঠাৎ হাসি পাইল। 'যা মিথ্যা' কথাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে হইতে লাগিল। কিছুই হইবে না। কোন আশা নাই। একটা অহেতুক নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিল বীরেশ্বরের মন।

মোড়ে আসিয়া বীরেশ্বর বিদায় লইল। রামমোহন বলিয়া দিলেন, যেও, যদি সময় পাও।

আচ্ছা।—বলিয়া বীরেশ্বর নিজের পথে রওনা হইল।

কিছুক্ষণ শূন্যমনে চলিতে চলিতে টের পাইল, মনের সেই মনোহারী সুরটা কাটিয়া গিয়াছে। রাগ হইল রামমোহনের উপর। সিনেমায় দেখা নারীমূর্তিগুলি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাড়ি ফিরিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিল। অনেক কথা চিন্তা করিবার আছে। কল্পনার বিলাসে ডুবিয়া অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়ার আনন্দ আজ চাই।...

বীরেশদা, শীগগির চলুন।

কে, প্রদীপ? কি ব্যাপার?

সর্বনাশ হয়ে গেছে, চলুন, সময় নেই।—প্রদীপ ছুটিয়া রওনা হইল। বীরেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

প্রদীপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দীপিকা—

হ্যাঁ।

আপনার সঙ্গে বিয়ের জন্য সেজেগুজে তৈরি হয়ে বসেছিল।

তারপরে ?

বলেনদার সঙ্গে কোথায় চ'লে গেছে, আর পাওয়া যাচ্ছে না।

বীরেশ্বরের দম বন্ধ হইয়া গেল। পাও আর চলিতেছে না, পিছাইয়া আসিতেছে।

দীপিকাকে দেখা গেল। টলিতে টলিতে সে বীরেশ্বরদের বাড়ির দিকেই আসিতেছে। দলিয়া মুচড়াইয়া দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে কে যেন। একটু পিছনে বলেন্দু দাঁড়াইয়া পিশাচের মত হাসিতেছিল। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল সে।

বীরেশ্বর দম বন্ধ করিয়া দেখিতেছে—

দীপিকা বীরেশ্বরের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

বীরেশ্বর বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া টানিয়া তুলিল। হঠাৎ লক্ষ্য করিল, দীপিকার অস্পষ্ট অনাবৃত দেহ। কয়েকটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, বল, কি হয়েছে বল ?

অস্ফুট জবাব দিল দীপিকা, বলেনবাবু—

তবে আমিও—। বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিল মনে।—এস শীগগির। উন্মত্তের মত টানিতে লাগিল।

...ঘুমটা অকস্মাৎ ভাঙিয়া গেল এই সময়। চমকিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে দুই দিকে হাতড়াইয়া দেখিল বীরেশ্বর। কেহ নাই। বুকের উপর হাত রাখিয়া বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দটাকে চাপিয়া ধরিল। সর্বাঙ্গ ঘামিয়া গিয়াছে।

৮

সারাদিন অধীর প্রতীক্ষার পর সন্ধ্যাবেলা বীরেশ্বর দীপিকার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। দিনের আলো তাহার বলিবার বিষয়বস্তুর

পক্ষে প্রশস্ত নয় ভাবিয়াই কোন রকমে ধৈর্য ধরিয়া দিনটা অপেক্ষা করিয়াছে।

অহেতুক কিছুকাল দীপিকাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল। দীপিকার মুখের উপর একটু বেশি রক্ত আসিয়া পড়িল মাত্র। কিন্তু সঙ্কুচিত হইল না। নতচক্ষু হইয়া চুপ করিয়া একটু যেন বিকশিত হইয়া রহিল।

দীপিকা!—কাঁপিয়া উঠিল বীরেশ্বর।—অনেকগুলো কথা আছে আমার তোমার সঙ্গে।

দীপিকা নীরবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

বীরেশ্বরও আবার একটু সময় লইল। বাষ্প ঘন হইয়া উঠিলে আপন জোরে বাহির হইয়া পড়িবে বীরেশ্বর জানে।

দীপিকা!—বাষ্প ছাড়িতে আরম্ভ করিল।—তোমাকে আমার কথাগুলো বলা চাই। হয়তো—। যাকগে, জবাব তোমার যাই হোক, আমি ব'লে যেতে চাই।

দীপিকার সমস্ত দেহ শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিল। বীরেশ্বর সেটাকে কাঠিন্য মনে করিয়া ক্ষেপিয়া গেল। বলিল, ভয় নেই তোমার। কোন অনুরোধ—দয়াভিক্ষা করতে আসি নি আমি।

ছোট একটা নিশ্বাসের সঙ্গে অধীরতা দমন করিল দীপিকা। মৃদু কণ্ঠে বলিল, আমি কি তাই বলেছি?

কিন্তু সুর কাটিয়া বীরেশ্বরের বাষ্প সেই পথে অনেকখানি বাহির হইয়া গিয়াছে। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

দীপিকা জ্যা-যুক্ত ধনুকের মত অসহায়ভাবে টঙ্কারের অপেক্ষা করিতে থাকিল।

বীরেশ্বর বলিল। কিন্তু কণ্ঠস্বরে প্রত্যাশিত উচ্ছ্বাস নাই, উত্তাপ নাই। বলিল, কালকে মনে হয়েছিল, তুমি—তুমি আমার জন্যেই নির্দিষ্ট। আর, আমি—তোমার জন্যে। এর আর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়। আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু কাল রাত্রেই যেন প্রথম সেটা প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখতে পেলাম।

একটু থামিয়া কান্নার মত এক টুকরা হাসিয়া আবার বলিল,

মানুষ তপস্যা করে আত্মাকে জানবার জন্যে। একটা স্বপ্নের মধ্যে আমি আমার আত্মাকে যেন মুখোমুখি দেখলাম।

বলিয়া দৃষ্টি আনিয়া দীপিকার উপর মুহূর্তের জন্য স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ সরাইয়া লইল। গভীর, সুতরাং অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ মিশাইয়া বলিল, সব অন্ধকার কেটে গেল যেন। জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল আমার, সমস্ত স্বচ্ছ হয়ে গেল।

দীপিকার একাগ্র একমাত্র প্রশ্ন আপনা হইতেই জড়িতকণ্ঠে বাহির হইয়া গেল, কি স্বপ্ন?

তুমি—তোমাকে দেখলাম স্বপ্নে।

প্রত্যাশিত টঙ্কারে দীপিকা আগাগোড়া বাজিয়া উঠিল। গভীর তৃপ্তির রাঙাহাস্যে মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া নত হইয়া রহিল।

বীরেশ্বরেরও মনে হইল, সমস্ত বলা এবং শুনার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। চুপ করিয়া কাছাকাছি বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। হঠাৎ এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই—এইটুকুই আমার বলার ছিল।

ব-সু-ন—

না, যাই।—বলিয়া বীরেশ্বর বসিল আবার।—প্রদীপ এখনও ফেরে নি বুঝি?

না, আসবে এখুনি হয়তো।

আর কিছু জিজ্ঞাস্য না পাইয়া বীরেশ্বর নীরবে বসিয়া রহিল।

খানিক বাদে আবার বলিল, প্রদীপ বিকেলে বেরিয়েছে?

হ্যাঁ। এই সময় একবার আসে। এসে আবার বেরিয়ে যায়।

ও।

আর টানিতে পারিল না বীরেশ্বর। দীপিকার দিকে আর একবার তাকাইয়া হঠাৎ অকারণে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।—আচ্ছা, চলি। বলিয়া এবার সোজাসুজি উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

দীপিকা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল। কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল একটু। খুশিমনে মায়ের কাছে গিয়া চুপ করিয়া বসিল।

শান্তিলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরেশ কি বললে রে ?

না, এই গল্পসল্প করলেন। দাদার জন্তে অপেক্ষা করলেন।

শান্তিলতা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া শুধু বলিলেন, বীরেশ ছেলেটা ভাল। বেশ ছেলে। হবেই তো, এম. এ. পাস করেছে। দোষের মধ্যে—

কি দোষ ?—দীপিকা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ভাল চাকরি-বাকরি কিছু করে না, এই। অতগুলো পাস ক'রে করছে কিনা দালালি।

চাকরির চেয়ে দালালিতে যদি টাকা বেশি পাওয়া যায়, তবে তাই তো ভাল।—দীপিকা নিজেকে বলিল যেন।

শান্তিলতা প্রতিবাদ করিলেন না। স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ভাবিলেন, ধারণা ভাল থাকাই ভাল। ভাবনার এই ধারা অনুসরণ করিতে কবিতে মগ্ন হইয়া গেলেন। দীপিকা হঠাৎ উঠিয়া গেল।

একটু পরে প্রদীপ আসিলে শান্তিলতা তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন।

হ্যাঁ রে, বীরেশের বিয়ের কোন চেষ্টাচরিত্র করছে না ওরা ?

কি জানি, তা তো জানি নে আমি।—প্রদীপ গম্ভীর হইয়া জবাব দিল।

দীপিকার সঙ্গে উল্লেখ ক'রে দেখ্ না ? ওকে তো বেশ পছন্দই করে বীরেশ।

বিয়েই বুঝি করবে না বীরেশদা। পছন্দ করলে কি হবে !

কি করবে তবে ?

প্রদীপ হাসিয়া বলিল, তা তো জানি নে ? বিয়ে করবে না তাই শুনেছি।

তুই ভাল ক'রে খবর নে। বিয়ে না করলে পছন্দ করবে কেন ?

তা ছাড়া দীপির মত আছে কি না—

দীপির মত লাগবে না।—শান্তিলতা ধমক দিয়া উঠিলেন।—এম. এ. পাস ছেলে তার আবার মত ! দীপির ভাগ্য।

তুমি না এতদিন বলেনদার কথাই বলেছ ?

শান্তিলতা একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন, না। যা হবে না, তাই। অত টাকার জোর থাকলে তো আমার? ওরা যদি—। ভেবেছিলাম, বলেন্দু নিজে যদি খুব গরজ-টরজ করত। কোথায়?

একটু থামিয়া গোপনে বলিলেন, তা ছাড়া ছেলে হিসেবে বলেন্দুর চেয়ে বীরেশই ভাল। ওর তো ওই এক টাকা শুধু।

কিন্তু গভীর গুণের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। এবারে স্পষ্টতই অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িলেন বলেন্দুর দিকে। স্নিগ্ধ সরস কণ্ঠে বলিলেন, আর চেহারাটা সুন্দর। বলিষ্ঠ পুরুষের মত পুরুষ ছেলে।

বলেনদার গায়ে জোর কত?—প্রদীপও উৎসাহিত হইয়া উঠিল।—সেদিন আমার সামনে, একা তিনটে রিকৃশওয়ালাকে ঘুষিয়ে নাকের রক্ত বার ক'রে দিলে।

তিন জন?

হ্যাঁ।

শান্তিলতা খুশি হইয়া বলিলেন, তা পারে ও। লম্বা চওড়া—বেশ শরীরটা।

দীপিকা পাশে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। এতক্ষণে লক্ষ্য করিয়া শান্তিলতা থামিয়া গেলেন।

নিঃশব্দেই আবার সরিয়া গেল দীপিকা।

প্রদীপও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটাইয়া উঠিয়া গেল। দীপিকা প্রদীপকে একলা পাইয়া চাপা ব্যঙ্গের সুরে বলিল, তিনটে রিকৃশ-ওয়ালার নাক ভেঙে দিয়েছে একা! এমন পাত্র আর হয় নাকি? কি বুদ্ধি!

প্রদীপ তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া হাসিয়া বলিল, তাই আমি বললাম নাকি? আমি এমনই বললাম যে, বলেনদার শক্তি আছে গায়ে।

কিন্তু দীপিকার ঝাঁজ কেন যেন লাগিয়াই রহিল।—তা হ'লে হনুমান সিংয়ের আখড়া থেকে একটা পালোয়ান নিয়ে এসে বোনের বিয়ে দে।

প্রদীপ হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুই এত ভাবছিস কেন? যে ভাল

পাত্র তার সঙ্গেই আমরা তোর বিয়ে দেব। কিন্তু সে আবার রাজী হ'লে তো?

কে?—দীপিকা হাসি গোপন করিয়া প্রশ্ন করিল।

বীরেশদা, বীরেশদা। হ'ল?

হাসির সুযোগ পাইয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল দীপিকা।—তিনি তো বিয়েই করবেন না। বলিয়া আর এক দফা হাসিয়া লইল।

যে অর্থটা দীপিকা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছিল, ধরিতে না পারিয়া প্রদীপ বোকার মত তাকাইয়া রহিল। মুখে বলিতে না পারিয়া দীপিকা ছটফট করিতে লাগিল শুধু।

এসেছিলেন আমার কাছে।—দীপিকা অবশেষে গম্ভীর হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল। পরক্ষণে 'আমার কাছে' কথাটা যেন কাটিয়া দিল।—আমাদের কাছে। বলিয়া অযথা লাল হইয়া উঠিল।

কে? ও! বীরেশদা?

দীপিকা হাঁ-বোধক কয়েকটা দোলা দিল মাথার।

বীরেশ্বর কি বলিয়াছে শুনিবার আগ্রহে প্রদীপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করা চলে কি না, এই ভাবনায় ফাঁপরে পড়িয়া গেল। শেষে অতি সংকোচের সঙ্গে কোমল সুরে বলিল, বীরেশদা কি বললে রে?

তাই বলব নাকি তোর কাছে?—দীপিকার চোখে মুখে একটা সকৌতুক দীপ্তি খেলিয়া গেল।—দাদা একটা বুদ্ধু একেবারে।

বয়সে মোটে এক বৎসরের ছোট, লেখাপড়া কিছু বেশি শেখা ছোট বোনের গালাগালে প্রদীপ খুশিই হয়। বলিল, তা পারবি কেন? গাল দিতে পারবি। আমি তোর গার্জেন। আমাকে বুঝে-শুঝে দেখতে হবে না?

দীপিকা মুহূর্তের মধ্যে একটু আনমনা হইয়া গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ মৃদুস্বরে বলিল, দাদা, কালকে একবার বেড়াতে নিয়ে আয়।

কাকে রে?—প্রদীপও তেমনই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

বীরেশদাকে।—দীপিকা স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বিরক্তির সুরে বলিল।

ওঃ, বুঝেছি।

কি?

বুঝেছি।—হাসিয়া আর একবার বলিল প্রদীপ।

দীপিকা প্রতিবাদ করিল না। নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া মনের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

প্রদীপ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া এক সময়ে বলিয়া উঠিল, বীরেশদা বড় বইয়ের পোকা। কোন রকমের ফুর্তি-টুর্তি কিছুই নেই।—বলিয়াই মনে মনে জিহ্বায় কামড় দিল।

কি ফুর্তি করবে?

না। আমি বলছি যে শুধু লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। আর কোন দিকে বড়—বিশেষ কোন—শখ-টখ নেই।

বড় হবার জন্তে যাঁদের ঝোঁক চাপে, তোমাদের মত ফুর্তি-টুর্তি নিয়ে থাকলে তাঁদের চলে না।

প্রদীপ অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, এ অবশ্য সত্যি কথা।

বীরেশ্বর মনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ছুটিতেছিল।

—হাসছে বোধ হয়। খুশি হয়েছে খুব। হাম্বুক।

ক্রমে গতি কমিয়া আসিতেছে। মনেরও। একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল বীরেশ্বর।

—বলা হয়েছে সব কথা। স—ব কথাই, স্বপ্নের কথাও।

মনে হইয়া তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল মুখে। অকারণে এই তৃপ্তিটুকুই বীরেশ্বরের মনটাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দখল করিয়া রহিল। জ্বালা সেই প্রলেপে ঢাকা পড়িয়া গেল যেন। একটা অনির্দিষ্ট মাধুর্য অস্পষ্ট ছায়ার মত মনটাকে ঢাকিয়া শান্ত করিয়া রাখিল।

ঘরে ঢুকিয়া আজ দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে সুনয়না যখন প্রবেশ করিলেন, বীরেশ্বর তখন বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

ঠাকুরপো !—আস্তে আস্তে ডাকিলেন সুনয়না।

বীরেশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু চোখের মধ্যে তখনও মন আসে নাই।

কি খবর বউদি ?

সুনয়না হাসিয়া বলিলেন, কই, খবর এখনও হয় নি কিছু। একদিনেই বিয়ে হয়ে যাবে ভেবেছ বুঝি ?

ও, না না। ও তো আমার মনেই নেই।—মনে পড়িয়া গেল বীরেশ্বরের।

সুনয়না বিশ্বাস করিয়াও বলিলেন, না, মনে নেই! আচ্ছা, কোন্ দুঃখে তুমি আশ্রমে যেতে চেয়েছিলে বল তো ?

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বীরেশ্বর।—কার কাছে শুনলে ? দাদা বলেছেন ?

হ্যাঁ।

কি বললেন ?

বললেন সবই।—সুনয়না গম্ভীর হইলেন।—কি মানুষ তুমি বল তো ? আমাদের কাছে বলা নেই কওয়া নেই, সরাসরি আশ্রমে একেবারে ?

আরে, না না। ক্ষেপেছ! একটু ইয়ারকি করলাম, বুঝলে না ?

বুঝেছি। জানি নে কোন্‌টা তোমার ইয়ারকি। যাক্‌গে, শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছ এই ভাল।

শেষ পর্যন্ত আমি রক্ষা ক'রেই চলি, লক্ষ্য ক'রো।

তবে আশ্রমে নাকি খাওয়া-দাওয়ার সুখ আছে। তোমার দাদা বলছিলেন।—হাসিয়া বলিলেন সুনয়না।

সেই জন্যেই তো।—বলিয়া বীরেশ্বর আবার বইয়ের দিকে মন দিল।

সে জন্যে, না, কিসের জন্যে, আমি জানি।—সুনয়না বলিলেন, তোমার দাদার কথা ? অমন খাওয়ার সুখ মাথায় থাক্। বীরেশ্বর পড়িতেছে দেখিলেন।—আর পড়তে হবে না এখন। খাবে চল। সুনয়না উঠিলেন।

বীরেশ্বর বই বন্ধ করিয়া হঠাৎ বলিল, একটা কথা বউদি। আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে কাউকে কোন কথা দিও না কিন্তু।

সুনয়না বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া কি যেন বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, না, তা দেব না।

ক্রমশ

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

মিনুর চিঠি

আর তোমায় মা দেখতে পেলাম নাকো,
কেমন ক'রে আমায় ছেড়ে থাকো ?
যারা আমায় ছিনল গায়ের জোরে,
বৃথাই কাঁদি তাদের চরণ ধ'রে ;
মরণ দিতে নারায়ণকে ডাকো,
মাগো ! তুমি আমার শেষ কথাটি রাখো।

ছোরার ঘায়ে বাবা প'লেন ঘুরে,
হেঁচড়ে টেনে আনল আমায় দূরে।
তিনি কি মা প্রাণ পেয়েছেন ফিরে ?
সান্ত্বনা সেই দিয়ো দুঃখিনীরে ;
আমি তো নেই, কে দেয় গাড়ু মেজে,
মাগো ! কে দেয় তাঁকে রাতে তামাক সেজে ?

অমল, বিনু কোথায় আছে তারা ?
তাদের কথা ভেবে যে হই সারা !
হয় তো তারা আমার মতই কাঁদে—
আটকা প'ড়ে কোন্ পিশাচের ফাঁদে ;
খিড়কি দিয়ে পালিয়েছে কি বনে ?
মাগো ! রক্ষা কি কেউ করল আপন জনে ?

ঘর দুখানার সব কি গেছে পুড়ে ?
তোমরা কি আজ বেড়াও পথে ঘুরে ?

ভিন-গাঁয়ে কি পেলে কোথাও ঠাঁই ?
এই কথাটা জানতে শুধু চাই ;
ভাবনা এসে বুকটা যে দেয় কুরে,
মাগো ! তোমরা যে সব আছ হৃদয় জুড়ে !

তুলসীতলায় আর কি পিদিম জ্বলে ?
টিয়েটা কি তেমনি কথা বলে ?
পুঁই চারা যা পুঁতেছি নিজ হাতে
একটু ক'রে জল দিয়ো মা তাতে।
অণিমাদি কয় কি আমার কথা ?
মাগো ! না, আমার মতই এমনি ভাগ্যহতা !

মথুরদাদা কোথায় এখন তিনি ?
গায়ের জোরে নামী ছিলেন যিনি,
রাজার রোষে ডরায় নি যে কভু,
হাজার ডাকে পায় নি সাড়া তবু।
ধিক্কারে প্রাণ উঠেছে আজ ভ'রে,
মাগো ! মানুষগুলো জ্যান্তে আছে ম'রে !

শুনছি কানে দেশের নেতা সবে,
বলছে নাকি একটা বিহিত হবে।
নতুন ক'রে চুক্তি করে তারা,
ফেরত পাবে যার যা গেছে হারা।
অর্থ গেলে অর্থ পাওয়া যায়,
মাগো ! ধর্ম গেলে নারী কি তা পায় ?

কসুর আমার নেইক কিছু মোটে,
গুণ্ডারা সব ঘিরলে যে একজোটে।
রুখতে সেদিন পারল না তো কেউ,
রক্তে কারোর জাগল না তো ঢেউ !
মরণ আমার হ'লেই ছিল ভালো,
মাগো ! কালোর বুকে মিশিয়ে যেত কালো।

নদীর সোঁতা চলেছে একটানা—
চোখের জলে ভিজিয়ে চিঠিখানা
ভাসিয়ে দিলুম চন্দনারি নীরে,
মিনু তোমার যাবে না আর ফিরে।
যাই তবে মা !—সূয্যি বসে পাটে,
মাগো! বিকিয়ে র'লুম আজকে চোরা-হাটে !

শ্রীশান্তি পাল

সংবাদ-সাহিত্য

ভারত-বিভাগ ও তাহার আনুষঙ্গিক বঙ্গাঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও বাঙালী-নিগ্রহের প্রত্যক্ষ পরিণামস্বরূপ বঙ্গ ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অপমৃত্যু যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আশঙ্কাকে অমূলক প্রতিপন্ন করিয়া বিগত তিন বৎসরের মধ্যে বাঙালীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে ইতিহাসে দর্শনে যে আশ্চর্য উন্নতিবিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা সত্য সত্যই উল্লেখ করিবার মত। বামে হিন্দী ও ডাহিনে উর্দুর চাপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিলোপ ঘটিবে এবং ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়া বাঙালী জাতিরও বিনাশ হইবে—এ ভয় আমাদের অনেকের মনে জাগিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান ইতিহাসের সাধনায় বাঙালী কর্মীরা যে থমকিয়া থামিয়া যান নাই তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, ভয়ের কারণ নাই, বাঙালী ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ভারতের সর্বত্র নিক্ষিপ্ত হইলেও বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহের মতই পীঠস্থান রচনা করিবে, নিশ্চিহ্ন হইবে না। এই সাহিত্য ও সংস্কৃতির আশ্রয় যত দিন সে ত্যাগ না করিবে, তত দিন তাহার মৃত্যু নাই।

এই ঘোর দুর্দিনে বাংলা দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশালয় বিশেষ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষৎ নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। প্রকাশকদের মধ্যে আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স

লিমিটেড, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, পূর্বাশা লিমিটেড, বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড ও সিগনেট প্রেস লাভজনক গল্প-উপন্যাস নাটক ছাড়াও মূলে ও অনুবাদে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার বাঙালী পাঠকের সম্মুখে দুঃসাহসের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করিয়া চলিয়াছেন। এক দিকে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা এবং লোকবিজ্ঞান-গ্রন্থমালার নিয়মিত প্রকাশে বাংলা সাহিত্যের পরিধি যেমন বিস্তারলাভ করিতেছে, তেমনই অন্য দিকে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ('রামেন্দ্র-রচনাবলী') মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বৌদ্ধধর্ম') অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ('মীরকাসিম'), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ('বাঙ্গালার ইতিহাস') প্রভৃতি মনীষীগণের লুপ্তপ্রায় রচনাবলীর পুনঃপ্রকাশে আমাদের পুরাতন সমৃদ্ধিরও সন্ধান আমরা পাইতেছি। এক দিকে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মৌলিক 'বাঙ্গালীর ইতিহাস,' নির্মলকুমার বসুর 'হিন্দুসমাজের গড়ন,' অন্য দিকে মূল বাল্মীকি-রামায়ণ ও ব্যাসকৃত মহাভারতের উৎকৃষ্ট সারানুবাদ; এক দিকে রচিত হইতেছে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-বিজ্ঞান, অন্য দিকে পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, অর্থ নৈতিক ভূগোল ও তর্কশাস্ত্র; জওহরলালের 'আত্মচরিত' ও 'ভারত-সন্ধানে,' রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'খণ্ডিত ভারত' ও রাজা-গোপালাচারীর 'ভারতকথা' এক দিকে আমাদের অধিকারে আসিয়াছে, অন্যদিকে লুই ফিশারের 'মহাজিজ্ঞাসা,' জীনস্‌-এর 'বিশ্ব-রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থের বাংলা রূপও আমরা দেখিতে পাইতেছি। মোটের উপর, নিদারুণ হতাশার সম্মুখীন হইয়াও বাঙালী জাতি যে ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির এমন ধারাবাহিক একনিষ্ঠ ব্যাপক আয়োজন করিতে পারিতেছে তাহাতেই ভরসা হয়, হয়তো আমরা টিকিয়া যাইব।

ইন্দোনেশিয়া-বিজয়ী জওহরলাল স্বদেশে ফিরিয়া প্রথমেই বাঙালীদের লইয়া আসর বসাইলেন। প্রশ্ন করিলেন, তারপর? এবং সকৌতুক হাসিমুখে জবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূবে পশ্চিমে বাঙালীর ঘরে তখন আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, হুজুর, দিল্লী-প্যাক্টে তো কাজ

হইতেছে না, আমরা এখনও মার খাইতেছি। জওহরলাল ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তোমাদের কাছ হইতে এটা প্রত্যাশা করি নাই। তোমরা এত ছোট, এত ক্ষুদ্রমনা! আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘুরিয়া আসিয়া সর্বপ্রথম তোমাদের সহিত মুলাকাৎ করিতেছি, তোমরা সে বৃহৎ ব্যাপার উপেক্ষা করিয়া একটা সামান্য শরিকী মামলা লইয়া চেল্লাচেল্লি শুরু করিয়া দিলে! ছি! সত্যই তো। বাঙালী লজ্জিত হইল এবং সেই ফাঁকে উত্তেজিত জওহরলাল প্যাক্টের 'থাণ্ডারিং সাক্‌সেসে'র কথা ঘটা করিয়া শুনাইয়া গেলেন। বলিলেন, তোমরা বলিলেই হইল, সারা পৃথিবীর চিন্তানায়কেরা ইহার জন্য ধন্য ধন্য করিতেছেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় নেতারা খুশি হইয়াছেন, তোমরা ভালমন্দ-বিচারের ক্ষমতা পর্যন্ত হারাইয়াছ। ধৈর্য ধর, অপেক্ষা কর।

ধৈর্য ধরিলাম, অপেক্ষা করিলাম এবং ভয়বিহ্বলভাবে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম—পূর্ব-পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা হঠাৎ তিন গুণ বাড়িয়া গেল। শুনিলাম, তাহারা কলিকাতায় মহরমের জলুষ দেখিতে আসিতেছে। এদিকে বর্ষায় ঝড়ে চালাঘরের ছই উড়িল, তাঁবু ধূলিসাৎ হইল, জলে কাদায় ছাতাজোবড়া হইয়া দুর্বাসার দল অভিশাপ দিল কি দিল না শুনিতে পাইলাম না—নটরাজের তৃতীয় বিশ্বতাণ্ডব নৃত্যের প্রাথমিক দামামাধ্বনি কানে আসিয়া বাজিল।

* * *

উত্তর-কোরিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ-কোরিয়ার বিবাদ—নিশ্চয়ই গৃহবিবাদ নয়, হইলে পৃথিবীর শতাধিক রাষ্ট্র অকস্মাৎ এমন চঞ্চল হইয়া উঠিবে কেন! বাঙালী জাতি এই হিসাবে ভাগ্যবান যে তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পাপটা তাহাদের লইয়া অনুষ্ঠিত হইল না। কিন্তু বাঙালীর সামান্য সমস্যা মীমাংসালাভেরও সুযোগ পাইল না। কোরিয়ার বিশ্বসমস্যা লইয়া দিল্লীর কর্তারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ব্যতিব্যস্ত না হইয়া তাঁহাদের উপায় নাই, কারণ টিকি বাঁধা। 'সঙ্কটের আবর্তে বাঙালী' বলিয়া তারস্বরে এখানে আমরা চীৎকার করিতে থাকিলে সত্তর লক্ষ আশ্রয়চ্যুত পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুর দোহাই পাড়িয়া প্রতিবিধান চাহিলেও হঠাৎ যে একটা সুরাহা হইয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। বড় জোর

মনস্বী আবুল কালাম আজাদ আর একবার বাঙালীর পিঠ চাপড়াইয়া অন্যপ্রদেশবাসীদের শুনাইয়া বলিবেন—

"বাঙালীদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বাংলার বাহিরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও বাংলা ভাষা ত্যাগ করেন নাই—তাঁহারা ছেলে-মেয়েদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের গভীর অনুরাগ বিদ্যমান। ভারতে যে-ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ ও মাধুর্যমণ্ডিত বলিয়া সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই গণ্য করেন, সেই ভাষার প্রতি কোন ভারতবাসীর অনুরাগ থাকিলে তাহা কেন দোষাবহ হইবে ইহা বুঝিতে আমি অক্ষম। চণ্ডীদাস, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র চাটুজ্জে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চাটুজ্জে, নজরুল ইসলাম প্রমুখ মনীষীগণ যে-ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বাংলা ভাষা ত্যাগ করিতে বাঙালীরা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলে কি? আমি বিশেষ জোরের সহিত ইহাও উল্লেখ করিতে চাহি যে, বাংলা-সাহিত্যের জন্য প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীর গর্ব অনুভব করা কর্তব্য এবং প্রতি দশজন শিক্ষিত ভারতীয়ের মধ্যে একজন যদি বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া বাংলা-সাহিত্যের রস আস্বাদন করার আদর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া ভারতবাসী গর্ব অনুভব করেন। ইংরেজ এই দেশ ত্যাগ করিলেও তাঁহারা উক্ত ভাষা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। ঐরূপ মনোভাবকে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া চলে, তাহা হইলে কতক ভারতীয় নরনারী অনুরূপ উন্নত ও সমৃদ্ধ প্রতিবেশীর ভাষা কেন শিক্ষা করিবেন না তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

"তারপর যে সকল বাঙালী বাংলা দেশের বাহিরে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়াছেন ঐ সকল স্থানের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কোন দান নাই, ইহাও সত্য নহে। সার্ সৈয়দ আহমেদ ১৮৬২ সালে আলিগড় বৈজ্ঞানিক সমিতি স্থাপন করেন। সেই সময় তিনি গাজীপুর ও দিল্লীবাসী দুইজন বাঙালী বন্ধুর গভীর সাহায্য ও সহযোগিতা

পাইয়াছিলেন। ইংরেজী-সাহিত্যের আধুনিক কতক পুস্তক হিন্দুস্থানী ভাষায় তর্জমা করার ক্ষেত্রে তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য দানের বিষয় তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পর আলিগড় কলেজ স্থাপিত হইলে অধ্যাপক যাদব চক্রবর্তী দীর্ঘকাল ঐ কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৪ সালে আঞ্জুমান-ই-তুরকী উর্দু প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিন্দুস্থানী তর্জমার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ভাগলপুরের জনৈক বাঙালী উক্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। দেবনাগরী ও উর্দু হরফ সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্ট হইলে ১৯০২ সালে স্বর্গীয় মদনমোহন মালব্য দেবনাগরী হরফ সম্পর্কে একটা বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করেন। সেই সময় দেবনাগরী বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সপ্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি যে বারাণসী ও এলাহাবাদবাসী কয়েক জন বাঙালী বন্ধুর বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি আমার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন।

"সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও ঐ শ্রেণীর বাঙালীদের দান উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা যে সংস্কারমূলক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বাংলার বাহিরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে কয়েক জন বাঙালী ব্রাহ্ম লাহোরে বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাই সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের উৎসাহেই পাঞ্জাবে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।"

মৌলানা আজাদ বলিবেন, "দেশে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টির জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার গঠন ও পরিচালনের ক্ষেত্রে বাঙালীরাই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক। চিকিৎসক ও আইনজীবীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা অত্যধিক ছিল। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই তাঁহারা বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্বাধীন জীবিকায় লিপ্ত বাঙালীগণ দেশে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালীদের দান বলিয়া শেষ করা যায় না। আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারবাসীরা আধুনিক

শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়া যদি গর্ব অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙালী শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের অনুগ্রহেই তাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, উত্তর-ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বাঙালীরাই অগ্রদূত ছিলেন।"

আমরা তাহাতেই খুশি হইব কি না, সম্পূর্ণ আমাদের উপর নির্ভর করে।

* * *

কতকগুলি সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁহার নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গিতে দিবার চেষ্টা করিতেছেন। গত বারে "সংবাদ-সাহিত্যে" আমরা তাঁহার "ফিরে চল্" ছাপাইয়াছি। এবার অনেক আশা লইয়া তাঁহার বাঘ-ছাগলের কথা ছাপিলাম। যদি বাবা দক্ষিণ রায় শেষ পর্যন্ত কৃপা করেন!

বাঘ-ছাগলের কথা

(বনপীরের গান)

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল,—
ওই রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ,—
সুযোগ বুঝে শৃগাল মামা ডাক্তার ডাকাইল,
এক সুবিজ্ঞ রামছাগ।
ডাক্তার আসি শৃঙ্গ দাড়ি নাড়ি যুগপৎ
দুই চক্ষু মুদে কয়—
কঠিন অপারেশন ভিন্ন নাই যে অন্য পথ,
নইলে অক্কা পাবার ভয়।
এক দিকে তার মুণ্ড রাখি আর এক দিকে ধড়,
আমি তবে খসাই হাড়,
বেদম হয়ে আসছে রুগী হও সবে তৎপর;
শুনে সবাই নাড়ল ঘাড়।
কেউ কেউ বলেছিল—ক'রো না গো এমন কাজই
এতে বাঘটি যাবে ম'রে।
ডাক্তার ছাগল বলেছিলেন, দেখাচ্ছি ভোজবাজি
আমি দক্ষিণ রায়ের বরে।

সাঙ্গ হ'ল রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের গলা কাটা,
আর, বাহির হইল অস্থি,
ভারত-জোড়া হরিণ ভেড়া ভাবে, চুকল ল্যাটা
এবার ফিরে পেলাম স্বস্তি।
রক্তরাঙা গাঙের ধারা ভিজে বালুর চর,
আহা যেন খাঁড়ার দাগ,
এক পারে তার মুণ্ড পড়ে আর পারে তার ধড়,
হায় কাটা পড়ল বাঘ।

দক্ষিণ রায়ের বরে মুণ্ড তবু ছাগল খায়।
তার ক্ষুধা নাহি মেটে।
পেট নেই তার পেট ভরে কি? চালান করে হায়
সব এপারের এই পেটে।
কাটামুণ্ডের ভয়ে ওপার হয় বা ছাগলহীন,
আর এপারে হাঁসফাঁস!
এপারের সব ছাগলগুলি ভাবছে নিশিদিন—
কোথা মিলবে এত ঘাস?
উভয় পারের ছাগল মিলে চলছে গুঁতোগুঁতি,
বাধে বিষম্ গণ্ডগোল,
এমন সময় কাটামুণ্ড দিল প্রতিশ্রুতি—
আর খাইমু না ছাগল।

তাই না শুনে নানা মুনি দিলেন নানা মত,
ওই সম্ভব অসম্ভব,
কেউ বলে, বাঘ দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে শাক্ত পথ
এবার হইয়াছে বৈষ্ণব।
কেউ বা বলে, বাঘের কথায় ক'রো না প্রত্যয়
ভাই দিচ্ছি মাথার কিরে।
কেউ বা বলে, এপারের ঘাস মোটেই মিষ্টি নয়
এবার চল গো সব ফিরে।

দোটানায় পড়িয়া সবাই করে ছুড়োতাড়া,
আহা কত যে হয় ঘাম।
ফকির কহে—উভয় পারের যত হতচ্ছাড়া
ওরে বারেক তোরা থাম্।
ভাল ক'রে দেখ্ রে চেয়ে—কাটামুণ্ডু ওটা,
ও ত নয়কো আসল বাঘ,
আর, নিজের পানে তাকা—তোরাও মানুষ গোটা গোটা,
নয় রে কসাইখানার ছাগ।

এই, বাঘ-ছাগলের কথা যদি শুনে ভক্তিভরে
আর শোনায় বন্ধুজনে
ধড়ে মুণ্ডে জোড়া লাগে দক্ষিণ রায়ের বরে
এক পরম শুভক্ষণে।

—

গত সংখ্যার প্রতিশ্রুতি-মত আমরা এবারেও ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে'র আরও কয়েকটি ভুল সংশোধন করিয়া দিতেছি। বাকি রহিল আরও অনেক, কিন্তু আমাদের পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে ভয়ে অধিক পরোপকার-প্রবৃত্তি সংযত করিতে হইল। ডক্টর সেন আমাদের সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিলে সেগুলিরও বিহিত হইবে এবং পরবর্তী সংস্করণের পড়ুয়া পাঠকেরা নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করিয়া সেন মহাশয়কে ধন্য ধন্য করিবেন।

এবারে কিন্তু ডক্টর সেনের বিরুদ্ধে একটা গভীর অনুযোগ আছে। তাঁহার ঘন ঘন "মনে হয়," "বোধ হয়" "আমার অনুমানে"র প্রয়োগ ক্যাটালগ-প্রস্তুতের বেলায় খাটে কি? এ ক্ষেত্রে তিনি যাহা দেখিবেন তাহাই লিখিবেন, ইহাই বিধি। দুই আর দুইয়ে চার আমাদের লিখিতেই হইবে। দুই আর দুইয়ে পাঁচ লিখিতে পারেন আইন্‌স্টাইন,—ডক্টর সেন আইন্‌স্টাইন নহেন। তবে আইন্‌স্টাইন সাজিতে গিয়া তিনি যে অঘটন ঘটাইতে চাহিতেছেন, তাহার একটি নমুনা দিলেই আমাদের অভিযোগের গুরুত্বটা আশা করি তিনি উপলব্ধি করিবেন। ৪২৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিতেছেন—

'হেন্‌রি সারজেণ্টের শ্রীমদ্ভাগবত'—'শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীশ্রীনারায়ণের অষ্টমাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জন্ম ও বাল্যলীলা এবং কংসবধের উপাখ্যান। ভাষা সংগ্রহঃ। হেনেরি সারজ্যান্ট সাহেবেন ক্রিয়তে।'

রচনার নমুনা দিয়াছেন এবং ফুটনোটে বলিয়াছেন, "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রক্ষিত মূল হস্তলিপি অধুনা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত।"

এত জানিয়াও সেন মহাশয় প্রশ্ন করিতেছেন, "এই বইটিই কি বিদ্যাসাগরের রচনা বলিয়া প্রচারিত অধুনা লুপ্ত বাসুদেব-চরিত?"

এইরূপ অনুমান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চোর প্রতিপন্ন করিবার দুঃসাহস না দেখাইয়া সেন মহাশয় যদি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার রচিত বিদ্যাসাগর-জীবনীতে উদ্ধৃত বাসুদেব-চরিতের অংশগুলি সার্জেণ্টের পুথির সহিত মিলাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজেরও গোল মিটিত এবং প্রশ্ন তুলিয়া অপরকে বিভ্রান্ত করিবার পাপও তাঁহাকে স্পর্শিত না। এশিয়াটিক সোসাইটিও দূরে নয় এবং বিদ্যাসাগর-জীবনী দুইখানিও দুষ্প্রাপ্য নয়। এইরূপ ধোঁকা বা ধাপ্পা দেওয়ার প্রবৃত্তি ক্রিমিনাল উকিলের পক্ষে শোভন, অধ্যাপকের পক্ষে নয়। এশিয়াটিক সোসাইটি পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে বলিয়া অভিমানবশে অনুযোগ করিলাম, ডক্টর সেন ক্ষমা করিবেন। আরও দুই-একটি "মনে হয়" ও অন্যান্য ভুলের আলোচনা নীচে করা হইল।

পৃ. ৩৬ : সুকুমার বাবু লিখিয়াছেন, "নন্দকুমার রায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রামনারায়ণ তর্করত্নের পর কালিদাসের নাটক অনুবাদ করিলেন শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'মালবিকাগ্নিমিত্র' (১২৬৬)। মনে হয় এই অনুবাদ আসলে করিয়াছিলেন কালিদাস সান্ন্যাল।" শৌরীন্দ্রমোহন ("শৌরীন্দ্রনাথ" নহে) ঠাকুরের 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' অনুবাদ সম্বন্ধে কেন এরূপ তাঁহার "মনে হয়," তাহা তিনি আমাদের জানান নাই। আমাদের "মনে হয়" এই অনুবাদে যদি কাহারও হাত থাকে ত সে রামনারায়ণ তর্করত্নের। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বাড়িতে অভিনীত এই নাট্যগ্রন্থের অন্যতম অভিনেতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ...বলিলেন, 'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া

দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম।" এই উক্তি একেবারে অমূলক না-ও হইতে পারে। নাটকখানি সমালোচনাকালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' (১৬ জুলাই ১৮৬০) লেখেন—'গ্রন্থমধ্যে অনুবাদকের নাম ছিল না, সুতরাং [পূর্ব্ববারে] তাহা পাঠকগণকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে জানিতে পারিলাম, পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে অনুবাদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত বেশ ভূষা পরাইয়া দেন।"

পৃ. ৬৮ : যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের প্রকাশকাল "(১৮৫৮ ?)" দেওয়া হইয়াছে। সন্দেহ-চিহ্ন কেন ? উহা ১৭৮০ শকে (১৮৫৮) প্রকাশিত।

পৃ. ৬৯ : নিমাইচাঁদ শীলের 'এঁরাই আবার বড়লোক' প্রহসনের প্রকাশ-কাল "১৮৫৯" নহে,—১৮৬৭ সন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ-কৃত 'মেঘনাদ বধে'র নাট্যরূপ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সনে,—১৮৭৮ সনে নহে।

পৃ. ৭০ : "'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে' (১৮৭২) ইঁহারই [হরিশ্চন্দ্র মিত্রেরই] লেখা বলিয়া মনে হয়।" "মনে হয়" কেন ? ৩য় সংস্করণের পুস্তকে গ্রন্থকার-রূপে হরিশ্চন্দ্র মিত্রেরই নাম মুদ্রিত আছে।

পৃ. ১৩৫ : 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যের লেখিকা এখানে "কৃষ্ণকামিনী দেবী," কিন্তু পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় "দেবী" "দাসী"তে রূপান্তরিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, শেষটিই ঠিক।

"'কবিতামালা' (১৮৬৫) অজ্ঞাতনামা লেখিকার, 'বঙ্গবালা'-ও (বেয়ালিয়া ১৮৬৮) তাই।" 'কবিতামালা'র লেখিকা—রাখালমণি গুপ্ত ('বিশ্বভারতী পত্রিকা,' ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৬৬)। 'বঙ্গবালা' কোন "লেখিকা"র রচনা নহে ; সুকুমারবাবু পুস্তকখানির মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলে জানিতে পারিতেন যে, ইহার লেখক হরিশ্চন্দ্র মিত্র। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—"এই পুস্তক এবং মদ্রচিত অন্যান্য পুস্তক ঢাকা—সুলভ যন্ত্রালয়ে,...এবং বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভায় অম্মন্নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।" গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত তালিকাতেও 'বঙ্গবালা'র লেখক হিসাবে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নাম আছে।

পৃ. ১৪৮ : "মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' তিন ভাগ

(১৮৫৯-৬৫)।" ইহা ঠিক নহে ; প্রথম-দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত হইলেও তৃতীয় ভাগের প্রকাশকাল ১৮৬০ সন।

পৃ. ১৮৯ : রমেশচন্দ্রের দুই খণ্ড 'হিন্দুশাস্ত্রে'র প্রকাশকাল ১৩০০-০৩,—"১৩০২-৩" নহে।

পৃ. ১৯৩ : শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবৌ' প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সনে,—"১৮৭৯" সনে নহে।

পৃ. ১৯৬ : চণ্ডীচরণ সেনের 'এই কি রামের অযোধ্যা' ও 'অযোধ্যার বেগমে'র প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৯৫ ও ১৮৮৬,—"১৮৯৯" ও "১৮৮৭" নহে। 'ঝান্সীর রাণী'র প্রকাশকাল—ইং ১৮৮৮। সুকুমারবাবু চণ্ডীচরণের সকল পুস্তকেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল একখানি পুস্তকের খোঁজ রাখেন না ; উহা ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত 'জীবন-গতি-নির্ণয়'।

পৃ. ২০০ : যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'চিনিবাস চরিতামৃত' ও 'মহীরাবণের আত্মকথা'র প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৮৬ ও ১২৯৫,—"১৮৯০" ও "১২৯৪" নহে।

পৃ. ২১৩ : সুকুমারবাবু লিখিয়াছেন, শশিচন্দ্র দত্তের 'উপন্যাসমালা' লেখকের 'টেল্‌স অব ইয়োর' হইতে হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক অনূদিত। এই উক্তির সপক্ষে নজীর দেওয়া উচিত ছিল, কারণ অনেকে মনে করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই উহার অনুবাদক।

পৃ. ২১৪ : "১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র 'সুলভ সমাচার' নামে দৈনিকপত্র প্রকাশ করেন।" দৈনিকপত্র নহে,—সাপ্তাহিক পত্র। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে গিয়া ঐ সালের 'সুলভ সমাচার' দেখিলেই সুকুমারবাবু তাঁহার ভুলটি ধরিতে পারিতেন।

পৃ. ২২০ : 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের জন্ম-বৎসর সুকুমারবাবু দিতে পারেন নাই ; উহা ১৮৪৫। তিনি যোগেন্দ্রনাথের 'ম্যাটসিনির জীবন-বৃত্ত' পুস্তকখানির নাম "জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী" লিখিলেন কেন ?

রজনীকান্ত গুপ্তের ১ম খণ্ড 'সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাসে'র প্রকাশকাল "১২৮৩" স্থলে ১২৮৬ হইবে।

পৃ. ২২২ : "কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রথম গদ্য-নিবন্ধ হইতেছে 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯)। তাহার পর 'প্রভাত-চিন্তা' (ঢাকা ১৮৭৭)।"

মধ্যে যে 'সমাজশোধনী' (১৮৭২) বাদ পড়িল, সুকুমারবাবু তাহার হিসাব রাখেন না।

পৃ. ২৪১ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অনূদিত পুস্তকখানি 'ভারতবর্ষে,'—'ভারতবর্ষ' নহে। "'মধ্যযুগের ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ' (১৩২৭)" স্থলে 'ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ' (১৩১৫) হইবে। তাঁহার 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল'-এর প্রকাশকাল ১৩১৮,—১৩২৭ নহে; 'উত্তর-চরিত'-এর প্রকাশকাল ১৩০৮ নহে,—১৩০৭ সাল।

পৃ. ২৪২ : 'ঝাঁশির রাণী' ১৩১০ সালে প্রকাশিত,—১৩১৩ সালে নহে।

পৃ. ২৫৬ : রাধামাধব করের 'বসন্তকুমারী' নাটকের প্রকাশকাল ১৮৭৮,—১৮৭৯ নহে।

পৃ. ২৫৯ : "মশারফ হোসেনের...প্রহসন, 'এর উপায় কি' (? ১৮৭৬)।" প্রহসনখানি ১৮৭৫ সনে প্রকাশিত হয়।

পৃ. ২৬৩ : "প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষিণা কেনাচিদ্বান্ধবেন প্রণীতম্" 'সভ্যতা সোপান' (১৮৭৮)।" এই প্রহসনের লেখক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

পৃ. ২৬৬ : নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু হয় ১৯১২ সনে—১৯১১ নহে। তাঁহার রচিত 'বিজয়া'র প্রকাশকাল ১৮৮০ সন নহে,—১৮৭৮।

পৃ. ২৭০ : রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নাট্যসম্ভবে'র প্রকাশকাল ১৮৭৬,—"১৮৮৬" নহে। 'রামের বনবাসে'র প্রকাশকাল ১৮৮২ সন।

পৃ. ২৭১ : তাঁহার 'রাজা বংশধ্বজ' ও লৌহকারাগার'-এর প্রথম প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৮৮০,—"১৮৯০" ও "১৮৭৮" নহে।

পৃ. ২৭২ : রাজকৃষ্ণ রায়ের " 'ডাক্তার বাবু'—১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত।" 'ডাক্তার বাবু'র প্রকাশকাল—মার্চ ১৮৯০।

পৃ. ২৯৭ : সুকুমার বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'জন্মাষ্টমী'র ১ম সংস্করণের প্রকাশকাল দিতে পারেন নাই; উহা ১২৯৬ সাল। 'মুই হ্যাঁদু, প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সনে,—১৮৯৩ নহে।

পৃ. ৩০৩ : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের জন্ম-বৎসর "১৮৬৪" নহে,—১৮৬৩ (১২৬৯, বিষুব-সংক্রান্তি)।

পৃ. ৩০৪ : ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী'র প্রকাশকাল সুকুমারবাবু দিতে পারেন নাই; উহা ১৯১৮ সন।

পৃ. ৩০৭ : "বিহারীলাল দত্তের ... 'বঙ্গবিক্রম'।" ন্যাশনাল থিয়েটারের বিহারীলাল দত্ত 'বঙ্গবিক্রমে'র প্রকাশক,—গ্রন্থকার নহেন। ইহার গ্রন্থকার

যে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাহা সুবিদিত ; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাতেও তাঁহার নামের উল্লেখ আছে।

পৃ. ৩২৫ : শিবনাথ শাস্ত্রীর 'পুষ্পমালা'র প্রকাশকাল ১৮৭৫,—"১৮৮৫" নহে ; বাংলা সাল "১২৮২,"—"১২৯৫" নহে।

পৃ. ৩৪২ : সুকুমারবাবু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পুস্তকগুলির, এমন কি মাসিকে প্রকাশিত কোন কোন কবিতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনি কবির দ্বিতীয় কাব্য 'সাগর-সঙ্গমে'র (১৮৮১) অস্তিত্বের কথা অবগত নহেন।

পৃ. ৩৫৪ : সুকুমারবাবু কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের জন্ম-বৎসর দিতে পারেন নাই। তিনি কবির 'মিত্রকাব্যে'র ৩য় সংস্করণটি দেখিয়াছেন, উহার প্রকাশ-কালও দিয়াছেন ; কিন্তু একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া উহার ভূমিকাটি পাঠ করিলে দেখিতে পাইতেন যে, ১৮৭৪ সনে যখন এই কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কবির বয়ঃক্রম কুড়ি বৎসর।

পৃ. ৩৫৪ : হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'বিনোদমালা'র প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১২৮৫ সাল,—"১২৮৯" নহে।

পৃ. ৩৫৫ : দীনেশচরণ বসুর জন্ম-বৎসর ১৮৫১,—"১৮৫২" নহে (দ্র° 'জন্মভূমি,' কার্ত্তিক ১৩০৪)। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'মানস বিকাশ,'—'মানববিকাশ' নহে। সুকুমারবাবু আমাদের জানাইয়াছেন, "তিনি একখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, কুলকলঙ্কিনী।" আমরা অবশ্য জানি, তিনি একখানি নহে,—অনেকগুলি উপন্যাসের রচয়িতা ; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মোহিনী প্রতিমা বা সরলা' (১৮৮৮), 'নিরাশ প্রণয়' (১৮৮৮), 'বিমাতা না রাক্ষসী' (১৮৯৪), 'পদ্মিনী' (১৮৯৪) প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কয়খানি উপন্যাসের নাম সুকুমারবাবু যে শোনেন নাই, তাহা নহে ; তবে এগুলি যে দীনেশচরণের রচনা, তাহা জানা না থাকায় উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন ; পুস্তকের ১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়া বসিয়াছেন যে, এগুলির লেখক—হারাণচন্দ্র রক্ষিত !

পৃ. ৩৫৮ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-উদ্ধারে'র প্রকাশকাল "১৮৭৭" না হইয়া "জানুয়ারি ১৮৭৮" হওয়া উচিত ছিল।

পৃ. ৩৬২ : 'নটেন্দ্রলীলা কাব্যে'র "দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানদী"—নরেন্দ্রনাথ বসুর ছদ্ম নাম।

পৃ. ৪০৮ : দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছে'র প্রথম প্রকাশকাল ১৩০৭,—"১৩০৮" নহে।

পৃ. ৪১১ : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'সিন্ধুগাথা'র প্রকাশকাল ১৩১৪,—১৩১৩ নহে। তাঁহার 'অশ্রু-কণা'র ১ম সংস্করণের প্রকাশকাল সুকুমারবাবু দিতে পারেন নাই ; উহা—ইং ১৮৮৭।

পৃ. ৪১৩ : অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্ম-বৎসর ১৮৬০,—১৮৬৫ নহে।

পৃ. ৪১৪ : সুকুমারবাবুর মতে, "অক্ষয়কুমারের প্রথম-প্রকাশিত (?) কবিতা 'রজনীর মৃত্যু'…('বঙ্গদর্শন' কার্ত্তিক ১৮২৯)।" ১২৮৯, অগ্রহায়ণ ("কার্ত্তিক" নহে) সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত এই কবিতাটিকে বড়াল-কবির প্রথম-প্রকাশিত কবিতা বলিলে ভুল হইবে ; কারণ, ইহারও পূর্ব্বে ১২৮৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী'তে তাঁহার 'পুনর্ম্মিলনে' নামে কবিতা পাওয়া যাইতেছে।

পৃ. ৪১৫ : অক্ষয়কুমারের 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে,—"১২৯২" সালে নহে।

পৃ. ৪২২ : কামিনী রায়ের 'পৌরাণিকী'র প্রকাশকাল ১৩০৪ সাল,—"১৩০৮" নহে।

পৃ. ৪২৪ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'একঘরে' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে,—"১৮৯০" সনে নহে।

পৃ. ৪২৭ : মানকুমারী বসুর 'বনবাসিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সনে—১৮৮৭ সনে নহে। সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'রঙ্গিনী' সুকুমারবাবুর গ্রন্থমধ্যে ও নির্ঘণ্টে 'রঙ্গিণী' আকার ধারণ করিয়াছে।

পৃ. ৪২৮ : নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'মায়াবিনী'র প্রকাশকাল ১২৯২ সাল,—"১১৯৪" নহে। সুকুমারবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার "'ভবানী' গল্পের বই, মৃত্যুর অনেক কাল পরে সঙ্কলিত।" 'ভবানী' প্রথমে ১ম বর্ষের 'সাহিত্যে' (১২৯৭) মুদ্রিত হয়। লেখকের মৃত্যুর পরে ১৩২৬ সালের ভাদ্র মাসে উহা গুরুদাসের ॥০ সংস্করণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃ. ৪৩৭ : "হরচন্দ্র ঘোষের 'সপত্নী সরো' (১৮৭৪) উপন্যাস।" 'সপত্নী সরো'র প্রকাশকাল ১৮৭৪ নহে,—১৮৭৫। উপন্যাসখানির শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশকাল ইংরেজীতে "1875" মুদ্রিত আছে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার

(পূর্বানুবৃত্তি)

পানাগড় যোগ্য স্থান

আমি কলেজের ছাত্রদিকে রণ-শিক্ষা দিতে চাই। রণ-শিক্ষার বহুবিধ গুণ আছে। একটা প্রধান গুণ, ইহা দ্বারা যে বিনয়-শিক্ষা হয়, তাহা অন্য উপায়ে সম্ভবপর নয়। ছাত্রেরা মঠে থাকিবে, সংলগ্ন মাঠে তাহারা বেড়াইবে, খেলিবে ও তিন-চারি মাস নিয়মিত ভাবে রণ-শিক্ষা করিবে। আর, যথাসময়ে পাঠে মনোনিবেশ করিবে। এই সকল নানা কারণে বিশ্ব-আলয়গুলিকে নগর হইতে দূরে বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তরে সরাইতে হইবে। দৈবক্রমে, বর্ধমান জেলার পানাগড় গ্রাম মার্কিন সৈন্য-নিবাসের নিমিত্ত কয়েকখানা গ্রাম লইয়া ক্ষুদ্র নগরে পরিণত করা হইয়াছিল। সেই স্থানে নূতন বিশ্ব-আলয়সমূহ ও প্রত্যেকের নিকটে নিকটে মহা-বিদ্যালয়াদি, মঠ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে। সেখানে অল্প-সংখ্যক মহা-বিদ্যালয় আদর্শ-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। অধিকাংশ মহা-বিজ্ঞানালয় ও মহা-কলালয় সেখানে থাকিবে। এই সকলের অনেক গৃহ বহুব্যয়সাধ্য প্রাসাদ না করিয়া অল্প ব্যয়ে নির্মাণ করা যাইতে পারে এবং বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে নিকটবর্তী উপবনেও পাঠনা চলিতে পারিবে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে পুরীর নিকটবর্তী সাক্ষীগোপাল নামক গ্রামে এক সুর-পুন্নাগের উপবনে সত্যবাদী বিদ্যালয়ের বালকেরা পাঠাভ্যাস করিত।

পানাগড়ে বিদ্যানগর প্রতিষ্ঠা

পানাগড়ের সেনা-নিবাসের নিমিত্ত অধিকৃত ভূমি-পরিমাণ ছয়-সাত বর্গ-মাইল। এই ভূমির এক বর্গ-মাইলে তিন বিশ্ব-আলয়, সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়াদি ও মঠ নির্মাণের নিমিত্ত রাখিয়া অবশিষ্ট ভূমিতে গম, যব, মুগ, মসুর, তেলিয়া-কলাই (জাপানী Soy bean), তিল, সরিষা ও আখ চাষ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে শাকের ক্ষেতে যথাকালে নানাবিধ আনাজ উৎপন্ন হইতে থাকিবে। গো-শালায়

গাভী থাকিবে। বড় বড় সরোবরে মাছের চাষ হইতে পারিবে। সীমান্তে আরণ্য বৃক্ষ যথাসম্ভব বর্গানুসারে রোপিত হইবে। ফল-বৃক্ষের উদ্যান থাকিবে। বিশ্ব-কলালয়ের অধীনে কৃষিকর্ম শিক্ষার ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে। বিদ্যালয়সমূহের পরিধির মধ্যে আবহ-মন্দির, জ্যোতিষ-মন্দির, প্রদর্শনী-শালা, গ্রন্থশালা ইত্যাদি অবশ্য থাকিবে। যাহাতে বিশ হাজার ছাত্র নানা বিষয়ে উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহার সুচারু সর্বপ্রকার আয়োজন থাকিবে। এই নিবাসের নাম বিদ্যানগর। একজন নগরেশ এক সমিতির সাহায্যে নগরের খাদ্যনির্বাহ, পথঘাট, গৃহসংস্কার, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় তত্ত্বাবধান করিবেন। বঙ্গদেশের ও দূর প্রদেশের লোকেরা আসিলে মনে করিবে, এখানে সত্য সত্য সরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছে। এখন পানাগড়ের সেনানিবাস ভারত-সমর-বিভাগের কর্তৃত্বে আছে; প্রার্থনা করিলে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূমি ও প্রাসাদ বিক্রয় করিলে তাহার লব্ধ মূল্যে বিদ্যানগরে তিন বিশ্ব-আলয় ও কতকগুলি আদর্শ মহাবিদ্যালয়, মহাবিজ্ঞানালয় ও মহাকলালয় নির্মিত হইতে পারিবে। ইহাদের ছাত্রেরা যথাক্রমে শ্বেত, গৈরিক ও পীত বর্ণের শিরস্ক (টুপী) ধারণ করিবে এবং কোনও ছাত্র এই লাঞ্ছন ব্যতীত বাহিরে গেলে সে মহাবিদ্যালয়াদি হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

যে সকল কলিকাতাবাসী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত আছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতার কলেজ দূরে সরাইতে কষ্ট বোধ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের কোনও প্রতিষ্ঠানই চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা-বিপর্যয়ে প্রতিষ্ঠানেরও বিপর্যয় হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি লণ্ড'ন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থাকিতে পারে, তবে কলিকাতায় থাকিতে পারিবে না কেন? কিন্তু আর যে বহুবিধ ব্যাপারে উভয়ের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইংরেজ জাতির বিনয় (discipline), ইংরেজ ছাত্রদের বিনয়, বাঙ্গালীর কোথায়? ইংলণ্ডে পাঁচ শত ছাত্রের ইস্কুলে একটু টুঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া

যায় না। এক পার্শ্বে হয়ত কন্যারা গান গাহিতে শিখিতেছে, অন্য পার্শ্বের বালকেরা সেদিকে কান দেয় না। কেহ কেহ কলিকাতার দুই-তিন মাইল দূরে কলেজগুলিকে সরাইতে চাহিবেন, কিন্তু কলিকাতার আট-দশ মাইলের মধ্যে উচ্চ-ভূমি কোথায় পাইবেন? যে সকল ছাত্র পিতার বা অন্য অভিভাবকের সহিত কলিকাতায় বাস করে, তাহারা বরং দশ-পনর মাইল দূরস্থিত নূতন বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু অসংখ্য ছাত্র কলিকাতাবাসী নহে, তাহারা কেন কলিকাতায় ভিড় করিবে? তাহা ছাড়া কলেজ-স্থাপন এক কথা, আর উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অন্য কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিকে নূতন নূতন জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা তাহাদের এক প্রধান কর্তব্য হইবে। তাহারা কলিকাতার হট্টগোলে না থাকিয়া নির্জনে তাহাদের অধিশিক্ষক ও পথ-প্রদর্শক-সহ একত্র বাস করিয়া গবেষণাকর্মে রত থাকিবে। বর্তমানে বিজ্ঞান-কলেজের কিয়দংশ অপার সারকুলার রোডে, কিয়দংশ বালিগঞ্জে। বিজ্ঞান বিষয়ে এই পৃথক্ বাস অনুমোদনযোগ্য নয়। এক শাখার সহিত অন্য শাখার সাহচর্যলাভ বাঞ্ছনীয়। এক গ্রন্থশালায় সকল শাখারই যাবতীয় গ্রন্থ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক যাবতীয় সাময়িক পুস্তক থাকিতে পারিবে।

কন্যাদের নিমিত্ত পৃথক্ স্থানে মহাবিদ্যালয়াদি করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ ছাত্রীর সংখ্যা নিশ্চয় অল্প হইবে। Medical College, Law College ও Commerce College কলিকাতায় থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকা Medical College পাইলে তাহাদের গৃহের অভাব পূরণ হইবে।

মহা-বিদ্যালয়, মহা-বিজ্ঞানালয় ও মহা-কলালয়

কলিকাতার কলেজে ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক

পূর্বে লিখিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ৭৪টি কলেজের মধ্যে ২৬টি কলিকাতায় আছে। বর্তমানে কলেজে ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৪২,০০০। তন্মধ্যে কলিকাতার পাঁচটি কলেজেই ৩০,৫০০

ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এই পাঁচ কলেজের মধ্যে দুই-একটায় ১০,০০০ পর্যন্ত ছাত্র আছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়—এই ত্রিসন্ধ্যা কাতারে কাতারে ছাত্র আসিতেছে, যাইতেছে। যেমন সিনেমা-গৃহদ্বারে দর্শকের ভিড় হয়, ৩টায়, ৬টায় ও ৯টায় চিত্র প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ এই সকল মহাবিদ্যালয়েও ছাত্রেরা ত্রিসন্ধ্যা ভিড় করে। মহা-বিদ্যালয় চারিটি বর্ষে বিভক্ত। যদি এক এক বর্ষে ১৫০০ ছাত্রও থাকে, তাহাদিকে যে কত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শিক্ষক মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন; ছাত্রদের কেহ শুনিতেছে, কেহ শুনিতেছে না; কেহ পাঠগৃহে আছে, কেহ বা বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; কেহ এক কোণে ঘুমাইতেছে, কেহ বা গল্প করিতেছে; কে কাহার দৃষ্টিতে পড়ে? শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নাই। ছাত্র মাসে মাসে ১০।১২ টাকা বেতন দিতেছে; শিক্ষক তাঁহার বেতন লইতেছেন, পরস্পর কেনা-বেচার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার সকল কলেজ এক প্রকৃতির

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৮৫৫ সাল হইতে রাজ-পরিচালিত হইতেছে। তৎপূর্বে ইহার নাম হিন্দু-কলেজ ছিল। খ্রীষ্টান মিশনরীরা তাহাঁদের ধর্ম প্রচারার্থ কয়েকটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ডফ্‌ কলেজ প্রসিদ্ধ। কতকগুলি বাঙ্গালী যুবক খ্রীষ্টানও হইয়াছিল। এক্ষণে সে কলেজের নাম জেনারেল এসেম্বলী ইন্‌স্‌টিটু্যশান। প্রেসিডেন্সী কলেজের বেতন ১০৲টাকা; সকল ছাত্র দিতে পারিত না। এই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৬৯ সালে মেট্রোপলিটন ইন্‌স্‌টিটু্যশন নামে এক কলেজ স্থাপন করেন। তিনি উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন এবং ছাত্রদের কিছুমাত্র অবিনয় ক্ষমা করিতেন না। ইহার পর ১৮৮১ সালে ব্রাহ্ম সমাজের ইচ্ছানুসারে আনন্দমোহন বসু ব্রাহ্ম-ধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ প্রচারের নিমিত্ত সিটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৮৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ঈপ্সিত রাজনীতি প্রচারের নিমিত্ত রিপন কলেজ স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

ছাত্রদের সুবিধার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র বসু ইংলণ্ডে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়া ১৮৮৭ সালে বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করিলেন। ভবানীপুরে ও দক্ষিণ কলিকাতায় কোনও কলেজ ছিল না। ছাত্রদের সুবিধার জন্য ভবানীপুরে স্যর আশুতোষের নামে এক বৃহৎ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, সকল কলেজ একই প্রকৃতির। আচরণে কিংবা বিদ্যায় এক কলেজের ছাত্রকে অন্য কলেজের ছাত্র হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলেও সব কলেজই সমান। সেই শতকে ৫০।৫৫ জন ছাত্র পরীক্ষা পার হয়। অবশিষ্ট ছাত্রেরাও দুই বৎসর পড়িয়াছে, কলেজের বেতন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপায়ন দিয়াছে, কলেজ বাছনি করিয়াছে, কিন্তু সব ব্যর্থ। এত ছাত্র পরীক্ষায় কেন অপারগ হয়? শতকে ২০ জন বিফল হইতে পারে। ইহার অধিক হইলেই বুঝি, কলেজের দোষ আছে। ছাত্রেরা পড়িতেছে কি না, তাহা দেখিবার লোক নাই। কলেজগুলি ছাত্রকে বি.এ, ও বি. এস্-সি পরীক্ষায় পার করিবার এক-একটা বড় বড় কলবিশেষ বলা চলে। মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক নাই, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মায়া-মমতাও নাই। বৃহৎ বৃহৎ গ্রামোফোন রেকর্ড দ্বারাও এই শিক্ষা-কর্ম সম্পন্ন হইতে পারিত। সমাজ-চিন্তক ভাবিতেছেন, কেন ছাত্রেরা অবিনীত ও বিপথগামী হইতেছে; কিন্তু, তাঁহারা এই অবস্থার মূল অনুসন্ধান করেন নাই।

কলেজে ছাত্র ৫০০-এর অধিক হইবে না।

যদি আমরা ছাত্রকে সৎ শিক্ষা ও নানা বিষয়ে জ্ঞান দিতে চাই, তাহা হইলে এই অবস্থার পরিবর্তন করিতেই হইবে। এখানে দ্বিধার অবকাশ নাই। নির্মম ভাবে প্রত্যেক কলেজের ছাত্র-সংখ্যা কমাইতে হইবে। আমি মনে করি, প্রথমে প্রত্যেক কলেজকে দুই ভাগ করিতে হইবে,— এক ভাগে মহাবিদ্যালয়, অপর ভাগে মহাবিজ্ঞানালয়। এই দুই ভাগ এক বাড়িতে হইতে পারে। যথাবশ্যক স্থান থাকিলে এক বাড়ির একাংশে মহাবিদ্যালয় ও অপরাংশে মহাবিজ্ঞানালয় করিতে হইবে। কোনও মহাবিদ্যালয়ে বা মহাবিজ্ঞানালয়ে পাঁচ শতের অধিক ছাত্র থাকিবে না। প্রত্যেক মহাবিদ্যালয় ও মহাবিজ্ঞানালয় স্বাধীন।

মহাবিদ্যালয় ও মহাবিজ্ঞানালয় দুই শাখা নয়, দুই পৃথক্ বৃক্ষ। ছাত্রসংখ্যা অনুসারে এক, দুই, তিন, চারি মহাবিদ্যালয় কিংবা মহাবিজ্ঞানালয় হইতে পারিবে। যেমন, বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর মহাবিজ্ঞানালয়, এই দুই আলয়ে ১০০০ ছাত্র। বাণিজ্য-ছাত্রেরা সন্ধ্যার পর মহাবিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে। ইহাদের নিমিত্ত পৃথক্ আয়োজন করিতে হইবে না।

কলিকাতা হইতে দূরে নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা

দেখা যাইতেছে, কতকগুলি কলেজকে খর্বকায় হইতে হইবে। যদি কোনও কলেজে ছয় হাজার ছাত্র রাখিতে হয়, তদুপযোগী বিস্তীর্ণ স্থান চাই। পৃথক্ পৃথক্ ১২টা বাড়ি চাই। কলিকাতায় এই ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়। কলিকাতার বাহিরে উপযুক্ত স্থানে গৃহাদি নির্মাণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন বিদ্যা-নিকেতন গড়িয়া তুলিতে হইবে। এতদ্দ্বারা কলিকাতায় ছাত্রাধিক্য হ্রাস পাইবে এবং বহু উপনগরেও জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতে থাকিবে। শুধু কলিকাতাই জ্ঞানে ও ধনে বাড়িবে কেন? যদি এখন কলেজ-ছাত্র ৪২,০০০ হাজার হয়, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, যদি ভারত-ভাগ্য-বিধাতা প্রসন্ন থাকেন, দশ বৎসর পরে দুই লক্ষ কলেজ-ছাত্র হইবে। কত কলেজ যে চাই, তাহার নির্ণয় দুষ্কর। কিন্তু একটা আদর্শ না দেখাইলে নূতন নূতন কলেজ উন্নত ধরণের হইবে না। আমি কলিকাতার কতকগুলি কলেজ দেখিয়াছি, অন্য স্থানের কলেজও দেখিয়াছি। কিন্তু বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ, তাহার ভূমি, সংস্থান, ক্রীড়াক্ষেত্র, সরোবর, বৃক্ষরাজি, হোস্টেল ইত্যাদির এমন সন্নিবেশ আর কোথাও দেখি নাই। ইহার ভূমি-পরিমাণ প্রায় সপাদ শত বিঘা। উত্তর সীমান্তে অনিয়ত তিন পঙ্‌ক্তি আরণ্য-বৃক্ষরাজি। পূর্বদিকে আমবাগান, পশ্চিমে খেলার মাঠ, প্রায় মধ্যস্থলে সরোবর। সরোবরের তীরে তিনটি হোস্টেল। ছেলেরা সরোবরে স্নান, সন্তরণ ও জলক্রীড়া করে, ক্রীড়া-নৌকায় দাঁড় টানে। নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমি কর্তাদিকে এই কলেজ দেখিয়া যাইতে বলি। রেভারেণ্ড ব্রাউন প্রায় ২০ বৎসর এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান-পাঠী ছিলেন, কিন্তু কবিত্বের সহিত

বিজ্ঞানের এমন সুচারু সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার অসামান্য যত্নে, অধ্যবসায়ে ও দূরদর্শিতায় একটা সামান্য কলেজ এমন শ্রী-সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। এই কলেজে পাঁচ-ছয় শত ছাত্র পড়িত। ব্রাউন সাহেব প্রত্যেক ছাত্রকে চিনিতেন। শুনিয়াছি, আরামবাগে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এক শত বিঘা জমি ও লক্ষাধিক টাকা দান পাইয়াছেন। তাঁহারা একবার বাঁকুড়ায় আসিয়া দেখিয়া গেলে তাঁহারাও বুঝিবেন, কেবল পড়াশুনা দ্বারা ছাত্রেরা মানুষ হইবে না।

স্বল্প-ব্যয়ে কলেজের গৃহনির্মাণ

এক্ষণে কলিকাতায় ৫০।৬০ লক্ষ লোক বাস করিতেছে। ইহাদের পুত্রেরা নিজেদের ঘরে থাকিয়া কলেজে পড়ে। ইহাদের নিমিত্ত কলিকাতার উপকণ্ঠে পাঁচ-দশ মাইল দূরে নূতন নূতন কলেজ করিলে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। আর, যাহারা কলিকাতা-নিবাসী নয়, তাহারা বহুদূরস্থিত কলেজে স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক মহাবিদ্যালয়ের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ ভূমি চাই, কিন্তু বৃহৎ অট্টালিকা চাই না। তাড়িতদীপ, তাড়িতপাখা কিছুমাত্র প্রয়োজন হইবে না। খড়ের চালের ঘরে ছাত্রেরা অক্লেশে বাস করিতে পারে। সকল ছাত্রাবাস মঠ নামে অভিহিত হইবে এবং ছাত্রকে মঠের যোগ্য আচরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মহাবিদ্যালয় ও মহাবিজ্ঞানালয়ের ছাত্রেরা স্ব স্ব লাঞ্ছন ধারণ করিবে। প্রত্যেক মঠে অবশ্য একজন মঠাধীশ থাকিবেন। গ্রন্থশালা ও বিজ্ঞানশালার নিমিত্ত পাকা বাড়ি চাই। পাঠনার নিমিত্ত বাঁশের বেড়ার ঘর ও উপরে খড়ের চাল স্বল্পব্যয় ও স্বাস্থ্যকর হইবে। মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গালী খড়ের চালের মাটির ঘরে বাস করে।

প্রত্যেক মহাবিদ্যালয়ে পাঁচ শত ছাত্র। কিন্তু কোনও মহাবিদ্যালয়ে ছয়টির অধিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে না। প্রত্যেক বিষয়ের নিমিত্ত একজন প্রধান শিক্ষক থাকিবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের নিমিত্ত মোট ২৫ জন সহ-শিক্ষক থাকিবেন। প্রধান শিক্ষকেরা মূল বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন, বই পড়াইবেন না। ছাত্রেরা বই পড়িবে এবং সহ-শিক্ষকেরা ও কখনও কখনও প্রধান শিক্ষকেরা ছাত্রদের সহিত ব্যাখ্যাত বিষয়

আলোচনা করিবেন। প্রত্যেক ছাত্র রীতিমত পড়িতেছে ও শিখিতেছে কি না, তাহা পর্যায় ক্রমে দেখিতে থাকিবেন।

উপাধি পরীক্ষা

উপাধি পরীক্ষার দুই ভাগ,—আদ্য ও অন্ত্য। সুচারুরূপে সংসার-যাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত আমাদের যে যে বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, কেবল সে সে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য এক প্রধান বিষয়। আমি দেখিয়াছি, বর্তমানে বি.এ পরীক্ষায়, এমন কি এম.এ পরীক্ষায় পারগ ছাত্রেরা বহু বহু প্রচলিত শব্দের অর্থ জানে না। বি.এ-পরীক্ষা-পারগ ছাত্রেরা শব্দের ব্যুৎপত্তি চিন্তা করে, কিন্তু সুস্পষ্ট অর্থ বলিতে পারে না। "রাম রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন," ভাবার্থ বলিতে পারিবে, রাম রাজা হইলেন; কিন্তু ব্যাচ্যার্থ কিছু মাত্র বলিতে পারিবে না। 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', 'চণ্ডীদাস-সমস্যা', শতবার আবৃত্তি করে, কিন্তু 'পদাবলী' ও 'সমস্যা'র অর্থ জানে না। বাংলায় এম.এ-পরীক্ষা-পারগ ছাত্র কোন্ শব্দ পোর্তুগীস হইতে আসিয়াছে এবং কোন্ পুথী কোথায় 'রক্ষিত' আছে, বলিতে পারে; কিন্তু কার্য-'ব্যপদেশে' ও 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ' লিখিতে ভুলে না। এইরূপ পল্লব-গ্রাহিতা দ্বারা জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপূর্তি হয় না, আর চিন্তাধারাও গাঢ় হয় না।

পাঠ্য-পুস্তকের অনুবৃত্তি স্বরূপ কতকগুলি পুস্তক নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক পাঠের বিশেষ গুণ দেখিতে পাই না, বরং দোষই দেখিতে পাই। যুবকেরা উপন্যাস ও গল্প পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে। এইরূপ অসংখ্য বই হইতে ভাষাজ্ঞান কিছুই হয় না। আর, অল্পজ্ঞান যুবকদের কথা দূরে থাক্, প্রৌঢ় বড় বড় লেখকদের রচনায় তর্কবিদ্যার (Logic) এত ভুল দেখিতে পাই যে মনে হয়, তাঁহারা শিশু। কেবল অন্বয়-দ্বারা অথবা কেবল অবশেষ-দ্বারা কারণ অনুমাণ করিতে অনেক দেখিয়াছি। এই কয়টি কথা স্মরণ রাখিয়া এখানে আমি আদ্য ও অন্ত্য পরীক্ষার শিক্ষা-পরিপাটী দিতেছি।

মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিপাটি

আদ্য বিদ্যা-পরীক্ষা

১। বাংলা ভাষা (সাহিত্য নয়, সংস্কৃত-বহুল বাংলা বই; যেমন, বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস,' তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী,' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারতের অনুক্রমণিকা', মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ,' কাশীরাম দাসের মহাভারতের অংশ-বিশেষ। প্রত্যেক শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ বুঝিয়া যাইতে হইবে এবং আবশ্যক স্থলে সন্ধি ও সমাস শিখিতে হইবে। ৩০০ পৃষ্ঠা। ইহার উপযুক্ত ব্যাকরণ ১০০ পৃষ্ঠা)।

২। তর্ক-বিদ্যা (ব্যবহারিক; অবরোহী ও আরোহী; ৩০০ পৃষ্ঠা)।

৩। বিজ্ঞান (কিমিতিবিদ্যা ও ভূতবিদ্যা, প্রয়োগ ধরিয়া শিক্ষা। কিমিতি বিদ্যা ১০০, ও ভূতবিদ্যা ৩০০; মোট ৪০০ পৃষ্ঠা)।

৪। ইতিহাস (পৃথিবীর বড় বড় দেশের বর্তমান বৃত্তান্ত; ৪০০ পৃষ্ঠা)।

৫। (ক) সংস্কৃত (বিষ্ণু-পুরাণ ও মনু-সংহিতা হইতে কয়েকটি অধ্যায়, ২৫০ পৃষ্ঠা; ব্যাকরণ-কৌমুদী ১৫০ পৃষ্ঠা; মোট ৪০০ পৃষ্ঠা)।

অথবা (খ) গণিত (বীজগণিত, জ্যামিতি, সূচী [Conics], ত্রিকোণ-মিতি; ৪০০ পৃষ্ঠা)।

সংস্কৃতের পরিবর্তে ফারসী অথবা আরবী।

৬। ইংরেজী (ছাত্র সংবাদ-পত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে, এমন ইংরেজী জ্ঞানের বই; ৪০০ পৃষ্ঠা)।

উপাধি বিদ্যা-পরীক্ষা

বি. এ পরীক্ষায় পাস ও অনার্স, এই দুই ভাগের তেমন প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না। বি. এ'র পর এম. এ আছে; এই দুইয়ের মধ্যবর্তী জ্ঞান লাভের প্রয়োজন আছে কি? এই ভাগ দ্বারা শিক্ষক-দিগের কর্ম-বাহুল্য ঘটিয়াছে। পূর্বে দেখিয়াছি, শিক্ষাধিকর্তার নিযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক-নির্বাচন-সংসদ সকল বই আদ্যোপান্ত না পড়িয়া গুরু-লঘু চিন্তা না করিয়া অনুমোদন করেন। সেইরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত

পাঠ্য-নির্ধারণ-সমিতিরও (Board of Studies) সকল সদস্য সকল বই পড়েন কি না সন্দেহ। মাতৃকা পরীক্ষার নিমিত্ত একখানি বিজ্ঞানের বইতে কেঁচোর জনন-ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক শিক্ষক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কেমনে বালক-বালিকাকে ইহা বুঝাইবেন ? আমি বলিয়াছিলাম, "বিশ্ববিদ্যালয়কে জিজ্ঞাসা করুন।" বি. এ বাংলা অনার্সের একখানি অতিশয় অশ্লীল পুস্তক পাঠ্য-নির্ধারিত হইয়াছে। গ্রাম্য ভাষায় 'খেউড়' বলিতে পারা যায়। আমার বিবেচনায় এই বই রহিত করা কিংবা ইহার কিয়দংশ পোড়াইয়া ফেলা উচিত। ছাত্রেরা বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে শিখিতে পারিবে, এই আশায় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু সদস্যেরা লালিত্য-বর্জিত ইংরেজী-বাংলায় রচিত পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন।

১। বাংলা সাহিত্য (অতিপ্রাচীন সাহিত্য নয়, গত তিন শত বৎসরের সাহিত্য ; গদ্য ও পদ্য। ছাত্রেরা যে-কোনও বাংলা রচনার দোষগুণ বিচার করিবে। অল্প স্বল্প অলঙ্কার ও ছন্দের পরিচয় পাইবে। একখানি দেড়শত পৃষ্ঠার বহিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পড়িবে। পুস্তক মোট ৬০০ পৃষ্ঠার)।

২ রাজনীতি ও অর্থনীতি (মহাভারতের রাজধর্ম; কৌটিল্যের রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি আধার করিয়া বর্তমান কালের অর্থনীতি ও রাজনীতি লিখিতে হইবে। ৬০০ পৃষ্ঠা)।

৩। ইতিহাস (ভারতের সমুদ্রগুপ্তের পূর্বের ইতিহাস। এই ইতিহাসে কেবল বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বৃত্তান্ত নয়, পুরাণ ও মহাভারত হইতে তৎকালীন আচার-ব্যবহার, মহাভারতের কালে সামাজিক অবস্থা, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকাল, ইহার পূর্বের অথর্ববেদ যজুর্বেদ ঋগ্‌বেদের কালের সামাজিক অবস্থা বর্ণিত থাকিবে। বৈদিক কৃষ্টিকাল ও মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদ্বানদিগের ভ্রান্ত মতের খণ্ডন ; ভারতীয় দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কার (চমনলাল পশ্য); ইরাণে ও এশিয়া মাইনরে আর্য-উপনিবেশ ; মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে আর্য-উপনিবেশ ; পৃথিবীর বর্ষ বিভাগ, সপ্ত-দ্বীপ ও সপ্ত-সাগর, ইত্যাদি।

ঈজিপ্ট, চীন, বেবিলন, গ্রীস, রোমের পুরাতন ইতিহাস ও ভারতের সহিত সম্পর্ক। ৬০০ পৃষ্ঠা।)

৪। ইংরেজী (আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য। ৪০০ পৃষ্ঠা)।

৫। (ক) সংস্কৃত (কালিদাসের রঘুবংশ ও ভট্টিকাব্যের কয়েক সর্গ ; শকুন্তলা ; বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশ। ৫০০ পৃষ্ঠা)।

অথবা (খ) গণিত (চলগণিত [Calculus] ব্যাস ও সমাস ; পিণ্ডের স্থিতি ও গতি ; তরল দ্রব্যের স্থিতি ও গতি ; জ্যোতির্বিদ্যা [ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা আধার করিয়া পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা ; বাংলা পাঁজির গণিত ভাগের অর্থ ও উপপত্তি], সরল পরিসংখ্যান। ৫০০ পৃষ্ঠা)।

উপরে পাঠ্য-পরিপাটীর মধ্যে 'দর্শনে'র নাম-গন্ধ নাই। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, আমি দর্শনের প্রতি বিমুখ। উত্তম বিষয়ও দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে অযোগ্য হইতে পারে। প্রথম কথা, ১৯।২০ বৎসরের যুবক-যুবতীরা দার্শনিক হইবার অযোগ্য। যদি তাহাদিকে দর্শন পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহারা তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিবে না ; অমুকের মত, অমুকের মত, কতকগুলা মত মুখস্থ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়াদি হইতে যত শীঘ্র এই পরমতপ্রত্যয় দূরীভূত হয়, দেশে স্বাধীন চিন্তার পক্ষে ততই মঙ্গল। তাহারা বলিতে পারিবে না, "এই মতই সত্য এবং তদনুসারে আমাদের জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব।" ছাত্রেরা বুদ্ধির তাৎপর্যের পরিচয় পায়, কিন্তু তাহাদের কর্মক্ষেত্রে তাহা নিষ্ফল! পুনশ্চ, দেশটাই দার্শনিকের দেশ, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রা অতিশয় প্রত্যক্ষ। দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইতেছে না। Ethics নামে বিষয়টি আমাদের ভাষায় ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর আমরা বহুকাল হইতে জানি, ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। কোন্ পণ্ডিত ইহা নির্ণয় করিয়া আমাদের জীবনের পথ নির্ণয় করিতে পারে? ফলে থাকে কতকগুলি মত আর তর্কের কচকচি। আমি দর্শনের বিরোধী নই, কিন্তু তাহা জানিবার বয়স আছে। অধিশিক্ষায় দর্শন চলিতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।

মহাবিজ্ঞানালয়ের শিক্ষা-পরিপাটী

নানা কারণে বিজ্ঞান শিক্ষা বহুব্যয়সাধ্য। কিন্তু প্রত্যেক মহাবিজ্ঞানালয়েই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে, এমন কথা কি আছে? যে যে বিষয়ের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহার চিন্তা করিয়া পাঠ্য-পরিপাটী লিখিতেছি।

আদ্য বিজ্ঞান-পরীক্ষা

১। বাংলা ভাষা
২। তর্কবিদ্যা
৩। ইংরেজী
৪। গণিত

(১–৪) মহাবিদ্যালয়ে আদ্য পরীক্ষার অনুরূপ

৫। (ক) কিমিতিবিদ্যা ও ভূতবিদ্যা।

অথবা (খ) প্রাথমিক কিমিতি ও ভূতবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা।

অথবা (গ) প্রাথমিক কিমিতি ও ভূতবিদ্যা, জীববিদ্যা, জীবনবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব।

অথবা (ঘ) প্রাথমিক কিমিতি ও ভূতবিদ্যা, আবহবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা (কৃষির উপযোগী), কৃষিবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা।

ছাত্রেরা ইচ্ছামত একটি বিষয়ের পরিবর্তে আর একটি বিষয় লইতে পারিবে না। পরিবর্তন করিতে হইলে সংযোগ (Combination) পরিবর্তন করিতে পারিবে। এখন দেখিতেছি, আই.এ পরীক্ষার নিমিত্ত অনেকেই উদ্ভিদ-বিদ্যা পড়ে। তাহারা কতকগুলা সংজ্ঞা মুখস্থ করে, ছয় মাস পরে তাহার কিছুই মনে থাকে না। এই সকল বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্যই চাই। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে অল্প-স্বল্প কর্মাভ্যাস করিয়া ছাত্রেরা অন্বেষায় প্রবৃত্ত হইবে। কোনও নির্দিষ্ট বই থাকিবে না। ছাত্রেরা দুই বৎসরে কি দেখিয়াছে, কি জানিয়াছে, কি শিখিয়াছে, তাহা লিখিয়া রাখিবে। বিষয়-নির্বাচনে প্রত্যেক কলেজ স্বাধীন থাকিবে।

উপাধি বিজ্ঞান-পরীক্ষা

১। বাংলা সাহিত্য (উপাধি বিদ্যা-পরীক্ষার অনুরূপ)।

২। (ক) গণিত [উপাধি-বিদ্যা পরীক্ষার অনুরূপ], কিমিতিবিদ্যা ও ভূতবিদ্যা।

অথবা (খ) কিমিতি ও ভূতবিদ্যা (আদ্য পরীক্ষার অনুরূপ), উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও ভূবিদ্যা।

অথবা (গ) প্রত্যক্ষ মনোবিদ্যা, জীবন-বিদ্যা, নৃ-বিদ্যা।

বিজ্ঞানের ছাত্রেরা প্রথম বর্ষ হইতেই অন্বেষায় প্রবৃত্ত হইবে। উপাধি-পরীক্ষার ছাত্রেরা তৃতীয় বর্ষ হইতেই উচ্চতর বিষয়ের অন্বেষায় নিযুক্ত থাকিবে। কোনও ব্যবহারিক পাঠ্য-বই নির্দিষ্ট থাকিবে না। ছাত্রের মনে যে প্রশ্ন আসিবে এবং শিক্ষক যে প্রশ্ন করিবেন, তাহারা সেই সেই বিষয় অন্বেষণ করিতে থাকিবে। ফল যৎসামান্য হউক, ছাত্রদের মনে অন্বেষার প্রবৃত্তি ও আত্মপ্রত্যয় জন্মাইতে হইবে। তাহারা যে যন্ত্র খুঁজিবে, বিজ্ঞানের কর্মশালা হইতে তাহা দেওয়া হইবে, কিন্তু কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে না। তাহাদের চিত্ত ছোট ছোট বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেও ক্ষতি নাই। তাহারা ছোট হইতেই বড়তে উঠিতে পারিবে, আর গবেষণার নামে ভীত হইবে না। আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, প্রথম বর্ষ হইতেই ছাত্রদের অজ্ঞাত নূতন নূতন বিষয়ে অন্বেষা জাগাইতে পারা যায়। পাঠ্য-বিষয়ে ব্যাখ্যা অল্প সময়ে সমাপ্ত হইবে। আর, বাকী সময় তাহারা চর্বিতচর্বণ না করিয়া প্রশ্নের সমাধান করিতে থাকিবে। শিক্ষক ও ছাত্র অনুসারে এই সকল প্রশ্নের অবশ্য প্রভেদ হইবে। কিন্তু ছাত্র দুই বৎসরে কি দেখিয়াছে, কি করিয়াছে, তাহা একখানি বহিতে লিখিয়া রাখিবে। কর্মটি কিছু কঠিন এবং নূতন ধরণের। কিন্তু অসাধ্য নয়। এই প্রণালী না ধরিলে আমাদের যুবকেরা চিরদিন পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিবে। দেখা যাইবে, এখানেও কোনও বিষয়ে বিকল্প নাই। বর্তমানে বিজ্ঞান-কলেজে প্রবেশের সময় মনে করা হয়, সকল ছাত্রই সকল বিষয়ে সমান মনোযোগী হইতে পারে এবং তাহাদের ইচ্ছামত যে কোনও বিষয়

পড়িতে দেওয়া হয়। একটা বিষয়ের পরিবর্তে আর একটা বিষয় কেন পড়ে, তাহার মূল কারণ দুইটি। পরে লিখিতেছি।

মহাকলালয়ের শিক্ষা-পরিপাটী

বিদ্যার্থী ছাত্র অতি অল্প, ধনার্থী ছাত্রই অধিক। তাহারা কেন ধনার্থী, তাহা বুঝিতে কোনও কষ্ট নাই। ধন না হইলে কি খাইবে, কেমনে সংসার প্রতিপালন করিবে? আর ধনার্জনের যত উপায় আছে, তন্মধ্যে চাকরি একপাদ। দেহ সুস্থ থাকিলে তোমার আর কাহারও সাহায্য ও মূলধনের চিন্তা করিতে হয় না। ধনার্জনের আর যত পদ আছে, কোনটা এত সোজা নয়। তেজারতি ও মহাজনি দ্বিপাদ। ইহাতে মূলধন ও পরচিত্তজ্ঞতা চাই। ইহা বই পড়িয়া হয় না, মারোআড়ীর গদিতে বসিয়া দশ বৎসর তাহার মুহুরী হইতে পারিলে এই গুণ আসিতে পারে। কৃষিকর্ম ও বাণিজ্য ত্রিপাদ। মূলধন চাই, সমাযোগ (Organization) চাই এবং নিজের দক্ষতা চাই। নূতন কলা প্রতিষ্ঠা চতুষ্পাদ। মূলধন, সমাযোগ, দক্ষতা ও মাত্রিকার (Raw materials) প্রাচুর্য চাই। চাকরি একপাদ এবং যেমন তেমন চাকরি 'ঘরে বসে ঘি ভাত।' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না পাইলে চাকরি জুটে না। এই কারণে যত সহজে তাহা লাভ হইতে পারে সে বিষয়ে ছাত্রেরা সর্বদা দৃষ্টি রাখে।

কিন্তু এখন আর সে বুদ্ধিতে কুলাইবে না। চাকরি ক্রমশঃ অল্প হইবে, বেতনও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। আর, এত লব্ধোপাধিকের জন্য কত চাকরিই বা আছে? পশ্চিমবঙ্গ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূমি-পরিমাণ অল্প, কিন্তু জনসংখ্যা অত্যধিক। হিটলার দুঃখ করিতেন, জার্মানজাতির বসবাসের স্থান নাই। মনে পড়িতেছে, তাঁহার হিসাবে জনপ্রতি ছয়-সাত বিঘা পড়ে। আর, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের উপযোগী জনপ্রতি দুই বিঘাও মিলিবে না। বাণিজ্য ও কলা, এই দুই আশ্রয় না করিলে বাঙ্গালীর বাঁচিবার অন্য পথ নাই। জমি কোথায় যে চাষ করিয়া সংসার প্রতিপালন করিবে? ঝাড়গ্রামের রাজা মহাশয় কৃষি-মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, প্রায় পাঁচ শত যুবক বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী হইয়াছিল।

কেন হইয়াছিল ? রাজার কৃষিবিভাগে চাকরি পাইবে, এই আশায়। তাহারা এমন নির্বোধ নয় যে দশ-পনর বিঘা জমি চাষ করিয়া, যেমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই হউক, ভদ্রলোকের মত সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। তাহাদিকে কে বা মূলধন দিবে ? আর, ইহাও শোনা যাইতেছে, যাহারা নিজহাতে চাষ করে, রাজার শাসনে তাহারাই জমি ভোগ করিবে। রাজা মহাশয়ের কৃষি-মহাবিদ্যালয়ে অল্প-স্বল্প ছাত্র লইয়া সমুদয় উদ্‌যোগ ও অর্থ কৃষি-বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। এতদ্দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সফল ও কীর্তি স্থায়ী হইতে পারিবে।

পূর্বকালে মহাজনেরা পণ্য উৎপাদন করাইতেন। যাহারা করিত, তাহাদিকে প্রয়োজনমত মহাজন অর্থ দিতেন। কদাচিৎ মাত্রিকা-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে গ্রামে গ্রামে অগণ্য কলাজীবী দেশে এত পণ্য এবং এত উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করিত যে উদ্‌বৃত্ত পণ্য দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হইত। ইহারা কৌটকলাজীবী, প্রত্যেকে স্বাধীন। নিজের ধনে এবং প্রয়োজন হইলে স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া দ্রব্য নির্মাণ করিত। কিন্তু যন্ত্রশিল্প আসিয়াছে, বহু লোকের যৌথ ধনে বড় বড় যৌথ কলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৌট-কলা যৌথ-কলার প্রতিযোগিতায় টিকিতেছে না। কলা অসংখ্য। শিক্ষাপ্রণালীও তদনুরূপ বহুবিধ হইতেই হইবে। তথাপি সকলের বনিয়াদ এক প্রকার। আমার 'শিক্ষা-প্রকল্পে' সে বনিয়াদের আভাস দিয়াছি। এখানে মহাকলালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিপাটী দিতেছি।

আদ্য কলা-পরীক্ষা

আদ্য কলা-পরীক্ষা (মাতৃকা পরীক্ষার পর ৩ বৎসর)।

১। বাংলা (গত শত বৎসরের বাংলা সাহিত্য)।

২। ইংরেজী (ইংরেজী ভাষাজ্ঞান এরূপ হইবে যে ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে)।

৩। তর্ক-বিদ্যা (ব্যবহারিক)।

৪। গণিত (ব্যবহারিক)।

৫। সামান্য যন্ত্র-বিদ্যা (এখানে বিজ্ঞানের তত্ত্ব গৌণ, প্রয়োগ মুখ্য)।

৬। কিমিতি ও ভূত-বিদ্যার প্রয়োগ।

৭। বিবিধ মৃত্তিকার ইট, প্রস্তর, সিমেণ্ট, চর্ম, শৃঙ্গ, বাঁশ, দারু (গ্রাম্য ও আরণ্য), লোহা, ইস্পাত, তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর গুণ পরীক্ষা।

৮। অইল এঞ্জিন, তাড়িত মোটর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, ঘড়ী, টাইপার ইত্যাদির মেরামত কর্ম।

৯। হাস্ত কর্মাভ্যাস (দারু, লোহা, ইস্পাত, পিতল ও কাঁসার)।

আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক 'কারু' নাম পাইবে এবং যে কোনও নগরে মাসে স্বচ্ছন্দে দুই শত আড়াই শত টাকা উপার্জন করিতে পারিবে।

উপাধি কলা-পরীক্ষা

উপাধি কলা-পরীক্ষা (আদ্য পরীক্ষার পর ২ বৎসর)।

যাদবপুর ও শিবপুর শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে কৈমিতিক শিল্প, তাড়িত শিল্প, ও যান্ত্রিক শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এইরূপে শিক্ষিত যুবক আরও চাই। ইহাদের নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপ পাঠ্য-পরিপাটী নির্দেশ করিতেছি।

১। কিমিতিবিদ্যা ও ভূতবিদ্যার প্রয়োগ শিক্ষা।

২। যন্ত্র-বিদ্যা।

৩। ভূবিদ্যার অন্তর্গত খনিজের প্রয়োগ।

৪। উদ্ভিদ্-বিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার প্রয়োগ।

৫। ভারতের খনিজ, উদ্ভিজ ও প্রাণীজ মাতৃকার বিবরণ।

৬। ভারতে ও বিদেশে উৎপন্ন পণ্য-বৃত্তান্ত।

৭। অইল এঞ্জিন, ডায়নামো, তাড়িতসঞ্চয়ী-কোষ নির্মাণ শিক্ষা।

উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক 'কলাবিৎ' নাম পাইবে। ইহারা যে কোনও যন্ত্র প্রয়োগে অভিজ্ঞ হইবে। মহাবিজ্ঞানালয় অপেক্ষা মহাকলালয় অধিক ব্যয়সাধ্য হইবে।

ছাত্রদের কৃতিত্বের পরীক্ষা

উক্ত তিন আলয়ে প্রতি দুই মাসে ছাত্রদের পরীক্ষা করা হইবে। দুই মাসে যতটুকু পড়া কিংবা শিক্ষা দেওয়া হইবে, ততটুকু ছাত্র আয়ত্ত করিয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা। কভু প্রধান শিক্ষক, কভু সহ-শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন। দেড় ঘণ্টায় উত্তর করিতে পারিবে, এই পরিমাণ প্রশ্ন থাকিবে। মূল্য ৫০ অঙ্ক। পরীক্ষার ফল একখানি বহিতে লিখিত থাকিবে। শিক্ষার অন্তকালে অন্ত্য-পরীক্ষায় সমগ্র শিক্ষণীয় বিষয়ের পরীক্ষা হইবে। ৩ ঘণ্টায় উত্তর লিখিতে হইবে। এই পরীক্ষায় লব্ধ ফল ও দ্বৈমাসিক পরীক্ষার ফল যুক্ত হইয়া ছাত্রের কৃতিত্ব প্রকাশ করিবে। ৪০ অঙ্ক পাইলে পরীক্ষা পার, ৫০ অঙ্কে দ্বিতীয় বিভাগ ও ৬৫ অঙ্কে প্রথম বিভাগ গণ্য হইবে। ত্রিবিধ উপাধি-পরীক্ষা ত্রিবিধ বিশ্ব-আলয় করিবেন। আদ্য-পরীক্ষা মহাবিদ্যালয়াদিই করিবেন। বিজ্ঞান ও কলা-বিষয়ে পরীক্ষায় কর্মাভ্যাস-পরীক্ষা অবশ্য করিতে হইবে। শিক্ষাপদ্ধতির যে স্থূল আভাস দেওয়া গেল তাহা গৃহীত হইলে, মনে হয়, শতকে অন্ততঃ ৮০ জন ছাত্র পরীক্ষায় সফল হইবে। যদি না হয়, শিক্ষার দোষ কিংবা পরীক্ষার দোষ অনুমান করিতে হইবে এবং তাহার প্রতিকারও করিতে হইবে।

এই সকল বিষয়ের পাঠ্য-পুস্তক বাংলায় রচিত হইবে এবং কোনও পুস্তকের রচনা উত্তম না হইলে ছাত্রেরা ইংরেজীতে শিখিবে। এ বিষয়ে চিত্ত দৃঢ় না করিলে শিক্ষার উন্নতি হইবে না। ছাত্রেরা সাধারণতঃ মঠে থাকিবে এবং মঠাধীশের শাসনে পরিচালিত হইবে। দেহ অপটু না হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে রণাভ্যাস করিতে হইবে। ছাত্রেরা মঠ হইতে বাহির হইলেই তাহাদের স্ব স্ব বর্ণের শিরস্ক ধারণ করিবে। সাধারণ লোকে এই শিরস্ক দেখিয়া তাহাকে সম্ভ্রম করিবে। কোনও উপযুক্ত ছাত্র অর্থাভাবে মঠে থাকিতে, পুস্তক কিনিতে ও বেতন দিতে অসমর্থ হইলে মহাবিদ্যালয়াদি হইতে তাহার এই সকল ব্যয় নির্বাহিত হইবে। যে সকল ছাত্র পিতামাতা কিংবা অন্য অভিভাবকের সহিত বাস করিবে, তাহারা এইরূপ সাহায্য

পাইবে না। কেবল মহাবিদ্যালয়াদির বেতন হইতে মুক্তি পাইতে পারে।

এই প্রকল্প অনুসরণ করিতে হইলে, যে সকল কলেজে 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' হইতেছে, আর ছাত্রদের ইচ্ছানুসারে সঙ্গতি-অসঙ্গতি নির্বিশেষে যে কোনও বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সে সকল কলেজের আমূল পরিবর্তন করিতেই হইবে। প্রেসিডেন্সী কলেজ, এই নাম আর থাকিবে না। ইহার নাম কলিকাতা মহাবিদ্যালয় হইবে। রাজ-পরিচালিত এই মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সর্ববিধ সংযোগ (Combination) শিক্ষা দেওয়া হইবে। অন্য মহাবিদ্যালয়ের সে সামর্থ্য নাই, তাঁহাদিকে একটি কি দুইটি সংযোগ রাখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে। তথাপি কোনও মহাবিদ্যালয় ছাত্রবেতন হইতে ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ধনাঢ্য ও দাতার নিকট দান প্রার্থনা করিবেন এবং দানের যোগ্য বিবেচিত হইলে, আমার বিশ্বাস, দাতাও জুটিবে। দান না পাইলে শিক্ষক মহাশয়েরা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যয় লইয়া দেশের শিক্ষা-মহাব্রতে রত হইতে পারেন। ইহা আমাদের দেশে অসম্ভব নয়। যখন কলিকাতায় National Council of Education প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন শিক্ষক মহাশয়েরা অতি অল্প বেতনে অধ্যাপনা করিতেন। মহামতি গোখলে মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতন পাইতেন। এইরূপ আরও উদাহরণ আছে। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য পাইবেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা প্রথম প্রথম বেতন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কারণ, আমাদের দেশে বিদ্যা দান হইয়া থাকে; কখনও বিদ্যাবিক্রয় হইত না। কলিকাতায় বর্তমানে যে ২৬টি কলেজ আছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়

এককালে কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। ধনে, মানে, গৌরবে ভারতের শীর্ষস্থানে ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উদারচেতা হইয়া সকল প্রদেশের উচ্চশিক্ষার আদর্শ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার পক্ষে যাহা সুসাধ্য ছিল, এখন আর তাহা নহে। তখন

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় যাবতীয় প্রধান ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এক্ষণে এ ব্যাপ্তি হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় এখনও সে সে ভাষা শিক্ষার বিধি-ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। এক্ষণে বাংলা, বঙ্গের নিকট প্রতিবেশী ওড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী ও আসামী ভাষায়, ইয়োরোপীয় ভাষার মধ্যে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় এবং সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফারসী, ভারতের এই চারিটি পুরাতন ভাষায় এম. এ উপাধির নিমিত্ত ছাত্রদিকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। কিন্তু ফরাসীর পরিবর্তে জার্মান ভাষা হইলে দেশে জ্ঞান-বৃদ্ধি হইবে। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ব্যতীত ওড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী, আসামী, এই চারিভাষায় এম. এ পরীক্ষার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। উৎকল, পাটনা ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার এম. এ পরীক্ষার এইরূপ কোনও ব্যবস্থা আছে কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও আসামী, এই চারি ভাষা প্রাচ্যভাষা নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহাতীর্থ পরীক্ষার নিমিত্ত নির্ধারিত করিলে ভাল হয়।

আমি অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি, এম. এ উপাধির নিমিত্ত বাংলার শিক্ষণীয় বিষয় লঘু হইয়াছে। সংস্কৃত পাঠ্যের সহিত তুলনা করুন। কোনও ছাত্র সে সকল বিষয় দুই বৎসরে সম্যক আয়ত্ত করিতে পারে কিনা সন্দেহ। আর, বাংলার শিক্ষণীয় বিষয় যোগ্যছাত্র এক বৎসরেই আয়ত্ত করিতে পারে। সংস্কৃতের বিন্দু-বিসর্গ না জানিয়াও বাংলায় এম. এ উপাধি পাইতেছে। এই উপাধির সম্মানও তেমন নাই। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোধিত বিধানে দেখিলাম, বাংলার শিক্ষণীয় বিষয় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে আশা হয়, বাংলায় এম. এ উপাধির গৌরব বৃদ্ধি হইবে। যে বিষয়েই শিক্ষা হউক, যদ্দ্বারা ছাত্রের চিত্তের প্রসার, বুদ্ধির প্রাখর্য ও বিচারশক্তির সূক্ষ্মতা না জন্মে, সে বিষয় পরিহর্তব্য। পরপ্রত্যয়-নেয় বুদ্ধি যত শীঘ্র আমাদের শিক্ষা-নিকেতন হইতে বিদূরিত হয়, ততই মঙ্গল। এই বুদ্ধির প্রাবল্য হেতু জ্ঞানোৎকর্ষ হইতেছে না।

বিশ্ব-বিজ্ঞানালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাবতীয় বিজ্ঞানে এম. এস-সি পরীক্ষার নিমিত্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাঠ্য-প্রপঞ্চ দেখিলে সহজেই মনে হয়, অধুনা-জ্ঞাত যাবতীয় তথ্য পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ইহার অধিক আর কিছু আছে বা হইতে পারে, কল্পনা করিতে পারা যায় না। বোধ হয় পৃথিবীর যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এত উচ্চ পরীক্ষা নাই। তথাপি দুঃখ হয়, আমাদের এম. এস-সি পরীক্ষা-পারগ ছাত্রেরা ইয়োরোপ আমেরিকা না গেলে তাহাদের শিক্ষা পঙ্গু হইয়া থাকে। আমার মনে হয়, ইহার প্রধান কারণ, সে সে দেশে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, এ দেশে তাহা হয় না। সে সে দেশে ছাত্রেরা নিজে যাহা দেখিয়াছে, করিয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিবেচিত হয়। যাহাকে আমরা সামান্য বুদ্ধি বলি, সে দেশে সে বুদ্ধিই শ্লাঘ্য। অমুক কি বলিয়াছেন, অমুকের কি মত, সে দেশে ইহার কোনও মূল্য নাই। সে দেশে বিশ্ব-বিজ্ঞানালয়ের সংশ্লিষ্ট কলেজে ছাত্রদের মনে এই ভাব সর্বদা জাগরূক রাখিবার যথোচিত চেষ্টা করা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু পুরাকৃতিতত্ত্ব (Archeology) শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই। আমাদের এই বিশাল দেশে কত পুরাকৃতি আবিষ্কারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয়, এ বিষয়ে দক্ষতা লাভের নিমিত্ত আমাদের যত্নবান হওয়া কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশেও এতকাল এই বিষয় অবহেলিত হইয়াছিল। মাত্র ১৫ বৎসর হইল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাকৃতিতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, আমরা আর বিদেশী পুরাকৃতিতত্ত্ব-নিপুণের মুখ চাহিয়া থাকিব না।

বিশ্ব-কলালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়

বিশ্ব-কলালয় সম্পূর্ণ নূতন। শিবপুর ও যাদবপুর শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে শিল্পের মূলতত্ত্ব উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু কলা-প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা লাভের প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখা হয় না। বঙ্গদেশে যে যে কলা প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে, বিশ্ব-কলালয়ে সে সে কলা শিক্ষার ব্যবস্থা

করিতে হইবে। বঙ্গদেশে কাচ-কলা স্থায়ী হইয়াছে এবং এ বিষয়ে গবেষণার নিমিত্ত ভারতরাজ দিল্লীতে গবেষণাগার নির্মাণ করাইবেন। কিন্তু বঙ্গদেশে কুম্ভকলা শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সূত্র-নির্মাণ ও বস্ত্র-বয়ন, সূত্র ও বস্ত্র-রঞ্জন ও কাগজ-কলা শিক্ষা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাইকেল নির্মাণ, মোটর এঞ্জিন নির্মাণ, মোটর গাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই। বিশ্ব-কলালয়ে এই সকল নির্মাণ আরম্ভ করা যাইতে পারে। এক দিকে নির্মাণকর্ম, অন্য দিকে গবেষণা-কর্ম যুগপৎ চলিতে থাকিবে। এই কারণেই বিশ্বকলালয়কে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইবে।

উপসংহার

ইতঃপূর্বে কোথাও হিন্দী শিক্ষার উল্লেখ করি নাই। কারণ, বঙ্গদেশে বাংলাভাষায় যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। হিন্দী আমাদের মাতৃভাষা নয়। ১৫ বৎসর পরে রাষ্ট্রভাষা হইবার কথা আছে। কিন্তু ১৫ বৎসর পরে কি হইবে, তাহা এখন ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তবে ইহা নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, হিন্দীভাষা ভারতভাষা হইবে না। কারণ, সমস্ত দক্ষিণ দেশ হিন্দীর বিরোধী। যদি হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয়, বাঙ্গালী ছাত্রেরা আদ্য ও উপাধি পরীক্ষার সময়ে দুই বৎসরে প্রচলিত হিন্দী অক্লেশে শিখিতে পারিবে। তাহাদের হিন্দী সাহিত্য কিংবা প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদি জানিবার প্রয়োজন হইবে না ; কিন্তু আর একটা কথা নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, ভারতে নাগরী লিপি প্রচলিত হইবেই। এখন যাহারা সংস্কৃত পড়িতেছে, তাহারা নাগরী লিপি শিখিতে আরম্ভ করিতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কন্যাদের মাতৃকা-পরীক্ষার নিমিত্ত গীতকলা ও চিত্রকলা অতিরিক্ত বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার আলয়, কারু কলার নয়। আর এই পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ আয়োজন করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই দুই কলা শিখিতে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে এই কল্পনা করিয়া থাকিবেন। বঙ্গদেশে গীতবাদ্য শিক্ষার ও পরীক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। কেবল নিয়মানুসারী পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন আছে। তাহাঁরা

ইচ্ছা করিলে উপাধিও দিতে পারিবেন। চিত্রকলা শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় রাজ-পরিচালিত চিত্রকলা-শিক্ষালয় আছে। সেই কলালয়ের নির্দেশানুসারে অপর স্থানেও এইরূপ শিক্ষালয় স্থাপিত হইতে পারিবে এবং কৃতী ছাত্রদের পরীক্ষাও চলিতে পারিবে।

এখন এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করি। বুঝিতেছি, অনেকে এখানে বর্ণিত প্রকল্প-গ্রহণে ইচ্ছুক হইতে পারেন। কিন্তু যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইবে, সে অর্থ কোথা হইতে আসিবে? আমার উত্তর, দেশের বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্যেরা সাহায্য করিবেন এবং রাজকোষ হইতে অবশিষ্ট অর্থ প্রদত্ত হইবে। কেহ কেহ বলিবেন, রাজকোষে অর্থ নাই। আমি বলিব, অর্থ ধার করুন, এবং অচিরে দেশ হইতেই সে অর্থ পুনরাবৃত্ত হইবে।

সমাপ্ত

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

কল্যাণ-সঙ্ঘ

৬

পরদিন সকালে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সমরেশ। তিলুর সঙ্গে দেখা হ'ল। ভোরে আশ্রমে গিয়েছিল তিলু। আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস আছে। গরিব ছোট ছেলে-মেয়েরা থাকে সেখানে। ছাত্রাবাস থেকে তারা শহরের স্কুলে পড়াশুনা করে। থাকা ও খাওয়ার জন্য তাদের খরচ লাগে না। আশ্রম সমস্ত খরচ বহন করে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্তোত্রপাঠ করতে হয় ছেলে-মেয়েদের। স্তোত্রপাঠের সময় তিলুকে মাঝে মাঝে থাকতে হয়। আশ্রমের কর্তা জ্ঞানানন্দ স্বামী এই কাজটির ভার তিলুর উপর দিয়েছেন।

তিলুর পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি, গরদেরই ব্লাউস। পা খালি। মুখে প্রভাতের আকাশের মত পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা।

সমরেশকে দেখে তিলু একটু হেসে বললে, চা খাওয়া হয়েছে?

সমরেশ বললে, এখনই চা খাওয়া হবে কি ক'রে? মায়ের স্নান হয় নি।

তবে এস আমাদের ওখানে। চা খাবে। লতুর হাতের চা।

সমরেশ যেতে উদ্যত হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে বললে, লতুর হাতে নয়, তুমি খাওয়াও তো যেতে পারি। যে রকম ধর্ম-কর্ম করছ, তোমার হাতের চা খেলেও পুণ্যি।

তিলু বললে, এস না, থমকে দাঁড়ালে কেন?

যেতে যেতে সমরেশ বললে, তোমরা কাল তপনদের বাড়ি গিয়েছিলে?

তিলু বললে, তুমি জানলে কি ক'রে?

সমরেশ বললে, তপনের কাছ থেকে।

তিলু বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তপনবাবু বলছিলেন বটে—প্রতুলদের ওখানে আড্ডা জমিয়েছ তুমি। আবার প্রতুলদের ওখানে যাওয়া-আসা করছ কেন? ও তো এখন অন্য মত ধরেছে।

মতের মিল না থাকতে পারে, মনের মিল থাকবে না কেন?

মতে যদি সত্যি মতি থাকে তো মিল থাকা উচিত নয়।

সমরেশ জবাব দিল না। তিলু বললে, আমার খুব নিন্দে করছিল বুঝি?

সমরেশ বললে, নিন্দের কাজ কিছু করেছিলে নাকি?

তিলু বললে, ওর বোন একদিন আমাকে জপাতে এসেছিল। ভাগিয়ে দিয়েছিলাম।

জপাতে এলেই জপতে হবে, তার কোন মানে নেই। তবে কারও সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করা উচিত নয়।

তিলু ঝঙ্কার দিয়ে বললে, তোমাকে এত গুরুমশায়গিরি ফলাতে হবে না। কি অশোভন, কি শোভন, আমার খুব জানা আছে।

সমরেশ চুপ ক'রে গেল।

তিলু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কাল রাত দুপুর পর্যন্ত আড্ডা দিলে বুঝি?

সে আবার কি!

তিলু বললে, নয়ই বা কেন? তপনবাবুদের ওখান থেকে ফিরে কাকীমাকে ডেকে পাঠালাম। তুমি বাড়ি ফের নি ব'লে উনি আসতে পারলেন না।

সমরেশ বললে, মাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

তিলু বললে, তপনবাবুর গান শুনতে। চমৎকার গান গাইলেন।

সমরেশ হেসে বললে, মাসী বোনঝি দুজনেই মোহিত হয়ে গেলে বুঝি?

তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-ক্ষেপ ক'রে তিলু বললে, মানে?

সমরেশ বললে, মানে, দুজনেরই খুব ভাল লাগল, আর কি?

তিলু বললে, ভাল জিনিস ভাল লাগবে না? একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, নূতন ধরনে কথা বলতে শিখেছ দেখছি! মীরা রায়ের কাছে বুঝি? একটু চুপ ক'রে থেকে মাথা নেড়ে বললে, জানি কোথাও মন জড়িয়ে গেছে। না হ'লে ডাকের পর ডাক দিয়েও সাড়া পাওয়া যায় না। সমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললে, নয়?

সমরেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে, না, না, ওসব নয়। মায়ের কাছে ঐ নিয়ে মিথ্যে ক'রে পাঁচ কথা ব'লে ওঁর মাথা খারাপ ক'রে দিও না।

তিলুদের বাড়ির সামনে হাজির হ'ল ওরা। রাস্তার ধারে লোহার গেট। গেট পার হয়েই বাগান। গেট থেকে একটা অপ্রশস্ত লাল সুরকির রাস্তা বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত চ'লে গেছে। বাগানে নানা ফুল ও ফলের গাছ। রাস্তার পাশেই একটা কনকচাঁপার গাছ আষ্টে-পৃষ্ঠে ফুলে ভ'রে গেছে। একটা মইয়ের উপর চেপে লতু ফুল তুলে আঁচলে ভরছিল। সমরেশ ও তিলুকে দেখে মই থেকে তাড়াতাড়ি নেমে হাসতে লাগল।

সমরেশ মুচকি হেসে বললে, কি লতু, ফুল দিয়ে মালা গাঁথবে বুঝি?

লতু লজ্জায় মুখ রাঙা ক'রে বললে, যান।

তিলু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, মামা হয়ে ভাগনীর সঙ্গে রসিকতা করতে লজ্জা করে না?

সমরেশ বললে, বাঃ রে! রসিকতা কি করলাম! ফুল দিয়ে লতু মালা গাঁথবে না তো চচ্চড়ি করবে নাকি?

লতু হেসে ফেলল। তিলু গম্ভীর মুখে এগিয়ে গেল। সমরেশ বললে, তুমি বাড়িতে ঢুকেই মেজাজ চড়িয়ে দিলে দেখছি। চা খাওয়াবে না কি?

তিলু বললে, যার হাতের চায়ের লোভে ছুটে এসেছ তাকে বল।

সমরেশ লতুর দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বললে, সকাল থেকে চা খাই নি। চা খাওয়াবে ব'লে ডেকে নিয়ে এসে কি রকম কাণ্ড!

লতু বললে, আপনি চা খাবেন? আসুন। দাদামশায় এখনও চা খান নি।

সমরেশ হতাশভাবে বললে, চল। যদি দয়া হয় তো দেবে একটু।

দুজনে বাড়ির ভিতর ঢুকল। তিলুর কাকা মহেশবাবুর ঘন ঘন কাশির শব্দ শুনা গেল। উঠনের এক পাশে ব'সে মুখ ধুচ্ছেন তিনি। সমরেশ বললে, কাকাবাবু গলা পরিষ্কার করছেন; আমাকে দেখলেই বক্তৃতা শুরু করবেন। শুনে লতু মুচকি হাসলে। বাড়ির ভিতরে বারান্দায় এসে সমরেশ বললে, আমি এক পাশে গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। চা হ'লে এক কাপ দিয়ে যেও। লতু রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

মুখ ধোয়া শেষ ক'রে মহেশবাবু নেংচে নেংচে বারান্দায় এলেন; মুখে যন্ত্রণা ও বিরক্তি-সূচক ভাব। বারান্দায় একটা ঈজি-চেয়ারে ব'সে হুঙ্কার ছাড়লেন, চা নিয়ে আয়।

ওপাশের ঘর থেকে তিলু বেরুল। গরদের শাড়ি ছেড়ে ফেলে সাধারণ কালাপাড় শাড়ি ও শেমিজ পরেছে। সমরেশকে দেখে বললে, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাকাবাবুর কাছে ব'সগে না।

শুনতে পেয়ে মহেশবাবু ব'লে উঠলেন, কে?

তিলু বললে, ভোঁদু। আপনার সঙ্গে দেখা করবে কোথায়, এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সমরেশ মাথা চুলকতে চুলকতে তিলুর পাছু পাছু গেল। মহেশবাবু বললেন, ভোঁদা কবে এল?

তিলু বললে, কদিনই তো এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে সময় পায় নি। ব'লে মুখ টিপে হেসে সমরেশের দিকে তাকাল।

মহেশবাবু বললেন, কাজও নেই—সময়ও নেই। বেকারদের যা হয় আর কি!

তিলু রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল। সমরেশ মহেশবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মহেশবাবু সমরেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বাজে কাজ ছেড়ে একটা কাজকর্ম দেখ্ না।

সমরেশ মাথা চুলকে বললে, দেখব। দুদিন যাক।

মহেশবাবু মুখ ভেঙচে বললেন, দুদিন যাক! এই ক'রে ক'রে তো সারাজীবনটাই কাটিয়ে দিলি। ওদিকে বুড়ো মা রাতে মরছে, দিনে বাঁচছে। একটু মানুষের মত হয়ে যে তাকে নিশ্চিন্তে মরতে দিবি, সে দিকে হুঁশ-চিন্তে নেই।

রান্নাঘর থেকে তিলু ফোড়ন দিল, বনমানুষ কি মানুষ হয় কাকা! যার যেমন অদৃষ্ট।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মহেশবাবু। বললেন, ঠিক বলেছিস মা। বনমানুষ! যেমন গরিলার মত ষণ্ডামার্ক চেহারা, তেমনই এক-বগ্গা বুদ্ধি!

লতু চা আনল মহেশবাবুর জন্যে। চায়ের কাপ মহেশবাবুর সামনে নামিয়ে দিয়ে সমরেশকে বললে, আপনারও আনছি এখনই।

মহেশবাবু এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, কার? সমরেশের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বললেন, তোর জন্যে? চা খাওয়া কেন? ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরাবি বুঝি? চা শরীরের পক্ষে বিষ। পি. সি. রায় বার বার মানা ক'রে গেছেন চা খেতে। কখনও খাস না।—ব'লে আবার চায়ে চুমুক দিলেন।

সমরেশ বললে, না, খাব না।

মুখে তুলে পরম সন্তোষের সঙ্গে মহেশবাবু বললেন, খাস না। দেশে জন্মালে কি হয়, ও বিলিতী জিনিস। ওই খাইয়ে খাইয়ে সারা জাতটার দফা নিকেশ ক'রে দিলে বেটারা। এক এক ঢোক চা গেলা, আর বাঁধন দড়ির এক এক গাঁট বাঁধন পড়া। এ বাঁধন কাটা বড় শক্ত।—ব'লে এক চুমুকে বাকি চাটুকু শেষ ক'রে হাঁকলেন, আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।

লতিকা দুই হাতে দু কাপ চা নিয়ে হাজির হ'ল। মহেশবাবু নিজের কাপটি নিয়ে বললেন, ওটা কার জন্যে? ভোঁদার বুঝি? ও তো চা খাবে না বলেছে। আমাকেই দিয়ে যা।

সমরেশ বললে, তাই দাও। আমি আর খাব না।

তিলু এল। বললে, তোমার আশের চা খেয়ে কাকাবাবুর আবার পেট-বেদনা করবে। তুমিই খেয়ে নাও।

সমরেশ বললে, তা কি হয়! এইমাত্র কাকাবাবুর সামনে প্রতিজ্ঞা করলাম।

তিলু ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, তোমার প্রতিজ্ঞার দাম তো কত! ব'লে আবার রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

লতু বললে, কি করব বলুন? না খান তো দাদুকে দিয়ে দি।

মহেশবাবু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কাপ প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন। বললেন, কবার বলবে? আমাকেই দে।

লতু চায়ের কাপ মহেশবাবুর সামনে নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। মহেশবাবু সমরেশকে বললেন, কালেক্টরিতে একটা কাজ খালি আছে। চল্লিশ টাকা মাইনে। তা ছাড়া রেশন। ঐটার জন্যে চেষ্টা কর্। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গিন্নীর সঙ্গে আলাপ আছে তিলুর। ওদের স্বামীজীর শিষ্যা। ওকে ভাল ক'রে ধর্ গিয়ে। ও যদি একটু ব'লে-ক'য়ে দেয় তো হয়ে যেতে পারে।

তাই ব'লে দেখি।—ব'লে সমরেশ রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরের বারান্দায় একলাটি ব'সে তিলু তরকারি কুটছিল। সমরেশ বললে, শুনছ? কাকাবাবু তোমাকে ভাল ক'রে ধরতে বললেন।

তিলু ভ্রূ কুঁচকে বললে, কি বললেন?

সমরেশ বললে, বললাম যে—

তিলু মুখ লাল ক'রে বললে, জীবনে তো কিছুই শিখলে না। অন্তত ভদ্রতাটুকু শেখ।

তোমার কাছেই শিখব ভাবছি। ভদ্র-শিরোমণি তুমি।

তিলু ঝাঁঝাল স্বরে বললে, বিরক্ত ক'রো না। আমার কাজ আছে। বাড়ি যাও।

তাড়িয়ে দিচ্ছ নাকি? আমি নিজে আসি নি। ডেকে এনেছিলে আমাকে।

তিলু জবাব না দিয়ে তরকারি কুটতে লাগল। লতু এসে বললে, ভোঁদুমামার চা দাদু নিয়ে নিলেন।

ভারী গলায় তিলু বললে, ভালই তো করলেন। খাবে না যখন, মিছেমিছি নষ্ট হয় কেন!

লতু বললে, দাদু বেশ! এদিকে মুখে বলছেন—চা খেও না, আর নিজে তিন কাপ চালিয়ে দিলেন।

সমরেশ বললে, তোমার দাদু মহৎ ব্যক্তি। মহৎ ব্যক্তিদের ওই লক্ষণ। তোমার মাসীটিরও মহত্ত্ব কম নয়। তোমাদের বাড়িটার নাম 'মহৎ আশ্রম' রাখা উচিত।

লতু তিলুর দিকে এক চোখ তাকিয়ে মুচকি হাসল।

তিলু রোষ-রূঢ় স্বরে বললে, আমরা কেউ মহৎ নয়। অত্যন্ত ছোট আমরা। সেটা আমরা জনি। বেঁকিয়ে কথা ব'লে আমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে না। কাকাবাবুকে তুমি শ্রদ্ধা না করতে পার; কিন্তু তিনি আমার শ্রদ্ধেয়। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপ দয়া ক'রে আমার কাছে ক'রো না।

সমরেশ বললে, ওরে বাবা! তুমি যে মার-মূর্তি হয়ে উঠলে দেখি! চায়ের লোভে এসে ভাল করি নি। চার বদলে মার না জোটে শেষে!

লতু সহানুভূতির স্বরে বললে, ক'রে দেব এক কাপ চা? তিলুকে বললে, মাসী, একটু চিনি বের ক'রে দাও দেখি। ফুরিয়ে গেছে চিনি।

তিলু বললে, যা চিনি ছিল বের ক'রে দিয়েছি। রেশনের চিনি না পাওয়া পর্যন্ত চিনি বাড়ন্ত।

সমরেশ বললে, থাক্ থাক্। বাড়িতে গিয়েই খাব এখন। চিনি থাকলেও করতে নিষেধ করতাম। চায়ের সম্বন্ধে কাকাবাবুর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। করবামাত্র টের পাবেন আর সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করবেন। আচ্ছা, চলি তা হ'লে।

যেতে উদ্যত হয়েই থামল সমরেশ। তিলুকে বললে, কিছু মনে ক'রো না তিলু। তোমাকে অপমান করবার জন্যে কিছু বলি নি। প্রথমে যেটা বলেছিলাম, সেটা নেহাৎ রসিকতা। তোমাকে বন্ধু ব'লেই মনে করি। সেই জন্যে কথাবার্তায় মাত্রা রাখা আবশ্যক মনে করি নে। যাই হোক, এর পর থেকে সাবধান হয়ে চলব। আজকের মত মাপ কর।

লতু বিস্ময়-ভরা চোখে চেয়ে রইল। তিলু কোন জবাব দিল না। সমরেশ চ'লে এল।

বারান্দায় মহেশবাবু ব'সে ছিলেন তখনও। সমরেশকে বললেন, বললি ?

সমরেশ বললে, হ্যাঁ, বললাম।

মহেশবাবু বললেন, ও একবার বললেই হয়ে যাবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতেই চাকরি। তুই তা হ'লে টো-টো ক'রে এখানে সেখানে না ঘুরে, হাতের লেখাটা ঠিক ক'রে রাখ্‌গে। তোর যা হাতের লেখা,—ইংরেজী, না, উর্দু, বোঝা যায় না।

তাই করি গিয়ে।—ব'লে চ'লে এল সমরেশ।

৭

প্রতুলের বাড়িতে হাজির হ'ল সমরেশ। প্রতুল বসবার ঘরে ব'সে দাড়ি কামাচ্ছিল। টেবিলের উপর আয়নাটি কাত ক'রে রাখা; পাশে চায়ের কাপে জল, বুরুশ, সাবান ইত্যাদি। আয়নার দিকে দৃষ্টি একাগ্র ক'রে, অতি মনোযোগের সঙ্গে, সেফ্‌টি ক্ষুরের টান দিয়ে দিয়ে গালের দাড়ি নির্মূল করছিল। জুতোর শব্দে দাড়ি কামানো বন্ধ ক'রে দরজার দিকে তাকাল। সমরেশকে দেখে বললে, এস হে, ব'স। সমরেশ একটা চেয়ারে ব'সে বললে, সকালেই দাড়ি চাঁচতে ব'সে গেছ যে! কোথাও যাবে নাকি ?

প্রতুল জবাব দিলে, বলছি, ব'স। ব'লে ক্ষৌরকর্মে প্রবৃত্ত হ'ল।

দাড়ি কামানো শেষ ক'রে, মুখ ধুয়ে, কামাবার সাজ-সরঞ্জাম যথাস্থানে রেখে, একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে প্রতুল বললে, একবার শহরের বাইরে যেতে হবে।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ?

প্রতুল বললে, বাসুদেবপুর। সমরেশ জিজ্ঞাসু মুখে চেয়ে রইল। প্রতুল বলতে লাগল, ওখানে আমাদের একটি কর্ম-কেন্দ্র আছে। এখান থেকে বেশি দূর নয়, মাইল দশ-বারো মাত্র।

সমরেশ বললে, ফিরবে কখন ?

দু-তিন দিন পরে। যাবে নাকি ? চল না দেখে আসবে। ওখানে

আমাদের বেশ কাজ হচ্ছে। যারা কাজ করছে, বেশ ভাল কর্মী। ওদের সঙ্গে আলাপ ক'রে আনন্দ পাবে।

সমরেশ চুপ ক'রে রইল।

প্রতুল বললে, চল না। কাজকর্ম তো কিছু নেই। যাও তো একটা সাইকেলের যোগাড় করি।

সমরেশ বললে, আপত্তি নেই। কিন্তু মাকে একটা খবর দেওয়া দরকার।

তার ব্যবস্থা করা যাবে।

শৈলী ঘরে ঢুকল। এখনও স্নান ও প্রসাধন সারা হয় নি। কপালের উপর কুঁচো চুল এসে পড়েছে, পিঠের উপরে বেণী লুটছে; মুখে রুক্ষতা; পরিধেয়ে পারিপাট্যের অভাব।

শৈলী বললে, তুমি কি নেয়ে খেয়ে যাবে?

প্রতুল বললে, নিশ্চয়, না খাইয়ে বিদায় করতে চাস নাকি? তারপর সারাদিন হরি-মটর!

শৈলী বললে, সেখানে পৌঁছলে খাবার ভাবনা কি? মাসীমা আছেন। রাতদুপুরে গেলেও পঞ্চ-ব্যঞ্জন খাবারের ব্যবস্থা করেন।

তা করুন। তুই আলুভাতে ভাতের ব্যবস্থা ক'রে দে দেখি। সেখানে গিয়েই খাওয়া-দাওয়ার জন্যে তাদের ব্যস্ত না করাই ভাল। তা ছাড়া আমি একা নয় তো, সমরেশও যাচ্ছে।

বিস্ময়-সূচক ভ্রূভঙ্গী ক'রে শৈলী বললে, তাই নাকি! কিন্তু মিস মুখার্জির মত হবে?

প্রতুল হেসে বললে, কি হে, তিলুর মত চাইতে হবে নাকি?

শৈলী বললে, বাঃ রে! চাইতে হবে না! মিস মুখার্জি ওঁদের গার্জেন। ওঁর মত ছাড়া ওঁদের এক পা চলবার উপায় নেই।

সমরেশ বললে, কে তোমাকে এ সব খবর দিলে?

শৈলী বললে, আমি নিজে দেখে এসেছি যে! মিস মুখার্জিদের বাড়ির কাছেই তো আপনাদের বাড়ি? আমি গিয়েছিলাম একদিন আমাদের সমিতির জন্যে চাঁদা চাইতে। আপনার মাকে সব বুঝিয়ে বলতেই উনি দিতে রাজী হলেন। কিন্তু মিস মুখার্জি এসে মানা করতেই পিছিয়ে গেলেন।

সমরেশ বললে, মা বুড়ো মানুষ; নিজের মতামত কিছুই নেই। তিলুকে স্নেহ করেন। তিলুও ওঁকে খুব ভালবাসে, সেবা-যত্ন করে। তাই তিলুর ওপরই সব বিষয়ে নির্ভর করেন।

শৈলী ভ্রূ কুঁচকে বললে, আর আপনি?

সমরেশ প্রতুলের দিকে চেয়ে হেসে বললে, জীবনে অনেক কিছু তো করলাম; তিলুর মত নিয়েই সব করেছি নাকি হে?

প্রতুল বললে, তা হ'লে যাওয়াই স্থির তো? এখানেই নেয়ে খেয়ে নাও। শৈলীকে বললে, হ্যাঁ রে! আর একটা সাইকেলের কি করা যায় বল্ দেখি? যোগাড় করতে পারবি?

শৈলী আবদারের সুরে বললে, বাঃ রে! আমি কোথায় সাইকেল যোগাড় করব?

তপনের তো সাইকেল আছে। ঝিয়ের হাতে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দে—যেন সাইকেলটা এখনই কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

এক মুহূর্তে মেঘ নামল শৈলীর মুখে। ঝঙ্কার দিয়ে বললে, আমি পারব না দাদা, লিখতে হয় তুমি লেখ। আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, লেখবার দরকার হবে না। তপনবাবু সাইকেল চ'ড়ে পার হয়ে গেলেন।

ব্যস্ত হয়ে প্রতুল বললে, তাই নাকি? ছুটে বেরিয়ে গিয়ে হাঁক দিলে, তপন! তপন!

কিছুক্ষণ পরে তপন ফিরল। সাইকেল থেকে নেমে বললে, কি ব্যাপার?

প্রতুল বললে, কোথায় যাচ্ছ?

তপন বললে, মহেশবাবুর বাড়ি যাচ্ছি।

সমরেশও প্রতুলের পিছু পিছু বার হয়ে এসেছিল। শৈলী এসে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সামনে।

সমরেশকে দেখে তপন বললে, সকালেই এ পাড়ায় এসেছেন? সমরেশ জবাব দিল না। শৈলী এক দৃষ্টে তপনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তপনের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রতুলকে

বললে, গাড়ির ব্যবস্থা তুমিই কর দাদা, আমি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিগে।—ব'লে চ'লে গেল।

প্রতুল বললে, একটা দরকার আছে তোমার সঙ্গে। তোমার গাড়িটা একবার দিতে পারবে?

তপন বললে, আপনারটা কি হ'ল?

প্রতুল বললে, আমারটা ঠিকই আছে। আর একটা দরকার সমরেশের জন্যে। দুজনে বাসুদেবপুর যাচ্ছি। সুকুমার যেতে লিখেছে।

তপন মুচকি হেসে বললে, সমরেশবাবু দলে ঢুকছেন নাকি?

সমরেশ বললে, দলে ঢোকা আবার কি? প্রতুল বলছে যেতে। হাতে কাজকর্ম নেই। একবার বেড়িয়ে আসতে দোষ কি!

তপন বললে, দোষ আবার কি। দলে ঢুকলেও বা দোষ কিসের? এক রাস্তাতেই চলতে হবে তার মানে নেই। মত ও পথ দুইই তো বদলায়।

সমরেশ মৃদু হেসে বললে, পথ যে বদলায়, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের পাড়ায় তো কোন দিন যেতেন না, অথচ সকালেই ছুটেছেন।

তপন হেসে বললে, দায়ে প'ড়ে ছুটতে হচ্ছে। মহেশবাবুর তাগিদ। ওঁর জামাই যুদ্ধ-বিভাগে চাকরি করেন। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে বাস করবেন। একটা জায়গা কিনতে চান। সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করতে ডেকেছেন মহেশবাবু।

সমরেশ বললে, মক্কেলরাই উকিলের বাড়ি ছোটে—জানতাম এতদিন। দায়ে প'ড়ে উকিলকেও মক্কেলের বাড়ি ছুটতে হয় দেখছি।

জবাবে তপন কি বলতে যাচ্ছিল। প্রতুল বাধা দিয়ে বললে, তোমাদের তর্ক থাক্। সাইকেলটা দিতে পারবে?

তপন গম্ভীর মুখে বললে, কি ক'রে দেব? আমাকে এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে।

শৈলী ঘরের ভিতর থেকে ব'লে উঠল, তপনবাবুকে যেতে দাও

দাদা। দেরি হয়ে যাচ্ছে ওঁর। আমি হিমাংশুবাবুর সাইকেল আনিয়ে দিচ্ছি।

বলতে বলতে শৈলী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তপন একবার তার দিকে তাকাল। দুজনে চোখাচোখি হ'ল। শৈলী এবার চোখ ফিরাল না। তপন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, বেশ। তবে আর কি? আমি চললাম।—ব'লে সাইকেলে উঠে চ'লে গেল।

৮

সেদিন সন্ধ্যার পর তিলু ও লতু সমরেশদের বাড়িতে এল। আশ্রমে স্বামী জ্ঞানানন্দ 'হিন্দু-নারীর কর্তব্য' সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। সমরেশের মাকে নিয়ে তারা আশ্রমে যাবে। সমরেশের মাকে পূর্বেই খবর পাঠিয়েছিল। তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিলুরা আসতেই বললেন, তোমরা একটু ব'স মা। আমি কাপড়টা ছেড়ে নিই।

তিলু বললে, আপনার কাজ-কর্ম সারা হয়ে গেছে তো?

বৃদ্ধা বললেন, আজ আর কাজ-কর্ম কি? ভোঁদু তো বাড়িতে নেই। কোথায় বেড়াতে গেছে। রান্না-বান্না আজ আর করি নি।

লতু বললে, ভোঁদুমামা কোথায় বেড়াতে গেছেন?

তা তো জানি নে দিদি। সকালে চা না খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। চা-খাবার নিয়ে এই আসে এই আসে ভেবে ব'সে আছি, এলো দুপুরবেলায়—কোথায় নাওয়া-খাওয়া একেবারে সেরে। এক মিনিট দাঁড়াল না। যাবার কথা ব'লে দিয়েই চ'লে গেল। কি যে ওর মতি-গতি হয়েছে দিদি! কিছু বুঝি না। এতবড় ছেলে, একটু মায়া-দয়া নেই। হুজুগ পেলে সব ভুলে যায়। ওর জন্যে আমার ম'রেও সোয়াস্তি হবে না।

তিলু বললে, যে সংসর্গে পড়েছে, যা বাকি ছিল, তাও খোয়া যাবে।

বৃদ্ধা সভয়ে ব'লে উঠলেন, কেন মা? কার সঙ্গে মিশছে ও?

তিলু বললে, প্রতুলের সঙ্গে, যার খেড়ে বোনটা টো-টো ক'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

ওমা, তাই নাকি! ও ছেলেটাও তো শুনেছি—

বাউরী-মেথরদের নিয়ে কারবার। শহরের মত বেয়াড়া মেয়েদের সঙ্গে ভাব। বামুনের ছেলে হয়ে পৈতে ফেলে দিয়েছে। মুসলমানের ঘরে মুরগি খেতেও ওর আপত্তি নেই, এমন কি গরু—

রাম! রাম! তার সঙ্গে মিশেছে? হ্যাঁ মা, তুমি জেনেও বারণ কর নি?

আমি কি করব? আপনার কথাই শোনে না, আমার কথা শুনবে? আজ সকালে আমাদের ওখানে গিয়েছিল। কাকাবাবু চা খেতে বারণ করলেন তো পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়ে এল।

বৃদ্ধা গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বললেন, তাই নাকি! গুরুজনকে অপমান? চা খেতে তো আমিও মানা করি। ঠাকুরপোকে যদি অপমান করতে পারে, তা হ'লে আমাকে তো মেরে বসবে মা।

তিলু বললে, তা বিশ্বাস নেই। যা হচ্ছে দিন দিন।

প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করুণ কণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন, মনে মনে যা ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, তা তো হ'ল না। কি করব বল? আমার অদেষ্ট!

লতু বললে, কি ঠিক করেছিলেন দিদিমা?

বৃদ্ধা বললেন, তা আর মুখে ব'লে কি হবে দিদি! সে আমি জানি আর ভগবান জানেন। আর কারও জেনে কাজ নেই। ব'লে অভিমান-ভরা দৃষ্টিতে তিলুর দিকে তাকালেন।

তিলু মুখ ফিরিয়ে নিলে।

লতু বললে, দাদু আজ ভোঁদুমামাকে কি একটা চাকরির কথা বলছিলেন। সরকারী চাকরি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে। মাসীর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নীর খুব খাতির। মাসী একটু বললেই হয়ে যাবে।

বৃদ্ধা সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, ও আর ব'লে লাভ কি দিদি! কে কার কথা শুনে? আমার তো মরণ হবে না কিছুতে! কতদিন অদেষ্টে দগ্ধানো আছে কে জানে? ব'লে চ'লে গেলেন।

রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর ও শোবারঘরে তালা এঁটে ও বুড়ী ঝি নফরের মাকে বাইরের দরজা বন্ধ করতে আদেশ ও একটু সজাগ

থাকতে উপদেশ দিয়ে সমরেশের মা তিলু ও লতুর সঙ্গে আশ্রমের উদ্দেশ্যে বার হলেন। রাস্তায় আরও দু-চারজন মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। সকলেই আশ্রমের যাত্রী।

মাইল খানেক দূরে আশ্রম। দু-তিন বিঘা জায়গা ; চারিদিকে কাঁটা গাছের বুক পর্যন্ত উঁচু বেড়া। সামনে কাঠের গেট। গেট পার হ'লেই অপ্রশস্ত রাস্তা। দু পাশে ফুলের বাগান। নানা ফুলের মিশ্রিত সুরভিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। কতকটা এগিয়ে গেলেই একটি ছোট একতলা বাড়ি। সামনে বারান্দা। বারান্দার পরেই পাশাপাশি তিনটি কুঠরি। পাশের দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মাঝেরটি বেশ বড়। এই বাড়িটা জ্ঞানানন্দের শিষ্যেরা তাঁর জন্যে নির্মাণ করিয়েছেন। স্বামীজী এখানে এলে এই বাড়িতেই থাকেন। ডান দিকের কুঠরিতে শয়ন করেন, বাম দিকেরটিতে পড়াশুনা ও ধ্যান-ধারণা করেন, মাঝেরটিতে বসেন এবং শিষ্য ও শিষ্যাদের উপদেশ দান করেন। আজও মাঝের ঘরটিতে সভার আয়োজন করা হয়েছে। ঘরের মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা হয়েছে। এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি ছোট চৌকি, তার উপরে কার্পেটের পুরু আসন পাতা। এর উপরে স্বামীজী বসবেন। সামনে ও দুপাশে বসবেন শিষ্যারা।

বাড়িটির সামনেই রাস্তাটি থেকে একটি শাখা বেরিয়ে চ'লে গেছে ডান দিকে। এই রাস্তাটা ধ'রে কতকটা গেলেই ডান দিকে মা-কালীর মন্দির। শ্বেত পাথরে তৈরি। এর নির্মাণে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। খরচ বহন করেছেন স্বামীজীর শিষ্যরা। স্বামীজীর শিষ্য ও শিষ্যাবর্গের সংখ্যা বিস্তর। শিষ্যদের অনেকে ধনী, সমাজে প্রতিষ্ঠাশালী ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বাংলা দেশের ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের বাসস্থান ও কর্মস্থান। এখানে ছাড়া কাশীতে এবং বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আশ্রম স্থাপিত হয়েছে। শিষ্যবর্গের অর্থে ও স্বামীজীর নির্দেশে সবগুলিই পরিচালিত হয়। গৃহী শিষ্য ও শিষ্যা ছাড়া স্বামীজীর অনেকগুলি সংসারত্যাগী শিষ্য ও শিষ্যা আছেন। বিভিন্ন আশ্রমে তাঁরা বাস করেন। আশ্রমগুলির পরিচালনার ভারও তাঁদের উপরে ন্যস্ত। স্বামীজী সাধারণত কাশীর আশ্রমে বাস

করেন। প্রয়োজনমত বিভিন্ন আশ্রমে এসে শিষ্যদের উপদেশ ও উৎসাহ দেন।

এই রাস্তাটি ধ'রে কতকটা গেলেই ছোট বড় অনেকগুলি ঘর। মাটির দেওয়াল, খড়ে ছাওয়া। এই ঘরগুলিতে থাকে স্বামীজীর দু-চার জন শিষ্য শিষ্যা ও আশ্রমের আশ্রিত ছেলে-মেয়েরা।

মন্দিরে আরতি হচ্ছে। সামনে সুপরিচ্ছন্ন অঙ্গনে অনেকগুলি ছোট ছেলে-মেয়ে ও মহিলা জড়ো হয়েছেন। মন্দিরের উঁচু চত্বরে স্বামীজী ও শিষ্য-শিষ্যারা করজোড়ে দেবীমূর্তির দিকে একাগ্রদৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই গৈরিক-বসনধারী। স্বামীজী ও শিষ্যরা সকলেই মুণ্ডিতমস্তক। স্বামীজীর বয়স ষাটের কাছাকাছি। নাতি-দীর্ঘ মেদবহুল দেহ ; রঙ ফরসা। গাল দুটি ঝুলে পড়েছে। চিবুকের নীচে থাক জমেছে। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

তিলুরা মন্দিরের সামনে আসতেই পরিচিতা মহিলারা তাকে সম্ভাষণ করলেন। পরিচিতাদের মধ্যে রয়েছেন—তপনের মা, তপনের কাকা রায়বাহাদুর রাঘবচন্দ্রের স্ত্রী ও মেয়েরা, এবং আরও কয়েকটি মেয়ে। রায়বাহাদুর স্বামীজীর স্থানীয় প্রধান শিষ্যদের অন্যতম। বেশ মোটা অঙ্কের প্রণামী দেন মাসে মাসে। তাঁর বাড়ির সকলেই আশ্রমের সকল ব্যাপারেই পুরোভাগে স্থান পেয়ে থাকেন। শহরের শিষ্যাদের মধ্যে তিলুরও প্রতিষ্ঠা আছে। আশ্রমের নারী-কল্যাণ-কর্মে সে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে। স্বামীজীরও সে বিশেষ স্নেহের পাত্রী।

আরতি শেষ হবার পর সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। তারপর স্বামীজী সকলকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তিলু প্রণাম করতেই স্বামীজী তার পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহ জ্ঞাপন করলেন। লতু প্রণাম করতেই স্বামীজী বললেন, এ মেয়েটি ?

তিলু বললে, আমার দিদির মেয়ে।

স্বামীজী বললেন, বুঝেছি। গুণেনবাবুর মেয়ে। ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে মধুপুরে। আসেন নি ?

তিলু বললে, না। আসবেন শিগগির।

একজন প্রৌঢ়া মহিলার দিকে তাকিয়ে স্বামীজী বললেন, তোমার ছেলে তো আমার সঙ্গে দেখা করল না মা!

মহিলা সখেদে বললেন, বড় বেয়াড়া হয়েছে বাবা! পড়াশোনায় মন নেই। ঘরে একদণ্ড থাকতে চায় না। সারাদিন বাইরে হৈ-হৈ ক'রে বেড়ায়।

অন্যান্য মহিলারাও সহানুভূতি জানিয়ে বললে, ছেলে-পিলেদের নিয়ে বড় মুশকিল হয়েছে বাবা।

স্বামীজী বললেন, এই বয়সটাই খারাপ কিনা। মন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায়। এই মনকে একত্র ক'রে একটি বিশেষ আদর্শের দিকে একাগ্র ক'রে দিতে না পারলে জীবনে সাফল্য আসে না। এটা হচ্ছে শিক্ষকদের কাজ। কিন্তু আজকালকার শিক্ষকরা বিদ্যা দান ক'রেই খালাস। বিত্তমুখী বিদ্যা। ছাত্রদের সামনে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করবার শিক্ষা বা সামর্থ্য তাঁদের নেই। দেশের যুবকদের চরিত্র তাই হয়ে উঠেছে বড় শিথিল। বহু পথ ও বহু মতের মাঝখানে প'ড়ে তারা বিভ্রান্ত। ধর্মের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। এ অবস্থায় দক্ষ নাবিক যদি তাদের গতি নিয়ন্ত্রিত না করে, তা হ'লে বান-চাল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দেশে সচেতন দক্ষ নাবিকের বড় অভাব। স্বয়ং-সিদ্ধ, স্বার্থকামী, বিদেশী-ভাবাপন্ন, ধর্মদ্বেষী নেতাদের প্রাদুর্ভাব বড় বেশি। তারা ছেলেদের মনে ভ্রান্ত মত সঞ্চারিত ক'রে তাদের ভ্রান্ত পথে চালনা করছে। ফলে স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা ব'লে ভুল করছে তারা।

শিষ্যারা স্বামীজীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উপদেশামৃত পান করছে। চোখে মুখে শ্রদ্ধান্বিত ভাব। অদূরে জনৈক শিষ্য ছেলে-মেয়েদের প্রসাদ বিতরণ করছে। ছেলে-মেয়েরা কোলাহলসহকারে প্রসাদ চাইছে ও খাচ্ছে।

একজন শিষ্য এসে স্বামীজীকে বললে, চলুন তা হ'লে।

সকলে সভা-কক্ষের দিকে চলল। স্বামীজীর পাশে পাশে চলল তিনু। নতুর অন্য কারও সঙ্গে পরিচয় না থাকায় তিনুর সঙ্গেই এঁটে রইল। প্রতুলের মা অন্যান্য বৃদ্ধাদের সঙ্গে চললেন।

স্বামীজী তিলুকে বললেন, তুমি কিছু বলবে মা?

তিলু মৃদুকণ্ঠে বলিল, কি বলব?

স্বামীজী বললেন, তুমি তো মেয়েদের শিক্ষাদান করছ। লক্ষ্য করেছ বোধ হয়, যথেচ্ছচারিতার ভাব শুধু স্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যেই নয়, মেয়েদের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারা যার-তার সঙ্গে মেশে, যেখানে-সেখানে যায়, যা-তা করে। ফলে কত পরিবারে অনর্থ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে বাপ-মাদের, বিশেষ ক'রে মাদের, বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।—এই সম্বন্ধেই বলতে পার।

তিলু বললে, না বাবা, আমি পারব না। বলতে গেলেই আমার সব গুলিয়ে যায়। লজ্জাও করে।

স্বামীজী সাহস দিয়ে বললেন, লজ্জা কিসের? অবশ্য প্রথম প্রথম আড়ষ্ট ভাব একটা থাকে। বার কয়েক বললেই ওটা কেটে যায়।

সভা-ভঙ্গের পর তিলু, লতু ও সমরেশের মা অন্য মেয়েদের সঙ্গে বাইরে এল। গেটের সামনে রায়বাহাদুরের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পাশে দাঁড়িয়ে তপন সিগারেট টানছিল। সকলকে দেখে সিগারেট ফেলে দিয়ে তিলুদের কাছে এগিয়ে এল। তিলুকে বললে, সঙ্গে কেউ আসে নি? তিলু বললে, সঙ্গে আর কে আসবে? তপন বললে, সমরেশবাবু তো আজ সফরে গেছেন প্রতুলের সঙ্গে। তিলু গম্ভীর মুখে বললে, তাই তো শুনলাম। লতু তিলুর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। তপনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিলে।

সমরেশের মা, তপনের মা ও রায়বাহাদুর-গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তিলুও গেল সেখানে। রায়বাহাদুর-গৃহিণী তিলুকে বললেন, তোমরাও এস না গাড়িতে।

তিলু বললে, না, আমরা হেঁটেই যাচ্ছি।

রায়বাহাদুরের গাড়িটি বেশ বড়। কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা অনেক। কাজেই গৃহিণী আর পীড়াপীড়ি করলেন না। তপন মাকে বললে, তুমি গাড়িতে যাও, আমি এঁদের পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

রায়বাহাদুর-গৃহিণীরা চ'লে গেলেন। তপন চলল তিলুদের সঙ্গে। যেতে যেতে বললে, নতুন গাড়ি কিনছি শিগগির।

তিলু বললে, তাই নাকি ?

তপন বললে, ডজ্ গাড়ি—আপ-টু-ডেট্ মডেল।

লতু তিলুর পাশে যাচ্ছিল। চোখাচোখি হ'ল তপনের সঙ্গে।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

টুকরি

মনে যত খাঁটা পড়ে বয়সের দোষে,
কাব্য তত গুমরিয়ে মরে আপসোসে।
অবাধে যে কথা বলা চলিত যৌবনে
বাতিল হইল সবি যুক্তির ওজনে।
যাহাদের ল'য়ে স্বপ্ন বুনিয়াছিলাম,
লিখিয়া রেখেছি বটে তাহাদের নাম
খাতার পাতায়—মনে জাগে আজ দ্বিধা
বিবাহান্তে হয়তো হয়েছে অন্তবিধা।
সুতরাং চেপে যাওয়া আইন-সঙ্গত
এপক্ষে ওপক্ষে-জানো ফ্যাসাদ তো কত !
স্বতই নিঃশেষ কাব্য হিসাবের চাপে—
যে ফুলে গেঁথে'ছ মালা আজ তার ভাপে
সারাই বাতের ব্যথা, তাই আপসোস !
কাব্যের কমলবনে বিবেচনা-মোষ
ঢুকিয়া করেছে শুরু মহামাতামাতি—
চাঁদ জাগে নভে আমি জ্বেলে রাখি বাতি।

*   *   *

প্রেম নাই তাই হেমের প্রকাশ গায়ে,
মোটরে ওঠ রে, গৃহ ঠেকে কারাগার
বন্ধুত্বের প্রকাশ দু-কাপ চায়ে
নূতন যুগের বিধান চমৎকার !

স্মরণে

আর কিছু ছিল না ত, সম্মুখে দিশাহারা দুঃখের ছিল অমারাত্রি,
নির্ভীক দ্বিধাহীন যারা তবু একদিন দুর্গম পথে হ'ল যাত্রী,
প্রণমি তাদের আজ,—ধূলায় আঁকিল যারা আপন রুধিরে পদচিহ্ন,
আপন অস্থি দিয়ে বজ্র গড়িল যারা, আলোকে আঁধার করি' ছিন্ন।

প্রলয়ের দুর্দিন সহসা ছড়ায়ে পড়ে, বিদ্যুৎ-বাণ বাজে বক্ষে;
নিষ্ঠুর সত্যের আঘাতে স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেল তন্দ্রার চক্ষে;
আসিল পরম ক্ষণ, চরমের একায়ন, তরুণের জীবনের তন্ত্রে;
লক্ষ্যহারার হ'ল লক্ষ্য শঙ্কাহীন অমরণ মরণের মন্ত্রে।

বিশ্ববিজয়ী ছিল শাসন দুঃশাসন, ছিল রথচক্র নৃশংস,
তারি তলে পড়ি' কেহ নিপিষ্ট নিরুপায় পথের ধূলায় হ'ল ধ্বংস;
হাসিমুখে কারাগার, ফাঁসির মঞ্চ কেহ বরিল, ঝরিল দেহে রক্ত;
শক্তের উদ্যত আঘাতে চূর্ণ হ'ল উন্মদ স্বপ্ন অশক্ত।

তমসার তীরে তবু আদিত্য-বর্ণের দেখে তারা সত্যের সদ্ম;
রক্ত-সায়রে তাই অবশেষে একদিন ফোটে মুক্তির শ্বেতপদ্ম;
তারা জেনেছিল—নহে সীমাহীন পারাবার; বিদ্বেষ—তারো আছে অন্ত;
শঙ্কারো আছে শেষ, দুঃখেরো অবসান,—নিষ্ফল নহে বিষ-মন্থ।

শান্ত হয়েছে আজ সেদিনের বিভীষিকা, ক্ষান্ত হয়েছে রণতূর্য;
পূর্বগগনে তবু উদয়ের অনুরাগে জাগে কি আঁধারে নবসূর্য?
ধর্মচক্রতলে অধর্মে পুঞ্জিত লাঞ্ছনা দুঃখের গ্রন্থি,—
স্মরি তাই আঁখিজলে বিগত বীরের দলে, আজ যারা দূর-নভ-পন্থী।

বেদনা-সমিধ্ আর প্রাণের হব্য দিয়ে অগ্নি আবহনীয় ইদ্ধ
সেদিন করিল যারা, কোথা তারা?—হবে নাকি তাদের সাধনা আজো সিদ্ধ?

মুমূর্ষু তরে আনে তারা জীবনের বাণী, হবে কি তা মরণের বন্ধ
মুক্তির মরীচিকা-মাঝে? আহিতাগ্নিক কোথা তারা পুরোধা নমস্ত!

১৫ই আগস্ট ১৯৫০ শ্রীসুশীলকুমার দে

জমি-শিকড়-আকাশ

৯

পরের দিন সকালবেলাতেই প্রাণ-মাতানো শব্দ তুলিয়া বলেন্দুর গাড়ি আসিয়া প্রদীপের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল।

ঐ যে বলেনদার গাড়ি!—প্রদীপ বলিয়া উঠিল।

দীপিকা একবার কাঁপিয়া উঠিয়া শক্ত হইয়া গেল।

মচ্ মচ শব্দ—

দুরন্ত বৈশাখের মত প্রবেশ করিল বলেন্দু। প্রচণ্ড একটা উত্তাপ দীপিকার কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে—দীপিকা বোধ করিল।

এই যে প্রদীপ! চল, বেড়িয়ে আসবে।

কোথায়?—প্রদীপ তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল যেন।

ঘুমে। আমরা যাচ্ছি।

কে কে?

আমার মাসতুতো বোনেরা বেড়াতে এসেছে। ওদের নিয়ে যেতে হবে। অনীতা—অনীতাকে তুমি দেখেছ তো?

'হ্যাঁ' বলিতে প্রদীপের মুখখানা পুলকিত হইয়া উঠিল।

অনীতা এসেছে।—আবার বলিল বলেন্দু, সে যাবে। তোমাদের কথা বললে ওরা। দীপিকাকে নিয়ে চল না? আমাদের বাড়িটা খালিই প'ড়ে আছে। কোন অসুবিধে নেই।

প্রদীপ দমিয়া গেল অনেকখানি। দীপি? ও যাবে? ও তো—। কি রে, তুই যেতে পারবি?

মুহূর্তের জন্ম একটা নির্বাক শূন্যতা বিরাজ করিতে লাগিল।

বলেন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, কোন অসুবিধে হবে না। অনীতা রয়েছে। প্রদীপও যাচ্ছে— কি বল প্রদীপ?

প্রদীপের উপর অস্ত্রটা অব্যর্থ লাগিয়াছে—বলেন্দুর সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু প্রদীপ দীপিকার সম্বন্ধে ততটা ভরসা পাইতেছিল না। বলিল, হ্যাঁ। কি হবে? আমি থাকব, অনী—অনীতারা আছেন—

দীপিকা বলিল। কিছু না বলিলে প্রদীপ কথাটাকে একান্ত

করিয়া যে প্রশ্নের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে সেটা আরও স্পষ্ট হইয়া বিশ্রী হইয়া উঠিবে—এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল দীপিকা। বলিল, মা মত দেবেন না যে।

সে ভার আমার।—বলেন্দু একটা অবলম্বন পাইয়া ধরিয়া ফেলিল। —তিনি আপত্তি করবেন না। কি বল প্রদীপ?

প্রদীপ কিছু বলিতে পারিল না।

কবে?—দীপিকা এবার মৃদু প্রশ্ন করিল।

আজই।

আজই?—প্রদীপ এবার সভয়ে দীপিকার দিকে তাকাইল।—কিন্তু—

অনীতা বলছে, ওদের বেশি সময় নেই যে। নইলে তো আজ না গেলেও চলত।

প্রদীপ থামিয়া গেল।

না না। মা যেতে দেবেন না।—দীপিকা শিহরিয়া উঠিল মনে মনে।

সে ভার তো আমার।—বলেন্দু আরও শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল যেন।—মা যদি মত দেন তা হ'লে তোমার আপত্তি নেই তো?

দীপিকা চুপ করিয়া রহিল।

বলেন্দু শরবিদ্ধ পাখিটিকে ধরিয়া তুলিবার জন্য যেন উঠিয়া দীপিকার কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ একবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল দীপিকা।—না না। আজ তো হ'তেই পারে না। আজ কি ক'রে যাব?—বলিয়া করুণ দৃষ্টিতে প্রদীপের পানে তাকাইল।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে বলেন্দু আশ্বস্ত হইল।

প্রদীপও। সে বলিল, কদিনেই ঘুরে আসব তো। না কি বলেনদা? কদিন থাকবেন?

দিন সাতেক, আবার কি।—বলেন্দু বলিল।

তবে? আর না হয় তো আমরা আগেও চ'লে আসতে পারি। এত ক'রে বলছেন ওঁরা।—প্রদীপ বলিল।

দীপিকার মনের মধ্যেও এই ধরনের যুক্তি কে যেন ঠেলিয়া

তুলিতেছিল। মন নয়। মন জানে দীপিকা। মনের শিকড় যেখানে? মনের শিকড়—বীরেশ্বর একদিন বলিয়াছিল দীপিকার মনে পড়ে।

এই তো কয়টা দিন, শেষ বারের মত।—যুক্তি আসিতেছিল।—এদিককার শেষ দৃশ্য। বাইরের। ফিরে এসে যা বলব তার চেয়ে সত্যি আর কি আছে? তিনি বুঝবেন। নিশ্চয় বুঝবেন। আগুনে-পোড়া নির্মল জবাব পাবেন তখন—

তা হ'লে এই কথা রইল।—বলেন্দু তাগিদ দিল।—ঠিক আড়াইটের সময় তোমাদের তুলে নিয়ে যাব। চল প্রদীপ, মায়ের মতটা নিই।

না, না।—দীপিকা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আমরাই বলছি মাকে। যদি যাওয়া না হয় তবে খবর দেব।

হ্যাঁ, তাই ভাল।—প্রদীপ উঠিয়া বলিল, আপনি চ'লে যান বলেনদা। মাকে আমরাই ঠিক ক'রে নেব এখন। আমি বড় ভাই, আমি যখন সঙ্গে যাচ্ছি—

সেই তো।—বলেন্দু মুচকি হাসিয়া দীপিকার দিকে তাকাইল।—আমি চললাম তা হ'লে। অনেক কাজ প'ড়ে আছে এখনও।

বলেন্দু গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রদীপ একটা লাফ দিয়া উঠিল।—চল, মাকে বলিগে।

তুই তো অনীতার জন্যে লাফাচ্ছিস।—দীপিকা বলিল, আর যা হয় হোকগে।

কে বলে? দূর।—স্বর বদলাইয়া—তুই দেখিস নি তাকে? ভারি চমৎকার মেয়ে!

তা আর বুঝতে পাচ্ছি নে?

বাহির হইবার পূর্বে দীপিকা বলিল গোপনে, দাদা, শোন। মাকে বলতে হবে, আমি যেতে চাই নি। তুই জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছিস।

বুঝেছি।—প্রদীপও মৃদুস্বরে বলিল, তাই ভাল, চল্।

শান্তিলতা মত দিতে বাধ্য হইলেন। বরাবর যেমন হইতেছেন। মত দেওয়ার সম্পূর্ণ আগ্রহ সত্ত্বেও এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন, দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে কোনদিনই থাকে না।—কি করব? আমার কথা শোনে নাকি ওরা?—এই সুবিধাটা হাতে রাখেন।

সাজ্‌ সাজ্‌ রব তুলিল প্রদীপ। দীপিকা নীরবে কাঠের মত শক্ত দেহটা লইয়া ভূতে-পাওয়া রোগীর মত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

একটা চাপা ভয় ছিল দীপিকার। বীরেশ্বরকে ডাকিয়া আনার প্রস্তাবটার কথা প্রদীপ যদি উল্লেখ করিয়া বসে! বলিতেই হইবে—আমি যাব না। যাব না।

কিন্তু প্রদীপের বুদ্ধিমত্তায় কথাটা অনুল্লেখিতই থাকিয়া গেল। হঠাৎ যদি আসিয়া পড়েন! মনে হইতেই কাপড় ভাঁজ করিতে রত হাত দুইটা দীপিকার তৎক্ষণাৎ অচল হইয়া গেল।

আবার ভাঁজ করিতে লাগিল।

সকালবেলার রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বরের স্থিতপ্রজ্ঞ ভাব নষ্ট হইয়া আসিল। সাগরমলের টাকা পরিশোধের তারিখ আজ। বিলটা পাস হইয়াছে কি না খবরও নেওয়া হয় নাই। হিরণ মিত্রের সঙ্গে দেখা করিয়া সাগরমলের কাছে এক-আধ দিন সময় লইতে হইবে।

সুবোধ লাহিড়ীর পার্কার-ফিফটিওয়ান আর পাওয়া যায় নাই। হাসি পাইল বীরেশ্বরের।—অর্ডারটা হ'ল কি না কে জানে! হবে তো না-ই জানা কথা।

ভাগ্যক্রমে নিশিকান্তর শেয়ারগুলি আদায় করা গেছে। কুঞ্জবিহারীকে এখন আবার ধরা যায়, আগাম কিছু টাকা এখন পাওয়া যেতে পারে।—সারাদিন কাদায় আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকিবার অফুরন্ত সুযোগ। এ দিক দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একপ্রকার নিষ্ঠুর আনন্দ বোধ করিল বীরেশ্বর।

কিন্তু কাছাকাছি যাইয়া নোংরা স্থান মাড়াইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত পথিকের মত থামিয়া পিছাইয়া গেল মনে মনে। শরীরটা বিদ্রোহ করিল। অবশেষে নাক-মুখ বন্ধ করিয়া যেন কোন মতে একদমে প্রবেশ করিল সাগরমলের গদিতে।

সাগরমল গম্ভীর, বাঁকা সুরে অভ্যর্থনা করিল।—আছুন, আছুন। মনে কি পড়েছে নাকি বীরেশবাবু?

এসব কথাবার্তা বীরেশ্বরের রীতিমত আয়ত্ত হইয়াছে। এক গাল হাসিয়া বলিল, মনে পড়বে না মানে? শয়নে-স্বপনে জেগে-ঘুমিয়ে আপনার কথাই তো ধ্যান করি। ভোলবার কি উপায় আছে নাকি?

সে তো নেবার সময়।—সাগরমলও বুঝে সব।—দেবার সময় আবার ভুলতে দোষ কি?

ভুললে আর আসব কেন বলুন?—বীরেশ্বর আগের সুরের জের টানিতে অক্ষম হইয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল।

এখন তো আপনার দয়া।—সাগরমল ছাড়িতে চাহিল না।

বলতে পারেন আপনি সবই। আপনি পাওনাদার।—বীরেশ্বর শরীরের মোচড়টা সামলাইয়া বলিল, কিন্তু তারিখটাও তো পেরোয় নি এখনও? আজকের দিনটা তো আছে?

আজ দেবেন তা হ'লে?—সাগরমল হাসিয়া বলিল, তাই বলুন। আর, তারিখের কথা বললেন?—লোহার আলমারিটা খুলিয়া একখানা চেক বাহির করিয়া বীরেশ্বরের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। বীরেশ্বরের সই-করা চেক।

আর একবার হাসিয়া বলিল, দেখলেন? কদিন হ'ল আজ?

বীরেশ্বর লজ্জিত হইল। বলিল, পরশু দিন দেবার কথা ছিল। আমারই ভুল হয়েছে।

চেকখানা টানিয়া সরাইয়া লইল সাগরমল। রাখিয়া দিয়া হাস্য করিয়া বলিল, ভুল একটু হয় বাঙ্গালী-বাবুদের। মাছ আর সিগরেট কিনতে কিনতে ভুল হয়ে যায়।

বীরেশ্বর দ্বিতীয় মোড় সামলাইতে একটু সময় লইল।

নিন, বার করুন দেখি। পকেটে বেশিক্ষণ রাখলে আর কি লাভ হবে?

ও, না না। আজ আনতে পারি নি। বিলটা পাই নি কিনা। আর দুদিন সময় দিন সাগরমলবাবু।

আরে, সে কি আমি বুঝি নি বাবু?—সাগরমল হাসিতে হাসিতেই বলিল, কথারই যদি ঠিক থাকল, তবে আর বাবু কিসে?

সাগরমলের গালে একটা চড় বসাইয়া দিল বীরেশ্বর মনে মনে।

কিন্তু, না। চটিলে চলিবে না। ঠেকিলে আবার উহার কাছেই আসিতে হইবে। আর ঠেকিতে তো হইবেই।

দুই দিনের সময় লইয়া বীরেশ্বর উঠিয়া আসিল। বমি বমি ভাব করিতে লাগিল শরীরে। সভয়ে স্মরণ করিল, মাত্র সাগরমল শেষ হইল। আরও অনেক বাকি আছে।

পার্কার-ফিফটিওয়ান পাওয়া গেল আজ। সুবোধ লাহিড়ী খুশি হইয়া গেল।—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বীরেশবাবু। অর্ডার যদি হয় তো আপনারই হবে।

হিরণ মিত্রের কাছে যাইতে হইল না। বিলটা পাস হইয়া গিয়াছে। শুধু সই করিয়া টাকা লইতে হইবে।

বীরেশ্বরের মনের গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গেল। পৃথিবীটা তত খারাপ নয়। ভালও আছে। আনন্দে চোখে যেন জল আসিয়া পড়িল বীরেশ্বরের।

সাগরমল! আঃ—

সাগরমলের টাকা সুদে-আসলে শোধ করিয়াও বেশ কিছু টাকা হাতে থাকে বীরেশ্বর হিসাব করিয়া দেখিল।

কাশ্মীর! আগে কাশ্মীর যেতে হবে। আর কিছু বই।

চেক ব্যাঙ্কে জমা দিয়া টাকা তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাগরমলের গদিতে উপস্থিত হইল আবার। বলিল, দেখি আমার চেকখানা বার করুন তো। নগদ টাকাই নিয়ে এলাম।

সাগরমল সন্তুষ্ট হইল না। টাকাটা কয়দিন আবার হয়তো ঘরে বসিয়া থাকিবে। বলিল, রাগ করেছেন নাকি বীরেশ্বরবাবু?

না, রাগ করবার কি আছে! আমার দরকারের সময় আপনি তো আমার উপকারই করেছেন। তবে, একটা কথা মনে রাখবেন। কথা রক্ষা করবার জন্যে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি। সবাই এক রকম নয়।

তা বটেই তো, বটেই তো।

বাহির হইয়াই বীরেশ্বরের অনুতাপ হইল, অত্যন্ত বোকা উক্তি করা হইয়াছে ভাবিয়া।

এই সব হাঙ্গামা শেষ করিয়া বাড়ি ফিরতে বীরেশ্বরের প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। বাজুক। বীরেশ্বরের আজ কোন ক্লান্তি নাই।

সুনয়না খানিকক্ষণ বকিয়া লইয়া খাইতে দিলেন।

বউদি!—বীরেশ্বর খাইতে বসিয়া বলিল, আমি মাস তিনেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। দাদাকে ব'লো।

কবে?

কালকেই।

কি হ'ল আবার?—সুনন্দা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন।

বেড়াতে যাব।

তুমি তিন মাস ধ'রে বেড়াবে, আর তোমার বিয়ে কি আমি করব?

কার বিয়ে?—প্রশ্ন করিয়াই বীরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।—বিয়ে-টিয়ে আমি করব না বউদি। ঘুরে এসে যা হয় দেখা যাবে।

বেশ কথা! ওসব হবে না ঠাকুরপো। বিয়ে ক'রে তারপর যেখানে খুশি বেড়াতে যাও তুমি।

বীরেশ্বর নীরবে হাসিল একটু।

সুনয়না রাগ করিয়া বলিলেন, তবে তুমি বললে কেন? তোমার কথায়ই তো উনি খোঁজ-খবর করছেন।

মানা ক'রে দিও।—বীরেশ্বর সভয়ে বলিল, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেছিলাম বউদি। এখন আমার সময়ই নেই—

সুনয়না রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তখনকার মত চুপ করিয়া গেলেন।

রাত্রিতে বীরেশ্বর বেড়াইয়া ফিরিবার পর সুনয়নার কাছে খবরটা পাইল।

তুমি কি দার্জিলিং যাচ্ছ নাকি ঠাকুরপো? না, ঘুমে?—সুনয়না প্রথমেই ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করলেন।

না তো।

হ্যাঁ, অ্যাঁ!—সুনয়না জোর দিয়া বলিলেন, আমি খবর নিয়েছি সব।

বীরেশ্বর একটু চমকিয়া উঠিল।—কি খবর? কোথায়, কিসের খবর?

জানি সব।—সুনয়না ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, স-ব জানি।

দীপিকারা দার্জিলিং গেছে। দার্জিলিং না তো—ঘুমে। তুমি কাল যাচ্ছ।

বীরেশ্বরের ক্ষণকালের জন্য বাক্‌রোধ হইয়া গেল। অজ্ঞাতে মৃদু প্রশ্ন নির্গত হইল, কার সঙ্গে গেল?

ওর ভাই গেছে। বলেন্দু না কি! সে গেছে। তাদের বাড়ির মেয়েরা গেছে। ওদের বাড়ি আছে তো ঘুমে? সেখানে থাকবে।

অসহ্য জ্বালায় বীরেশ্বর বজ্রমুষ্টিতে দীপিকার গলা চাপিয়া ধরিল। গায়ের মাংস নখে ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল যেন। অবশেষে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল বীরেশ্বর—

হাঁপাইতেছিল।

কিছুই করিতে না পারিয়া অক্ষম আক্রোশে বীরেশ্বর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেগে সুনয়নার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

সুনয়না স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।—ঠাকুরপো, শোন, শোন।—পিছনে পিছনে বৃথাই ডাকিলেন বার কয়েক।

ঘণ্টাখানেক পরে বীরেশ্বর ফিরিয়া আসিল। সুনয়না তখন সর্বেশ্বরের নিকট কি বলিতেছিলেন। বীরেশ্বর হালকা সুরে ডাক দিল, বউদি, খেতে দাও।

সুনয়না তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। বীরেশ্বরের চোখের দিকে একবার তাকাইয়া শুধু বলিলেন, চল।

বীরেশ্বর হাস্যের ভঙ্গী করিয়া বলিল, তোমার কি বুদ্ধি বল তো বউদি? আমি যাব কতদূরে, কতদিনের জন্যে! ওরা যে গেছে তাই আমি জানি নে।

ও! আমি ভেবেছিলাম তুমি জান।—সুনয়না সহজ সুরে বলিলেন।

কিছু না।—বীরেশ্বর বলিল, আমাকে বলে নি তো।

শিরাগুলি আবার যেন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মাথা তুলিতেছে!

সশব্দে হাসিয়া উঠিল।—কি সব ধারণা বউদির!

তোমাকে সত্যি বলে নি, ওরা যাবে?—সুনয়না ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

না। আমাকে কেন বলবে?

সুনয়না আর কথা বলিলেন না।

পরের দিন বীরেশ্বর যত দূরের টিকেট পাওয়া যায় একখানা কিনিয়া লইয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল। জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া পিছনের দিকে অপসৃয়মান শহরের আলোর দিকে কিছুকাল তাকাইয়া রহিল। উপরের এই মায়াজালের আবরণের নীচে কত গ্লানি, কত ক্লেদ, কত বিড়ম্বনা আছে বীরেশ্বর জানে। মুখ ফিরাইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইল। বাতাসের ঝাপটা লাগিয়া চক্ষু বন্ধ হইয়া গেল। দুর্দান্ত বেগে দূরে সরিয়া যাইতেছে অনুভব করিল শুধু। নিরুদ্দেশ যাত্রার আবেশ আসিয়া গেল বীরেশ্বরের।

১০

পথে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দীপিকার মনের মধ্যে কাঁটার মত একটা অস্বস্তি বিঁধিয়া রহিল।—অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় হ'ল।

সমতল ছাড়িয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে যখন উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, অস্বস্তির কাঁটা তখন নীচের দিকে সবুজ সমতলের সঙ্গে ক্রমে মিশিয়া গেল। পাহাড়ের বিচিত্র দৃশ্যে, আনন্দ কলরবে, হাসিতে ঠাট্টায় মনের যে সমতলে ছোটখাট বিচার বিবেচনা রাজত্ব করে সেটা নীচে পড়িয়া গেল।

উপরে উঠিলে ওজন কমে। দীপিকা শুনিয়াছিল। মনের মধ্যে সেটা অনুভব করিল আজ। অনীতার সঙ্গে পাল্লা দিয়া কলহাস্যে গড়াইয়া পড়িতেছিল অনীতার গায়ের উপর। অনীতার মতই। পুরুষ বলেন্দুর দিকে আড়চোখে দীপিকা চাহিয়া দেখিতেছিল মাঝে মাঝে। বলেন্দু মহাদেবের মত চটুল নারীর বোঝা বুকের উপর ধারণ করিয়া আনন্দে বহন করিতেছিল। তার প্রশস্ত বক্ষের নিরাপদ আশ্রয় স্বতঃসিদ্ধের মত দীপিকার মনের তলায় কাজ করিয়া যাইতেছে।

আর প্রদীপ অনীতার প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনের চারিপাশে পায়রার মত নৃত্য করিতেছে।

চমৎকার স্বপ্নের মত ছোট বাড়িখানা বলেন্দুর। পৌঁছিয়া দীপিকারা সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল।

চমৎকার!—মনে মনে বলিল দীপিকা।

পরের দিন হইতে বলেন্দু দীপিকাদের হাওয়ায় উড়াইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশ বিলাসে দেহটা যেন ছাড়িয়া দিল দীপিকা।

খাড়া চড়াই পাইলে বলেন্দু দীপিকার দিকে হাতটা আগাইয়া দিয়া অনীতাকে বলে, অনী, তুই প্রদীপের হাত ধর্।

প্রদীপ সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরিয়া নির্বোধের মত দুই হাতই আগাইয়া দেয়।

অনীতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে।—এক হাতে পারবেন না বুঝি? হাঁটবেন কি ক'রে?

প্রদীপ লাল হইয়া বলে, বাঃ, পারব না মানে? আপনি তো হালকা একেবারে!

দীপিকা বলেন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, তুই জানলি কখন দাদা?

এবার অনীতার লাল হইবার পালা।

বলেন্দু দীপিকার হাতের মধ্যে একটা বাড়তি চাপ দিয়া হাসে।

দীপিকা এইটুকুতেই বেপরোয়া অসতীত্বের আনন্দ ভোগ করে যেন।

মাঝে মাঝে বীরেশ্বর সমতল হইতে মাথা তুলিয়া উঁকি মারিয়া মিলাইয়া যায় ছায়াবাজীর মত। কিন্তু অনেক দূরে—অনেক নীচে।

বলেন্দু নিশ্চিন্ত হইয়া প্রথম দিন-তিনেক অপেক্ষা করিল। কিন্তু ক্রমে চঞ্চল এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। সময় ফুরাইয়া আসিতেছে।

দীপিকা সেদিন শরীর খারাপ বলিয়া বাহির হইল না।

থাক্, শরীর খারাপ বোধ করছ যখন, বেরিয়ে কাজ নেই।—বলেন্দু শান্তভাবে উপদেশ দিল। ইঙ্গিতের আনন্দে শরীরের তারগুলি তাহার যেন ঝনঝন করিয়া উঠিল। হাসিল মনে মনে।

আর সকলকে লইয়া বলেন্দু বাহির হইল।

চলিতে চলিতে রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়া

বলেন্দু বলিয়া উঠিল, ওঃ-হো! প্রদীপ, তুমি ভাই অনীকে নিয়ে যাও। আমার একটু কাজ আছে অন্যখানে।

প্রদীপ নাচিয়া উঠিল।—বেশ তো। আমরা এগোই। আপনি কাজ সেরে আসুন।

আমার আর যাওয়া হবে না বোধ হয়।—বলেন্দু বলিল, দেরি হবে ওখানে। আচ্ছা, দেখা যাবে। তোমরা যাও তো।

বলেন্দু খসিয়া পড়িল।

একটু ঘুরিয়া দ্রুতপদে বলেন্দু বাসায় ফিরিল। পা দুইটা শরীরের সঙ্গে সমান বেগে চলিতে পারে না বলিয়া বলেন্দু আরও অশান্ত হইয়া পড়িল। পায়ে হাঁটা এই জন্যই সে পছন্দ করে না কোনদিন।

দীপিকা তখন গল্পের বই পড়িতেছিল বসিয়া—

যথাসম্ভব নিঃশব্দে প্রবেশ করিল বলেন্দু। কিন্তু সামান্য শব্দেও দীপিকা টের পাইল। মুখ তুলিতে পারিল না। অপলক চক্ষে বইয়ের পাতার উপর আবদ্ধ হইয়া পড়িল। দেহটা যেন জমাট বাঁধিয়া নিশ্চল হইয়া গেল।

বলেন্দু দরজার ভিতরে মুহূর্তের জন্য থামিয়া দীপিকাকে পিছন হইতে আগাগোড়া একবার দেখিয়া লইল। রাসটা একটু টানিয়া লইল যেন। ধীর পদে দীপিকার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

এবার মুখ না তুলিয়া উপায় নাই। দুই জোড়া চক্ষু পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। বলেন্দু যেন দীপিকার চক্ষের একটা পলক পড়িবার অপেক্ষায় উদ্যত হইয়া রহিল। নির্নিমেষে মুমূর্ষু দৃষ্টিটা বলেন্দুকে ঠেকাইয়া রাখিতেছে।

কখন এলেন?—পলক ফেলিবার পূর্ব-মুহূর্তে দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল, ওরা আসে নি?

না।

জবাবের ছোট শব্দটার সঙ্গে শরীরের তাপ বলেন্দুর অনেকখানি বাহির হইয়া গেল। তারগুলি ঢিল হইল একটু। একটু নড়িয়া-চড়িয়া দীপিকার বিছানার উপর বসিল।

দীপিকার শরীরের উপর দিয়া যেন ঝড় বহিয়া গিয়াছে। অবসন্ন

কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, মাথাটা ধরেছিল। অনেকটা কমেছে এখন।

বলেন্দু তাকাইল। মুখের কোণে একটু হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

বুঝিতে পারিয়া এবার সহজ লজ্জায় মাথা নত করিল দীপিকা। কপালে হাতটা বুলাইয়া আবার বলিল, এখনও আছে—অনেকটা কম।

বলেন্দু অপৌরুষের গ্লানিতে ক্রমশ নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এমন কোনদিন হয় নাই তার।

একটু সরিয়া বসিয়া সহসা দীপিকার কপালে হাত রাখিল।—জ্বর-টর হয় নি তো?—দীপিকার বাঁ হাত টানিয়া লইল হাতের মধ্যে কিছু একটা করিবার বা ধরিবার তাড়নায়।—না, জ্বর হয় নি।—হাতটা মৃদু আকর্ষণ করিয়া একটু ধরা গলায় বলিল, তুমি শোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

দীপিকা হাতটা টানিতে পারিল না। যেটুকু শক্তি ছিল হাত পর্যন্ত পৌঁছায় না। শুধু বলিল, এখন ভাল আছি একটু—

বলেন্দু স্থির দৃষ্টিতে দীপিকার চক্ষু দুইটি ধরিয়া ফেলিল। হাতখানা বলেন্দুর হাতের মধ্যেই ছিল তখনও। মুঠি দৃঢ় হইতে হইতে জ্বর দেখার আবরণটুকু ছিঁড়িয়া গেল। সত্য এবার নগ্ন মূর্তিতে মুখামুখী হইল।

এই অজ্ঞান অবস্থার জন্যই যেন এতক্ষণ বিলম্ব করিতেছিল বলেন্দু। হাতখানা নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, হাওয়া আসছে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দি।

দীপিকা চক্ষু মুদিয়া খোলা বইয়ের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। বলেন্দুর পায়ের শব্দ অনিবার্য মৃত্যুর মত কাছে আসিতেছে, হৃৎপিণ্ডের তালে তালে শুনিতে লাগিল।

অকস্মাৎ বলেন্দুর স্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকাইয়া উঠিল দীপিকা।—না—না—না—না। না—

বলিতে বলিতে পিছাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। চোখ বুজিয়া ক্রমাগত চাপা আর্তনাদ করিয়া চলিল, না—না—না।

বলেন্দু অসহ্য বিস্ময়ে ভ্রূকুটি করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দীপিকা ক্ষণপরে চোখ মেলিল। ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে যেন। বলিল, দরজা খুলে দিন—দিন—

বলেন্দু নড়িল না। তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টিতে দীপিকাকে যেন দগ্ধ করিতে চাহিল। বলিল, এই শেষ কথা?

হ্যাঁ।

বলিতে লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ঢাকিল দীপিকা।

তা হ'লে সবই মিথ্যে? সবই ভঙ্গী?

সব ভুল—ভুল—

ভুল?—বলেন্দু বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিল, এ রকম ভুল মাঝে মাঝেই কর তো?

দীপিকা আবার মুখ ঢাকিল।

কোন্‌টা ভুল?—বলেন্দু হঠাৎ প্রশ্ন করিল।

দীপিকা নিরুত্তর রহিল।

বলেন্দু পীড়াপীড়ি করিল না। হঠাৎ অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিল। কথা-কাটাকাটিতে শরীরটা যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দীপিকা আরও কিছুকাল তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে অযৌক্তিক এক টুকরা হাসি ফুটিল মুখে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাসিটা চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কান পাতিয়া খানিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া মাথাটা বাহির করিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল।

বলেন্দু নাই।

অহেতুক করুণায় ভরিয়া উঠিল মনটা।

রাস্তায় নামিয়া বলেন্দু অবশেষে হাসিল। ক্ষমা করিল দীপিকাকে। অপমানের গ্লানিটা কেমন করিয়া যেন ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল।—আমারই দোষ। বোকার মত দেরি করার ফল। সে ঠিকই করেছে যা করা উচিত।

কিন্তু ভুলটা কি?—প্রশ্নটা মাঝে মাঝে বিঁধিতেছিল।

অনীতা প্রদীপের সঙ্গে অনেকক্ষণ একা আছে। জাগ্রত কর্তব্য-বুদ্ধির তাড়ায় বলেন্দু বেগ বাড়াইয়া দিল। অনীতার ছোট বোনও সঙ্গে আছে। কিন্তু সে নিতান্ত ছোট।

রাত্রিতে নিরিবিলিতে দীপিকা প্রদীপকে বলিল, কাল আমাদের যেতে হবে। তুই বল্ বলেনবাবুর কাছে।

প্রদীপ আকাশ হইতে পড়িল।—কেন?

হ্যাঁ। কেন আবার কি? বাড়ি যাব না?

যাবই তো। একসঙ্গেই যাব। দুদিনের জন্যে আগে যাব কেন? তা ছাড়া ওরা যেতেই দেবে না যে।

দেবে। দিক না দিক, আমাকে যেতেই হবে।

প্রদীপ প্রমাদ গণিল। স্নেহের সুরে বলিল, কেন, কি হয়েছে বল্ তো?

কিছু হয় নি। আমি যাব।

প্রদীপ অভিভাবকের মত ধমক দিল এবার।—যাব বললেই যাওয়া হয় নাকি?

বেশ, আমি একাই যাব তবে।—দীপিকা শেষ কথা জানাইয়া দিল।—তুই যাবি নে জানি আমি। দীপিকা যাইতে উদ্যত হইল।

কোথা যাস, শোন্?—প্রদীপ বিব্রত হইয়া পড়িল। ওঁরা কি মনে করবেন বল দেখি? একটা কারণ তো বলতে হবে?

কিছুই বলতে হবে না।—দীপিকা বলিল। আমরা যাব, তাই বলতে হবে।

অনীতা আসিয়া পড়িল।

প্রদীপ চোখের ইঙ্গিতে মিনতি করিয়া নিষেধ করিল দীপিকাকে। তাড়াতাড়ি মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া জানাইল, যা বলবার আমি বলব।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তে হবে দীপিকাদি।—অনীতা বলিল, শেষ রাত্রে বেরুতে হবে।

আবার?—দীপিকা অনীতার হালকা সুরে বলিল, একদিন তো দেখলাম ভাই। রোজ রোজ ভাল লাগে না।

কালকেই শেষ। আর তো যাব না। কি বলেন প্রদীপবাবু ?

প্রদীপ ভয়ে ভয়ে জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়।

কি নিশ্চয় ?—হাসিয়া উঠিল অনীতা।

কাল যেতে হবে টাইগার হিলে।

হ্যাঁ, ঠিক।—অণিতা হাসিমুখে দীপিকার দিকে চাহিল।—আপনি কিন্তু 'না' বললে শুনব না।

দেখা যাক। শেষরাত্রে ঠিক করা যাবে।—দীপিকা চাপা দিতে চাহিল।

দেখা যাবে। না গেলে ছাড়বও না তো।

কোন জবাব দিল না দীপিকা।

চলুন, বলেনদা ডাকছেন আপনাকে।—বলিয়া টানিয়া লইয়া চলিল দীপিকাকে। পিছন ফিরিয়া প্রদীপের দিকে চাহিয়া করুণা করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, আপনি যাবেন না ?

একটা টিপ খাইয়া তালপাতার সেপাইয়ের মত লাফাইয়া উঠিল প্রদীপ। বলিল, হ্যাঁ, যাচ্ছি।

দরজার কাছে গিয়া দীপিকা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।—থাক্। এখন নয়।

কি হ'ল ?—অনীতা বিস্মিত হইল।

কিছু না, চলুন।—বলিয়া এবার নিজেই আগাইয়া গেল।

বলেন্দুর ঘরে ঢুকিয়া দীপিকাই প্রথম কথা বলিল, কি, শুয়ে পড়েছেন যে ?

বলেন্দু জবাব না দিয়া নির্বাক দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল, শরীরটা ভাল নেই।—বলিয়া একটু হাসিয়া লইল।

মুখ ফিরাইয়া লজ্জা গোপন করিল দীপিকা।—মাথা ধরেছে ?

হ্যাঁ।

দীপিকা নিজেকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া উঠিল মনে মনে।—এ কি হচ্ছে ? আবার ? মুখে মুচকি হাসিয়া বলিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দোব ?

পিছনে ছুটিয়াও কথাটাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না আর। নিজের ওপর চাবুক কষিল দীপিকা। ছিঃ ছিঃ!

বলেন্দু নিশ্চিন্ত হইল। হাসিমুখে বলিল, দিলে ভাল হয়। কিন্তু কে দেবে?

দীপিকাকে শিয়রে বসিয়া বলেন্দুর কপালে হাত রাখিতে হইল। রাগে লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না।

অনীতা বলিল, মাথা ধরেছে, এতক্ষণ বলেন নি কেন?

একবার স্পর্শ করিয়াই আকস্মিকভাবে উঠিয়া পড়িল দীপিকা। অনীতাকে বলিল, আপনি বসুন ভাই। আমার একটু কাজ আছে।—বলিয়া মুহূর্ত অপেক্ষা করিল না। কারও দিকে চাহিল না। চলিয়া গেল।

বলেন্দুর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল।

অনীতা বসিল শিয়রে। প্রদীপ হতবুদ্ধির মত মিনিট খানেক কাটাইয়া দীপিকার অনুসরণ করিল।

অনীতার হাত ঠেলিয়া বলেন্দু উঠিয়া বসিল।—থাক্, সেরে গেছে।

অনীতা টান দিয়া আবার শোয়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, সারুক। আপনি শুয়ে থাকুন না। দীপিকাকে ডেকে দোব?

না।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বলেন্দু।

ভোরের দিকে অনীতা জাগিয়াও চুপচাপ পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া আস্তে আস্তে ডাক দিল, দীপিকাদি!

ধরা গলায় পাশের বিছানা হইতে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল দীপিকা।

জেগে আছেন?—অনীতা একটু বিস্মিত হইল।

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।

যাবেন?

একটু বিলম্বে জবাব দিল দীপিকা, না ভাই।

অনীতা কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। ক্ষণেক থামিয়া থাকিয়া শুধু বলিল, আপনি না গেলে বলেনদাও যাবেন না।

আমার যাবার উপায় নেই ভাই।

উপায় নেই?

না, আমাকে আজকেই যেতে হবে।

অনীতা মাথা উঁচু করিল।—কোথায়?

বাড়ি।

অনীতার কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বলিল, কি হয়েছে, আমায় বলবেন?

বলিবার কথা দীপিকার হৃদয় ভরিয়া ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। ভোরের আবছায়া আলোর মধ্যে মনের এক অংশ উপরে উঠিয়া সমস্ত অস্পষ্টতা ডুবাইয়া দিয়া নিছক প্রেমের স্বপ্নে বিভোর করিয়া তুলিতেছিল।

বলব।—দীপিকা নাটকীয় উচ্ছ্বাসে আরম্ভ করিল।—আপনার বলেনদাকে বলবেন, আমাকে যেন তিনি ক্ষমা করবেন।

অনীতা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া লইল।

দীপিকার হঠাৎ কান্না পাইল। অনেকক্ষণ আর কিছু বলিতে পারিল না।

বলেনদাকে বলব?—অনীতা মনে করাইয়া দিল।

হ্যাঁ।—দীপিকা সিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল।—আমাকে ক্ষমা করেন যেন। আমি—আমার মন—আমার অধিকারে নেই। আমি একজনকে—

কাকে?—অনীতা শত চেষ্টাতেও ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না।

একদিন সবই জানতে পারবেন। সব বলব। কিন্তু, আজ নয়।

অনীতা নিরুপায় বোধ করিয়া আকুল হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বলিল, আপনার সঙ্গে আর শিগগির দেখা হচ্ছে না যে।

দেখা হবে।

ওখানে গিয়ে একদিনের বেশি থাকতে পারব না কিনা!

দীপিকা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সেই দিনই হবে। আজ না। আজ আমায় মাপ করবেন।

দিনের আলোতে ভোরের আমেজ ক্রমে শুকাইয়া গেল। কিন্তু দৃঢ়তাটুকু টিকিয়া রহিল। অনীতা অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে অভিমানে বলিল, তা হ'লে চলুন, আমরাও যাচ্ছি। একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই যাব।

অনীতাও বাঁধা-ছাদা করিতে আরম্ভ করিল।

বলেন্দু রাগে গুম হইয়া বসিয়া ছিল। অনীতা আসিয়া বলিল, না, ওঁরা থাকবেন না কিছুতেই।

বেশ তো। বলছে কে থাকতে?

অনীতা বলিল, ওঁদের একা যেতে দেওয়া ভাল দেখায় না। চলুন, আমরাও চ'লে যাই।

তাই চল।—বলেন্দু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

অনীতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাতের আঙুল টিপিতে টিপিতে বলিল, দীপিকাদি রাত্রেই বলছিলেন আপনাকে বলবার জন্মে—

কি?

বলেছিলেন, তাঁকে যেন ক্ষমা করেন আপনি।

কেন?

উনি আর একজনকে ভালবাসেন।

ওঃ।

অনীতা বলেন্দুর মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল।

ঐ দালাল বীরেশ্বর!—বলেন্দু তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিয়া উঠিল, বেশ তো। ভাল তিনি বাসুন না তাকে। মানা করছে কে?

না। তাই বলেন আর কি।—অনীতা গতিক খারাপ বুঝিয়া সরিয়া গেল।

. .

গাড়িতে এক কোণে বসিয়া ছিল দীপিকা। প্রেম-গরিমায় গরীয়সী মনে হইতেছিল নিজেকে।—উত্তীর্ণ! তিনি বুঝিবেন।

একটা কথা তীক্ষ্ণ এক টুকরা ব্যঙ্গের মত সঙ্গে সঙ্গে পীড়া দিতেছিল।—আপনার বলেনদাকে বলবেন—তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর একজনকে ভালবাসি আমি, নইলে তো রাজীই হতাম। এই? ছিঃ—ছিঃ—

শরীরটা শিহরিয়া উঠিল। একটু হাসিও ফুটিয়া উঠিল মনের কোণে।

ক্রমশ

শ্রীভুবনমোহন সরকার

নতুন ফসল

২

ওরে ভয় নাই, আকাশে আবার ডেকেছে সোনার বান—
বিদায়ের লাল অরুণ আভায় পুন ঝলমল করে,
ভোরের পাখিরা আবার গাহিছে গান
ভোঁতা ছুরিটায় আবার পড়েছে শান
বহে নির্ঝর নিথর পাথর পুন করি খান্‌খান
ডানা মেলে ফের কল্পনা-পাখি ওড়ে মন-অম্বরে।

শাল-আলোয়ান টেনে ফেলে দে রে উড়ুক চাদর গায়ে,
কন্‌কনে হাওয়া কোন্ উত্তাপে মন্দ বাতাস হ'ল!
শীতে-ভাঙা-গলা ফিরে পেল ফের সুর
শুষ্ক সায়র পুন হ'ল পরিপূর
মরা ডালে ফুল ফুটিল আবার ঝ'ড়ো বৈকালী বায়ে
বদ্ধ থেকো না ঘরে গৃহস্থ, রুদ্ধ দুয়ার খোলো।

চলার পথের শেষ নাই ওরে, থামিস না বাঁকে বাঁকে
স্বর্ণ-সন্ধ্যা দিগন্ত ছেয়ে তিমির রাত্রি হবে
হোক্ না তা ব'লে মিছা কি বর্তমান
ভাটায় যখন লাগে জোয়ারের টান
স্রোতে ভেসে যায় গাঁয়ের বধূর কলসি থাকে না কাঁখে
হিসাব-নিকাশ রাখ্‌ রে পথিক, বিদায়ের উৎসবে।

ভৈরবী গান যে গেয়েছে সে কি গাবে না পূরবী আর,
গাহিতে যে জানে পূরবী গানেও আসর মাতায় সে যে.
ঝিল্লিমুখর কেন গৃহ-প্রাঙ্গণ,
দিকে দিকে নব জীবনের আয়োজন
এবারে যে গান গাহিবে হোক তা নিশীথ-চমৎকার
জীবন-বীণার তার যে বেঁধেছ বহু বেদনায় মেজে।

তিলে তিলে জ'মে বুকের অশ্রু মুক্তা হয় নি কি রে
সে মুকুতা দিয়ে এখন না যদি গাঁথিবি কণ্ঠহার

দুঃখসাধন সবি হবে বরবাদ
জ্যোৎস্নাবিহীন যেন আকাশের চাঁদ
বিনা পসরায় ভিখারীর মত চলিবি কি খেয়াতীরে
শূন্য মুষ্টি পারে না খুলিতে অসীম কালের দ্বার।

ওরে ভয় নাই, আকাশে আবার লেগেছে রঙের ঘোর
বাতাসে আবার ভাসিয়া বেড়ায় নূতনের আহ্বান
এ-পারে ও-পারে অন্তবিহীন পথ
কভু ছায়াময় কভু মরীচিকাবৎ
কথা যা জমেছে বল্ রে পথিক, খালি কর্ বুক তোর
চলমান এই পৃথিবীতে চাই শুধুই চলার গান।

* * *

মেদভার তত বেড়ে বেড়ে যায় বয়স যতই বাড়ে
ঝ'রে ঝ'রে যায় অন্তর-ক্লেদভার
ওরে রে প্রবীণ, এল শুভদিন পঁহুছি যমের দ্বারে
শান্ত চিত্তে পরিণাম কর্ সার।
পুরাতন বাস ছাড়িয়া নূতন বেশ-বাস পরিধান—
গীতা কয়, তাহা এর বেশি কিছু নহে।
মরমী যে জন সেই জানে শুধু পুরানো জুতার মান,
ব্যথিত যে জানে কোথা কাঁটা তার দহে।
সারা জীবনেও জানিতে পারি নি কোথা হতে আগমন ?
কেমনে জানিব কোথা যাব এর পর ?
শুনি যাব চির-পরিচিত ঘরে তবু ভয়ে কাঁপে মন
অজানা বলিয়া পূজা পান ঈশ্বর।

* * *

বৃত্তের পরে বৃত্ত চলেছে সারা সংসার জুড়ে
বৃত্তে বৃত্তে নাহি লাগে ঠোকাঠুকি
তাই তো সহজে চলে অসহায় মানুষের সংসার
রামেরে লইয়া সীতা হন সুখী দেখিলে কৃষ্ণে তিনি

রামের বৃত্ত ত্যজিয়া হয়তো বৃত্তান্তর লাগি—
ত্রেতায় দ্বাপরে লেগে যেত মারামারি।
বৃত্তে বৃত্তে সীতা ও শ্রীরাধা মহানন্দেই আছে।
পরম দয়ালু মহাবিধাতার বৃত্তবিধান-বলে
সুখী মানুষের গণ্ডীবদ্ধ মন
বৃত্তের মাঝে অন্তঃসলিলা বহে যে আকর্ষণ
তারি নাম দিনু—পীরিতি প্রণয় প্রেম স্নেহ ভালবাসা
ভক্তি শ্রদ্ধা—বৃত্তের খেলা খালি
বৃত্ত রয়েছে ঘিরিয়া মানুষে ব্যষ্টি সমষ্টিতে
ব্যক্তি ও পরিবারে
ধর্মে রাষ্ট্রে দেশে ও সম্প্রদায়ে
মাঝে মাঝে যথা নভোমণ্ডলে ছুটো ধূমকেতু এসে
কোনো বৃত্তের গণ্ডি ভাঙিয়া ছুটিয়া বাহির হয়ে
অন্য বৃত্তে ঘটায় বিপর্যয়
সৃষ্টি স্থিতি তখনি কাঁপিয়া উঠে।
পরিচিত এই মাটিতে তেমনি অনধিকারীর দাবি
বৃত্তে বৃত্তে ঘটাইছে সংঘাত
ঘটিছে যুদ্ধ, ঘটে বিপ্লব, বাধিতেছে সংগ্রাম
দেশে দেশে আর জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে আর
মানুষে মানুষে কলহ ও কোন্দল—
সকলি বন্ধু, ভুলে-ইচ্ছায় বৃত্ত-ভাঙার খেলা
এ বৃত্তান্ত মানব সভ্যতার।

* * *

পরশমণি, সোনার খনি, হারিয়ে গেলে পথে
একটু সোনা দিচ্ছে আভাস তব,
কি যে পেলাম কি হারালাম বুঝতে কোন মতে
নিজেই নারি কারে কি আর কব!
বসন্ত-ভোর পরেছিলাম অনেক ফুলের মালা
কোনটিতে চোখের জলের শীতল শিশির ঢালা

কোনটিতে তীব্র বিষের অগ্নিদহন জ্বালা
কেউ বা এলে পদব্রজে কেউ বা বিজয়-রথে
কেউ পুরাতন কেউ বা অভিনব
পরশমণি, সোনার খনি, হারিয়ে গেলে পথে
একটু সোনা দিচ্ছে আভাস তব।

বসন্ত যে মিলিয়ে গেল এল ঝড়ের রাতি
কাল-বোশেখী মাতল ফুলের বনে
কেউ জানে না কোন্ তিমিরে হারিয়ে গেল সাথী
ধাঁধে নয়ন তড়িৎ-শিহরণে।
একটুখানি মনে পড়ে—হাত রাখিয়া হাতে
বলেছিলে, ভয় কি, তুমি এস আমার সাথে
তারপরে যে কি ঘটিল ঝঞ্চার সংঘাতে
হারিয়ে গেলে সেই আঁধারে খুঁজনু পাতি পাতি
আজও খুঁজে বেড়াই মনে মনে,
বসন্ত যে মিলিয়ে গেল এল ঝড়ের রাতি
কাল-বোশেখী মাতল ফুলের বনে।

ঝড়ের নিশি প্রভাত হ'ল ফুটল আলোর রেখা
সোনার আভা লাগল গগন-ভালে
দেখি চরাচরের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি একা
সঙ্গী কি কেউ ছিল কোনও কালে।
শুধু তোমার পরশখানি সোনার শোভা ধ'রে—
দেহের সাথে সাথে আমার মনও ছিল ভ'রে
ভাঙা বনের বিজনতায় ডাকনু এত ক'রে
পরশমণি, সোনার খনি, পেলাম না তো দেখা—
আটকা পড়ি লোহারই জঞ্জালে,
ঝড়ের নিশি প্রভাত হ'ল ফুটল আলোর রেখা,
সোনার আভা লাগল গগন-ভালে।

* * *

কেন জাগাই তারে বল যে জন ঘুমিয়ে পড়েছে।
কেন গাঁথব মালা সেই ফুলে যার পাপড়ি ঝরেছে?
আমি একলা জেগে আছি
গাঁথা হয় নি মালাগাছি।
খুঁজে বেড়াই তারে বুকে যাহার টনক নড়েছে,
কেন জাগাই তারে বল যে জন ঘুমিয়ে পড়েছে!

অনেক সাধ্যসাধন করেছিলাম যখন ছিল রাতি
আমি মুখের কাছে ধরেছিলাম বুকের দীপভাতি।
শুধু শুধিয়েছিলাম গানে
তোমায় রাখি যে কোন্‌খানে
চলে জগৎজুড়ে আঁধার এবং ঝড়ের মাতামাতি।
অনেক সাধ্যসাধন করেছিলাম যখন ছিল রাতি।

তুমি হীরের মতো ঝলমলিয়ে রইলে সেদিন একা,
যেন কুহু রইলে ওপারে আর এপারে রই কেকা
মাঝে রইল তিথির বাধা
তাই মিথ্যে হ'ল সাধা
ক্রমে ঝাপসা হ'ল অবহেলায় পরস্পরের দেখা,
তুমি হীরের মত ঝলমলিয়ে রইলে সেদিন একা।

জেগে ভোরের আলোয় চেয়ে দেখি তোমার এলোচুলে
যেন জড়িয়ে আছে আবর্জনা শুকনো মরা ফুলে
তুমি বেঁহুশ আছ ঘুমে
তোমার সিঁদুর ও কুঙ্কুমে
যেন মনে হ'ল রক্ত মৃতের হয়তো মনের ভুলে
জেগে ভোরের আলোয় চেয়ে দেখি তোমার এলোচুলে।

জানি সেদিন হতে তুমি ঘুমাও আমি বেড়াই জেগে
শুধু এখান ওখান সেখানে সই প্রসাদ মেগে মেগে
নানা রঙিন পুষ্পরাজি
আজো সাজায় আমার সাজি

সখি তুমি রইলে থমকে থেমে আমি ছুটনু বেগে
জানি সেদিন হতে তুমি ঘুমাও আমি বেড়াই জেগে

*   *   *

শান্তির পারাবার শুকাইল একে একে
বুদ্ধ ও যীশু আর গান্ধী
বড় বড় বৈদ্যেরা ডুবে গেল রসাতল
ঠোট্‌কা এনেছে শেষে ঠান্‌দি।
ঠান্‌দিরা আড়াইশো সভ্য
কেউ পুরাতন কেউ নব্য
চোষ্য লেহ্য চাই চব্য
বলে, এসো সবে মিলি রান্ধি
শান্তির পারাবার শুকাইল একে একে
বুদ্ধ ও যীশু আর গান্ধী।

হাতে নিয়ে হাতিয়ার সান্ত্রীরা একে একে
ক'য়ে যায় শান্তির বার্তা
নিজস্ব প্রতিনিধি ছুটে যায় দেশে দেশে
বাণী নিয়ে দুই তিন চার তা
বাণী জ'মে ওঠে সারা বিশ্বে
অণু-পরমাণু অদৃশ্যে ;
ভাঙে ভেদাভেদ ধনী নিঃস্বে
কোই না কিসিকে আর মারতা
হাতে নিয়ে হাতিয়ার সান্ত্রীরা একে একে
ক'য়ে যায় শান্তির বার্তা।

শান্তির খাঁটি বাণী কান পেতে শোনে শুধু
পুরাতন প্রেইরি ও পম্পাস
উত্তরে শোনে তাহা হিম সাইবেরিয়ার
অতন্দ্র তুন্দ্রারা বারো মাস।

সে বাণী হয় না বলা উনোতে
বসে যেথা শ্রীমনসা ধুনোতে
যায় যারা পালাগান শুনোতে
বজায় রাখিয়া ফেরে অভ্যাস।
শান্তির খাঁটি বাণী কান পেতে শোনে শুধু
পুরাতন প্রেইরি ও পম্পাস।

জাগেন ঠাকুর রবি শান্তির নিকেতনে
সেবাগ্রামে গান্ধীর আত্মা,
সভয়ে দেখেন তাঁরা শান্তির চানাচুর
বেচে যায় সকলে তুহাত্তা
মুড়মুড়ে ভাজা হয়ে সগু
গান্ধীর ইংরেজী গগু
ঠাকুরের মিঠি মিঠি পগু
মুখে মুখে নিমেষে না-পাত্তা
জাগেন ঠাকুর রবি শান্তির নিকেতনে,
সেবাগ্রামে গান্ধীর আত্মা।

*   *   *

তরুণ গিরি, তোমার মাঝে স্তব্ধ হয়ে আছে
হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাতের যেন বিপুল সম্ভাবনা
তোমায় দেখে প্রণাম জানাই ভবিষ্যতের কাছে
আকাশ-জোড়া শিখা হেরি হই যে অন্যমনা।
জানি তুমি পড়বে ফেটে অন্তর-উত্তাপে
উৎসারিয়া লাভার স্রোত করবে হৃদয় খালি
আজকে তোমার সকল দেহ সেই আশাতে কাঁপে
বিপর্যয়ের আগুন রাখো বক্ষে তোমার জ্বালি।
গিরি, তোমার শিরে নাহি বনের সমারোহ
শ্যামল সবুজ প্রাণের আভাস তোমার 'পরে নহে

চোখে তোমার তাই দেখি না আকাশ-কুসুম-মোহ
থমকে আছে প্রাণ-প্রবাহ প্রলয়-আগ্রহে।
পুরাতনের ভিত্তি 'পরে স্বস্তি নাহি তব
তাই তো আছ প্রতীক্ষিয়া ভাঙার অপেক্ষায়
ধ্বংস হ'লে এই পুরাতন তবেই, অভিনব,
জন্ম নিয়ে ভাঙবে তোমার কঠিন স্তব্ধতায়।
আমি পুরাতনের কবি, জড়ত্ব-জঞ্জালে
স্থবির হয়ে প'ড়ে আছি—এইটুকু মোর আশা
মহাকালের জয়টীকা, নবীন, তোমার ভালে
জানি সকল গড়ার পিছে ভাঙন সর্বনাশা।
নবীন গিরি, তোমার গুরু পাগল নটরাজ
তাণ্ডবেতে বারে বারেই মোছেন ধরার পাপ,
পাপের ভরা জ'মে জ'মে পূর্ণ হ'ল আজ
তুমি এস মুক্তিরূপী প্রলয়-অভিশাপ।

* * *

আমাদের কথা কেহ শুনিল না, কেহ জানিল না প্রিয়ে,
ছন্দে গাঁথিতে পারি নি কখনো যদিও লেখেছি ঢের
বাহিরের এই আবরণ-তলে জোয়ারের স্রোত নিয়ে
ছুটিয়া চলেছে প্রেমের ফল্গু কেহ তো পায় না টের।
উঠেছি বসেছি এক সাথে মোরা সুখে দুখে সম্পদে
বিপদে আপদে সন্তান-স্নেহ করিয়াছি ভাগাভাগি
পরস্পরের ধরিয়াছি হাত এ আঁধারে পদে পদে
একের নিশ্বাস অপরে গণেছি বিনিদ্র নিশি জাগি
মন্ত্রের কথা শুনি ভারতের পুরাতন ইতিহাস
জনমে জনমে পাকে পাকে মোরা বাঁধিয়াছি গাঁটছড়া
কাহারো সাধ্য নাই শুনি প্রিয়ে ছিঁড়ে যাবে এই ফাঁস
অদৃষ্টের ইঙ্গিতে দুয়ে একই নীড়ে পড়ি ধরা।
তবু তো দেখেছি নীড় ভেঙে যায় ঝড়ের ঝাপট লেগে
ক্রৌঞ্চ-মিথুন চঞ্চু-সমরে হানে যে পরস্পরে

কুলায়ে রাখিয়া সঙ্গীরে কেহ শূন্যে ঘুরিছে বেগে
মানস-লক্ষ্যে কেহ উড়ে যায়, কেহ নীড়ে কেঁদে মরে।
এ সংসারের উপর-তলায় বজায় রাখিয়া ঠাট
নীচের তলায় বহু বিপ্লবে অনেকে ছন্নছাড়া,
শুরু না হইতে বহু হতভাগা ভাঙিয়া দিয়াছে হাট
অনেক প্রবাহ পঙ্ককুণ্ডে হারাল জীবনধারা।
হিসাব-নিকাশ আমরা করি নি চলিয়াছি হেঁট-মুখে
দিয়েছি কেবল, ফিরিয়া পাইতে কাহারো ছিল না মন
বুদ্বুদ কভু উঠিতে দেখি নি গভীর সাগর-বুকে
প্রেমের স্পর্শে সফল হয়েছে সামান্য আয়োজন।
সে প্রেমের কথা কেহ তো জানে না গোপনে প্রকাশ তার
সবাই দেখেছে হাসিমুখ প্রিয়ে, জানে না প্রেমের ব্যথা
বক্ষ নিঙাড়ি দিয়াছি দুজনে তাই চলে সংসার
তুমি আমি শুধু জানি, আর কেহ জানিবে না সেই কথা।

* * *

এ নহে দর্শন বন্ধু, হৃদয়ের গাঢ় অনুভূতি
ছন্দে গানে আমি চাই সাধ্যমত করিতে প্রকাশ,
সহজ সরল ভাবে এ আমার মনের আকুতি,
অপরে উদ্দেশ করি নিজেকেই দিই যে আশ্বাস।
এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা কবি তাঁহারে ধেয়াই,
জীবনের অভিজ্ঞতা—অভিজ্ঞতা কঠিন কঠোর
যত দিন যায় শুদ্ধ প্রেম হয়ে বিকশিছে তাই
এ নহে দর্শন-চিন্তা, নিত্য সত্য ভালবাসা মোর।
তিনি ছাড়া সব কিছু খুঁজেছিনু জীবন-সমরে,
অনেক আকাঙ্ক্ষা মোর ছিল মোর অসংখ্য বিলাস,
অনেক কষিনু দাগ হৃদয়ের নিকষ-পাথরে
মূল্যবান ধাতুমূল্য দিনে দিনে হয়ে এল হ্রাস।
যে দাগ অস্পষ্ট ছিল, চেয়ে দেখি বিস্মিত অন্তরে
ভাস্বর দীপ্তিতে তাই ছায় মোর মনের আকাশ।

ভালুক

(Anton Chekov-এর 'The Bear' নাটিকার অনুবাদ)

চরিত্র—এলেনা আইভানোভ্‌না পপভা—তরুণী বিধবা, গালে টোল খায়, কিছু ভূসম্পত্তি আছে।

গ্রেগরী স্টেপানভিচ্‌ স্মারনভ্‌—মধ্যবয়স্ক জমিদার

লুকা—পপভার পুরাতন চাকর

পর্দা উঠলে দেখা যাবে পপভার বসার ঘর। পপভা শোকবিচলিতভাবে ব'সে আছে। দৃষ্টি একটি ফোটোগ্রাফের উপর নিবদ্ধ। লুকা তার সঙ্গে কথা কইবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

লুকা। এ তুমি শুধু শুধু নিজেকে শুকিয়ে মারছ মা! ঝি চাকর সকলে ফল কুড়োতে গেছে, হেন কেউ নেই যে স্ফূর্তি করছে না, বাড়ির বেড়ালটা পর্যন্ত উঠনে লাফিয়ে লাফিয়ে শিকার ধ'রে বেড়াচ্ছে। তুমিই শুধু একলা ঘরের ভেতর মুখ অন্ধকার ক'রে ব'সে আছ—না হাসি, না আনন্দ! হ্যাঁ, তা এক বছর, ভেবে দেখতে গেলে প্রায় বছর খানেক তুমি বাড়ি থেকে কোথাও বারই হও নি।

পপভা। আর কোনও দিন বার হব না। (দীর্ঘশ্বাস) কেনই বা হব? আমার জীবনের আর কি আছে? ওঁর কবর ঐ বাইরের মাটির তলায়, আর আমার এই চারটে শূন্য দেয়ালের মধ্যে। মরণ আমাদের দুজনকেই কোলে টেনে নিয়েছে।

লুকা। ঐঃ—ঐ হ'ল! কর্তা মারা গেলেন, তা কি আর করবে বল, ভগবানের ইচ্ছে। আহা, স্বর্গে তিনি শান্তি পান। তা তুমি তো তাঁর জন্যে কান্নাকাটি করলে, আহা, সে উচিত কাজই করেছ। আহা, সময় যখন এল, আমার বুড়ীও তো আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল। বেশ, আমিও তার জন্যে কাঁদলুম, মাসাধিক কাল ব'সে ব'সে কাঁদলুম। কিন্তু তাই ব'লে জীবন ভোর কাঁদব কি? (সনিশ্বাসে) আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই; কোথাও যাও না, কারুর মুখ দেখ না পর্যন্ত! আমরা যেন মাকড়সার মত অন্ধকারে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছি। এমন তো নয় যে আশেপাশে ভদ্দরলোক নেই, জেলায় মানুষের তো অভাব নেই। ঐ তো রিবূলভে সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে—অফিসারগুলোকে দেখতে কি! মাথা ঘুরে যায়। শুক্কুরবার শুক্কুরবার কেমন নাচ হয়, গড়ের বাদ্যি বাজে! আহা, তোমার এই কাঁচা বয়েস,

এই চেহারা, এমন টুকটুকে গাল, এই এখনই যা সাধ-আহ্লাদ মেটাবার! রূপ তো আর চিরদিন থাকে না! দশ বছর বাদে কি আর ঐ অফিসারেরা ফিরেও তাকাবে? তা আর হবে না, সবই চুকে যাবে।

পপভা। (জোরের সঙ্গে) দেখ, আমার সামনে এসব কথা তুমি মুখে আনবে না। তুমি জান, নিকোলাই যখন মারা গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও মেরে রেখে গেল। প্রতিজ্ঞা করলুম যে, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বিধবার বেশে থাকব—পৃথিবীর মুখ দেখব না। স্বর্গ থেকে সে দেখুক, জানুক আমার ভালবাসা,—হ্যাঁ, তোমার তো অজানা নেই, নিকোলাইয়ের কোন দুখ-দরদ ছিল না, আমার প্রতি কোন মায়া-মমতা ছিল না ওর। এমন কি অন্য মেয়েকে পর্যন্ত—। কিন্তু আমি? আমি মৃত্যু পর্যন্ত ওর বিধবা হয়ে থাকব। দেখাব, আমি কেমন ক'রে ভালবাসতে পারি। কবরের তলা থেকে ও দেখুক, ওর মৃত্যুর আগে আমি কেমন ছিলাম।

লুকা। বাপু, এসব কথা না ব'লে, বাগানে খানিকটা বেড়িয়ে এস, নয়তো বল, টবি আর ওর জুড়ি ঘোড়াটাকে জুতে দিই, বাইরে মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে এস।

পপভা। ওঃ! ওঃ! (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল)

লুকা। কি হ'ল? ও মা, এ কি হ'ল গো! রক্ষে কর!

পপভা। আহা, কি ভালই বাসতেন টবিকে! যখন বেরুতেন, ওর ওপর চেপেই না বার হতেন, আর কেমন সওয়ার ছিলেন! লাগামখানা টেনে যখন ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেন, তখন কি ভালই না দেখাত! টবি—টবি—টবিকে আজ একটু বেশি ক'রে দানা দিতে বল।

লুকা। যে আজ্ঞে। (বিকট জোরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল)

পপভা। (চমকে উঠে) আঃ! কে? ব'লে দাও তো, আমি লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি না।

লুকা। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

পপভা। (ছবিটার দিকে তাকিয়ে) দেখছ, ওগো, দেখছ, আমি কত ভালবাসতে পারি, কেমন সব ক্ষমা করতে পারি। আমার

ভালবাসা আমার আগে মরবে না, তার কাঁপন আমার এই বুকের কাঁপনের আগে থামবে না। (কান্নার ভেতর মুখে হাসি ফুটে উঠল) লজ্জা করে না? আমার এই বয়েস, তবু আমি একলা ঘরের ভেতর প'ড়ে রয়েছি, মৃত্যু পর্যন্ত শুধু তোমারই বিধবা হয়ে থাকব, আর তুমি—? লজ্জা ক'রে না তোমার, দুষ্টু? আমাকে ঠকিয়ে, আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, হপ্তার পর হপ্তা আমাকে একলা ফেলে রেখে—

লুকা। (চকিতভাবে ঘরে ঢুকে) অ মা, একটা লোক আপনাকে খুঁজছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

পপভা। তুমি কি তাঁকে বল নি যে, আমার স্বামী মারা যাবার পর আমি আর কারুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি না?

লুকা। বললাম তো, কিন্তু সে যে কিছুতেই শোনে না, যত বোঝাই তত বলে, ভীষণ দরকার।

পপভা। আমি দেখা করি না—

লুকা। বোঝালাম, কিন্তু লোকটা—যমও নেয় না—গালমন্দ করতে করতে সোজা ঢুকে আসছে। এতক্ষণে বোধ হয় খাবার-ঘর অবধি চ'লে এসেছে।

পপভা। (বিরক্তির সঙ্গে) বেশ, তাঁকে আসতে বল। কি অভদ্র! (লুকার প্রস্থান) এই লোকগুলো যে কেন আমায় জ্বালায়! লোকটা চায় কি? কেন যে আমার শান্তি নষ্ট করে! (সনিশ্বাসে) নাঃ, আমায় দেখছি কন্‌ভেণ্টে গিয়ে থাকতে হবে। (চিন্তাগ্রস্তভাবে) হ্যাঁ, কন্‌ভেণ্টেই থাকতে হবে গিয়ে—

লুকা ঢুকল. সঙ্গে স্মারনভ

স্মারনভ। (লুকার প্রতি) ব্যাটার খালি কথা আর কথা, ব্যাটা গাধা! (পপভাকে দেখতে পেয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে) ইয়ে, দেখুন, আমার নাম গ্রেগরী—গ্রেগরী স্টেপানভিচ্‌ স্মারনভ—জমিদার আর গোলন্দাজ-বাহিনীর রিটায়ার্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট। বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

পপভা। (হাত না বাড়িয়ে) কি চাই আপনার?

স্মা। আপনার স্বর্গত স্বামীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল, মারা যাবার আগে তিনি আমার কাছে বারো শো টাকা[১] দেনা রেখে যান। কাল আমায় বন্ধকী সুদ দিতে হবে। তাঁর সেই টাকাটা আপনি আজ আমায়—

পপভা। বা—রো—শো! তা এত টাকা আমার স্বামী আপনার কাছে ধার করেছিলেন কেন?

স্মা। তিনি আমার কাছ থেকে দানা[২] নিতেন।

প। (সনিশ্বাসে লুকার প্রতি) লুকা, টবিকে খানিকটা বেশি ওট্ দিতে ভুলো না যেন। (লুকার প্রস্থান) তা নিকোলাই যদি আপনার কাছে টাকা ধার ক'রে থাকেন, তা হ'লে আপনার সে টাকা আমি নিশ্চয়ই শোধ দোব; কিন্তু আজকের মত আমায় মাপ করতে হবে। কারণ ঠিক এখন আমার হাতে বাড়তি কিছু নেই। পরশু আমাদের সরকার শহর থেকে ফিরে আসবে, আর সে এলেই আমি তাকে আপনার টাকা শোধ করার কথা ব'লে দোব। কিন্তু এখন আপনার ইচ্ছেমত আমি টাকাটা কিছুতেই দিতে পারি না। আর তা ছাড়া ঠিক সাত মাস আগে আমার স্বামী মারা যান, আমার এখন আদৌ টাকাকড়ির দিকে নজর দেবার মত মানসিক অবস্থা নয়।

স্মা। আর আমার এখন মানসিক অবস্থা এমনি যে, কালকেই যদি সুদের টাকা দিতে না পারি, তা হ'লে এই পৈতৃক প্রাণটাকেই দিয়ে দিতে হবে। পাওনাদারে আমার যথাসর্বস্ব ক্রোক ক'রে নেবে।

প। আপনার টাকাটা আপনি পরশুই পাবেন।

স্মা। আমি পরশু টাকা চাই না, আমি আজই চাই।

প। আমায় মাপ করতে হবে, আজকে আমি কিছু দিতে পারব না।

স্মা। কাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে গেলে আমার চলবে না।

প। তা, টাকা না থাকলে আমি কি করতে পারি, বলুন?

---

১ মূলে Ruble (রুব্‌ল্) আছে।
২ মূলে Oat (ওট্) আছে।

স্মা। তার মানে, আপনি বলতে চান যে, আপনি আমায় এখন টাকা দিতে পারবেন না?

প। না।

স্মা। তা হ'লে এই আপনার শেষ কথা?

প। হ্যাঁ, শেষ কথা।

স্মা। একেবারে শেষ কথা, অ্যাঁ, একেবারে চূড়ান্ত কথা?

প। ঠিক তাই।

স্মা। ধন্যবাদ। টুকে নিচ্ছি। (কাঁধ ঝাঁকুনি দিল) এর ওপরেও লোকে আমায় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলবে! রাস্তায় একজনের সঙ্গে দেখা হ'লেই অমনি ব'লে ওঠে—আহা, গ্রেগরী, তুমি অত অগ্নিশর্মা হয়ে আছ কেন? কিন্তু না রেগে আমি থাকি কি ক'রে? টাকা না হ'লে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাল থেকে এই এখন পর্যন্ত দেনদার ব্যাটাদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরলাম, তা কোন ব্যাটা এক পয়সা শোধ দিলে না! হয়রানিতে মরমর হয়ে, প'ড়ো সরাইখানায় মদের পিপে মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে, শেষকালে এখানে এলাম বাড়ির থেকে বিশ ক্রোশ দূরে। আর এসে কি শুনছি, না, 'মানসিক অবস্থা'! এতে কেন রাগ হবে না?

প। আপনাকে স্পষ্টভাবে ব'লে দিয়েছি যে, আমার সরকার শহর থেকে ফিরে এলেই আপনার টাকা আপনাকে দিয়ে দোব।

স্মা। আমি তো আর আপনার সরকারের কাছে আসি নি, এসেছি আপনার কাছে। আপনার সরকার চুলোয় যাকগে,—মানে, বললাম ব'লে কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমার তাতে কি?

প। দেখুন, আমায় মাপ করবেন। এ রকম চড়া গলায় এ জাতীয় কথাবার্তা শোনা আমার অভ্যেস নেই। এখন এ বিষয়ে আমি আর কোন কথা শুনতে পারব না।

স্মা। খুব ভাল। মানসিক অবস্থা···সাত মাস আগে স্বামী মারা গেছেন! বলি, আমায় সুদ দিতে হবে, না, হবে না? আপনার না হয় স্বামী মারা গেছেন, আর আপনার মানসিক অবস্থা না কি ছাই হয়েছে, আর আপনার সরকার কোথায় কোন্ চুলোয় গিয়েছে!

কিন্তু এখন আমি কি করব? আপনি কি মনে করেন যে, আমি বেলুনে চেপে পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে পালাব? না কি দেয়ালে মাথা ঠুকব? গ্রুসদেভের কাছে গেলাম,—বাড়ি নেই। ইয়ারোশোভিচ ব্যাটা, আমায় দেখেই ঘাপটি মেরে রইল। কুরিট্সিনের সঙ্গে তো হাতাহাতি হয়ে গেল, আর একটু হ'লেই জানলা গলিয়ে ফেলে দিচ্ছিলাম। মাজুগোর পেটে কি মুণ্ডু হয়েছে! আর এঁর 'মানসিক অবস্থা'! কোন ব্যাটা আমায় এক পয়সা শোধ দিলে না! এর কারণ আর কিছু নয়, এদের সঙ্গে আমি নেহাত নরম ব্যবহার করেছি, নেহাত একটা ক্যাব্লা গোবেচারার মত চুপ ক'রে আছি ব'লে। নেহাত নরম ব্যবহার। বহুৎ আচ্ছা! দাঁড়াও, আমার আসল রূপ আমি দেখাব। আমাকে নিয়ে খেলানো আর চলবে না। যতক্ষণ না টাকা পাচ্ছি, ততক্ষণ এখান থেকে এক পা নড়ছি না। (পপভা চ'লে গেল) উঃ, কি রাগটাই না হচ্ছে! সর্বশরীর রাগে কাঁপছে, নিশ্বেস পর্যন্ত নিতে পারছি না। উঃ, অসুখ না করে! (চীৎকার ক'রে) এই বেয়ারা!

লুকা। কি হয়েছে?

স্মা। জল নিয়ে আয়। (লুকা চ'লে গেল) উঃ, কি যুক্তি! একটা লোক পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে, আর উনি পয়সা দেবেন না। কেন? না, ওঁর এখন টাকাকড়ির ব্যাপারে মন দেবার মত মন নেই। যত রাজ্যের মেয়েলিপনা। এই জন্যে আমি কখনও আজ পর্যন্ত মেয়েমানুষকে সইতে পারি না। বরং বরফের বস্তার ওপর ব'সে থাকব, কিন্তু মেয়েমানুষের কাছে নয়। সারা শরীর একেবারে কন্‌কনিয়ে উঠছে, আর সবই এই ন্যাকামির জন্যে। এই সমস্ত কবিয়ানা দূর থেকে দেখলেও আমার গা জ্ব'লে ওঠে—স্রেফ রাগে জ্ব'লে ওঠে। এসব আমার দু চক্ষের বিষ।

লুকা ঢুকল, হাতে জল

লুকা। গিন্নীমার শরীর খারাপ হয়েছে, তিনি আসতে পারবেন না।

স্মা। বেরিয়ে যাও। (লুকার প্রস্থান) শরীর খারাপ! আসতে

পারবেন না! ঠিক আছে, আসবার দরকার নেই। যতক্ষণ না টাকা পাচ্ছি, এই আমি এইখানে গ্যাঁট হয়ে ব'সে রইলাম। শরীর তোমার সাত দিন খারাপ হয়ে প'ড়ে থাকুক, আমি এইখানে সাত দিন প'ড়ে থাকব। এক বছর খারাপ হয়ে থাকুক, আমি এক বছর থাকব। নিজের কড়ি আমি ঠিক বুঝে নোব। ওসব বিধবার ভোল আর গালের টোল ও আমার কাছে চলবে না। ওসব চাল আর টোল-খাওয়া গাল আমার ঢের দেখা আছে। (জানালা থেকে হাঁক দিলে) সাইমন, ঘোড়াগুলোকে গাড়ি থেকে খুলে দাও, আমি এখন এখান থেকে যাচ্ছি না। আমি এখন এইখানেই থাকব। আস্তাবলের লোকগুলোকে বল, যেন ঘোড়াগুলোকে দানা দেয়। ব্যাটা আবার লাগামে ঘোড়ার পা জড়িয়ে ফেলেছে! (জানালা থেকে স'রে গেল) ওঃ, বেজায় গরম পড়েছে! তার ওপর কোন ব্যাটা কিছু দিচ্ছে না, রাতে ঘুম হয় নি, আর সব্বার ওপরে এখানে এসে এক শোকের ধাপ্পা আর 'মানসিক অবস্থা'! উঃ, মাথা দপদপ করছে! খানিকটা ভডকা খাব নাকি, অ্যাঁ? হ্যাঁ, তাই খাওয়া যাক খানিকটা! (চীৎকার ক'রে) বেয়ারা!

লুকা ঢুকল

লুকা। কি হ'ল?

স্মা। ভডকা এক গেলাস—ভডকা। (লুকা চ'লে গেল।) উঃফ! (ব'সে ব'সে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল) স্বীকার করতেই হবে যে, একেবারে অপরূপ দেখাচ্ছে। সারা গায়ে ধুলো, জুতো নোংরা, জামাকাপড় আকাচা আভাঁজ, কোটের গায়ে খড় লেগে আছে। ভদ্রমহিলা যে আমায় ডাকাত ভাবেন নি, এইটেই আশ্চর্য! (হাই তুলল) এ রকম ভাবে বসার ঘরে ঢুকে পড়াটা এক রকম অভদ্রতাই বলতে হবে। কিন্তু কি করব? আমি নিরুপায়। আমি তো আর এখানে বেড়াতে আসি নি, এসেছি পাওনার টাকা আদায় করতে। আর পাওনাদারদের তো আর কোন বাঁধাধরা পোশাকের বালাই নেই।

লুকা ঢুকল, হাতে ভডকা

লুকা। আপনি, আজ্ঞে, একটু বাড়াবাড়ি করছেন।

স্মা। (রাগতভাবে) কি?

লুকা। ইয়ে—আজ্ঞে—বিশেষ কিছু না।

স্মা। বলি, কার সঙ্গে কথা কইছিস? চুপ ক'রে থাক্।

লুকা। (জনান্তিকে) ব্যাটা শয়তান এইখানেই র'য়ে গেল; কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম! (প্রস্থান)

স্মা। কি রাগটাই না হচ্ছে! এত রাগ হচ্ছে যে, মনে হচ্ছে যেন দুনিয়াটাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারি। শরীরটা পর্যন্ত যেন খারাপ-খারাপ মনে হচ্ছে। (চীৎকার) বেয়ারা!

পপভার প্রবেশ

পপভা। দেখুন, একা একা শান্তিতে বাস ক'রে পুরুষমানুষের গলা শোনা আমার অনভ্যেস হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া চীৎকার আমার একেবারে অসহ্য লাগে। আমি আপনাকে ব'লে দিচ্ছি যে, আপনি আমার শান্তি নষ্ট করবেন না।

স্মা। আমার টাকা ফেলে দিন, আমি চ'লে যাচ্ছি।

প। আমি তো আপনাকে বেশ পরিষ্কারভাবে ব'লে দিয়েছি যে, এখন আমার হাতে বাড়তি কিছু নেই। পরশু অবধি আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

স্মা। আর আমিও তো আপনাকে বেশ পরিষ্কারভাবে ব'লে দিয়েছি যে, পরশু আমার টাকার দরকার নেই, আমার আজকেই দরকার। আজ যদি আপনি আমায় টাকা না দেন তো কাল আমায় গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলতে হবে।

পপভা। কিন্তু টাকা না থাকলে আমি কি করব? এমন অদ্ভুত লোক—

স্মা। তা হ'লে আপনি আজ আমায় টাকা দেবেন না, অ্যাঁ?

পপভা। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

স্মা। তাই যদি হয়, তা হ'লে এই আমি এখানে বসলাম। যতক্ষণ টাকা না পাচ্ছি, ততক্ষণ নড়ছি না। (ব'সে পড়ল) তা হ'লে আপনি আমায় পরশু টাকা দেবেন? বহুৎ আচ্ছা! আমি এখানে পরশু অবধিই ব'সে থাকব। সারাক্ষণ ব'সে থাকব। (লাফিয়ে উঠল) বলি, কাল আমার টাকাটা দিতে হবে, না, হবে না? না কি এই নিয়ে আমি মস্করা করতে এসেছি?

পপভা। দেখুন, চেঁচাবেন না, এটা ঘোড়ার আস্তাবল নয়।

স্মা। আস্তাবলের কথা আমি জিজ্ঞেস করছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি যে, কাল আমায় টাকা দিতে হবে, না, হবে না?

পপভা। আপনি ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কি ক'রে ব্যবহার করতে হয় তা জানেন না।

স্মা। নাঃ, জানি না। ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি না।

পপভা। না, জানেন না। আপনি একটা অসভ্য ইতর। কোনও ভদ্রলোক কখনও ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে এ রকম ভাবে কথা বলে না।

স্মা। বাহবা! তা হ'লে আপনার সঙ্গে কি রকম ভাবে কথা বলতে হবে? ফরাসী ভাষায় কথা কইতে হবে কি? (মেজাজ খারাপ ক'রে ব্যঙ্গের সুরে) আপনি টাকাটা না দেওয়াতে আমার কি ভালই লাগছে! মাপ করবেন, আপনাকে আবার বিরক্ত করলুম। আজকের দিনটা কি সুন্দর! এই কাপড়টায় আপনাকে এমন চমৎকার মানিয়েছে! (নমস্কার করল)

পপভা। এটা একটা গোলা লোকের মত, চোয়াড়ের মত ব্যবহার হচ্ছে।

স্মা। (খোঁচা দিয়ে) গোলা লোক! চোয়াড়! ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কি ক'রে ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি না! বলি, আপনি যত চড়ুই দেখেছেন, তার চেয়ে ঢের ঢের ভদ্রমহিলা আমার দেখা আছে। এই সব ব্যাপারে জড়িয়ে আমি তিনবার ডুয়েল লড়েছি। বারো জন আমার কাছে ধরা দিয়েছিল, আর ন জন ধরা দেয় নি। হ্যাঁ, এমন দিনও ছিল—এমন দিনও ছিল, যখন আমি বোকার মত গায়ে সেণ্ট মেখে, মিষ্টি মিষ্টি কথা ব'লে, হেসে হেসে কথা ব'লে, হেসে হেসে নমস্কার ক'রে, আংটি বোতাম চড়িয়ে ঘুরে বেড়াতাম। ভালবাসতাম, কষ্ট পেতাম, চাঁদের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ছাড়তাম, এই রেগে যেতাম, এই গ'লে যেতাম, এই জ'মে যেতাম, প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম, পাগলের মত ভালবাসতাম। যম জানে, কি যে না করেছি! মুক্তি-আন্দোলনের

সপক্ষে পায়রার মত বকবকিয়ে বেড়াতাম। অর্ধেক টাকা তো দয়াবৃত্তির চর্চা ক'রেই উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন? এখন আর সেটি চলছে না। ওসব অনেক হয়েছে। কালো চোখ, আকুল আঁখি, ডালিম-রাঙা ঠোঁট, টোল-খাওয়া গাল, চাঁদ, আধো ভাষ, মৃদু শ্বাস—এখন আর ওসবের পেছনে একটি তাঁবার পয়সাও খসাচ্ছি না। আপনার সম্বন্ধে কিছু বলছি না, কিন্তু ছোট বড় সমস্ত মেয়েমানুষই ভণ্ড, হিংসুটে, বাঁকা মন, হাড়ে হাড়ে মিথ্যেবাদী, আর আড়ালে আড়ালে নিন্দে করা স্বভাব। প্রত্যেকেই অহঙ্কারী, ছোট বিষয়ে মন, নিষ্ঠুর আর অযৌক্তিক। ঐ সব ফুরফুরে কবি কবি জীবদের দিকে তাকান, মন একেবারে আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাবে। কিন্তু একবার তাদের মনের ভেতরটায় তাকান দিকি?—কুমীর! কুমীর! আস্ত মেছো কুমীর। (একটা চেয়ারের পেছন দিক আঁকড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা ভেঙে গেল) কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই কুমীরের যে কোন কারণেই হোক ধারণা হয়েছে যে, হৃদয়বৃত্তির ব্যাপারে তাঁর একচেটিয়া অধিকার, তাঁর বিশেষ দাবি! না না, ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবেন না, ইচ্ছে হয় তো আমায় দু ঘা কষিয়ে দিন, কিন্তু কোলের কুকুরটাকে ছাড়া মেয়েমানুষকে আর কখনও কিছু ভালবাসতে দেখেছেন? পুরুষমানুষ যখন কষ্ট পাচ্ছে, তার যথাসর্বস্ব উজাড় ক'রে দিচ্ছে, মেয়েমানুষের ভালবাসা তখন কিসে প্রকাশ পায়? না, আঁচল নাড়ানোতে আর লোকটাকে আরও বেশি ক'রে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টায়। মেয়েমানুষ হবার দুর্ভোগ তো আপনার হয়েছে, আপনি তো জানেন তাদের স্বভাব কি! আচ্ছা, আপনি সত্যি ক'রে বলুন তো, আপনি কি এমন মেয়ে কোথাও দেখেছেন, যে নাকি ভালবাসার ব্যাপারে অকপট আর একনিষ্ঠ, যে বিশ্বাসঘাতক নয়? আপনি দেখেন নি। কেবল বুড়ী আর খেয়ালীরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে না, তারাই কেবল একনিষ্ঠ থাকে। বরং একটা শিঙওয়ালা বেড়াল, কিংবা একটা সাদা বনমোরগ দেখা যাবে, কিন্তু একনিষ্ঠ নারী নয়।

পপভা। তা হ'লে আপনার মতে ভালবাসার ব্যাপারে কারা একনিষ্ঠ? কারা বিশ্বাসী? পুরুষেরা?

স্মা। হ্যাঁ, পুরুষেরা।

পপভা। পুরুষ! (তিক্ত হাসি হেসে) পুরুষেরা বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ! কথা বটে! (ঝাঁজের সঙ্গে) এ রকম কথা বলার কি অধিকার আছে আপনার? পুরুষেরা বিশ্বাসী আর একনিষ্ঠ? দেখুন, কথা যখন উঠল তা হ'লে বলি, সমস্ত পুরুষ জাতের মধ্যে যাঁদের আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছি, তাঁদের মধ্যে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে আমার স্বামীকে। তাঁকে আমি পাগলের মত আমার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ভালবাসতাম, তাঁর পায়ে আমি আমার জীবন, যৌবন, আনন্দ, পার্থিব সম্পত্তি—যা কিছু সব উজাড় ক'রে দিয়েছিলাম, তাঁর মধ্যেই আমি বেঁচে ছিলাম, তাঁকে পূজা করতাম বলা যায়। সে রকম ভালবাসা কেবল একজন অল্পবয়সী কল্পনাপ্রবণ মেয়ের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু তিনি, সেই সর্বোত্তম ব্যক্তিটি অতি নির্লজ্জের মত আমায় প্রতি পদে পদে ঠকালেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ডেস্ক থেকে এক ড্রয়ার প্রেমপত্র বার হ'ল। আর তিনি যখন বেঁচে ছিলেন—ওঃ! সে কথা ভাবলেও মাথা ঘুরে ওঠে। হপ্তার পর হপ্তা তিনি আমায় একলা ফেলে রেখে অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম ক'রে বেড়াতেন, আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আমায় ঠকিয়েছেন। আমার টাকাকড়ি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ ক'রে খেলা করতে তাঁর বাধে নি। কিন্তু তবুও তাঁকে আমি ভালবেসেছি, তবু তাঁর প্রতি আমি বিশ্বস্ত থেকেছি। আর শুধু সেখানেই শেষ নয়, এখন তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এখনও তাঁর প্রতি আমি বিশ্বস্ত, এখনও তাঁর স্মৃতিকে আমি একনিষ্ঠভাবে বুকে ক'রে রেখে দিয়েছি, আমি চিরদিন এই ঘরের ভেতর একলাটি প'ড়ে থাকব। চিরবিধবা হয়ে থাকব আমি।

স্মা। (অবজ্ঞার সঙ্গে হেসে) চিরবিধবা! আমায় ভেবেছেন কি? যেন আমি আপনার ঐ অন্ধকার কাপড় প'রে, এই ঘরের ভেতর মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকার মানে বুঝি না! এটার মধ্যে কি কবিত্ব! কি রকম ধরা-ছোঁয়ার অতীত ভাব! যখন কোন জমিদার কি পোষা কবি পাশ দিয়ে যাবে, তখন সে মনে মনে ভাববে, আহা, এইখানেই সেই রহস্যময়ী টামারা থাকে, স্বামীর প্রতি ভালবাসা বশত যে পৃথিবীর মুখ দেখে না। এসব খেলা আমার জানা আছে।

পপভা। (ফেটে পড়ল) কি! আপনার এত আস্পর্ধা যে, এই ধরনের কথা আপনি আমায় বলেন!

স্মা। আপনি হয়তো নিজেকে জীয়ন্তে গোর দিয়েছেন। কিন্তু কই, মুখে পাউডার দিতে তো ভোলেন নি?

পপভা। কি? কি বললেন? আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়!

স্মা। দেখুন, দয়া ক'রে চেঁচামেচি করবেন না, আমি আপনার চাকর নই। খাঁটি কথা বলতে দিন। মেয়েমানুষ নই, আর পষ্ট কথা বলার অভ্যেসও রাখি। সুতরাং চেঁচাবেন না।

পপভা। আমি চেঁচাচ্ছি, না, আপনিই চেঁচাচ্ছেন? আপনি আমায় একলা থাকতে দিন।

স্মা। আমার টাকা ফেলুন, চ'লে যাচ্ছি।

পপভা। আমি আপনাকে টাকা দেব না।

স্মা। দিতেই হবে।

পপভা। একটি পয়সা দেব না, থাকলেও না। আপনি আমায় ছেড়ে চ'লে যান।

স্মা। আমি আপনার স্বামীও নই, কিংবা প্রেমিকও নই, সুতরাং দয়া ক'রে সিন্ করবেন না। (বসল) এ আমি পছন্দ করি নে।

পপভা। (রেগে রুদ্ধকণ্ঠে) তা হ'লে আপনি বসলেন?

স্মা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পপভা। আমি আপনাকে বলছি যে, আপনি বেরিয়ে যান।

স্মা। টাকা ফেলুন। (জনান্তিকে) ও কি রাগানটাই না রেগেছি রে বাবা, কি রাগানটাই না রেগেছি!

পপভা। আমি অসভ্য স্কাউণ্ড্রেলদের সঙ্গে কথা বলি না। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান। (থেমে) যাবেন, না, যাবেন না?

স্মা। না।

পপভা। না?

স্মা। না।

পপভা। বেশ। (ঘণ্টা পড়ল, লুকা ঢুকল) লুকা, এই ভদ্রলোককে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

লুকা। (স্মারনভের কাছে এগিয়ে গেল) আজ্ঞে, দেখুন, বলছি, ইয়ে, কিছু না মনে ক'রে দয়া ক'রে বেরিয়ে —। মানে, আপনার ইয়ে করার দরকার নেই।

স্মা। চোপ রও। বলি, কার সঙ্গে কথা কইছিস? মেরে একেবারে হাড় গুঁড়িয়ে দোব।

লুকা। উঃ রে বাবা! কি লোক রে বাবা! (চেয়ারে ধপ ক'রে ব'সে পড়ল) ও, শরীর খারাপ করছে, শরীর খারাপ করছে, নিশ্বেস নিতে পারছি না।

পপভা। ড্যাশা কোথায়? ড্যাশা? (চীৎকার) ড্যাশা! পেলাজিয়া! ড্যাশা! (ঘণ্টা নাড়লে)

লুকা। ওঃ, তারা সব ফল কুড়োতে বাইরে গেছে। কেউ বাড়ি নেই। ওঃ, মাথা ঘুরছে। জল! জল!

পপভা। (স্মারনভকে) বেরিয়ে যান এখান থেকে।

স্মা। আপনি কি একটু ভদ্র ব্যবহার করতে পারেন না?

পপভা। (ঘুষি পাকাল, পা দিয়ে মাটিতে লাথি ঠুকল) একটা ছোটলোক, একটা জংলী ভাল্লুক, একটা ডাকাত!

স্মা। কি? কি বললেন?

পপভা। বলছি যে, আপনি একটা ভাল্লুক, একটা ডাকাত!

স্মা। (এগিয়ে গিয়ে) কোন্ অধিকারে আমায় অপমান করেন?

পপভা। অপমান? মনে করেছেন যে, আমি আপনাকে ভয় করব?

স্মা। আর আপনি কি মনে করেছেন যে, আপনার কবিত্বের জন্যে আমি আপনাকে ছেড়ে কথা কইব? অ্যাঁ? আমি এ ব্যাপার নিয়ে ল'ড়ে যাব।

লুকা। ওরে বাবা! কি লোক রে বাবা! জল! জল!

স্মা। পিস্তল!

পপভা। আপনি কি মনে করেন যে, আপনার ঐ মুখকো চেহারা দেখে আর ষাঁড়ের মত গলা শুনে, আমি ভয় পেয়ে যাব? অ্যাঁ? গুণ্ডা শয়তান কোথাকার!

স্মা। আমি ল'ড়ে যাব। ওসব মেয়েমানুষ-টানুষ আমি কেয়ার না। ওঃ, 'কোমল'ই বটে—

পপভা। (বক্তৃতায় বাধা দেবার চেষ্টা ক'রে) ভাল্লুক! একটা ভাল্লুক! ভাল্লুক!

স্মা। কেবল পুরুষেরা অপমান করলেই যে তার শোধ নিতে হবে—এটা একটা কুসংস্কার। এ সবের দিন চ'লে গেছে। সমানাধিকার যদি চান তো পেতে পারেন। এ অপমান আমি সইব না, ল'ড়ে যাব।

পপভা। পিস্তল দিয়ে? বেশ।

স্মা। এখনই, এই মুহূর্তে।

পপভা। এ-ক্ষু-নি। আমার স্বামীর অনেকগুলো পিস্তল ছিল, আমি আনছি গিয়ে। (যেতে যেতে ফিরে তাকাল) ঐ হেঁড়ে তাল-মাথার ভেতর একটা আস্ত গুলি ঢোকাতে পারলে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। যম নিক, যম নিক— (প্রস্থান)

স্মা। মুরগীর ছানার মত টিপে শেষ ক'রে ফেলব। খোকাও নই, হ্যাকাও নই। ওসব অবলা-ফবলা আমি মানি নে।

লুকা। দোহাই বাবা, (হাঁটু গেড়ে) এই বুড়োর ওপর দয়া ক'রে অন্তত এখান থেকে যান। গিন্নীমা এমনিতেই ভয়ে মরমর হয়ে গেছেন, আর আপনি তাঁকে গুলি করব ব'লে শাসাচ্ছেন!

স্মা। (না শুনে) লড়তে যদি আসে, তা হ'লেই হ'ল, সমানাধিকার—মুক্তি। এখানে তো আর স্ত্রীপুরুষে কোন ভেদ নেই। আমি গুলি করব, নিছক নীতিগত ভাবে গুলি করব। কিন্তু কি মেয়ে রে বাবা! (ভেংচে) যম নিক, যম নিক! হেঁড়ে তাল-মাথার ভেতরে গুলি ঢোকালে তবে প্রাণ জুড়োয়! কিন্তু কি রকম লাল হয়ে উঠল, কি রকম ভাবে গাল দুটো চকচক করতে লাগল! উঃ, আমার চ্যালেঞ্জ মেনে নিলে—জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

লুকা। হুজুর, দোহাই আপনার, যান। আমি চিরটা কাল আপনার নাম ক'রে ভগবানের কাছে ডাকব।

স্মা। এই হচ্ছে নারী। এই রকমই আমি বুঝি। একেবারে

সত্যিকারের নারী। ও ট'কো-মুখ আচারের হাঁড়ি নয়, এ হ'ল আগুন—বারুদ, হাউই। গুলি করতে হবে ভেবে দুঃখই হচ্ছে।

লুকা। দোহাই হুজুর, যান।

স্মা। ওর সবটাই আমার ভাল লাগছে। সবটাই। যদিও গাল দুটো একটু টোল খাওয়া, তবুও ভাল লাগছে। ধারটা শোধ না নিলেও চলে। রাগও আর নেই আমার। আশ্চর্য! আশ্চর্য মেয়ে!

পপভা ঢুকল, হাতে পিস্তল

পপভা। এই—এই হ'ল পিস্তল। কিন্তু লড়ায়ের আগে আমায় কি ক'রে গুলি ছুঁড়তে হয়, দেখিয়ে দিতে হবে। আমি আগে কখনও পিস্তল ছুঁড়ি নি।

লুকা। ঠাকুর, দয়া ক'রে বাঁচান। দেখি, গাড়োয়ান আর কোচ্‌ম্যানটাকে ডেকে আনি। আঃ, এ অভিশাপটা এল কেন রে বাবা! (প্রস্থান)

স্মা। (পিস্তলগুলো নিয়ে বোঝাতে লাগল) এই যে, দেখুন। পিস্তল অনেক রকমের আছে। এই হ'ল মর্টিমার পিস্তল, এগুলো কেবল ডুয়েলের জন্যেই তৈরি। এই হ'ল স্মিথ, আর এই হ'ল ওয়েসন্‌ রিভলভার, খাসা জিনিস। এ এক জোড়া কখনই নব্বই টাকার কম দাম নয়। রিভলভার এই এমনি ক'রে ধরতে হয়। (জনান্তিকে) কি চোখ, কি চোখ, প্রেরণা এনে দেয়!

পপভা। এমনি ক'রে?

স্মা। হ্যাঁ, অমনি ক'রে। তার পরে ঘোড়াটা টিপে ধরুন আর এমনি ক'রে তাগ করুন, মাথাটা একটু হেলান, হাতটা ঠিক রাখুন—হ্যাঁ, অমনি ক'রে, তারপর ঘোড়াটা টিপে দিন। বাস্‌, কেল্লাফতে। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, মাথাটি ঠাণ্ডা রেখে, ঠিকমত তাগ করতে হবে, কখখনও হাত কাঁপাবেন না।

পপভা। এই ঘরের ভেতর গুলি-টুলি ছোঁড়ার অসুবিধে আছে। চলুন, বাগানে চলুন।

স্মা। চলুন তা হ'লে। কিন্তু আমি ব'লে দিচ্ছি, আমি আকাশে গুলি ছুঁড়ব।

পপভা। এই হ'ল শেষ অবলম্বন। কিন্তু কেন?

স্মা। কারণ—কারণ আমার খুশি।

পপভা। কি, ভয় করছে নাকি? অ্যাঁ? না না, ও-রকম ক'রে এড়ানো যাবে না। আসুন আপনি আমার সঙ্গে। ওই কপালে যতক্ষণ না একটা গুলি দাগছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই—ওই কপালে। কি, ভয় হচ্ছে নাকি?

স্মা। হ্যাঁ, আমার ভয় করছে।

পপভা। মিথ্যে কথা। কেন, লড়বেন না কেন?

স্মা। কারণ—কারণ—আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

পপভা। (হেসে) আমাকে ভাল লাগছে! এতখানি বুকের পাটা, বলে কিনা—আমাকে ভাল লাগছে! (দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে) রাস্তা দেখুন।

স্মা। (নিঃশব্দে গুলি ভরল, টুপি নিল, দরজার দিকে গেল। মিনিট খানেক সেখানে যখন তারা নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন সে দোনা-মোনা করতে করতে এগিয়ে এল) শুনুন, আপনি কি এখনও রেগে আছেন? আমারও ভীষণ বিরক্তি লাগছে। কিন্তু বুঝছেন— কি ক'রে খুলে বলি? মানে, আপনি বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটা হচ্ছে, মানে—বলতে গেলে—(চীৎকার) আপনাকে আমার ভাল লাগছে—এটা কি আমার দোষ? (একটা চেয়ার আঁকড়ে ধরতে চেয়ারটা সশব্দে ভেঙে গেল) মরুকগে, খালি খালি আপনার আসবাব-পত্তর নষ্ট করছি। আপনাকে আমার ভাল লাগছে। বুঝছেন না? আমি—আমি বলতে গেলে আপনাকে ভালবাসি।

পপভা। বেরিয়ে যান এখান থেকে। দু চক্ষের বিষ!

স্মা। হায় ভগবান! এ কি মেয়ে! জীবনে কখনও এ রকম দেখি নি। আমার হয়ে গেছে, আর আশা নেই। ইঁদুরের মত জাঁতাকলে প'ড়ে জব্দ হয়ে গেছি।

পপভা। স'রে দাঁড়ান, নয় তো গুলি করব।

স্মা। করুন তা হ'লে গুলি। আপনি বুঝবেন না, ঐ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মরাতেও কি সুখ—ঐ মাখনের মত হাতে গুলি

খাওয়াতেও কি আনন্দ! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। দেখুন, ভেবে দেখুন, এখনই মন স্থির ক'রে ফেলুন। একবার চ'লে গেলে, জীবনে আর কখনও দেখা হবে না। এখনই যা করবার ঠিক ক'রে ফেলুন। আমার জায়গা-জমি আছে, স্বভাব-চরিত্রও ভাল, বছরে দশ হাজার টাকা আয়, হাতের তাগ এমনি যে হাওয়ায় টাকা ছুঁড়ে সেটাকে বিঁধতে পারি, অনেকগুলো ভাল ঘোড়াও আছে আমার। বিয়ে করবেন আমাকে?

পপভা। (অবজ্ঞার সঙ্গে রিভলভার ঝাঁকি দিয়ে) চলুন বাইরে, ল'ড়ে যান।

স্মা। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কিছু বুঝতে পারছি না। (চীৎকার) বেয়ারা, জল—

পপভা। চলুন, চলুন, ল'ড়ে যান।

স্মা। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বোকার মত, বাচ্চা ছেলের মত প্রেমে প'ড়ে গেছি। (পপভার হাত ধ'রে ফেললে, সে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠল) আমি আপনাকে ভালবাসি (হাঁটু গাড়ল) জীবনে কখনও আমি এ রকম ভাবে ভালবাসি নি। বারো জন মেয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছিল, আর ন জন দেয় নি। কিন্তু তাদের কারুকে আমি এ রকম ভাবে ভালবাসি নি। আমি নেতিয়ে পড়েছি, মোমের মত গ'লে যাচ্ছি, বোকার মত হাঁটু গেড়ে ব'সে ভালবাসা চাইছি। ছি ছি! আজ পাঁচ বছর প্রেমে পড়ি নি, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম পর্যন্ত, আর হঠাৎ এমন প্রেমে প'ড়ে ছটফট করছি, যেন জলের মাছকে ডাঙায় তোলা হয়েছে। হ্যাঁ, কি, না? তুমি আমায় চাও না? (উঠে দরজার দিকে গেল)

পপভা। থামুন।

স্মা। কি?

পপভা। না, কিছু না। চ'লে যান। না, থামুন। না, চ'লে যান, চ'লে যান। আপনাকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। না না, যাবেন না। ওঃ, যদি জানতেন! আমার এত রাগ হচ্ছে, এত রাগ হচ্ছে! (রিভলভার টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে) এই সবের জন্যে

আমার আঙুলগুলো ফুলে উঠেছে। (রাগে রুমালটা ছিঁড়ে) দাঁড়িয়ে আছেন যে বড়? চ'লে যান।

স্মা। নমস্কার।

পপভা। হ্যাঁ হ্যাঁ, চ'লে যান। (চীৎকার) কোথায় যাচ্ছেন, কোথায়? থামুন। না না, চ'লে যান। ওঃ, এত রেগে গেছি! না, আমার কাছে আসবেন না, খবরদার, আমার কাছে ঘেঁষবেন না।

স্মা। (কাছে গিয়ে) ওঃ, নিজের ওপর কি রাগটাই না হচ্ছে আমার! একেবারে কলেজের ছেলের মত প্রেমে প'ড়ে গেছি, হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম পর্যন্ত। (রূঢ়ভাবে) আমি তোমাকে ভালবাসি। কেন, কিসের জন্যে তোমাকে ভালবাসতে গেলাম? কালকে আমার দেনা শোধ করতে হবে, চাষের কাজ শুরু করতে হবে—আর এখানে তোমাকে—(তার হাত পপভার কোমরে রাখল) নিজেকে আমি এর জন্যে ক্ষমা করব না,—কখনও না।

পপভা। স'রে যান আমার কাছ থেকে, হাত সরান। আমি আপনাকে দু চক্ষে দেখতে পারি নে। চলুন, পিস্তল নিয়ে—

(একটি দীর্ঘায়ত চুম্বন। লুকা ঢুকল, হাতে কুড়ুল; মালি হাতে গাঁইতি; কোচম্যান, মজুর, ডাণ্ডা ইত্যাদি অস্ত্রে সুসজ্জিত)

লুকা। (চুমু খেতে দেখে) আরে ব্বাপ!

পপভা। (চোখ নামিয়ে) লুকা, আস্তাবলের লোকদের বল যে, টবিকে ওরা যেন আজ একটুও দানা না দেয়।

অনুবাদক—অসিতকুমার

তলানি

মুসোলিনি হিটলার জন্মাবে বার বার
জন্মাবে বাওদাই শ্রীচিয়াং-কাই-সেক
রাবণ দুর্যোধন বিদুর ও বিভীষণ
ফিরে ফিরে জন্মায় নিয়ে নিয়ে নানা ভেক।

ব্রহ্মবান্ধবের বাংলা রচনা

নবলব্ধ স্বাধীনতার দিনে শ্রীমদ্ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে বিশেষভাবে স্মরণ করি। পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে তিনি জীবন পণ করিয়াছিলেন। আজিকার দিনে তাঁহার অমূল্য রচনাগুলি শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হওয়া উচিত। আক্ষেপের বিষয়, এই সকল রচনা অধুনা দুষ্প্রাপ্য, অনেকেই ইহার সন্ধান রাখেন না। এগুলির সংগ্রহ-গ্রন্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সুলভে প্রচার করিলে একটি মহৎ অনুষ্ঠান হইবে। ব্রহ্মবান্ধবের বাংলা রচনাগুলি সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করিবার জন্য আমরা তাঁহার গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক পঞ্জী সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

১। **বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি**। শ্রাবণ ১৩১৩ (৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ৭৮।

"এই পুস্তিকায় যে কয়খানি চিঠি প্রকাশিত হইল তাহা আমি বিলাত হইতে বঙ্গবাসী পত্রে লিখিয়াছিলাম। শুনিয়াছি যে চিঠিগুলি সাধারণের ভাল লাগিয়াছিল। তাই ঐগুলিকে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।... ২০শে শ্রাবণ ১৩১৩।"

ইহাতে ১০ খানি চিঠি আছে; প্রথম ৯ খানি ১৯০২ সনের নবেম্বর হইতে ১৯০৩ সনের জুন মাসের মধ্যে বিলাত হইতে লেখা; ১০ম বা শেষখানির তারিখ—"৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা।"

ব্রহ্মবান্ধব লিখিয়াছেন:—"বিলাত দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে সভ্যতা সামাজিকতা লৌকতা আচার ব্যবহার—এই সকল বিষয়ে হিন্দুজাতি ইংরেজ অপেক্ষা অনেক বড়। যে নব্য সংস্কারকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতা দেখিয়া হিন্দুকে হীন মনে করেন তাঁহারা অত্যন্ত কৃপাপাত্র। আমাদের দেশে এক্ষণে যে অনাচার বা কুসংস্কার নাই তাহা নহে। আর ইংরেজের কাছে যে কিছু শিখিবার নাই তাহাও নহে। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করা যায় যে হিন্দুর আন্তরিক উদারতা ও উন্নত ভাবের নিকট ইংরেজের বাহ্য রং ঢং কিছুই নয়।"

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

২। **ব্রহ্মামৃত**, ১ম ভাগ। ১৩১৬ সাল (১ ডিসেম্বর ১৯০৯)। পৃ. ২৪।

হিন্দু পালপার্বণ সম্বন্ধে 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের কয়েকটি রচনা।

৩। **সমাজ-তত্ত্ব।** ১৩১৭ সাল (১৫ মে ১৯১০)। পৃ. ৬৩।

ইহাতে "হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা," "তিন শত্রু," "হিন্দুজাতির অধঃপতন" ও "বর্ণাশ্রমধর্ম"—এই চারিটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি ১৩০৮ সালের নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র বৈশাখ, শ্রাবণ, মাঘ ও ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে গৃহীত।

পুস্তকখানির "সূচনা" লিখিয়াছেন—সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। উহা এইরূপ:—

> "পণ্ডিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় অথবা ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রৌঢ়কালের বন্ধু। আগে জানিতাম যে আশৈশব বান্ধবতা না থাকিলে বন্ধুর স্নেহ চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু উদারচেতা ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার হৃদ্গত অনন্ত স্নেহধারায় আমাকে সদাই অভিসিক্ত রাখিতেন। আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ, অনুগত, অনুজসদৃশ ছিলাম। আজ সাধারণভাবে এই কথাটি প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া আমি অতিশয় সুখবোধ করিলাম।
>
> উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মনস্বী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া আমি অনেক সময় বিস্মিত হইতাম। তিনি অসাধারণ পণ্ডিতও ছিলেন। সে পাণ্ডিত্য তিনি ঢাকিয়া রাখিতে জানিতেন। কখনও তাঁহাকে পাণ্ডিত্যজনিত মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে দেখি নাই। যে ব্যক্তি সংস্কৃত, লাটিন, ইংরেজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, সিন্ধী, মারহাট্টী, প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, খ্রীষ্টান থিয়লজী, বেদান্ত, সাংখ্য, সুফী প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তিনি কখনই স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিবার অবসর খুঁজিতেন না। মেধাবী ব্রহ্মবান্ধব তাই অনায়াসে হিন্দুসমাজতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত কঠিন সিদ্ধান্তগুলিও অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। আমার সহিত এবং আমার এই সকল বিষয়ের শিক্ষাগুরু পূজনীয় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সমাজতত্ত্ব লইয়া তাঁহার অনেক বার অনেক কথা হইয়াছিল। এই আলোচনার ফলে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকে যে

যাহা বলুক ব্রহ্মবান্ধব কখনই খ্রীষ্টান নহেন, পরন্তু হিন্দুবুদ্ধিসম্পন্ন, চিরকুমার, সন্ন্যাসী মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে তিনি স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন—মৃত্যুকালে তিনি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিরূপেই দেহত্যাগ করেন।

বিধাতার বিধান বুঝি না। জানি না বিধাতা কোন্ অজ্ঞেয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে শেষে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের বিদ্যা ও বুদ্ধি, সর্ব্বদিকপ্রসারিণী হইলেও সমাজসেবায় ও ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ঘাটনে অধিকতর উপযোগিনী ছিল। ব্রহ্মবান্ধব পরোপকার করিতে পারিলেই, রোগীর সেবার অবসর পাইলেই, যেন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন। সিন্ধুদেশে প্লেগের প্রকোপের সময় তিনি যে ভাবে সেবা করিয়াছিলেন, রক্তমাংসের দেহ মানুষের পক্ষে তাহা এখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার হৃদয়খানা সাগর অপেক্ষাও বিশাল ও গভীর ছিল। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতায় তাঁহার হৃদয়ের অক্ষয় ভাণ্ডার নিত্য পূর্ণ থাকিত। তাই ভাবের কথা হইলে ব্রহ্মবান্ধবের লেখনীপ্রসূত ভাষা গোমুখীনিস্থত গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় কোটিতরঙ্গে উছলিয়া যাইত। অমন মিঠে মধুর ভাষা আমি আর পড়ি নাই। সে ভাষার পরিচয় এ পুস্তকেও আছে।

সমাজ না বুঝিলে সমাজসেবক হওয়া যায় না। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু সমাজের বাঁধুনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—উহার বিন্যাসপদ্ধতিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই মানুষের মত সমাজ সেবা করিতে জানিতেন। তাঁহার এই পুস্তক হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক, ইহার অন্তর্গত সিদ্ধান্তগুলি সকলের গ্রাহ্য হউক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। বড় সাধ আছে যে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জীবন-কথার আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করি। সে সাধ কখনও পূর্ণ হইবে কি না জানি না। তবে সমাজে এই পুস্তকের যথারীতি আদর হইলে, আমি সে উদ্যোগ করিতে সাহস করিব। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩১৭ সাল।"

১৯২৬ সনে বর্ম্মণ পাব্‌লিশিং হাউস 'সমাজ-তত্ত্ব' পুস্তকখানি 'সমাজ'

নামে পুনর্মুদ্রিত করেন; তবে তাহাতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুলিখিত ভূমিকাটি নাই।

৪। **আমার ভারত উদ্ধার।** শ্রাবণ ১৩৩১ (ইং ১৯২৪)। পৃ. ৩০।

ব্রহ্মবান্ধবের বাল্যজীবনের স্মৃতিকথা। এই অসমাপ্ত রচনাটি ১৩১৪ সালের ১২ই ও ১৯এ জ্যৈষ্ঠের (১০ম-১১শ সংখ্যা) 'স্বরাজ' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত এবং প্রবর্তক পাব্লিশিং হাউস হইতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

৫। **পাল-পার্ব্বণ।** পৌষ ১৩৩১ (৩০ জানুয়ারি ১৯২৫)। পৃ. ৪০।

ইহাও প্রবর্তক পাব্লিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে এই কয়টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে:—শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, জামাই-ষষ্ঠী, স্নান-যাত্রা, রথ-যাত্রা, ৺কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, শিব-চতুর্দ্দশী, দোল-লীলা, উদ্বোধন।

এই সকল রচনার মধ্যে স্নান-যাত্রা ও দোল-লীলা—এই দুইটি 'স্বরাজ' পত্র হইতে ও বাকীগুলি 'ব্রহ্মামৃত' হইতে গৃহীত।

সম্পাদিত সংবাদপত্র: ব্রহ্মবান্ধব দুইখানি সুপরিচিত সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন; একখানি—'সন্ধ্যা,' দৈনিক পত্র; অপরখানি—'স্বরাজ,' সাপ্তাহিক পত্র। এগুলির পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু রচনার সন্ধান মিলিবে।

'সন্ধ্যা'র সকল সংখ্যা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; এমন কি, ইহার প্রথম প্রকাশকাল নির্ধারণও গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! নানা মুনির নানা মত; কেহ বলেন, ১৯০৪ সনের শেষাশেষি, আবার কাহারও কাহারও মতে ১৯০৫।* আমরা ১ম বর্ষের দশ সংখ্যা 'সন্ধ্যা' দেখিয়াছি; সকলগুলিই নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত। ইহার মধ্যে যেখানি সর্বাপেক্ষা পুরাতন তাহার সংখ্যা নং ২৩৪; তারিখ—৮ কার্তিক ১৩১২, বুধবার (২৫ অক্টোবর ১৯০৫)। ইহার পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকিলে এবং রবিবার ও পূজা-পার্বণের

* প্রবোধচন্দ্র সিংহ 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবে' 'সন্ধ্যা'র ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল দেন নাই; তবে উহার "অনুষ্ঠান-পত্র"টি উদ্ধৃত করিয়াছেন (দ্র° পৃ ৮১-৮৩)।

সংখ্যা হিসাব হইতে বাদ দিলে, 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব যে ১৯০৫ সনের জানুয়ারি মাসের গোড়ায়—এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

'সন্ধ্যা' স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রচারিত হইত। কিন্তু 'স্বরাজ' প্রকাশিত হইত শিক্ষিত জনগণের জন্য। 'স্বরাজ' মোট ১২ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৬ ফাল্গুন ১৩১৩ (১০ মার্চ ১৯০৭); দ্বাদশ বা শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ আষাঢ় ১৩১৪; ৬ষ্ঠ, ৯ম ও শেষ সংখ্যা নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইতে পারে নাই। 'স্বরাজে' মুদ্রিত রচনাগুলি লেখকের নাম-স্বাক্ষরিত না হইলেও "অনুষ্ঠান-পত্র," "স্বরাজ-গড়," "বিবেকানন্দ কে?," "আমার ভারত উদ্ধার" প্রভৃতি কয়েকটি রচনা যে ব্রহ্মবান্ধবেরই, অন্তর্লীন প্রমাণ-বলে তাহা জানা যায়।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ব্রহ্মবান্ধবের লিখিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত দু-একটি প্রবন্ধের সন্ধান পাইয়াছি; সেগুলি—

১। **'বঙ্গদর্শন'**: আষাঢ় ১৩১১: "বেদান্তের প্রথম কথা"।

২। **'সাহিত্য-সংহিতা'**: আশ্বিন-কার্তিক ১৩১১: "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"।

ইহা ১৯০৪ সনের ২রা অক্টোবর 'সাহিত্য-সভা'র পঞ্চম বাৎসরিক দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত হয়। পূর্বস্থলী-নিবাসী কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটির বিষয়—ফার্কুহার (Farquhar) সাহেবের মতের সমালোচনা ('সাহিত্য-সংহিতা,' ফাল্গুন ১৩১৩, পৃ. ৬২৮-৩০ দ্র°)।

সভার পরবর্তী অধিবেশনে (১৯০৪, ১১ই ডিসেম্বর) ব্রহ্মবান্ধব "স্বদেশীয় শিক্ষা" নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন; ইহা কোথায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সন্ধান পাই নাই। প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সভায় যে আলোচনা হয়, তাহা 'সাহিত্য-সংহিতা'য় (ফাল্গুন ১৩১৩, পৃ. ৬৩১-৪) প্রকাশিত হইয়াছে। "সভাপতি [ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ] মহাশয়ের সম্মতিক্রমে প্রবন্ধপাঠক মহাশয় বলিলেন—ডাক্তার চুণীলাল বাবুর মতামতের সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে, তদীয় শিক্ষা-প্রবর্তন-প্রস্তাব, বাস্তবপক্ষে দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল নহে—বরং অনুপযোগী, তাহা

তিনি জানেন। জানিয়াও তিনি সেই অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, ইংরেজী অর্থকরী বিদ্যা, তিনি তাহা বিলক্ষণ বিদিত। কথাটা কতকাংশ সত্য। 'সারস্বত আয়তনে' অর্থকরী বিদ্যাধ্যয়নের ব্যবস্থা না থাকিবে এমন নয়। লণ্ডনে বি. এ., এম. এ. উপাধিধারীরা চাকরি পাইয়া থাকেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা চাকরি পান না। বেতন গ্রহণেই কি বিদ্যালয় উন্নত হয়? তাঁহার 'সারস্বত আয়তনে'র পরিচালনে তিনি কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন না, এ কথাও ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন।"

পত্রাবলীঃ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে লিখিত ব্রহ্মবান্ধবের পত্রগুলিও সংগৃহীত হওয়া উচিত; এগুলি তাঁহার জীবনীর প্রথম শ্রেণীর উপকরণ। যোগানন্দ মিত্রকে লিখিত তাঁহার একখানি বাংলা পত্র ফাদার তুর্মীজের সৌজন্যে নিম্নে মুদ্রিত হইল।

নন্দ—তোমার কার্ড পাইয়াছি। তুমি নিরাপদে পঁহুছিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। যখন [মাদারিপুর] বেড়াইতে গিয়াছ তখন ভাল করিয়াই দেশটা দেখিয়া এস। পুকুর দীঘি নদী বন ক্ষেত—ভালবাসার সহিত দেখিও। ভালবাসিলে ভালবাসা পাওয়া যায়। শুনিয়াছ ত বাঙলার মাটি—মাটি নয়—কিন্তু মা-টি। আর গরীব লোকেদের সঙ্গে মিশিতে চেষ্টা করিও।

আমরা কলিকাতার লোকে বন্দে মাতরম্ বলি কিন্তু মা বঙ্গলক্ষ্মী যে কি বস্তু তাহা জানি না। যাহারা দেশকে ভাল না বাসে—দেশের ইতিহাস শিক্ষা দীক্ষায় যাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই—তাহাদের আত্মমর্য্যাদা হয় না—আর মর্য্যাদা না হইলে সকলই বৃথা।

আমরা এখানে ভাল আছি। তোমার ভগিনীপতি ভগিনী ও তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি তারিখ ১৭ই পৌষ ১৩১২। শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথকে আর একবার স্মরণ করিবার সুযোগ মিলিল। বাঙালীর এখন মাত্র দুইটি কাজ—রিহ্যাবিলিটেশন ও রিক্যাপিচুলেশন। বিস্ফারিত সজল করুণ নেত্রে উর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া হাম্বারব তুলিয়া আমরা প্রথম কাজ ভাল করিয়াই সারিতেছি এবং আবির্ভাব-তিরোভাবের জাবর কাটিয়া দ্বিতীয় কর্তব্যও মন্দ পালন করিতেছি না। চারণক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ডাবাও খালি, সুতরাং "একদা যাহার বিজয় সেনানী" অথবা "বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া" গান করিয়া পেটের ক্ষুধা মারিতেই হইবে। দুগ্ধহীন গাভীর চাটে যে কাজ হয় না, সে পরীক্ষা ১৯৪৭এর ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৫০ এর ১৫ আগস্ট—আজ তিন বৎসরে হইয়া গেল।

* * *

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে নূতন করিয়া চর্বণ করিবার উপযোগী কিছু পুরাতন খাদ্য আবিষ্কার করা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে হাজির হইবার অনেক পূর্বেই যে একজন বাঙালী মনীষী তাঁহাকে বিশ্বকবি হিসাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—এ সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত ছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনী রচনা করিতে বসিয়া পুরাতন উপকরণ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে উপাধ্যায়-সম্পাদিত অধুনা-দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী সাপ্তাহিক *Sophia* ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় The World-Poet of Bengal শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ দৃষ্টিগোচর হইল। যাঁহাদের ধারণা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুরস্কার, বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক স্বীয় গলার মাল্যপ্রদান, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি বলিয়া নবীনচন্দ্রের প্রশস্তি প্রভৃতি সত্ত্বেও, যাঁহাদের ধারণা বিদেশের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইবার পর আমরা তাঁহাকে স্বীকার করিয়াছি, তাঁহাদের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য নিবন্ধটি হুবহু মুদ্রিত করিতেছি।—

Rabindra Nath is the youngest son of the Brahma patriarch, Devendranath Thakur. He is about forty years old; but he looks as youthful as a fresh-blown *champa*. His raven locks, lotus-petalled eyes, pencilled eyebrows, chiselled nose, swan-like neck, and the majesty of his tall figure illumined by a marigold complexion, would make a subject worthy of the canvas of a Raphael or an Angelo.

But his poetry is greater, better and immeasurably higher than his person. In his youth he warbled, like a sweet little birdie, strains of love inspired by the sensuous beauty of nature. He soared with the dewy lark to bathe in the flood-light of the morning sun ; he flew with the *chatak* to drink of the rainclouds ; he revelled with the *chakor* in the moonbeam overflowing the earth with molten silver. He wandered in bowers of roses resonant with the pipings of feathery songsters ; played with the shiny shingles of the brook and gazed and gazed at the eddying rainbows formed in its bosom by the golden darts of the sun. In fact there was no beauty in nature which he did not woo and win over to his youthful self.

But in all his revellings on rose-banks and wallowings in beds of lilies there is a spirit of sadness which restrains the extravagance of joy, chastens the coarseness of the senses, and stands as a shade obscuring, yet beautifying, the exuberance of light which in-forms his passionate lyrics. He sings ; his voice pierces the mid-sky and smites the very vault of heaven, but falls down, at last, on the earth like a shower of bewailing, tremulous tear-drops. His song is more like the cooing of a dove pouring out its heart to one that is absent than the self-sufficient strain of the cuckoo filling the woodlands with its luxurious richness.

This sadness about him has made him a master in the art of pourtraying human passions. Who has read his description of a *sannyasi's* struggle to put out the flame of paternal affection towards an orphan girl, and not shed hot tears ? Who is there so hardhearted as not to melt in pity at the sight of his picture of a burly *Cabuli* fruit-seller transformed into tenderness itself by the majestic charms of the blossom of a Bengali girl ? And one would not mind to be disengaged from Tennyson's "In Memoriam" and Shelly's "Episychidion" to sympathise and grieve with him in his outbursts of pain—the excruciating pain of an unrequited love.

Rabindra is not only a poet of nature and love but he is a witness to the unseen. Revelation apart, Kant, Tennyson and Newman are considered to be three modern witnesses to the invisible world. Poor Bengal has produced another and it is Rabindra Nath.

When we were young, full of ardour, love and warmth, we were one day reading his "World-Current." We were carried on and on by

the "current" till we felt ourselves lost in a shoreless ocean of beauty and love. Tedious time with its painful divisions appeared to us but a speck, in the colorless bosom of eternity. Our individuality lost its isolatedness and was joined to the all. We could not live apart. We were obliged to live as a part of the whole. We were made partakers of the symphonies of the spheres. We hovered from flower to flower with the honey-sipping bee. We sang with the happy and wept with the sorrowing. We drank of the mother's heart and ran after children in love. We realised that we were living with all but not with ourself. And this "World-Current" is but a small poem written at random. Whenever he sings, whether it be of beauty that pervades the world, or of love that makes man semidivine, he takes us to the region of the infinite. The heavens with their luminous orbs the earth with its flora and fauna, man with his reason and love, have been transformed by his magic wand into ripples of an eternal beauty that lies outstretched beyond space, unruffled and serene. He is verily a mystic beholder of the invisible regions.

If ever the Bengali language is studied by foreigners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet. He is like the Devadaru which has its roots deep down, down the lowlands but which threatens to pierce the sky—such is its loftiness. He will be ranked amongst those seers who have come to know the essence of beauty through pain and anguish.

* * *

পর-বৎসর (১৯০১) ব্রহ্মবান্ধব তৎসম্পাদিত ইংরেজী মাসিক পত্র *The Twentieth Century*-র জুলাই (Vol. I. No. 7.) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'নৈবেদ্য'-এর যে অপূর্ব বিশ্লেষণ-মূলক আলোচনা করিয়াছিলেন (নরহরি দাস এই ছদ্মনামে) তাহাতে মিল্টন, দান্তে ও কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথকে একাসনে বসাইয়া বলিয়াছেন—

There is not a single theological blunder in the whole collection. Its theism is sound to the core. In all places of worship, be they Christian, Muhamaddan or Hindu, the hundred sonnets can be recited or sung without the least scruple. They are the outpourings of a human heart and, as such, they belong to nature and universal reason.

পুরাতন বাঙালীর এই গুণগ্রাহিতার নূতন পরিচয়ে আমরা আজ নূতন করিয়া আনন্দ করিতে পারি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিশুপালবধের যে আকস্মিক আয়োজন করিয়াছেন তাহা আমাদের কাছে হলওয়েল-বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যার

কাহিনী হইতেও ক্রূর মর্মস্পর্শী বলিয়া মনে হইতেছে। বাংলা-বিভাগের ডক্টর শ্রীকুমার শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া ভাল কাজ করিতেছেন না। যাহাদিগকে স্কুল-জীবনে এগারো বৎসর যথেচ্ছ নাই দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে হঠাৎ এক ধমকে শায়েস্তা করার পন্থা ধর্মানুমোদিত নহে। ইহা শনৈঃ সাধিত হইলে আমাদের কিছু বলিবার থাকিত না। প্রবল জলস্রোতে হঠাৎ বাঁধ দিলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। "পাসে"র স্রোত সহাইয়া সহাইয়া রোধ করিলে অনেক নিরপরাধ-হত্যার পাতক হইতে বিশ্ববিদ্যালয় আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন।

—

বেহাই-যুগল সেন এবং গুপ্তের ইতিহাসের পঙ্ক-সমুদ্রে হতভাগ্য বাঙালীর নাকানি-চোবানি শেষ না হইতেই মাখনলাল রায়চৌধুরী আসিয়া জুটিলেন। এই মিশর-বিজয়ী শাস্ত্রীজীর অনবদ্য ভাষায় বিশ্বের প্রেমপত্রগুলি পড়িয়াই আমরা হাফ্‌কাত হইয়াছিলাম, 'জাহানারার আত্মকাহিনী'র আঘাত আমরা দাঁড়াইয়া সহ্য করিব কেমন করিয়া? দোহাই "ডঃ, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, ডি-লিট, শাস্ত্রী, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়", ন খলু ন খলু, বাঙালী পাঠকেরা আশ্রম-মৃগ নয়—গার্হস্থ্য কেঁচো মাত্র, তাহাদের উপর আপনার "মারাত্মক" ইতিহাসের তীক্ষ্ণ নৃশংসবাণ আর প্রয়োগ করিবেন না। শ্রীমতী Andrea Butenschon-এর উপন্যাস *The Life of a Mogul Princess*-(1931, George Routledge & Sons, Ltd.)-কে ঐতিহাসিক 'জাহানারার আত্মকাহিনী' বলিয়া প্রচার করিবেন না। ইংরেজী ভাষার নভেলকে "কাশ্মীর থেকে পারস্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে" বলা আর দারার ছিন্নমুণ্ডকে দিয়া কথা-বলানো একই ধরনের ম্যাজিক। যাহা বিশ্ববিজয়ী পি. সি. সোরকারকে সাজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের তাহা সাজে না। আমাদের মনে হয়, ১৫।৭।৫০ তারিখে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় উদ্ধৃত আম্বালার ভিখারী আখতার আলির ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিম্নলিখিত জোবানবন্দী আসলে অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রীরই জোবানবন্দী:

"I was meditating in a mosque in Saharanpur one day when suddenly I found myself seated on the wings of two heavenly Spirits. I did not know how I arrived here."

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রতাপ বৃদ্ধির জন্ম আমাদের হিন্দী-ভাষাভাষী ভাইয়েরা যে উদ্যম ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার সহিত সর্বত্র সততা ও সত্যবাদিতা যুক্ত হইলে ফল আরও স্থায়ী হইত। অপরিপুষ্ট হিন্দী সাহিত্যকে দ্রুত সাবালক করিবার জন্ম অনুবাদের সিরিঞ্জে বহু বৈদেশিক ও প্রাদেশিক "ফুড" তাহাকে দেওয়া হইতেছে। যদি হজম হয়, সে ঋণ স্বীকার না করিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অন্যপ্রদেশবাসীর বা বৈদেশিক পণ্ডিতদের গবেষণা সর্বদাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করা সমীচীন। দাক্ষিণাত্য-হায়দ্রাবাদের হিন্দী "সমাচারপত্র সংগ্রহালয়" হইতে সম্প্রতি বেঙ্কটলাল ওঝা কর্তৃক প্রকাশিত 'হিন্দী সমাচারপত্র সূচী' প্রথম খণ্ডে দেখিলাম শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক আবিষ্কার, মায় প্রথম হিন্দী সাপ্তাহিক 'উদন্ত মার্ত্তণ্ডে'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, অথচ স্বীকৃতির ভদ্রতা পুস্তকটির কোনওখানে নাই। লাট আনের মত বহু নামকরা সমাচারপত্র-বিষয়ে-অজ্ঞ ব্যক্তির তারিফ ব্রজেন্দ্রবাবুর আবিষ্কারের জোরে ওঝা মহাশয় কুড়াইয়াছেন তাহাতেও আমাদের দুঃখ নাই; কিন্তু পণ্ডিত বেনারসীদাস চতুর্বেদীর মত সাধু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিও (জ্ঞানী, কারণ পণ্ডিতজী-সম্পাদিত 'বিশাল-ভারত' পত্রেই ব্রজেন্দ্রবাবুর আবিষ্কারগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল) এই পুস্তকের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্র-বাবুর নামোল্লেখ মাত্র করেন নাই, ইহাতেই আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। অস্বীকৃতি একটা ষড়যন্ত্রের রূপ লইয়াছে। এরূপ হওয়া উচিত হয় নাই।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২২শ বর্ষ, ১১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৭

উদ্বাস্তু-সমস্যা

পূর্ববঙ্গের হিন্দু পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া দলে দলে ভারত-রাষ্ট্রে চলিয়া আসিতেছে আশ্রয়ের সন্ধানে এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া নূতন ভাবে সংসার পাতিবার আশায়। এই বাস্তুত্যাগের হিড়িক আরম্ভ হইয়াছে ভারত-বিভাগের পূর্বে নোয়াখালী-দাঙ্গার (১৯৪৬ অক্টোবর) পর হইতে। দাঙ্গা হইয়াছিল নোয়াখালী জেলায় এবং উহারই পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার একাংশে; কিন্তু হিন্দুর বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হইয়াছিল নোয়াখালী ব্যতীত পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায়। গান্ধীজীর ঐতিহাসিক গ্রাম-পরিক্রমার ফলে নোয়া-খালীতে অল্পসংখ্যক হিন্দু পুনর্বাসনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই এবং অধিকাংশ মুসলিম রাজকর্মচারী ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা দুর্বৃত্ত দলকে প্রশ্রয় দিতেছে। সুতরাং ওই পুনর্বাসনোদ্যোগী অল্প-সংখ্যক হিন্দুকেও শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তু হইয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিতে হইল!

নোয়াখালী-দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিম-বাংলায় হইল না,—হইল বিহারে। বিহারী হিন্দুরা চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত নোয়াখালী-দাঙ্গার প্রতিশোধ লইল। ফলে, বিহারী মুসলমানেরা দলে দলে নোয়াখালীর হিন্দুদের মতই বাস্তুত্যাগ করিতে লাগিল। বিহারের প্রতিক্রিয়া হইল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পাঞ্জাবে এবং সিন্ধুদেশে। উ-প-সী প্রদেশ হিন্দুশূন্য হইল; আর পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখকে বিতাড়িত করিল মুসলমান, এবং পূর্ব-পাঞ্জাব হইতে মুসলমানকে তাড়াইল হিন্দু ও শিখ; সিন্ধুদেশও প্রায় হিন্দুশূন্য হইয়া গেল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

ভারত-ব্যবচ্ছেদের পূর্বে মুসলিম-লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসিত অখণ্ড বাংলার রাজধানী কলিকাতায় যে বীভৎস নারকীয় ও মানবতা-নাশক কাণ্ডের সূত্রপাত হইল, ভারত খণ্ডিত হইবার পরও উহার জের মিটিল

না। ফলে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি শিশু রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হইল বিস্তর। উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন-সমস্যা উভয় রাষ্ট্রকেই বিব্রত করিয়া তুলিল এবং ইহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বানচাল করিবার উপক্রম করিল।

গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে (১৯৫০ খ্রীঃ) আবার পূর্ব-পাকিস্তানে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইল। এবারকার নৃশংস পৈশাচিক কাণ্ড একটি বা দুইটি জেলায় ঘটে নাই—ঘটিয়াছে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র ব্যাপকভাবে এবং পূর্ব-পূর্ব বারের তুলনায় অধিকতর সুচিন্তিত পরিকল্পনা লইয়া। ইহাতে শুধু মুসলমান সাধারণ-জনই (Masses) যোগ দেয় নাই, পাকিস্তান সরকারের আনসার-বাহিনীও যোগ দিয়াছিল। অনেক স্থানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের যে ইহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, সেইরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই। পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রতিক্রিয়া হইল বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে নহে, এবং ইহার পশ্চাতে কোন পরিকল্পনাও ছিল না। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর এখানকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দাঙ্গার প্রশ্রয় দেন নাই এবং বিচক্ষণতা ও দ্রুততার সহিত ইহা দমন করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলমান দলে দলে বাস্তুত্যাগ করিয়া পূর্ব-পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে লাগিল, এবং পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত প্রবাসী পাকিস্তানী মুসলমান ঊর্ধ্বশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিল।

ইহার পর দিল্লী-চুক্তি সম্পাদন এবং নেহরু-লিয়াকৎআলির বন্ধুভাবে প্রেমালিঙ্গন। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা লইয়া এবং শুভবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা চুক্তিবিরোধীরাও অস্বীকার করিবেন না। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই চুক্তির শর্তগুলি যে আন্তরিকতার সহিত পালন করিতেছেন, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে পশ্চিমবঙ্গ-ত্যাগী মুসলমানদের দলে-দলে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা হইতেই। আর পূর্ব-পাকিস্তান-সরকার চুক্তির শর্তগুলি আদৌ পালন করিতেছেন কি না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পালন করিলেও কি ভাবে ও কত দূর পালন করিতেছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে

পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুর দৈনিক সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক,—যে অবস্থায় পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুকে বাস্তুত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে বাস্তুত্যাগীদের উপর কাপুরুষতা, ভীরুতা ও ক্লৈব্যের অপরাধ আরোপ করা যায় কি না, এবং অবস্থার পরিবর্তন না হইলে খুব সাহসী হিন্দুর পক্ষেও পূর্ব-পাকিস্তানে সপরিবারে মানুষের মত বাস করা সম্ভব কি না।

নোয়াখালী-দাঙ্গার পর পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিশিষ্ট হিন্দুকে এইরূপ মন্তব্য করিতে শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সাহসী হইয়াও কেন এ ভাবে মার খাইয়া ভিটা-মাটি ছাড়িতেছে? কেহ কেহ এইরূপও বলিয়াছেন যে, মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই জানিয়াও মারিয়া মরিল না কেন? অত্যন্ত দুঃখের সহিত ও গভীর বেদনা লইয়াই তাঁহারা ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ-সাহিত্য' বিভাগে খ্যাতনামা কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি কবিতায় সেই দুঃখ ও বেদনার ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বজাতির কাপুরুষোচিত আচরণ ও পরাজয়ের গ্লানির কথা শুনিলে স্বজাতিবৎসল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাণে আঘাত লাগে। সে আঘাত দুঃসহ ও বেদনাদায়ক! কবির ব্যথিত চিত্তের খেদোক্তি—

"ওরে বরিশালী ভাই ঢাকাই বাঙাল
এ সঙ্কটে হ'লি তোরা প্রাণের কাঙাল!
তোরাই কি জিনে এনেছিলি স্বাধীনতা?
এ দেখি দিনের সাপ রাতে হ'ল 'লতা'!"...

উদ্বাস্তুদের বাস্তুভিটাতে ফিরিয়া যাইবার জন্য কবি উদাত্ত-স্বরে শুনাইয়াছেন আহ্বান-বাণী—

"ফিরে চল্ দলে দল্ ফিরে চল্ ভাই,
এবার চাহিলে প্রাণ বিনিময় চাই।
না মেরে মরিয়া গান্ধী হইল অমর,
সে পথ কঠিন যদি, বীর হয়ে মর্।

কান পেতে শোন্ ওই মাটির আহ্বান
এ কালিমা ঘুচাইতে চাই লাখ প্রাণ।
সে প্রাণ দিতেই হবে, স্থির কর্ মন—
আমরণ মরিবি, না, মরিবি এখন ?"

কবির এই আহ্বান যতই আন্তরিকতাপূর্ণ হউক না কেন, লেখক পূর্ববঙ্গের একজন ভুক্তভোগী বাস্তহারা হইয়া বলিতে পারেন যে, "বাঙাল"রা ইহাতে সাড়া দিবার জন্য কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিবে না। তাঁহার আহ্বান অরণ্যে রোদনের মত ইতিমধ্যেই যে বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর দরদী ভাবুক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই এই সরল সহজ কথাটা ভুলিয়া যান যে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় পৈশাচিক মনোবৃত্তি লইয়া যে কোন প্রকারে হউক সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তাড়াইবার জন্য দলবদ্ধ হয়, সেখানে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে বাস করা কত দুঃসাধ্য ও কষ্টকর! তারপর এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের পক্ষে বাস করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। আর যদি রাষ্ট্রের কর্মচারীগণ এই বিতাড়ন-ব্যাপারে সংখ্যাগুরু স্বজাতীয়গণের সহিত সক্রিয় অংশীদার হন, তাহা হইলে তো কথাই নাই। এই সকল স্থলে পৌরুষ কিংবা ক্লৈব্যের, বীরতা কিংবা ভীরুতার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদী জাতি পৃথিবীর নানা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছিল। তাহাদের নিজস্ব কোন বাসভূমি ছিল না। ইহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা দিকেই অগ্রসর। ইহাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম আছে। সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ইহুদী জাতি প্যালেস্টাইনে ইস্রাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই রাষ্ট্র আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ইহুদী জাতির যে সমস্ত লোক জার্মানিতে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছিল এবং নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ভোগ করিতেছিল, নাৎসী-

জার্মানির সর্বাধিনায়ক শাসনকর্তা হিটলার কি ভাবে তাহাদিগকে স্বোপার্জিত ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া জার্মানি হইতে তাড়াইয়া দিল, সেই কলঙ্ক-কাহিনী আজও আমাদের মনে আছে।

পাঞ্জাবের শিখ জাতি দুর্ধর্ষ সাহসী সামরিক জাতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। শিখ-ধর্মের প্রতিষ্ঠা অবধি মুসলমানের সঙ্গে শিখের যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সংঘর্ষ কতবার যে হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। মৃত্যু-বরণ, দুঃখ-ভোগ, দুর্ধর্ষতা এবং সাহসিকতার মধ্য দিয়া শিখ জাতি একটা গৌরবোজ্জ্বল মহিমান্বিত ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। সেই শিখদিগকে সংখ্যা-গরিষ্ঠ পাঞ্জাবী মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। আবার পূর্ব-পাঞ্জাব হইতে সংখ্যাগুরু শিখ ও হিন্দু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ব্যতীতই মুসলমানকে তাড়াইয়া দিয়াছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব মুসলমানদের করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও সেখানে মুসলমানরা থাকিতে পারিল না, যদিও পাঞ্জাবী মুসলমানরা শিখের ন্যায় দুর্ধর্ষ ও সাহসী যোদ্ধার জাতি। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি যুধ্যমান সম্প্রদায় যদি নিরস্ত্র থাকে কিংবা একই রকমের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে, তাহা হইলে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হইবে সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দ্বারা। এই সকল স্থলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা মারাত্মক হাতিয়ার-বিশেষ এবং যে-পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে সে-পক্ষের জয় সুনিশ্চিত।

এই শিখ জাতির বীরত্বের অমর কাহিনী লইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাব্দী পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন 'বন্দী বীর'। এই অনবদ্য কবিতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন বীর জাতির প্রতি। কবিতাটির আরম্ভ—

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিছে শিখ
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ॥"

কবিগুরুর স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি—

"এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"

কবির ভাবোদ্বেল কণ্ঠে আরও শুনিতে পাই—

"পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজীর' কহি শত বীর শত শির দেয় ডারি॥"

এই ইতিহাস-বিশ্রুত শিখ জাতিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহসী পাঞ্জাবী হিন্দুকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের পূর্বেই পূর্বপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া দলে দলে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা কিংবা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা সংযুক্ত হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, সেই আলোচনা করিলাম বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে। আর এই উভয় পক্ষের বৈরিতায় বা সংঘর্ষে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, এইক্ষণে সে আলোচনা করিতেছি।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ-শাসনকালে সুরাবর্দী-মন্ত্রী-মণ্ডলীর আমলে অখণ্ড বাংলার রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে মুস্লিম-লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালন উপলক্ষে যে নারকীয় মহা-হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে আক্রমণকারী ছিল সংখ্যা-লঘু লীগপন্থী-মুসলমানেরা। সেই সঙ্গে চলিয়াছিল লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, নারীধর্ষণ ও নারীহরণ। আক্রমণের পশ্চাতে শুধু যে সুনিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল তাহা নহে, ব্রিটিশ এবং মুসলিম রাজকর্মচারীদের যোগাযোগ পর্যন্ত ছিল। লীগ-নেতা প্রধান-মন্ত্রী সুরাবর্দীও যে ইহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এইরূপ অভিযোগ হিন্দুদের পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছিল। আক্রমণ আকস্মিক ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত হইলেও কলিকাতার হিন্দুরা ইহার উপযুক্ত জবাব দিতে

পশ্চাৎপদ হয় নাই। প্রতিরোধের সঙ্গে হিন্দু প্রতিশোধও লইয়াছিল। তবে নারীধর্ষণ ও নারীহরণের প্রতিশোধ লওয়া হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু হিন্দুর শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য ইহার বিরোধী, এবং এরূপ জঘন্য পাপ-কার্যে লীগপন্থী গুণ্ডা দলের মত হিন্দু অভ্যস্তও নহে। কিন্তু সফল প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ সত্ত্বেও হিন্দুকে কি সর্বনাশা অবস্থারই না সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল! আর সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যাগুরু হিন্দুর যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার তুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসমানের ক্ষতি নিঃসঙ্কোচে তুচ্ছ বলা যাইতে পারে।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারত-রাষ্ট্র 'পুলিসী অভিযান' (Police Action) চালাইবার পূর্বে তথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর উপর কাসিম রেজভীর নেতৃত্বে রাজাকার দল কিরূপ সুসংহত ব্যাপক অত্যাচার ও উপদ্রব চালাইয়াছিল, তাহা সুবিদিত। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রাজাকার-বাহিনী হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়া হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ইত্যাদি দুষ্কৃতির দ্বারা নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে সর্বস্বান্ত করিতেছিল। কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুর দুর্গতি লাঞ্ছনা ও দুর্দশা এরূপ চরমে উঠিয়াছিল যে, গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। নিতান্ত নিরুপায় ও অসহায় হইয়া দলে দলে হিন্দুকে পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা জমিজমা ও বিষয়-সম্পত্তি ছাড়িয়া ভারত-রাষ্ট্রে আশ্রয় লইতে হইল। এই নিপীড়িত ও উপদ্রুত হিন্দুরা শতে শতে বাস্তুত্যাগ করে নাই, করিয়াছিল হাজারে হাজারে।

বিরাট মুসলিম জনসভায় রাজাকার-নেতা সৈয়দ কাসিম রেজভীকে কোরাণ ও কৃপাণ উপহার দিয়া অভিনন্দিত করা হয়। রেজভী অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে,তিনি রাজাকার-বাহিনীর সাহায্যে শীঘ্রই ভারত-রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া রাজধানী দিল্লী অধিকার করিবেন, এবং সেই মহানগরীতে রাষ্ট্রপালের প্রাসাদ-চূড়ায় নিজামের আস্রাফী পতাকা উড্ডীন করিবেন। অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস! কোরাণ ও কৃপাণ হাতে লইয়া জেহাদ (!) আরম্ভ করিবার পূর্বেই এই মহাবীরকে (!) বন্দী হইতে হইল ভারত-রাষ্ট্রের হস্তে। নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন ইত্যাদির অভিযোগে রেজভীর এখন বিচার চলিতেছে।

কিন্তু এই সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে মোট জনসংখ্যার শতকরা নব্বই জন হিন্দু এবং মাত্র দশ জন মুসলমান থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাধিক্যের উপর সংখ্যাল্পের এরূপ নিরঙ্কুশ বর্বরোচিত অত্যাচার কি করিয়া সম্ভব হইল? সরল জবাব, ইহা সম্ভব হইয়াছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতায়। হিন্দু-উৎসাদন-পর্ব অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্র হইতে আগত উদ্বাস্তু মুসলমানের পুনর্বাসন ব্যবস্থা সমতালে চলিতেছিল। হায়দ্রাবাদ ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেড় লক্ষ বাস্তুত্যাগী মুসলমানকে সে রাজ্যে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং নিজাম সরকার ইহাদের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন। 'পুলিসী অভিযানে'র সাফল্যের পর সেই দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু মুসলমান চলচ্চিত্রের দ্রুত-ধাবমান দৃশ্যপটের মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে যে, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পূর্ববঙ্গের দশ হাজার বাস্তুহারা হিন্দু-পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের হিন্দুদের ভাগ্য প্রসন্ন! সেই জন্যই নেহরু-মন্ত্রীসভা নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির অনুরূপ কোন প্রকার চুক্তির পথ বাছিয়া লন নাই, লইয়াছিলেন সশস্ত্র অভিযানের পথ। সেই দুর্গম বন্ধুর বিপদসঙ্কুল পথ ধরিয়া চলার ফলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। অন্য পথ ধরিয়া চলিলে হায়দ্রাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু নিজাম-সরকার-সমর্থিত রাজাকার-বাহিনীর অত্যাচার-উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইত না। পাকিস্তান-সরকার-সমর্থিত আনসার-বাহিনীর অত্যাচার-উপদ্রবে পূর্ববঙ্গে হিন্দু যেমন অতিষ্ঠ হইয়া ভিটামাটি ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে, হায়দ্রাবাদের হিন্দুকেও আজ সেই অবস্থায় পড়িতে হইত।

ব্রিটিশ-শাসনকালে বাংলা দেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ ও রক্তারক্তি হইয়াছিল, এইক্ষণে সেই পুরাতন প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি। ভারতে ব্রিটিশ-শাসন কায়েম রাখিবার দুরভিসন্ধিতে বিদেশী শাসকগণ Divide & Rule Policy বা ভেদনীতি অবলম্বন করেন। এই নীতি ব্রিটিশের উদ্ভাবিত অভিনব নীতি নহে।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতেও এই ভেদনীতির প্রচলন ছিল। আমাদের রাজনীতিশাস্ত্রে সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ—এই চতুর্বিধ উপায়ের উল্লেখ আছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে স্বদেশী যুগে বঙ্গভঙ্গবিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে বিনাশ করিবার জন্য বিদেশী শাসক-মণ্ডলী পূর্ব বাংলায় ভেদনীতির প্রয়োগ করেন। ফলে, কুমিল্লা শহরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাই নবাব সলিমুল্লার আগমন উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধে। হিন্দুর বন্দুকের গুলিতে একজন মুসলমান নিহত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই দাঙ্গা থামিয়া যায়। ইহার কিছুকাল পরে কুমিল্লা শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে গ্রামাঞ্চলে মগ্‌রা বাজারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সেখানেও হিন্দুরা দলবদ্ধ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। বিপন্ন হিন্দুদের রক্ষার্থে কুমিল্লা হইতে স্বয়ংসেবক দল প্রেরিত হয়। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কুমিল্লার খ্যাতনামা নেতা দেশসেবক স্বর্গীয় বসন্তকুমার মজুমদার।

কুমিল্লার পরবর্তী দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছিল মৈমনসিং জেলার জামালপুর মহকুমা-শহরে। তথায় হিন্দুরা সাফল্যের সহিত দাঙ্গার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে নাই। কেননা স্থানীয় পুলিসের বড়কর্তা ছিলেন একজন ইংরেজ, তিনি পুলিস-বাহিনীর লোক সঙ্গে লইয়া মুসলমান-দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করিয়াছিলেন। দাঙ্গাকারীরা বাসন্তী-প্রতিমা ভাঙিয়া ফেলে এবং স্বদেশী যুগের বিখ্যাত নেতা জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কাছারি-বাড়িতে হানা দিয়া লুঠতরাজ চালায়। এই সমস্ত হইল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তৎকালে কার্জনী পরিকল্পনায় বিভক্ত বাংলার নব-গঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের ছোটলাট ছিলেন কুখ্যাত সার্ ব্যাম্‌ফিল্‌ড্ ফুলার।

কুমিল্লা শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিবার সময় হিন্দু-মহিলারাও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্বদেশী যুগের বঙ্গবিশ্রুত চারণ-কবি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বর্গীয় কামিনীকুমার ভট্টাচার্য একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দীপনাময় সঙ্গীতের আরম্ভ এইরূপ—

"আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধর গো,

পরিহরি চারু কনক ভূষণ
গৈরিক বসন পর গো ॥"

ফুলারী আমলে স্বদেশী আন্দোলনকে দমাইবার জন্য এবং নবজাগ্রত হিন্দু-সম্প্রদায়কে দাবাইবার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলায় শুধু যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথই বিদেশী শাসকরা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমন নহে। গুর্খা সৈন্য ও পিটুনী পুলিস বসানো, পিটুনী ট্যাক্স আদায়, নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের স্পেশাল কন্‌স্টেবল্‌ নিয়োগ, 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি ও সভাধিবেশনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, সশস্ত্র পুলিসের সাহায্যে বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন ভাঙিয়া দেওয়া, এবং তৎসংশ্লিষ্ট নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ চলন্ত শোভাযাত্রী দলের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালাইয়া রক্তপাত, ছাত্র বহিষ্কার, বিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য বন্ধ, গবর্মেণ্টের চাকরিতে শিক্ষিত যোগ্য হিন্দুর ন্যায্য দাবি অস্বীকার, দেশসেবকদের ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত করা ইত্যাদি যাবতীয় সম্ভাব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া হিন্দুকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করা হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা তখন ভেদনীতি ও দণ্ডনীতি যুগপৎ অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের ইহাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে বাঙালীর জাতীয় জীবনের যৌবনোদ্গম। পূর্ণিমা-রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হয়, নদীতে বান আসে, জোয়ার-জল উথলিয়া উঠিয়া দুই কূল ছাপাইয়া কলকলনাদে বহিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাবেও তেমনই বাঙালী জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে জোয়ার আসিয়াছিল, বাংলায় প্রাণ-বন্যার প্রবাহ উদ্দাম দুর্বার বেগে ছুটিয়াছিল। ক্ষমতার মাদকতায় বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া সেদিন লর্ড কার্জন ও তাঁহার অনুচরবর্গের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগে নাই—'এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?'

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের এই পুরাতন সুবিদিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিলাম এই জন্য যে, সে যুগে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দুইটি বিভিন্ন রণাঙ্গনে

তাহাদিগকে একই সময়ে সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছে—এক দিকে ঘরের বিভীষণ, আর এক দিকে বাহিরের শত্রু। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিন্দুর নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায় নাই এবং হিন্দু কাহারও নিকট নতশির হয় নাই। বিজয়ী বীরের গর্ব ও গৌরব লইয়া জয়-পতাকা হস্তে হিন্দু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলন সার্থক ও সফল হইল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-বিভাগ রহিত হইয়া যায়,—দ্বিখণ্ডিত বাংলা আবার অখণ্ড বাংলায় রূপান্তরিত হয়। এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিলেন বলিয়া নিজ সম্প্রদায়ের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ বাতিল হইলেও ভেদনীতির জের মিটিল না। ইহার কুফল ফলিতে লাগিল। দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারী চাকরির ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং রাজানুগ্রহের উচ্ছিষ্ট লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ চলিল। দেখিতে না দেখিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জাতির মন বিষাইয়া উঠিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য তো দূরের কথা, ব্যবধান বাড়িতে লাগিল। সুতরাং ভেদনীতির প্রয়োগ যে আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা স্বীকার্য। যদিও এই সর্বনাশা নীতি জাতির অগ্রগতির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু ইহাকে একেবারে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। বাংলা দেশে ইহার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া শাসনকর্তারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ইহা প্রয়োগ করিলেন। ভারতবর্ষের সার্বজাতিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের শক্তিকে খর্ব করিবার জন্য বিদেশী রাজা শেষ পর্যন্ত ভেদনীতির মারণাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবার পর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতায় দুইবার, ঢাকা শহরে দুইবার, কুমিল্লা শহরে, পাবনা শহরে ও বাংলার আরও কয়েকটি স্থানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে

বাংলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে মুসলমান রাজকর্মচারীর সংখ্যাও বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উসকানি দিতে এবং দাঙ্গাকারী মুসলমানদিগকে প্রকাশ্যে বা গোপনে সাহায্য করিতে ইংরেজ রাজপুরুষদের দোসর হইলেন এই মুসলমান সরকারী কর্মচারীর দল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শহরাঞ্চলে হিন্দু সমুচিত উত্তর দিয়াছে, কোন ক্ষেত্রেই হিন্দুকে হটিয়া যাইতে হয় নাই। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠতা শতকরা ৮৫ হইতে ৯০ ছিল বলিয়া হিন্দুকে পর্যুদস্ত হইতে হইয়াছে।

ভেদনীতির এই রণাঙ্গনে ইংরেজ শাসকবর্গের সমর-কৌশল বা স্ট্রাটেজি ছিল অদ্ভুত ও অভিনব! সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের দাবি-দাওয়া অন্যায্য-অযৌক্তিক হইলেও ব্রিটিশ শাসকগণ জানিয়া শুনিয়া প্রশ্রয় দিতেন। মসজিদের সামনে বাজনা ও গো-কোরবানি— প্রধানত এই দুইটি লইয়াই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইত বেশি। অন্যান্য ছোট-বড় ব্যাপার লইয়াও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হইত। প্রথমোক্ত দুইটিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কখনও হিন্দুর দাবি, আবার কখনও বা মুসলমানের দাবি মানিয়া লইয়া তদনুযায়ী আদেশ দিতেন। স্থায়ী-ভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ইঁহারা কোন কালেই করেন নাই, এবং ওইরূপ সদুদ্দেশ্য লইয়া কাজ করার ইচ্ছাও ইঁহাদের ছিল না। সুতরাং বৎসর ঘুরিয়া আসিতেই হিন্দুর পর্ব উপলক্ষে কিংবা মুসলমানের পর্ব উপলক্ষে সেই পুরাতন সমস্যাই নবকলেবরে দেখা দিত। এই ভাবে কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষতার মুখোশ পরিয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মনোভাবকে জাগাইয়া জীয়াইয়া রাখিতেন।

মসজিদের সম্মুখে বাজনা ও গো-কোরবানি লইয়া এবং অন্যান্য কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যখন আসন্ন, তখন ইহাকে অঙ্কুরে বিনাশের কোন চেষ্টাই করা হইত না। অবশেষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়া মারামারি, কাটাকাটি, খুনখারাপি, লুটতরাজ, গৃহদাহ ইত্যাদির তাণ্ডব যখন চরমে উঠিত, ঠিক সেই মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের লোকেরা দলে দলে ছুটিয়া আসিতেন উহা দমন করিতে। কখনও সশস্ত্র পুলিস, কখনও বা সামরিক বাহিনী ডাকিয়া আনা হইত দাঙ্গা

দমনের জন্য। দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামিয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রেস নোটের মাধ্যমে প্রচারিত হইত যে, Situation under control—অবস্থা নিয়ন্ত্রণাধীন।

ইহার পর আরম্ভ হইত অপরাধীর সন্ধানের জন্য পুলিস-তদন্ত ও আনুষঙ্গিক গ্রেপ্তার এবং বিচারের পর্ব। শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে এই পর্বে অভিযোগ করিবার মত হেতু খুব কমই থাকিত। তাঁহাদের অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে সুযোগ বুঝিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব যে না দেখাইতেন, তাহা নহে। তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে আইনানুগ হইয়া চলা ছিল কর্তৃপক্ষের রীতি। ইহাতে ভেদনীতি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। যেহেতু ইংরেজ শাসনকর্তারা ইহাই দেখাইতে চাহিতেন যে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করুক, ইহা ব্রিটিশ সরকার চাহেন না; তবে যখন আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে, অপরাধী সাব্যস্ত হইলে সাজা পাইতে হইবে। বিশেষত শাসনকর্তারা হাইকোর্টকে রীতিমত সমীহ করিয়া চলিতেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশের গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে হাইকোর্ট উচ্চাদর্শ অনুসরণ করিয়া চলার জন্য লোকপ্রিয় হইয়াছিল, এবং ন্যায্য, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারের জন্য হাইকোর্টের সুখ্যাতিও ছিল যথেষ্ট।

তদন্ত ও বিচার পর্বে মুসলমানকে অধিকাংশ স্থলেই হিন্দুর নিকট হার মানিতে হইত। কেন না, হিন্দুদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বেশি, আর আইন-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হিন্দুরা শুধু সংখ্যায়ই গরিষ্ঠ ছিলেন না, বিচক্ষণতা বহুদর্শিতা এবং প্রতিষ্ঠায়ও ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আর একটি কারণও উল্লেখযোগ্য। প্রায় ক্ষেত্রে মুসলমানেরা আক্রমণকারী থাকিত। সুতরাং বিচারে দণ্ডিত অপরাধীর সংখ্যায় তাহারা কোন দিনই লঘুর কোঠায় পড়িত না।

ব্রিটিশের অনুসৃত ভেদনীতির রণকৌশলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম। বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, ওই রণকৌশলে এমন ফাঁক ছিল, যাহা হিন্দুর আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক। আর আলোচ্য ভেদনীতি দুরভিসন্ধিমূলক হইলেও হিন্দু-উৎসাদন উহার লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং

ভেদনীতি চালু থাকা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুকে বাস্তুত্যাগ-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গবিভাগের পর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী দশ-বারো বৎসরের মধ্যে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, চাকরে, তালুকদার, কারবারী, মৌলবী, মোল্লা প্রভৃতিকে লইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মত একটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। নিরক্ষর অজ্ঞ মুসলিম জনগণের সহিত এই শ্রেণীর মুসলমানদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রহিয়াছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুসলিম-লীগে দলে দলে যোগ দিয়া উহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাহার উপর ব্রিটিশ রাজের পূর্ব-অনুসৃত ভেদনীতি দ্রুতবেগে ইন্ধন যোগাইল এই সাম্প্রদায়িক বিরোধে। নবাব, জমিদার, ব্যারিস্টার, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ রাজকর্মচারী এবং বড়-বড় ব্যবসায়ী ধনিক পূর্ব হইতেই মুসলিম-লীগে যোগ দিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাবে মুসলিম সাধারণ-জনও (Masses) লীগে যোগদান করিল। ব্রিটিশ শাসকমণ্ডলীর ভেদনীতি-সঞ্জাত এবং প্রশ্রয়-পুষ্ট লীগের দাবি-দাওয়ার চরম পরিণতি পাকিস্তান পরিকল্পনায়।

মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ডের সাহায্যে প্রাণরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার ন্যায় ব্রিটিশ জাতিও রাজত্ব রক্ষার দুরাশায় এই দাবিকে শেষ অবলম্বন স্বরূপ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। অবশেষে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' ('Quit India') দাবি ব্রিটিশকে মানিয়া লইতে হইল। ভারত ত্যাগের পূর্বে ইংরেজ ভারতকে খণ্ডিত করিয়া দিয়া গেল এবং সেই খণ্ডিত ভারত হইতেই সৃষ্টি হইল পাকিস্তানের। গান্ধীজী ছিলেন ভারত-বিভাগের বিরোধী। তৎসত্ত্বেও গান্ধী-ভক্ত উচ্চ স্তরের কংগ্রেস-নায়ক-মণ্ডল ভারত-বিভাগে সম্মতি দিলেন। সম্ভবত তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, পাকিস্তান পাইলে লীগ-প্রধানগণের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিবে, দুইটি রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দরুণ পৈশাচিকতা, বর্বরতা ও নৃশংসতার তাণ্ডবের পুনরাবৃত্তি হইবে না, দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই কংগ্রেস-নায়কগণকে আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ পাইতে হইল।

পাকিস্তান-রাষ্ট্র গঠিত হইবার পর ভারত-রাষ্ট্রকে পাকিস্তানের সহিত সংশ্লিষ্ট বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তন্মধ্যে উদ্বাস্তু-সমস্যা একটি বৃহৎ ও জটিল সমস্যা। ইহার সমাধান নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির মাধ্যমে যে সম্ভবপর নহে, তাহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বীকার না করিলেও পরবর্তী ঘটনাবলীর দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। গান্ধীপন্থী প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য কৃপালনী তাঁহার 'ভিজিল্' (*Vigil*) কাগজে একাধিক প্রবন্ধে চুক্তির প্রতিকূলে তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিয়াছেন। চুক্তির ব্যর্থতা সম্পর্কে তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল দেশনায়কের সুযুক্তিপূর্ণ মতামতকে অগ্রাহ্য করা যায় না। হিন্দু-মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি বলিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতামত না হয় আপাতত বাদ দিলাম। উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধান যে কি ভাবে এবং কখন সম্ভব হইবে, তাহা দেশনেতা, সমাজপ্রধান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

জমি-শিকড়-আকাশ

১১

রবিবারের সকালবেলায় সর্বেশ্বরের বাহিরের ঘরে স্বামীজী অপেক্ষা করিতেছিলেন। সর্বেশ্বর আসিবামাত্র বলিলেন, চলুন তো একটু সর্বেশ্বরবাবু।

সৌম্যমূর্তি সর্বেশ্বর আসন লইয়া বলিলেন, কোথায়?

শ্রীমন্তবাবুর ওখানে। ভদ্রলোক বড় প্রবঞ্চনা করছেন।

কি রকম?

আর বলেন কেন! তিন হাজার টাকা আশ্রমকে ডোনেশন দেবেন ব'লে ওঁর স্ত্রীর নামে গেটটা করিয়ে নিয়েছেন—ললিতা-সুন্দরী গেট।

হ্যাঁ, সে তো শুনেছি।

এক হাজার আগাম দিয়েছিলেন। বাকি টাকা আর দিচ্ছেন না। আজ কাল করতে করতে এক মাস ধ'রে অনবরত ঘোরাচ্ছেন।

লোকটা অতি বজ্জাত তো?

হাড়-বজ্জাত।

কি করতে চান এখন?

আজকে শেষ কথা শুনে আসতে চাই। আপনিও একটু বলুন। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে। টাকারও খুব দরকার যে। —গৌড়ানন্দ উৎকণ্ঠার সুরে বলিলেন, উৎসবের আর দেরি নেই তো।

কোন্ উৎসব?—সর্বেশ্বর মনে করিতে পারিলেন না।

আমাদের প্রতিষ্ঠা-দিবস।

ও, প্রতিষ্ঠা-দিবস এসে পড়েছে?

আর এক মাসও নেই।

তবে তো আর সময়ই নেই।

গৌড়ানন্দ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।—চলুন একবার। ওঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আজ করতেই হবে।

চলুন। কিন্তু ভাবছি—যে রকম লোক—গালমন্দ দিয়ে ফেলব। অবশ্য গীতা পাঠ করি, রাগ করা আমার চলে না। কিন্তু রাগ হবেই, সামলাতে পারব না।

বলিয়া একটু লজ্জিত হইলেন সর্বেশ্বর। উক্তিটা একজন হেডমাস্টারের মত হয় নাই।

আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনার কাছে স্বীকার করব স্বামীজী—মনে করি বটে, রাগ আর করব না; কিন্তু—শেষ রক্ষা করতে পারি নে। সেদিন ইস্কুলে—একটা ছেলে—ভাল ছেলে, দুষ্টুমি করে আমার কার্টুন এঁকেছিল বোর্ডে। এমন রাগ হ'ল। নিছক রাগের বশে মারলাম ছেলেটাকে। মারের চোটে ছেলেটা যখন কাতরাতে লাগল, তখন জ্ঞান হ'ল। থামলাম।

গৌড়ানন্দ ক্ষণেক ইতস্তত করিলেন, শেষে বলিলেন, রাগ শরীরের ধর্ম। তাকে জয় করার প্রচেষ্টার মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব। আপনি যে চেষ্টা করছেন, এতেই আপনার জয়।

একটু হাসিয়া আবার বলিলেন, কিন্তু আমাদের শ্রীমন্তবাবুর মত লোকের পাল্লায় পড়লে রাগ না ক'রে পারবে এমন মানুষই নেই।

তাই বলুন।—সর্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইলেন।—চলুন দেখা যাক।

সর্বেশ্বর উঠিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। উভয়ে রওনা হইলেন।

বীরেশের কোন খবর পেলেন?—গৌড়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্বেশ্বর গম্ভীর হইলেন। বলিলেন, আমার কাছে তো চিঠিপত্র লেখে না। ওর বউদির কাছে একখানা দিয়েছে শ্রীনগর থেকে। দিল্লী আগ্রা কাশ্মীর ক'রে বেড়াচ্ছে আর কি।

বেড়াক কিছুদিন।—গৌড়ানন্দ সহানুভূতিতে বলিলেন, অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়ছিল। মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ওর। সব সময়ই মনে হ'ত কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অল্প হাসিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে যেদিন দেখা করতে গিয়েছিল, সেদিন আপনি দেখলে নিশ্চয় ভাবতেন, মাথা ওর খারাপ হয়ে গেছে।

খারাপই হয়েছে তো।—সর্বেশ্বর বলিলেন।

সব পুড়িয়ে দেবে, শ্মশান ক'রে দেবে।—গৌড়ানন্দ সহাস্যে বলিলেন, সেই জন্যেই লিখছে বলছিল।

মিথ্যে কথা বলেছে।—সর্বেশ্বর বলিলেন, ওরকম কিছু ও লেখে নি তো।

আপনি পড়েছেন?

কিছু কিছু পড়েছি—গোপনে।—সর্বেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, ওর বউদি খাতাটা এনে দিয়েছিল। ইভলিউশনের দার্শনিক ব্যাখ্যার মত কি একটা লিখছিল। খুব বেশি লেখেও নি।

ইভলিউশন!—গৌড়ানন্দ হাসিলেন।—আজকালকার রেওয়াজ। দর্শন বলুন, ধর্ম বলুন, যাই লিখতে যান, বায়োলজি, কসমোলজি, ফিজিক্স—বিজ্ঞানের সব কিছু আলোচনা ক'রে নিতে হবে। আমিও করেছি।—আর একবার হাসিলেন।—নইলে আজকালকার পাঠকদের মন ওঠে না যে!

তাই বটে।—সর্বেশ্বর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।—বিজ্ঞানের খটমটি কিছু থাকলেই পাঠকদের ভক্তি হয় লেখকের ওপর।

শুধু তাই নয়। ডেকার্টে, কাণ্ট, হেগেল—ওদিকে যত আছে সব

আলোচনা ক'রে নিতে হবে। তারপর আপনি বলুন, বেদান্ত বলবেন বা যা বলবেন। ঐ সব করতেই তো বইখানা বড় হয়ে গেল।

ভাল কথা, আপনার বইয়ের খবর কি?—সর্বেশ্বর তখন জিজ্ঞাসা করিলেন।

হয় নি এখনও কিছু।

কেন?

অনেকে বলছেন, এ বই কোন ব্রিটিশ বা আমেরিকান পাবলিশার্স পেলে লুফে নেবে। ভাবছি তাই পাঠাব। এখানে ছাপা হ'লে কজনই বা জানবে, কজনই বা পড়বে! বাইরে হয়তো পৌঁছবে না।

খুব ভাল প্রস্তাব হয়েছে।—সর্বেশ্বর বলিয়া উঠিলেন।—কোন বিলিতী কোম্পানিকে পাবলিশ করতে দিন। সব দিক দিয়ে ভাল হবে।

তাই দেব ভাবছি। আমার এক বন্ধু লেখালেখি করছেন। দেখা যাক।

খুব ভাল হবে।—বলিয়া সর্বেশ্বর চুপ করিলেন।

গৌড়ানন্দ চিন্তামগ্ন হইয়া একমনে হাঁটিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্তবাবু বাড়িতেই ছিলেন।

আদর করিয়া বসাইলেন।—আসুন স্বামীজী, আসুন মাস্টার মশাই। টাকা দেব না—এমন কথা তো বলি নি আমি। আমার দিকটা তো একটু বিবেচনা করবেন? 'ল'টা হয়েছে 'ন'এর মত। ন্দ-এর 'ন'টা বোঝাই যায় না। হয়েছে নলিতাসুন্দরী। আমি অবশ্য মাইণ্ড করতাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী দেখে এসে ভারি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তা ছাড়া লেখাটা হয়েছে এমন জায়গায় আর এত ছোট যে, কারুর চোখেই পড়ে না। আমার স্ত্রী বলছেন যে, চোখেই যদি না পড়ল লোকের, তা হ'লে আর লাভ কি?

এটা তো সত্যি কথা হ'ল না।—গৌড়ানন্দ কম আক্রমণাত্মক ভাষাটাই ব্যবহার করিলেন।—একটু ভাল ক'রে দেখলেই বোঝা যায়, সবই ঠিক আছে। সিমেণ্টের ওপর লেখা তো?

আমিও দেখেছি শ্রীমন্তবাবু।—সর্বেশ্বর বলিলেন এবার।—পরিষ্কার বোঝা যায় সব।

তা যাই বলুন। আমরাও দেখেছি যখন—। শ্রীমন্ত অটল রহিলেন।

তা হ'লে আপনার বক্তব্যটা কি একটু স্পষ্ট বলুন?—গৌড়ানন্দ উষ্মার রেশটুকু দমন করিতে পারিলেন না।

লেখাটা একটু ঠিক ক'রে দিন—এই তো আমার কথা।

একগাছা বেতের জন্য সর্বেশ্বরের হাতখানা নিসপিস করিতে লাগিল।

গৌড়ানন্দ অবাধ্য স্নায়ুগুলি সংযত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলিয়া উঠিলেন, তার পরেও যদি আপনি না দেন টাকা?

তা কেন দেব না, বলুন তো মাস্টার মশাই?

কেন দেবেন না, সে কথা বলা মুশকিলই তো!—সর্বেশ্বর একটা টিপ্পনি দিয়া অনেকটা শান্তি পাইলেন।

গৌড়ানন্দ হাতের লাঠিটা মেঝের উপর খাড়া করিয়া ধরিয়া বলিলেন, বেশ, তাই ক'রে দিচ্ছি। এ কথাটাও যদি আগে বলতেন, এতটা অসুবিধে আমার হ'ত না। ওটা ক'রে দিয়ে তিন-চার দিন পরে আসব তা হ'লে। চলুন মাস্টার মশাই।

অত্যন্ত হীনপ্রকৃতির লোক।—রাস্তায় নামিয়াই সর্বেশ্বর বলিলেন।

আস্ত বাঁদর!—গৌড়ানন্দ বাষ্প খানিকটা বাহির করিয়া দিলেন।—এবারটা দেখি। কেসই করতে হবে ওর নামে শেষ পর্যন্ত। টাকাটার খুব দরকার হয়ে পড়ল কিনা!—একটু থামিয়া বলিলেন আবার।

প্রসঙ্গটাই সর্বেশ্বরের অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। তিনি নীরব হইলেন।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সর্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ দিকে যাবেন এখন? চলুন—আমার ওখানে বসিগে। কাগজটাও পড়া হয় নি আজকের।

চলুন।

কালকের কাগজে আমেরিকার এক প্রফেসরের একটা আর্টিকেল ছিল। বেশ লাগল।

কি লিখেছে ?

লিখেছে ঐ। ভারতের দিকে তাকাও। ভারতের জ্ঞানের আলোই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে স্বীকার করেছে।

সবাই স্বীকার করবে ক্রমে।—গৌড়ানন্দ নিরুৎসুক কণ্ঠে বলিলেন।

রামমোহনবাবুর খবর কি ?—হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সর্বেশ্বরের।

গৌড়ানন্দ গম্ভীর হইলেন। বলিলেন, বলতে পারি নে। তিনি আশ্রমে কিছুদিন থেকে আর যান না।

কেন, কি ব্যাপার ?

আমি মানা ক'রে দিয়েছি।

সর্বেশ্বর বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

গৌড়ানন্দ বলিলেন, কোন বন্ধুর জন্যেই আমি আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট হতে দিতে পারি না।

কি করেছেন ?—সর্বেশ্বর সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আপনি শোনেন নি কিছু ?—গৌড়ানন্দ পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন।

না, কিছুই না।

গৌড়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, আপনার পক্ষে না শোনাই স্বাভাবিক—এ সব নোংরা কথা। রামমোহনবাবুর—। শেষের দিকে একটু টানিয়া গুরুত্ব আরোপ করিয়া দিলেন, চরিত্রদোষ ঘটেছে।

সর্বেশ্বর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। গৌড়ানন্দের চোখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না লজ্জায়। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, কি ? কার ?

সে বড় বিশ্রী ব্যাপার!—গৌড়ানন্দ ঘৃণার স্বরে বলিলেন, বলব চলুন। অবশ্য আমার শোনা কথা। জানি না কতটা সত্যি। কিন্তু রটেছে যখন, কিছু আছেই ভেতরে।

থামিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন একটা।—হুঁ-হুঁ। এথিক্স্। এই এথিক্স্ রামমোহনবাবুর!

সর্বেশ্বর মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

বাড়ি পৌঁছিয়া গোড়ানন্দকে বসিতে দিয়া নিজে বসিয়া সর্বেশ্বর সংকুচিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ সব কথা বলতেও বাধে মুখে।—অবাধ সরস ভঙ্গীতে গৌড়ানন্দ

বলিতে আরম্ভ করিলেন।—কিছুদিন আগে উনি যখন কাশী গিয়েছিলেন, সেই সময় একজন অনাথা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। রাঁধবে বাড়বে, কাজকর্ম করবে, মেয়েটিরও একটা আশ্রয় হবে—এই ভেবেই এনেছিলেন। কিন্তু এখন শুনছি, শুধু রাঁধাবাড়া নয়—সবই চলছে। ক্ষুব্ধ হাস্যের সঙ্গে শেষ করিলেন গৌড়ানন্দ।

সর্বেশ্বর কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, ছিঃ-ছিঃ—

এর পরেও আমি তাঁকে আশ্রমের সংস্রবে যেতে দিতে পারি, বলুন?

না না। উচিত নয়। কিন্তু আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না।

গৌড়ানন্দ উচ্চাঙ্গের হাস্য করিলেন শুধু।

খবরের কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িতে শুরু করিয়াই বলিলেন, অথচ এই রামমোহনবাবুর চরিত্রের দৃঢ়তা একটা আদর্শের মত ছিল লোকের কাছে। বড় ভাইয়ের সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে বিয়ে করলেন না, তাতে বিঘ্ন হবে মনে ক'রে।

তা জানি, সেই জন্যেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট আমারও কম হয় নি সর্বেশ্বরবাবু।—গৌড়ানন্দ গভীর আবেগের সঙ্গে বলিলেন, কিন্তু মানুষের দুর্বলতা যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা আমি জানি।

সত্যি, মানুষ বড় দুর্বল।—সর্বেশ্বর দুর্বল মন্তব্য করিলেন।

না।—গৌড়ানন্দ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিলেন যেন।—না। মানুষ দুর্বল নয়। অমৃতের পুত্র মানুষ। দুর্বলতা জয় করতে পারে ব'লেই মানুষ। কই, আপনি আমি তো দুর্বল নই।

সর্বেশ্বর চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন, হ্যাঁ, দুর্বলতা জয় করার মধ্যেই তো মনুষ্যত্ব। কিন্তু কজনই বা পারে? দুর্বল সবল সব রকমের মানুষ নিয়েই জগৎ।

সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু রামমোহনবাবুর মত উচ্চশিক্ষিত সবল মানুষের এই অধঃপতন। আমি ক্ষমার অযোগ্যই মনে করি।

তা বটেই তো।

গৌড়ানন্দ খবরের কাগজে চোখ বুলাইতে লাগিলেন।

বাজারের থলি হাতে লইয়া ভৃত্য লোচন দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সর্বেশ্বর দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইলেন।—হ্যাঁ, একটু দাঁড়া।

গৌড়ানন্দ মুখ তুলিয়া বলিলেন, ও, বাজার হয় নি বুঝি?

না, যাব এখন।—সর্বেশ্বর চাঞ্চল্য গোপন করিলেন।

আচ্ছা, আমি উঠি সর্বেশ্বরবাবু।

বসুন না। তাড়াতাড়ির কি আছে! বাজারটা আবার এখানকার এমন, একটু দেরি করলেন তো ভাল জিনিস কিছুই পাবেন না।

আমি জানি ভাল জিনিস সকালে না গেলে পাওয়াই যায় না।

গৌড়ানন্দ উঠিলেন।

১২

টাকা ফুরাইয়া আসিতে বীরেশ্বর নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছেদ টানিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। কলেজ আমলের বন্ধু ভবতোষের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রথমেই বলিল, শোন্, আগে কাজের কথাটা ব'লে নিই। পরে সব আলাপ করা যাবে।

তাই কর্।—ভবতোষ হাসিয়া বলিল।

শোন্। আমি এক রকম 'সর্বতীর্থ ঘুরিলাম' ক'রে এখানে এসেছি কালকে। মাস খানেকের হোটেল-খরচ এখনও আছে সঙ্গে। কাজেই এক মাসের মধ্যে আমার একটা ব্যবস্থা করা চাই। বাংলা লিখতে পারি। ভালই পারি বোধ হয়। শুনেছি, সিনেমার সংলাপ লিখে বেশ টাকা পাওয়া যায়। একটু ধরপাকড় ক'রে তারই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। একটা ট্রায়েলের চান্স অন্তত যোগাড় করতে হবে। তারপর, দেখা যাক। কলকাতায়ই থাকব স্থির করলাম।

হয়েছে?

না, আর একটা কথা। আর আমার সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে একজন মেয়ে ঠিক করতে হবে।

অ্যাঁ?

প্রেম করবার একজন মেয়ে চাই, বাস্। আর কিছু চাই না। এইবার বল্ তুই।—বীরেশ্বর আরাম করিয়া বসিল।

ভবতোষ বলিল, এখন আলাপ করা যায়? কাজের কথা তো হ'ল?

বাক্যের উত্তেজনা নিঃশেষ হওয়ায় বীরেশ্বর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

কি করছিলি এদ্দিন?

দালালি করছিলাম ভাই। আর লিখছিলাম। না, লিখতে চেষ্টা করছিলাম।

কি?

শীঘ্র জবাব দিল না বীরেশ্বর।

কি লিখছিলি?

ইভলিউশন। মনের।—একটু হাসিয়া অবশেষে বলিল বীরেশ্বর।

সর্বনাশ!

সর্বনাশই বটে।—বীরেশ্বর ক্লান্তস্বরে বলিল, ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিলি কেন?

নাগাল পেলাম না। লিখলে ভুল কথাই হয়তো লিখব যখন মনে হ'ল, তখন ছেড়ে দিলাম। স্থগিত রাখলাম বরং। মনটা শেষকালে আমাকেই ভিক্‌টিম ক'রে নানা খেল্ শুরু ক'রে দিলে কিনা!

ভবতোষ হাসিয়া উঠিল।—কি রকম?

বীরেশ্বর সভয়ে পিছাইয়া গেল যেন।—পরে। পরে। দুদিন জিরোতে দে ভাই।

ভবতোষ নীরব দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল কিছুক্ষণ। বীরেশ্বরের কথাবার্তার একটা অর্থ-সঙ্গতি স্পষ্ট হইয়া উঠিল যেন। বলিল, হ্যাঁ, তোকেই শেষকালে ভিক্‌টিম করল! খেল্‌টা কি খেলল সে থাক্ এখন। তারপরে? হাতড়ে বেড়াচ্ছিস বুঝি?

বেড়িয়েছি। কিন্তু, আর না।

ভবতোষ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, চা খাবি?

হ্যাঁ।

ভবতোষ একটা হাঁক দিয়া চায়ের হুকুম দিল।

লেখাটা নিয়ে এসেছিস?—ভবতোষ বলিল।

বীরেশ্বর মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া জবাব দিল, না।

যাকগে, শেষ হ'লে দেখা যাবে।—ভবতোষ ছাড়িয়া দিল। এখন তা হ'লে তোর কাজের কথায় আসা যাক। সিনেমার সংলাপ। ধর্, একটা ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু সেটা দালালির চেয়ে উচ্চস্তরের মনে করছিস কেন? মোটেই তা নয় যে। সংলাপ মানে—প্রলাপ। লিখতে পারবি?

কথাটা মনে লাগিল বীরেশ্বরের। কিন্তু ভাবিতে গিয়া মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খাইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল আবার।—এখানেই থাকতে হবে যে আমাকে। যে স্তরের হোক দালালি এখানে সম্ভব হ'লে তাই করতাম। যা হোক একটা কিছু করতে হবে তো। ঐটেই সুবিধে মনে হচ্ছে।

বেশ, দেখ্ চেষ্টা ক'রে। আচ্ছা, তা হ'লে এক নম্বর গেল। এখন দু নম্বর। প্রেম করবার মেয়ে।

হ্যাঁ, এটা আরও জরুরি।

এটা আরও কঠিন রে ভাই।—ভবতোষ অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।—লাখে লাখে মেয়ে প্রেম করছে, অথচ দরকার মত একজনও পাওয়া যাবে না। এই দুঃখেই আমাকে বিয়ে করতে হ'ল যে।

বিয়ে করেছিস তুই?

দু বছর।

বীরেশ্বর কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হইয়া রহিল। হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, বেশ, ভাল। কিন্তু বিয়ে করলে আর এখানে কেন? বাড়িই ফিরে যাই।

বাস্, মুহূর্তে ফেঁসে গেল সব?—ভবতোষ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেশ্বর পুনরায় পিছনে হেলান দিয়া পড়িয়া একটু হাসিয়া বলিল,

কি করব? তুই নিরাশ ক'রে দিলি যে। তা ছাড়া—। বীরেশ্বরের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।—নতুন ফিলজফি দেব আমি—আমার মানসিক অবস্থা এমন না হ'লে চলে?

চা আসিল।

বীরেশ্বর এক চুমুক টানিয়া লইয়া বলিল, তবে ফিলজফি আছে আমার। দেব।

তবে দিয়ে দে না। চুকে যাক।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

বীরেশ্বর বলিল, আমাদের স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করবার সময় একটা কথা ব'লে ফেলেছিলাম। প্রচণ্ড দার্শনিক তথ্য।

কি—রে?—ভবতোষ ইয়ারকির সুরে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

-মানবদেহটা এখনও তৈরি হয় নি। কথাটা অবশ্য ঝোঁকের ওপর বলেছিলাম। কিন্তু ক্রমশ যেন হাড়ে হাড়ে কথাটার সত্যতা, যাকে বলে উপলব্ধি—করছি আমি। আমার নিজেরই অনেক কার্যকলাপের পরে, বুঝলি, কেমন একটা অস্পষ্ট বানর-বানর ভাব এসে যায়। মনে হয়, আমি বানরই র'য়ে গেছি।

জোরে হাসিতে গিয়া থামিয়া গেল ভবতোষ; বলিল, আর সকলকে কি মনে হয়?

তখন আর অস্পষ্টতা থাকে না।

স্পষ্ট বানর?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দালালিতে, প্রেমে—

প্রেমেও?

খুব বেশি। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত সমষ্টিগত—ন্যাশনাল ইণ্টার-ন্যাশনাল যত প্রকার আছে—ধূর্ত স্বার্থবুদ্ধির চেঁচামেচিতে আসল জমি সম্বন্ধে ভুল হবার জো নেই।

ভবতোষ অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল, তোর কেস্‌টা আমি বুঝেছি। ভাল একটা চাকরি। তোকে রক্ষা করতে হ'লে ভাল চাকরি একটা চাইই। রোগটা ঐ।

হ্যাঁ, বোধটা একেবারে মেরে ফেলতে হ'লে তাই চাই। তোর মত! ভাল চাকরিতে নিশ্ছিদ্র মজবুত হয়ে বসেছিস!

নইলে জীবন তোর দুর্বহ হয়ে উঠবে যে।

একটু উঠুক।—বীরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।—এখন অন্তত বোধ আছে, বুঝতে পারি। সেটুকু আর নষ্ট করতে চাস না। এই উপকারটা করিস না আমার।

আচ্ছা, করব না। ব'স্, ব'স্।

বীরেশ্বর হাসিয়া আবার বসিল।

তা হ'লে আমাকে এখন কি করতে বলছিস?—ভবতোষ মনে করাইয়া দিল।

বীরেশ্বর চিন্তা করিতে করিতে ডুবিয়া গেল কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ এক সময়ে বলিল, আচ্ছা, আমি যদি এখন সিদ্ধান্ত করি যে, কাল থেকে আমি রিক্শ টানতে শুরু করব, কি চানাচুর ফেরি করব, কি থিয়েটারে ঢুকব, কি—

অনেক আছে—লিস্ট বাড়িয়ে লাভ নেই। তা হ'লে কি—তাই বল্।

যে কোন সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারি। আটকাবে কে?

কেউ না।

শ্রীনগরেই যদি জীবনটা কাটিয়ে দেবার মতলব করি আমি? কিংবা কাটামুণ্ডুতে?

কে আটকাবে?

তাই বল্। আবার বাড়িও চ'লে যেতে পারি আজকেই।

খুব—খুব।—ভবতোষ সহাস্যে উৎসাহ দিল।

আশ্চর্য স্বাধীনতা রয়েছে আমার। তা হ'লে বাড়িই যাই, কি বলিস?

কেন যাবি না? যাবার স্বাধীনতা রয়েছে যখন?

বীরেশ্বরও হাসিল। অত্যন্ত ম্লান হাসি। বলিল, কলকাতায় থাকব—এই সিদ্ধান্তই পথে করছিলাম। প্ল্যানটা চমৎকার মনে হয়েছিল। এখন—। তা ছাড়া তুইও তো ভরসা দিতে পারলি না কিছু?

ভবতোষ জবাব না দিয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, শোন্। মজবুত নিচ্ছিদ্র লোকের একটা পরামর্শ শুনবি?

বীরেশ্বর একটা অবলম্বনের আশায় আশান্বিত হইয়া উঠিল। বলিল, বল্।

বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। তারপরে মন স্থির ক'রে সিদ্ধান্ত একটা করা আর সেই মত কাজ করা বাস্তবিকই কঠিন হবে না দেখবি। এখন চল্ প্যারাডাইসে ভাল হিন্দী ছবি আছে একটা, চল্। বীরেশ্বর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল।

রাস্তায় ভবতোষ আর একবার উপদেশ দিল।—জীবনটাকে একটু সহজভাবে নে, সহজ ভাবে দেখ্, সব সহজ হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ পরে বীরেশ্বর কথা বলিল, তাই করব। লেখা-টেখা সব ছেড়ে দেব। দাদার মত হবার জন্মে চেষ্টা করব। গীতা, কলা, চিঁড়ে, দই, এমন একাকার ক'রে, এমন সমগ্রভাবে গ্রহণ করেছেন দাদা! সুন্দর! তাই করব।

ভবতোষ বীরেশ্বরের অনেক কষ্টের ফাঁকা শান্তি ভঙ্গ করিল না।

ক্রমশ

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

ইণ্টার-ভিউ

হে রাজকন্যা, তোমার পিতার প্রাসাদ-দ্বারে
কপাল ঠুকিতে এসেছি আমরা তিরিশ জনা;
বাঁচিবে সে জন কুসুম-মাল্যে বরিবে যারে।
মরিবে বাকিরা। দোহাই তোমার, ধ'রো না ফণা,
হেনো না ছোবল তীক্ষ্ণ দন্তে আজিকে মোরে,
লহ জড়াইয়া ললিত-বাহুর ভুজগ-পাশে—
দংশিও পরে আজীবন কাল পরাণ ভ'রে,
ঢালিও গরল, ব'লো কুবচন—যা মনে আসে।

সেদিনের সেই বিষ-দংশন গোপন রবে,
লুকাব তাহারে দেঁতো হাসি হেসে মানের দায়ে;
আজ যদি কাটো, ছটফটানিটা দেখিবে সবে—
মরিব শরমে, না-ও যদি মরি কাটির ঘায়ে।

তাই তোমারেও, ওগো গ্যাদারিণি, মিনতি করি,
নহিলে কি ভাব তোমারই জন্যে রয়েছি মরি' ॥

দমদম মতিঝিল
১৬ই জুলাই। ১৯৫০

"সম্বুদ্ধ"

কল্যাণ-সঙ্ঘ

৯

সকাল নটা। সমরেশ বাইরের বারান্দার এক পাশে একটা ঈজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত হয়ে কি একটা বই পড়ছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখল, লতু ও তিলু আসছে। বইটা বন্ধ ক'রে সমরেশ খাড়া হয়ে বসল। তিলুর মুখ গম্ভীর। লতুর মুখে মৃদু হাসি। কাছে আসতেই সমরেশ উঠে দাঁড়াল; মুখে হাসি টেনে বললে, কি খবর? তিলু জবাব দিল না। লতু বললে, নেমন্তন্ন করতে এসেছি আপনাদের। সমরেশ প্রবল আগ্রহের ভান ক'রে বললে, তাই নাকি? কখন? লতু জবাব না দিয়ে তিলুর পাছু পাছু ঘরে ঢুকে গেল। সমরেশ তাদের অনুসরণ করল।

ভেতরের বারান্দায় গিয়ে তিলু হাঁক দিলে, কাকীমা! সমরেশের মা পূজোর ঘরে ছিলেন। সাড়া দিলেন, কে? তিলু? ব'স মা, আমার হ'ল ব'লে। নফরের মা! একটা মাদুর পেতে দে। নফরের মা কাছেপিঠে ছিল না। থাকলেও সুবিধে হ'ত না। কানে সে কম শোনে। সমরেশ বললে, দাঁড়াও, আমি মাদুর পেতে দিচ্ছি।

লতু বললে, আপনাকে আর আতিথেয়তা করতে হবে না। কোথায় মাদুর আছে বলুন দেখি? শোবার ঘরে তো? ব'লে লতু যেতে উদ্যত হতেই সমরেশ বললে, তুমি দাঁড়াও না। আমি এনে দিচ্ছি। বিছানায় পাতা আছে আমার। লতু বললে, থাকলেই বা, আমি কি তুলে আনতে পারব না? তিলু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, নিজেই আসুক না। পরের শোবার ঘরে ঢোকবার তোর দরকার কি বাপু? কি না জানি মূল্যবান জিনিস-পত্র আছে! ব'লে মুখ মচকাল। সমরেশ মাদুরটা এনে লতুর হাতে দিয়ে বললে, তোমাদের আতিথেয়তা করব না? কি রকম আতিথেয়তা করলে সেদিন!

লতু মাদুর পাততে পাততে বললে, বাঃ রে! আমার দোষ কি? চা তো করেছিলাম আপনার জন্যে। দাদু যদি—

বাধা দিয়ে তিনু বললে, বাজে কথার জবাব দিয়ে আমার কি হবে? চিনির তো চাষ হয় না কারও বাড়িতে? যাকে-তাকে যখন-তখন চা খাওয়ানো উঠে গেছে সব বাড়িতেই। তা ছাড়া, চা খাবার তো একটা ভাল জায়গা হয়েছে আজকাল।

সমরেশ বললে, খাবার জন্যে কাউকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে না খাইয়ে যে বিদেয় ক'রে দেয়, তাকে কি বলে লতু?

মা বার হয়ে এলেন। পরনে কেটের কাপড়; কপালে চন্দনের ছাপ-ছোপ; হাতে একটি রেকাবিতে কলা মিষ্টি ইত্যাদি পূজার প্রসাদ। মায়ের মুখ প্রসন্ন। কাছে এসে তিনু ও লতুকে প্রসাদ দিলেন। যা রইল, সমরেশের সামনে ধ'রে বললেন, এই নে।

সমরেশ বললে, পরে খাব, এখন রেখে দাও। মা ভুরু কুঁচকে বললেন, আবার কোথায় রাখতে যাব? খেয়ে নে না এখনই।

তিনু বললে, পুজোর প্রসাদ তো খেতে নেই ওদের। ভগবান নেই ওদের মতে।

মা বললেন, কাদের মতে?

তিনু মুখ টিপে হেসে বললে, যাদের সঙ্গে মিশছে আজকাল, চব্বিশ ঘণ্টা প'ড়ে আছে যাদের কাছে।

মা গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, সে কি কথা?

তিনু বললে, ভগবান নেই, ধর্ম-অধর্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই, জাতের বিচার নেই, বামুনের সঙ্গে বাউড়ীর, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বিয়ে হওয়াতে আপত্তি নেই—

মা অবাক হয়ে শুনছিলেন, হঠাৎ রেকাবিটা সমরেশের সামনে ধ'রে বললেন, নে, ধর্, না ধরিস তো আমার মাথা খাস তুই। সমরেশের হাতে রেকাবিটা গুঁজে দিয়ে বললেন, এই পেসাদ ছুঁয়ে বল্ যে, কখনও মিশবি না ওদের সঙ্গে।

মা, তুমি কেন ক্ষেপছ বল দেখি! মিথ্যে ব'লে তোমাকে খেপাচ্ছে। মা বললেন, হ্যাঁ, মিথ্যে বইকি। তিনু কখনও মিথ্যে

বলে না। আজ এত দিন ওকে দেখছি, ওকে আমি চিনি না? মিথ্যে বলিস তুই, তোরা।

সমরেশ বললে, বেশ, তাই। তা হ'লে প্রতিজ্ঞা করিয়ে লাভ কি? ভগবান যখন মানি নে, তখন পূজোর প্রসাদ ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে ভয় কি আমার? ব'লে রেকাবিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মা বললেন, শুনলে মা কথা?

তিলু বললে, আপনি শুনুন, আমি ঢের শুনেছি।

মা যথারীতি সখেদে বললেন, এ ছেলে নিয়ে আমি কি করব বল তো? কি উপায় করি ওর? আজ যদি চোখ বুজি, ও তো খেরেস্তান হয়ে বেরিয়ে যাবে।

লতু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। মা বললেন, তুই হাসছিস দিদি! সত্যি আমার ওই ভয়।

লতু বললে, ভোঁদু মামাকে আপনি যা করেন, মনে হয় উনি যেন এখনও আপনার কোলের খোকা। কিন্তু কলকাতায় আমাদের পাড়ার সবাই ওকে যা খাতির করত!

মা বললেন, তা করুক দিদি। কিন্তু ওর বুদ্ধিশুদ্ধি এখনও কিছু হয় নি। লতু হাসতে লাগল। তিলু বললে, আজ দুপুরে স্বামীজী আমাদের ওখানে চণ্ডীপাঠ করবেন। আপনি যাবেন। মা সাগ্রহে বললেন, স্বামীজী চণ্ডীপাঠ করবেন? যাব বইকি মা।

তিলু বললে, রান্না-বান্না করবেন না। সবাই ওখানেই খাবেন। শুধু দুপুরে নয়, রাত্রেও।

মা বললেন, হঠাৎ এত সব ব্যাপার হচ্ছে যে?

তিলু বললে, জামাইবাবু কাল এসেছেন। লতুর বিয়ের সম্বন্ধে রায়-বাহাদুরের সঙ্গে পাকা কথাবার্তা কইবেন। রায়বাহাদুরদের বাড়ির সবাইকে রাত্রে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে। শুভকাজ আর স্বামীজী এখানে আছেন, সেই জন্যে চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করেছেন।

মা বললেন, বেশ করেছেন মা। মা-চণ্ডীর কৃপায় সব শুভ হবে। তপন ছেলেটিকে তো দেখলাম সে দিন। বেশ ছেলে। যেমন চেহারা, তেমনই ব্যবহার। লতুদিদির আমার বেশ ভাল বর হবে।

লতু লজ্জায় মুখ নীচু করল।

তিলু বললে, তা হ'লে যাবেন ঠিক?

মা বললেন, যাব মা।

দুজনে মাকে প্রণাম করল। মা আশীর্বাদ করলেন, সুখী হও মা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

বাইরের বারান্দায় সমরেশ ঈজি-চেয়ারটায় ব'সে পড়ছিল। এদের পায়ের শব্দ পেয়েও মাথা তুলল না। লতু বললে, ভোম্বল মামা! আজ আমাদের ওখানে নেমন্তন্ন। সকাল সকাল যাবেন।

সমরেশ বললে, তাই নাকি?

তিলু ব্যঙ্গের স্বরে বললে, সকাল সকাল না যাওয়াই ভাল। চণ্ডীপাঠ হবে। ওসব শুনে সময় নষ্ট না ক'রে আড্ডায় জমায়েৎ হ'লে ঢের বেশি কাজ হবে।

কিছুক্ষণ পরে সমরেশের মা এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, পেসাদ খেলি? সমরেশ বললে, হ্যাঁ। মা বললেন, ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন, খেতে বেলা হয়ে যাবে। কিছু খাবি কি আর?

সমরেশ বললে, না।

মা বললেন, লতুর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করবার জন্যে জামাই এসেছেন। তাই এত সব ব্যাপার।

সমরেশ বললে, তাই নাকি? আমাকে তো কিছু বললে না।

মা বললেন, বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে দিতে চান। ছুটি ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়।

সমরেশ বললে, ছুটি ফুরিয়ে গেলেই বা। উনি তো চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন।

মা সবিস্ময়ে বললেন, সে কি! এত বড় চাকরি—লোকে সাধ্যি-সাধনা ক'রে পায় না!

সমরেশ বললে, এইখানেই থাকবেন। বাড়ি করবার জন্যে জায়গা খোঁজা হচ্ছে।

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। বললেন, তাই নাকি? আর কোন মতলব নেই তো?

সমরেশ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে উৎসুক কণ্ঠে বললে, কিসের মতলব?

মা বললেন, তিলুকে বিয়ে করবার।

সমরেশ বললে, থাকতে পারে। জামাইবাবুর বয়স তো এমন বেশি নয়। তিলুর সঙ্গে বেমানান হবে না।

মা সমরেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, যা হবার হোক বাছা। আমি একা ভেবে কি করব? ছেলে যার মুখের দিকে তাকায় না, তার অদৃষ্টে অনেক দুঃখু আছে। ব'লে বাড়ির ভেতরে চ'লে গেলেন।

একটু পরেই সমরেশ উঠল। উঠে প্রতুলের বাড়ি চলল। কতকটা গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হ'ল তাকে। একটা মোটর গাড়ি প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে পিছনে আসছে। পুরনো মডেলের ফোর্ড। ফোর্ড সাহেবের প্রথম চেষ্টার ফল খুব সম্ভব। কালো রঙ। রোদে জলে রঙ চ'টে গিয়েছে। তালি দেওয়া হুড ধুলোয় ধূসর হয়ে উঠেছে। হর্ন আছে; কিন্তু বেশ বাজে না। বাজাবার দরকারও হয় না। এমনই যা শব্দ হয়, তাতেই আগে পিছে মাইল খানেকের মধ্যে সবাই সতর্ক হয়ে ওঠে। সমরেশ পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা সামনে আসতেই দেখল, গাড়িতে মৃণালিনী ও রোসেনারা। সমরেশকে দেখেই রোসেনারা ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললে। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষতে শুরু করল। হাত দশেক এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা থামল; কিন্তু ভেতরে ইঞ্জিনটা চলতে লাগল এবং তারই ধমকে গাড়িটার সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

রোসেনারা মুখ বাড়িয়ে ডাক দিলে, সমরেশবাবু, শুনুন।

সমরেশ কাছে যেতেই বললে, কোথায় যাচ্ছেন? প্রতুলবাবুর বাড়ি বুঝি?

রোসেনারার পরনে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি, সাচ্চা জরির পাড়। গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ। পরিপুষ্ট, সুগোল, শুভ্র হাত দুটি গাড়ির ধারে রেখে কথা বলছে, বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটি ছোট সোনার রিস্ট ওয়াচ। মৃণালিনী স্নান সেরেছেন। এলো খোঁপা। পরনে সাদা শিল্কের

পাড়হীন শাড়ি, সাদা সিল্কের ব্লাউজ। চোখে রিম-লেস সোনার চশমা।

সমরেশ বললে, আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

রোসেনারা বললে, আমরা গিয়েছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠী, মিসেস বোসের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের বাড়ি এসেছিলেন কাল বিকেলে, মিসেস রায়ের বাড়িও। তাই আজ দুজনে দেখা ক'রে এলাম। আসুন না আমাদের গাড়িতে। শুক্তির কাছে যাচ্ছি আমরা। প্রতুলবাবুর বাড়িতে নামিয়ে দেব।

চারিদিকে তাকিয়ে সমরেশ গাড়িতে উঠল। ড্রাইভারের পাশে বসল।

তিনুদের বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়ি চলল। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তপন ও তিনুর ভগ্নীপতি। রোসেনারা তপনকে দেখতে পেয়ে বললে, তপনবাবুকেও তুলে নেওয়া যাক।

মৃণালিনী বললে, থাক্ থাক্। তপনকে খরচের ঘরে লিখে রাখ তোমরা। আমাদের পাশ মাড়ায় নি এসে থেকে।

গাড়িটা পার হয়ে গেল। তপনরা গাড়িটার দিকে তাকাল। সমরেশকে দেখে তপনের মুখে হাসি ও তিনুর ভগ্নীপতির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

মৃণালিনী সকৌতুকে বললেন, ঐ ভদ্রলোককে চেনা মনে হ'ল! কোথায় যেন দেখেছি ওঁকে।

সমরেশ বললে, উনি তো ও-বাড়ির জামাই। নাম—গুণেনবাবু, যুদ্ধ বিভাগে চাকরি করেন। ছুটি নিয়ে এসেছেন।

বিস্ময়ের চমক জাগল মৃণালিনীর চোখে মুখে, বললেন, কি নাম বললেন, গুণেন? কোথায় বাড়ি বলুন তো?

সমরেশ বললে, কোথায় ঠিক বলতে পারব না। খুব সম্ভব বিহারের কোন শহরে।

বহুদিনের বিস্মৃত কোন ঘটনার স্মৃতি জেগে উঠল মৃণালিনীর মনে; চোখ দুটি তন্দ্রাতুর হয়ে উঠল; এক কোণে হেলে প'ড়ে চোখ বুজে ব'সে রইলেন।

রোসেনারা বললে, ওঁকে চিনতেন নাকি ?

মৃণালিনী মৃদুকণ্ঠে বললেন, বোধ হয়।

প্রতুলের বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই শৈলী বেরিয়ে এল সমরেশ জিজ্ঞেসা করলে, প্রতুল আছে নাকি ?

শৈলী বললে, আছেন।

সমরেশ নেমে মেয়েদের নমস্কার ও ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

শৈলী বললে, আপনারা নামবেন না ?

রোসেনারা বললে, না। শুক্তিদির ওখানে যাচ্ছি। বিশেষ কথা আছে। তুমিও এস আমাদের সঙ্গে।

শৈলী বললে, আমি তো যেতে পারব না। মায়ের জ্বর হয়েছে।

রোসেনারা বললে, তাই নাকি ? তা হ'লে গিয়ে কাজ নেই তোমার। আমরাই যাই। আমি আসব এখন, সব বলে যাব তোমাকে।

১০

শুক্তিদের বাড়ি। শুক্তি চাঁদা আদায় করতে বেরিয়েছে। এ কাজটির ভার তার উপরেই। বাড়িতে বাড়িতে যায়। উকিল, ডাক্তার, মাস্টার, কেরানী, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী—সকলের বাড়িতেই। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। কোন কোন বাড়িতে শ্রদ্ধা, সম্মান, এমন কি স্নেহও পায়; আবার কোথাও পায় অনাদর, অশ্রদ্ধা। কোন কোন বাড়ির গৃহিণী স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আমাদের বাড়ি এসো না ; কর্তা এসব ধিঙ্গিপনামি পছন্দ করেন না। সব রকমের ব্যবহারকে সমান হাসিমুখে নিতে পারে শুক্তি। সুযোগ পেলেই মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে। বুঝিয়ে দেয় তাদের, এ দেশে মেয়েরা কত অসহায়, কত দুর্বল, কত পরমুখাপেক্ষী ; জানিয়ে দেয় তাদের, বিদেশের মেয়েরা কত স্বাধীন-চিত্ত, স্বাবলম্বী, সব বিষয়ে কত অগ্রসর। চেষ্টা করলে মেয়েরা যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে, শিক্ষা-দীক্ষায়, কাজ-কর্মে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, তা বুঝিয়ে দেয় তাদের। অন্য দেশের, বিশেষ ক'রে রাশিয়ার মেয়েদের কার্যকলাপ-কাহিনী গল্প করে। যে সব বইয়ে এই সব কাহিনী লেখা

আছে সেই সব বই সংগ্রহ ক'রে পড়তে দেয় মেয়েদের। শহরে অনেক সনাতন-পন্থী বাড়ির মেয়েরাও তার চাল-চলন পছন্দ না করলেও, তার মিষ্ট স্বভাব, স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের জন্য তাকে অপছন্দ করে না।

নীরজা বাড়িতেই আছে। নিজের ঘরে, বিছানায়। বালিশে বুক চেপে শুয়ে একমনে চিঠি লিখছে। কতকটা লিখছে, আবার ভাবছে। কথা না জোগালে মাঝে মাঝে ফাউণ্টেন পেনের মাথাটা কামড়াচ্ছে।

চিঠি লিখছে একটি ছেলেকে। ছেলেটি সাপ্লাই-বিভাগে চাকরি করে। বছর ছাব্বিশ বয়স। লম্বা, দোহারা গঠন। শক্তিমান, ব্যায়ামপুষ্ট দেহ। উজ্জ্বল-শ্যাম গায়ের রঙ। খাড়া নাক, সরু ঠোঁট, দৃঢ় চিবুক ও চোয়াল, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চোখ, মুখে পৌরুষের ছাপ। পার্টিতে আনাগোনা শুরু করেছে ছেলেটি। নিজে থেকে করেনি, নীরজাই করিয়েছে। প্রথম দেখা হয় তার সঙ্গে সিনেমায়। একটা নাম-করা বাংলা ছবি চলছিল। দ্বিতীয় শো রাত ন'টায়। টিকিট-ঘরের সামনে অত্যন্ত ভিড়। নীরজা টিকিট কিনতে পারে নি। ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে। মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল, টিকিট কেনা হয়ে গেছে। শহরে কলেজের বা কলেজ থেকে পাস করা ছেলেদের নীরজা চেনে। একে আগে দেখে নি। কাছে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে বললে, দেখুন, দয়া ক'রে আমার টিকিটটা কিনে দিন না। বিস্মিত হ'ল ছেলেটি। মফস্বল শহরেও এমন এগিয়ে আসা মেয়ে আছে নাকি! মুখের দিকে চাইল নীরজার। পাউডারের পুরু প্রলেপের উপর বিজলী বাতির আলো শুভ্র ছটায় বিকীর্ণ হয়ে চোখে পড়ল তার। ইতিমধ্যে নীরজা সামনের দাঁত দুটি চেপে, অধরোষ্ঠে করুণ হাসির আভাস জাগাল, চোখে ফুটিয়ে তুলল অসহায় ব্যাকুলতা। ছেলেটি সাগ্রহে বললে, বেশ তো, দিন না।

অনেক কষ্টে টিকিট কিনে এনেছিল ছেলেটি। চেহারা ও পোশাক দু-ই বিপর্যস্ত হয়ে গিছল। নীরজা ন্যাকামির সুরে বলেছিল, ছি ছি, ভারি অন্যায় হ'ল! মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিলাম। একজনের আসবার কথা ছিল। এলে আর আপনাকে—

ছেলেটি বললে, কি আর কষ্ট!

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, কোন্ পাড়াতে থাকেন?

পাড়ার নাম বলল ছেলেটি। নীরজা সোৎসাহে বললে, আমাদের বাড়ির কাছেই তো! ভাল হ'ল। এতখানি রাস্তা এত রাত্রে একলা ফিরতে হবে না আমাকে। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে, কি বলুন?

ছেলেটি একটু বিপন্ন হ'ল ব'লে মনে হ'ল। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছেলে। রাত্রির অন্ধকারে অপরিচিতা যুবতী মেয়েকে পাশে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে সঙ্কোচ কাটে নি এখনও। কোন রকমে বললে, বেশ তো। এবার নীরজা হাসল। চোখের কোণে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে বললে, কথা থাকল, ফেলে পালিয়ে যাবেন না।

ফিরেছিল এক সঙ্গে। হেঁটে নয়, রিক্‌শায়। ভাড়া অবশ্য দিয়েছিল ছেলেটিই। সেই সময়ে পরিচয়-বিনিময় হয়েছিল। ছেলেটি সরকারী চাকরিতে ঢুকেছে সম্প্রতি। কাঁচা হ'লেও পাকা হবে অদূরভবিষ্যতে। মুরুব্বির জোর আছে পিছনে। নীরজার পাশাপাশি ঘেঁষাঘেষি ব'সে ছেলেটির বুকের মধ্যে জোয়ার উঠেছিল, কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, মাথা মুখ গরম হয়ে উঠেছিল, কালঘাম ছুটছিল সারা দেহে, কপালে ও কপোলে; ঘন ঘন রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে শুকনো গলায় নীরজার কথার উত্তর দিচ্ছিল। রিক্‌শা থেকে নেমে নীরজা ছেলেটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আবার আসবার জন্য। ছেলেটি আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে নি।

পৃথিবীতে কোন ভাল জিনিস নির্বিঘ্নে আয়ত্ত করবার উপায় নেই। সকলেরই চোখে পড়ে, চোখ টাটায়। ছেলেটি তাদের এখানে একদিন পার্টি-মীটিঙে আসতেই সব মেয়েই সহস্রচক্ষু হয়ে উঠল। রোসেনারা তো রোশনাইয়ের মত জ্ব'লে উঠল, কানের হীরের দুলে, হাতের চুড়িতে, গলার হারে, চোখে, মুখে, সর্বাঙ্গে। নীরজাকে তার কানে কানে বলতে হ'ল, সাপ্লাই বিভাগের ক্ষুদে চাকুরে, মাইনে একশো টাকার খুব বেশি নয়। একটু ধাতস্থ হ'ল রোসেনারা। এমন কি শুক্তির মত মেয়ে, বরফের মত ঠাণ্ডা জমাট, সেও যেন গলতে শুরু করবে মনে হ'ল। পদ্মা, রাধা আর আর মেয়েরা সবাই ন'ড়ে চ'ড়ে বসল, ঘন ঘন

নয়ন-বাণ হানতে লাগল ছেলেটার উপর। বেসামাল হয়ে উঠল ছেলেটি, সপ্তরথীর সমবেত আক্রমণে অভিমন্যুর মত। তার চেয়ে বে-সামাল হয়ে উঠল নীরজা। কোন রকমে ব্যূহমধ্য থেকে ছেলেটিকে টেনে বার করল। এক পাশে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বললে, চলুন একটু বাইরে, কথা আছে। মেয়েদের মধ্যে মুখ-টেপা হাসি আর চোখ-টেপা চাহনি চলতে লাগল। গ্রাহ্য করে নি নীরজা। ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে নিষেধ ক'রে দিয়েছিল, পার্টি-মীটিঙে আসতে হবে না। সরকারী চাকরিতে গোলমাল হতে পারে। এমনই এখানে আসবেন। সুবিধেমত সময়ের হদিশ জানিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু নীরজাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে না কেউ। সুবিধেমত ঘাটে ভিড়তে চায় সে। এ জীবন আর ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না জীবনের এই পরমক্ষণকে ব্যর্থতার মধ্যে বিলিয়ে দিতে। চায় একজন সাথী, যার কাঁধে নিজের ভার চাপিয়ে দিতে পারে। চায় নিজের পছন্দমত একটি বাড়ি একান্তভাবে নিজের। চায় ছেলে-মেয়ে, চায় সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনাময় জীবন। অনেক কষ্টে পেয়েছে একজনকে যে ধরা দেবার জন্যে উন্মুখ। কিন্তু পিছন থেকে টান দিতে শুরু করেছে একজন।

মৃণালিনীর লোভ কিসের জন্য ছেলেটির উপরে? বয়স তো চল্লিশের কোঠায় পা বাড়িয়েছে। নিজের জন্যে একে চাওয়া শুধু অশোভন নয়, অনৈতিক। দুবার নাকি নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়েছে রাত্রে। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত গল্প করেছে, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের হিসেব জানিয়েছে। মৃণালিনীর নিজের একটা মেয়ে আছে অবশ্য। দেখতে মন্দ নয় মেয়েটা ; পনেরো পার হয়েছে কিনা সন্দেহ। হাতীর পিঠে মাহুতের মত, ঐ কচি মেয়েটাকেই ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় নাকি! ঐ মায়েরই তো মেয়ে। অঙ্কুশ হাতে পেয়েছে জন্মসূত্রে ; ছেলেটাকে চালিয়ে নিতে পারবে না বলা যায় না।

শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে নীরজাকে। ঘূর্ণির পাক কাটিয়ে বার ক'রে আনতে হবে ছেলেটাকে। আজকাল আয়নায় চোখ দিলেই যৌবনের অস্তিমতা কাঁটার মত চোখে মনে বিঁধতে থাকে তার। এমন

সুযোগ হাতে পেয়ে হাতছাড়া করতে দিলে এ জীবনে পথ থেকে আর ঘরে উঠতে হবে না তাকে।

চিঠি লিখলে, বাঁড়ুজ্জেদের বাগানের ধারে অপেক্ষা ক'রো। সেখান থেকে কবর-ডাঙার পাশ দিয়ে জোয়াল-ভাঙার জঙ্গলের ধারে গিয়ে গল্প করব। কাল শুক্লা-তৃতীয়া। এক ফালি চাঁদ উঠবে আকাশে।

চিঠিটা লেফাফায় বন্ধ ক'রে ঝির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল। ঝিটি তার পত্র-বাহিকা। অনেককে অনেক চিঠি পাঠিয়েছে এর হাত দিয়ে। কোনবার বান-চাল হয় নি, এবারেও হবে না নিশ্চয়।

নীচের তলায় রান্না করছে বিশ্বম্ভরবাবু। অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। জীবনে অন্যদোষ ঘটলেও অন্নদোষ ঘটে নি কখনও। বরাবর নিজের হাতে পাক ক'রে খায়।

হাঁড়িতে চাল সেদ্ধ হচ্ছে। তাতেই দিয়েছে আলু-পটল। সামনে উবু হয়ে ব'সে হুঁকোতে তামাক খাচ্ছে। পাশের জানলার ভিতর দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একটু দূরে বাথ-রুমে স্নান করছে শ্বেতাঙ্গিনী। দরজা বন্ধ। দেওয়াল দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করার অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করছে বিশ্বম্ভর।

শ্বেতাঙ্গিনী স্নান করছে। দ্বিতীয় বার স্নান। ভোরে উঠে একবার স্নান করে। রান্না-বান্না সেরে আর একবার স্নান করে। এর পর সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে যাবে সে। স্টেশনের কাছে কুলীদের একটা বস্তি আছে। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্তে একটা স্কুল করেছে এরা। একটা টিনের চালায় স্কুল বসে। ময়লা কাপড়-জামা পরা, ধূলি-ধূসর ছেলেমেয়েগুলোকে কোন রকমে জড়ো ক'রে পড়তে বসায় শ্বেতাঙ্গিনী। ছেলেমেয়েগুলির পড়ার চেয়ে খেলায় ঝোঁক বেশি। শ্বেতাঙ্গিনীকে খাতির করে না তারা। কথা শোনে না, ধমক দিলে কুৎসিত গালাগালি দেয়। তবু শ্বেতাঙ্গিনী তাদের আদর করে, লজেঞ্চুস ঘুস দিয়ে, ভাল ছবির বই দেবার লোভ দেখিয়ে তাদের পোষ মানাবার চেষ্টা করে। ভাল লাগে না শ্বেতাঙ্গিনীর, এ জীবন তার ভাল লাগে না। ঘর থেকে পথে নামা সোজা, পথ থেকে ঘরে ফেরা কঠিন। নিজের ছেলে-মেয়ের কথা মনে পড়ে। করাল ব্যাধি এক দিনে

তাদের তার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। স্বামীকেও আজকাল মনে পড়ে। আদর্শ স্বামী ছিল না সে। চব্বিশ ঘণ্টা নেশাতে বুঁদ হয়ে থাকত; তিরিক্ষি মেজাজ; ভাল কোন কথা বলতে গেলে খেঁকিয়ে উঠত, গায়ে হাত তুলতে দ্বিধা করত না; আদর করত, যখন তার দেহকে তার প্রয়োজন হ'ত। স্বামীকে সে ভালবাসত কি না, সে জানে না। তবে ভালবাসত তার ঘরটিকে। যে ঘরটিকে সে নিজের হাতে সাজাত গোছাত; পরিচ্ছন্ন করত; প্রভাতে চৌকাঠে চৌকাঠে জল ছিটিয়ে, দরজায় দরজায় মাড়ুলী দিয়ে, সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে, লক্ষ্মীর বেদীর সামনে আভূমি প্রণতা হ'য়ে, যার কল্যাণ কামনা করত দিনের পর দিন। দুর্ভিক্ষের বৎসরে স্বামী যখন বাসন-কোসন, আসবাব-পত্র জমি-জায়গা একের পর এক বিক্রি ক'রে দিয়ে তার সংসারের ভিত্তিমূলে দিনের পর দিন কুঠার আঘাত করতে লাগল, তখন স্বামীকে নিবৃত্ত করবার জন্যে সে প্রতিবাদ করেছিল, অনুনয়-বিনয় করেছিল, কান্নাকাটি করেছিল, স্বামীর পায়ে মাথা খুঁড়েছিল, স্বামীকে গালাগালি ক'রে মার খেয়েছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু রাখতে পারে নি। স্বামীকেও রাখতে পারে নি শেষে। একদিন শেষরাত্রে না ব'লে পালিয়ে গেল সে। সবাই বলে—যুদ্ধে গিয়েছিল। ম'রেও গেছে নাকি! তারপর আর ভাবতে পারে না শ্বেতাঙ্গিনী; মাথাটা গরম হয়ে ওঠে, সারা গা জ্বালা করে; দ্বিতীয় বারের পরও স্নান ক'রে আবার স্নান করতে হয় তাকে।

শ্বেতাঙ্গিনী বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে এল। বিধবার বেশ তার। শেমিজ ও নরুনপাড় ধুতি। শেতাঙ্গিনী বেরবামাত্র কাশল বিশ্বম্ভর। শ্বেতাঙ্গিনীর ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। যতদূর সম্ভব হিল্লোল তোলবার চেষ্টা করল সর্বদেহে। আলগা হাতে মাথার ভিজে চুলগুলো একটু সামলাল; তারপর ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল।

* * *

বেলা দশটায় শুক্তি বাড়ি ফিরল। নিজের ঘরে বিছানার ওপরে বসল। অজস্র ঘামছে; একটা হাতপাখা নিয়ে পাখা করতে লাগল নিজেকে। নীরজা এসে সামনে দাঁড়াল। শুক্তি বললে, ওরা নাকি একটি নারী-সমিতি করছে।

নীরজা বললে, কারা ?

শুক্তি বললে ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নী। রাঘববাবুরাও পেছনে আছেন বোধ হয়।

কে বললে ?

মিসেস রায়, রোসেনারা আসছিল গাড়িতে ক'রে। রাস্তায় দেখা হ'ল। ওরাই বললে। ওদের নাকি ডেকে পাঠিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নী।

ওরা কি বলে ?

বুঝলাম না ঠিক। খুব সম্ভব ওরা যোগ দেবে, আমাদেরও নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

বড়লোকেরা পেছনে থাকলে তো কাজের সুবিধেই হবে। কাজ নিয়েই তো দরকার।

কথাটা শুনে বিস্মিত হ'ল শুক্তি। কিছুক্ষণ নীরজার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বললে, গরিব মেয়েদের ওপর যে ওদের কত দরদ, ক-বছর ধ'রে দেখেও বুঝতে পার নি ? মেয়েরা খেতে পায় নি, পরতে পায় নি, পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি করেছে। তাদের ছেলে-মেয়েরা অনাহারে, রোগে, পোকার মত মরেছে। ওদের কেউ কি এদের দিকে তাকিয়েছে ? আজ হঠাৎ এদের ওপর ওদের দরদ জেগে উঠল, সন্দেহের কথা নয় কি ? তা ছাড়া রাঘববাবুরা থাকবেন ওদের পেছনে। যা হচ্ছিল, তাও তো পণ্ড হয়ে যাবে।

নীরজা জবাব দিল না। শুক্তি চুপ ক'রে ব'সে পাখার হাওয়া খেতে লাগল।

শ্বেতাঙ্গিনী এসে বললে, স্কুল নেই ?

ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াল শুক্তি, বললে, আছে বই কি, হেডমিস্ট্রেস আজ থেকে ছুটি নিয়েছে। আমার ওপরেই সব ভার। সকাল সকাল যেতে হ'ত আজকে।

১১

প্রতুলের বাড়িতে কল্যাণ-সঙ্ঘের কর্মীদের বৈঠক বসেছে। বসবার ঘরে টেবিল-চেয়ার এক পাশে সরিয়ে দিয়ে শতরঞ্জি পাতা

হয়েছে। এক পাশের দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে আছে প্রতুল। তার দু পাশে ব'সে আছে শহীদ ও সুকুমার। বাসুদেবপুরের কাজের ভার ঐ দুজনের হাতে। আজ সকালেই এসেছে বাসুদেবপুর থেকে। ওদের সামনে সারি বেঁধে বসেছে—হিমাংশু, আরও পাঁচ-ছয় জন হিন্দু ও মুসলমান যুবক। এক পাশে, দু'সারির যোজক ভাবে ব'সে আছে একজন যুবক, নাম শশধর। লম্বা ছিপছিপে চেহারা; ফরসা রঙ। পরনে পাজামা ও পাঞ্জাবি। এম. এ. পাস ক'রে বাড়িতে বেকার ব'সে আছে। ধনী ব্যক্তির একমাত্র কন্যাকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ ক'রে ওর জীবন-যাত্রা নির্বাহের পথ বাঁধা হয়ে গেছে। চাকরি-বাকরি করবার দরকার নেই ওর। কলকাতায় থাকতে কম্যুনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিল। দলের কর্তাদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এখানে এসে- কল্যাণ-সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে। কম্যুনিজ্‌ম সম্বন্ধে বিস্তর বই পড়া আছে এবং কম্যুনিজ্‌মের আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। প্রতুলের জন-কল্যাণের মধ্যেই কর্মধারাকে আবদ্ধ রাখা এ সমর্থন করে না। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জন-কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করা এর অভিপ্রায়। কম্যুনিজ্‌ম সম্বন্ধে এর জ্ঞান-বিস্তার দেখে এখানকার কর্মীরা সকলেই চমৎকৃত হয়েছে ও এর উপরে অনুরক্ত হয়ে উঠেছে, এবং আশু ভবিষ্যতে এখানকার প্রতিষ্ঠান যখন নিখিল-বঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের শাখারূপে প্রকৃত আদর্শ-অনুযায়ী পথে যাত্রা শুরু করবে, তখন তার চালনার ভার যে প্রতুলের হাত থেকে খ'সে এরই হাতে পড়বে, সে সম্বন্ধে কারও সন্দেহ নেই।

আজকার বৈঠকে মহিলা-কর্মীরা কেউ আসে নি। সকলেই আসতে পারবে না, জানিয়ে দিয়েছে। শৈলী বাড়িতে থেকেও যোগ দেয় নি।

সমরেশ ঘরে ঢুকল। প্রতুল তাকে চোখের ইঙ্গিতে আহ্বান করল তার কাছে এসে বসতে। যে ছেলেটি বক্তৃতা করছিল, সে চুপ ক'রে গেল। অন্য সকলের মুখে, বিশেষ ক'রে শশধরের মুখে, বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল।

সমরেশকে ওরা কেউ পছন্দ করে না। বরাবর কংগ্রেসের কাজ করেছে। ১৯৪২-এর আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বর্তমানে তার

মত কি, তা জানা যায় নি। কাজেই প্রতুলের খাতিরে পার্টির কাজের মধ্যে তাকে ঢুকতে দেওয়া, তারা পছন্দ করে নি। বিশেষ, পার্টির বৈঠকের মধ্যে তাকে স্থান দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। একে তো দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ শুরু হবার পর থেকে তাদের দলে ভাঙন ধরতে আরম্ভ করেছে। হিন্দু ও মুসলমান কর্মীরা পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখছে। হিন্দু-মহাসভার আওতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে অনেক হিন্দু ছেলে, অনেক মুসলমান ছেলে মুসলিম-লীগের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তা ছাড়া কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসনভার আসছে দেখে অনেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যে অসাম্প্রদায়িক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা এত দিন একসঙ্গে কাজ করেছে, দুর্গতদের দুর্গতি মোচনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে, সে আদর্শকে আড়াল ক'রে দেবার উপক্রম করছে ভেদবুদ্ধির প্রাচীর। কাজেই সকল রকম প্রভাবকে যদি সতর্কতার সঙ্গে দূরে রাখা না যায়, তো সঙ্ঘের সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়বে।

যে ছেলেটি সমরেশকে দেখে বক্তৃতা বন্ধ করেছিল, বক্তৃতায় বাধা পেয়ে তার চোখ-মুখএর ভাব কড়া হয়ে উঠল। প্রতুল বললে, চুপ করলে কেন? বল না। সমরেশ আমার অনেক দিনের বন্ধু। রাজদ্বারে, এমন কি শ্মশানেও বন্ধুত্বের যাচাই হয়ে গেছে। তোমাদের মন্ত্রগুপ্তিকে গুপ্তি মারবে না ও।

ছেলেটি বলতে শুরু করলে, পাড়াগাঁয়েও বিদ্বেষ ও বিভেদ বুদ্ধির ঢেউ এসে গেছে। একই গ্রামের মধ্যে যারা জন্মেছে, মানুষ হয়েছে, একই পাঠশালায়, একই গুরুমশায়ের সামনে পাশাপাশি ব'সে বর্ণবোধ, ধারাপাত পড়েছে, পরস্পরের উৎসবে ও পর্বে যোগ দিয়েছে, সওগাত পাঠিয়েছে, পাশাপাশি ব'সে যাত্রা ঝুমুর কবি ও পীরের গান শুনেছে, গ্রামে আগুন লাগলে একসঙ্গে নিবিয়েছে, পাশাপাশি জমি চাষ করেছে, এক কলকের তামাক খেতে খেতে সুখ-দুঃখের কথা বলেছে, সাংসারিক সমস্যার আলোচনা করেছে, একসঙ্গে একই গান গাইতে গাইতে মাঠ থেকে ফিরেছে, একই পুকুরে স্নান করেছে, একই

পথে চলেছে, একই হাটে হাট করেছে, একই দোকানে জিনিস কিনেছে, আজ তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিভেদের ফাটল। দিন দিন গভীর ও বিস্তৃত হচ্ছে। দল বেঁধে উঠছে গাঁয়ে গাঁয়ে। হিন্দু মুসলমানের, মুসলমান হিন্দুর পাড়ায় একা যেতে সাহস করছে না। জমি চাষ করতেও দল বেঁধে যাচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হাট বসছে, হিন্দু-মুসলমান ভিন্ন পুকুরে স্নান করছে, ভিন্ন পথে হাঁটছে। মহরমের তাজিয়া আর হিন্দুর পাড়ায় আসছে না, হিন্দুর প্রতিমা মুসলমান-পাড়ার পাশ দিয়েও যেতে সাহস করছে না। বিভেদ বুদ্ধিকে বাড়িয়ে তুলছে স্বার্থান্বেষী হিন্দু ও মুসলমান জমিদার ও জোতদারেরা, হিন্দু ও মুসলমান নেতারা, হিন্দুদের স্বামীজী ও মুসলমানদের মৌলভীরা। অথচ দুর্ভিক্ষের বৎসরে হিন্দু-মুসলমানরা পেটের জ্বালায় যখন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল একসঙ্গে, খাদ্যের আশায় ছুটেছিল গ্রাম থেকে শহরের দিকে, না খেতে পেয়ে মরেছিল পাশাপাশি, তখন তো কেউ তাদের মুখের দিকে তাকায় নি, জীবন-সঙ্কটের ঘন আঁধারকে একটা সলতে জেলেও কেউ ফিকে করবার চেষ্টা করে নি। কংগ্রেস—

প্রতিবাদ করল সমরেশ, কংগ্রেস তখন জেলের ভেতরে—

ছেলেটি কড়া গলায় প্রতিবাদ করলে, সবাই তো নয়। বাইরে তো ছিলেন কেউ কেউ—

সমরেশ বলল, মুষ্টিমেয়, অক্ষম—

একজন বললে, এখন তো সব বেরিয়ে এসেছেন। বক্তৃতা করা ছাড়া কে কি করছেন ?

আর একজন বললে, কেউ কিছু করছে না,—না কংগ্রেস না মুসলিম লীগ ; ভাগ-বাঁটোয়ারায় মেতে আছে তারা।

শশধর বললে, যেতে দাও। বল তুমি।

ছেলেটি বলতে লাগল, এখানেও গত আগস্ট মাস থেকে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠেছে। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ভয় করছে, সন্দেহ করছে। ব্যবসায়ে পরস্পরকে বয়কট করছে। পরস্পর লড়াই করবার জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করছে। মৌলভীরা ও

স্বামীজীরা বক্তৃতায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে নিজের নিজের সম্প্রদায়কে গরম ক'রে তুলছে। মুসলিম গার্ড ও হিন্দু ন্যাশনাল-গার্ডরা নিজের নিজের ইউনিফর্ম চড়িয়ে, পতাকা উড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় আস্ফালন ক'রে বেড়াচ্ছে ও পরস্পরকে মারবার জন্যে ছুরি ও সড়কি শানাচ্ছে।

এখানের কুলী-বস্তিতেও হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষি শুরু হয়েছে। কলের জল নিয়ে সে দিন মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের মারামারি হয়ে গেছে। শ্বেতাঙ্গিনীর পাঠশালায় নাকি মুসলমানদের ছেলেমেয়েরা আসছে না।

প্রতুল সবিস্ময়ে বললে, তাই নাকি?

শশধর বলল, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যাতে না বাড়ে, তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। যদি কেউ এ বিরোধ বাড়াবার চেষ্টা করে, তাকে বাধা দিতে হবে।

হিমাংশু বললে, রায়বাহাদুরেরা একটা সভা ডাকছেন শিগগির। ওঁদের গুরু স্বামী জ্ঞানানন্দ নাকি বক্তৃতা করবেন। হিন্দুজাতির আসন্ন সঙ্কটের কথা তিনি সমস্ত হিন্দুদের বুঝিয়ে বলবেন, এবং জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুদের একত্র হবার জন্যে উপদেশ দেবেন।

প্রতুল বললে, কি করতে চাও তোমরা?

শশধর বললে, সেদিন আমাদের দলের শ্রমিক পুরুষ-মেয়েরা সকলে কাজকর্ম করবে; বিকেলে দলে দলে স্লোগান দিতে দিতে যথাস্থানে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই বিভেদ-চেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়ে আসবে।

প্রতুল বললে, এতে কি কোন কাজ হবে? হয়তো একটা গোলযোগ হতে পারে।

শশধর বললে, তাই তো আমরা চাই। তা হ'লে যারা আমাদের দল ছেড়ে গেছে বা যাবার চেষ্টা করছে, তাদের চৈতন্যোদয় হবে! কিন্তু একটা কথা, এই খবরটা খুব গোপনে রাখতে হবে। আশা করি, সমরেশবাবু এ কথাটা কাউকে বলবেন না।

প্রতুল বললে সে সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

১২

বাড়ি ফিরতে সমরেশের বারোটা বেজে গেল। বাড়ি এসে দেখলে, সব ঘরের দরজায় তালা দেওয়া; নফরের মা বারান্দার এক পাশে আঁচল পেতে ঘুমোচ্ছে। সমরেশ হাঁকাহাঁকি ক'রে নফরের মাকে জাগাল। নফরের মা ধীরে সুস্থে উঠে বসল; বার কয়েক হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর বললে, কি বলছ?

সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, মা কোথায় গেছেন?

মা ঘরে নেই।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কোথায় গেছেন?

হাত বাড়িয়ে নফরের মা বললে, ও-বাড়ি।

কেন?

কেন আবার! নিমন্তন্ন ও-বাড়িতে, ঘরে রান্নাবান্না হয় নাই।

মনে পড়ল সমরেশের। বললে, আমি নাইব কি ক'রে? চাবিটা আন্ গিয়ে।

নফরের মা বললে, আমাকে ঘর থেকে এক পা নড়তে বারণ ক'রে গেছেন গিন্নীমা।

আমি তো বাড়িতে থাকছি, তার আর কি?

প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে নফরের মা বললে, উটি লারব দাদাবাবু! গিন্নীমা আমাকে পই পই ক'রে মানা ক'রে গেছে।

সমরেশ বিরক্তির সঙ্গে বললে, কি মুশকিল! আমি থাকব বলছি যে। সমরেশের যুক্তিটা এতক্ষণে নফরের মা বুঝল বোধ হয়। বাইরে ঝাঁজালো রোদের দিকে মিটমিট ক'রে তাকাল কিছুক্ষণ, তারপর বললে, বাবা, যা রোদ, মাথা ঘুরে প'ড়ে যাব মাঝরাস্তায়। এমনই মাথা ঘুরোছে সকাল থেকে। তুমি বরং দুপা যেয়ে লিয়ে এস।

সমরেশ বললে, এইটুকু যেতেই মাথা ঘুরে যাবে তোর? অন্য দিন এই রকম রোদেই তো কাজ ক'রে বেড়াস।

নফরের মা বললে, বললাম যে সকাল থেকে মাথা ঘুরোছে। মাথা তুলতে লারছি। ব'লে আবার শুয়ে পড়ল।

অগত্যা সমরেশকেই তিনুদের বাড়িতে যেতে হ'ল।

বাড়ির সামনেই বড় একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে। বসবার ঘরে কেউ নেই। ভিতরের বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে ব'সে আছেন মহেশবাবু; গড়গড়ায় তামাক টানছেন। পাশে একটা চেয়ারে ব'সে আছেন রায় বাহাদুর রাঘবচন্দ্র। বেঁটেখাটো মানুষটি; ষাট বৎসরের বেশি বয়স হ'লেও বেশ শক্ত-পোক্ত শরীর; মেটে রঙ; মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি; মাথার চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা; সামনে মেয়েদের মত সোজা সিঁথি; চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে; চোখে সোনার চশমা। পরনে শান্তিপুরি ধুতি, সিল্কের লম্বা-ঝুল পাঞ্জাবি; পায়ে পাম্প-শু। বুক-পকেটে ঘড়ি, বুকের উপর সোনার মোটা চেন ঝুলছে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নীচের চামড়াটা কালো পুরু হয়ে উঠেছে। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সেখানটা ঘষতে ঘষতে রায় বাহাদুর টানা গলায় বলছেন, সমাজের বড় দুর্দিন এসেছে। চার দিকে চলেছে পশুত্বের তাণ্ডব-লীলা। অনাচার, অবিচারের স্রোত ব'য়ে চলেছে। গুরু-লঘু জ্ঞান নেই, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ নেই; রাজা-প্রজায় তারতম্য নেই। ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্য বিচার নেই; সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। এখন চাই স্বামীজীর মত সাধুপুরুষদের আশ্রমবাস ত্যাগ ক'রে, লোকালয়ে এসে, সমাজের হাল শক্ত ক'রে ধরা। যে মূঢ় মানব-সমাজ অন্ধ গতিতে অতল গহ্বরের দিকে আগিয়ে চলেছে, জোর ক'রে তাকে ফিরিয়ে আনা। না হ'লে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।—ব'লে চশমার ভিতর দিয়ে দুই জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি মহেশবাবুর মুখের উপরে ন্যস্ত করলেন।

মহেশবাবুর ডান হাতে সটকা, বাম হাত দিয়ে হাঁটুতে হাত বুলচ্ছেন। সমস্ত মানব-সমাজের আসন্ন ধ্বংসের খবর শুনেও মুখের ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটল না মোটেই। তামাক টেনেই চললেন। রায় বাহাদুর বলতে লাগলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের কথা স্মরণ করুন। তাঁরা সমাজকে চতুর্বর্ণে ভাগ ক'রে দিয়ে, প্রত্যেক বর্ণের জন্যে যোগ্যতা অনুসারে কর্ম নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। চিন্তার ভার দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণকে, সমাজ-রক্ষার ভার ক্ষত্রিয়কে, খাদ্য-সংস্থানের ভার বৈশ্যকে, সেবার ভার শূদ্রকে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—সকলে পরস্পরের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে একযোগে সমাজকে গঠন ও বর্ধন করবেন। কিন্তু এখন চোখের সামনে কি দেখতে পাচ্ছেন?

মহেশবাবু চোখের সামনে দেখতে পেলেন সমরেশকে, ডাকলেন, ভোঁদা নাকি রে? শোন্। কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এখনও চান-টান করিস নি বুঝি? রোদে রোদে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ালেই চলবে? রায় বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের দ্বারিকদার ছেলে। সারা জীবন কিছু করলে না, জেলে যাওয়া আর জেল থেকে বেরিয়ে আসা—এই দুই কাজ ছাড়া। লেখাপড়াও কিছু হ'ল না। ও-দিকে বুড়ো মা মরতে বসেছে। কি যে করা যায় এই ছেলেকে নিয়ে!

সমরেশ কাছে আসতেই রায় বাহাদুর তাকে আপাদ-মস্তক দেখে বললেন, দ্বারিকবাবুর ছেলে তুমি? কত দূর পড়াশুনা করেছ? সমরেশের হাসি পেল রায় বাহাদুরের প্রশ্ন করবার ভঙ্গী দেখে; যেন চাকরির উমেদারের সঙ্গে কথা বলছেন। হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললে, কিছু দূর করেছি। এম. এ.টা পাস করেছি।

রায় বাহাদুর বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন, তাই নাকি? তবে যে মহেশবাবু বললেন—

মহেশবাবু বললেন, ঠিকই বলেছি। এম. এ. পাসই করেছে, লেখাপড়া কিছু শেখে নি। গুছিয়ে একটা দরখাস্ত লিখতে বলুন দেখি? বিদ্যে বেরিয়ে পড়বে। সমরেশকে বললেন, একটা কাজ কর্। হাঁদাকে ডেকে দে। কলকেটা বদলে দিয়ে যাক। আর শোন্, লতু কোথায়? এক কাপ চা যদি—। খেতে দেরি হবে তো? রায় বাহাদুরকে বললেন, আপনারও হবে নাকি এক কাপ?

রায় বাহাদুর বললেন, পাগল নাকি? এখন চা!

সমরেশ রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, ঠাকুর রান্না করছে। কাজেই ফিরে এল। মহেশবাবু হেঁকে বললেন, কি হ'ল রে? সমরেশ বললে, লতুকে দেখতে পেলাম না। দেখি ওদিকে।

একটা ঘরের ভিতর চণ্ডীপাঠ চলছে। সামনের দেওয়াল ঘেঁষে কুশাসনে ব'সে আছেন স্বামীজী। সামনে ছোট জলচৌকির উপর কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ; ফুল ও বেলপাতার স্তূপে প্রায় ঢাকা পড়েছেন। আশেপাশে পাথর ও পেতলের থালাতে ফল মিষ্টান্ন ইত্যাদি ভোগোপ-

করণ। ডান পাশে কতকটা দূরে একটা গালচের উপর ব'সে আছেন গুণেনবাবু ও তপন। অত্যন্ত ভক্তিগদগদ ভাব। বাঁ 'পাশে দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে আছেন সমরেশের মা, তপনের মা, আরও কয়েকটি বিধবা ও সধবা মহিলা। ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে লতু। স্বামীজীর কাছ থেকে একটু দূরে খালি মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে আছে তিলু। পরনে সাদা গরদের শাড়ি, টকটকে লালপাড়; সাদা গরদের ব্লাউজ। মাথার চুল এলিয়ে পড়েছে পিঠে, গালের পাশে। উপোস ক'রে আছে ব'লে মুখটি শুকিয়ে গেছে। ভক্তিভরে স্বামীজীর মুখের পানে তাকিয়ে চণ্ডীপাঠ শুনছে। শুভ্র সুডৌল হাত দুটি কোলের উপর আলগা ভাবে নামানো।

গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে চণ্ডীপাঠ করছেন স্বামীজী। সারা ঘর গমগম করছে। ধূপ-ধুনোর, ফুল-চন্দনের গন্ধে ঘরের বাতাস সুরভিত হয়ে উঠেছে, একটা পরম পবিত্র ভাব বিরাজ করছে সারা ঘরটিতে। এই পরিবেশের মধ্যে তিলুর শুচিস্নিগ্ধ, ভাবমুগ্ধ রূপটি বড় ভাল লাগল সমরেশের। এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল তিলুর দিকে। তিলুও একবার মুখ ফিরাল তার দিকে। চোখাচোখি হতেই স্বামীজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

লতুর চোখে চোখ মিলতেই সমরেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। লতুও পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে, তার কাছে এসেই ব'লে উঠল, ও মা! ও কি চেহারা হয়েছে আপনার! মাথার চুল উড়ছে, মুখ কালো হয়ে উঠেছে, জামা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে! মাটি কাটছিলেন নাকি?

সমরেশ বললে, না। মায়ের কাছে থেকে চাবিটা আন দেখি। ঘরে ঢুকতে পাই নি।

লতু বলল, নাই বা ঢুকলেন! একটা ঘরে তো ঢুকছেন। ও-ঘরে বসবেন চলুন। পাখা এনে দিচ্ছি। শরবৎ খাবেন?

সমরেশ বললে, বসব না, শরবতও খাব না। আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না তোমাকে। তোমার দাদুর জন্যে এক কাপ চা ক'রে দাওগে। আর হাঁদাকে ডেকে তামাক সাজার ব্যবস্থা কর। তার আগে কিন্তু চাবিটা এনে দাও।

চণ্ডীপাঠ শুনবেন না?

সমরেশ বললে, শুদ্ধ হয়ে ওসব শুনতে হয়। চান-টান এখনও করি নি।

লতু বললে, তা বটে! তার ওপর মুসলমান মেয়েটির সঙ্গে এক গাড়িতে যাচ্ছিলেন। মাসী দেখেছে।—ব'লে মুখ টিপে হাসল।

সমরেশ বললে, তা দেখুক। তুমি চটপট যা যা বললাম ক'রে ফেল দেখি। তপন বেচারা ছটফট করবে দেরি হ'লে।

মুখ লাল ক'রে মধুর কোপের সঙ্গে লতু বললে, যা-তা বলছেন! আপনি না আমার মামা? ফিক ক'রে হেসে বললে, আবার দুদিন পরে মেসোমশায় হয়ে উঠতে পারেন।

সমরেশ সবিস্ময়ে বললে, সে আবার কি কথা!

ঘাড় নেড়ে আবদারের সুরে লতু বললে, জানি, জানি, সব জানি। ব'লে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

মহেশবাবু হাঁকলেন, ভোঁদা, বললি রে?

সমরেশ লতুকে বললে, যাও লক্ষ্মীটি! চাবিটা এনে দিয়ে দাদুর ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমি চ'লে যাই। এখনই এক চোট হয়ে গেল বাইরের ভদ্রলোকের সামনে। আবার এক চোট শুরু হয়ে যাবে এখনই।

মহেশবাবু ব'লে উঠলেন, শু'য়ে গেলি নাকি রে? ও লতু!

লতু সাড়া দিলে, যাচ্ছি দাদামশায়!

লতু চাবিটা সমরেশকে এনে দিয়ে দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

শুষ্কং কাষ্ঠং

মরা অতীতের ভস্মে রেখেছি ঢেকে
প্রায়োপবেশনে মুমূর্ষু প্রাণ-বহ্নি
কোথা ইন্ধন! সুরভির স্নেহ মেখে
কোথায় অরণি! এ যে শুধু কাঠ, তম্বি।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

বাস্তুহারা

সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা ব'লে থাকেন, সৃষ্টির আদিতে হয়েছিল নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-বাদাড় সব কিছুরই সৃষ্টি হ'ল এবং যথাযথস্থানে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি হ'ল অসংখ্য রকমের জীবজন্তুর; তাদের কেউ স্থলচর, কেউ জলচর, কেউ খেচর, কেউ উভচর, কেউ বৃক্ষচর। তারা কেউ বাসা বাঁধল অগাধ জলের তলায়, কেউ গভীর বনে, কেউ গাছের ডালে, কেউ গর্তে। তারা কেউ অহিংস, কেউ সহিংস; অহিংসরা গাছপালা ফলমূল খেতে লাগল, সহিংসরা মটকাতে লাগল অহিংস-দুর্বলের ঘাড়। এইভাবে কতকাল কেটে গেল। তারপরে একদিন স্রষ্টার যেন কি রকম এক-ঘেয়ে লাগল, জন্তু-জানোয়ারের সংসার তাঁর যেন ভাল লাগল না। তিনি ভাবলেন, এমন চমৎকার পৃথিবী সৃষ্টি করলুম; সেটা ভোগ করবে কিনা জন্তু-জানোয়ার? রামঃ! তাই অসংখ্য রকমের জন্তুর মধ্যে তিনি আর এক রকমের জানোয়ার ছেড়ে দিলেন, তার নাম দিলেন 'মানুষ'।

নতুন মানুষকে দেখে বাঘ সিংহ তেড়ে এল, সাপ ফণা তুলল। সেই অবস্থা দেখে মানুষের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। কাঁদতে কাঁদতে কাঁপতে কাঁপতে সে স্রষ্টাকে বললে, আমায় কোথায় নিয়ে এলে ঠাকুর? এরা যে সবাই আমায় খেতে আসছে; এদের রাজ্যে আমি বাঁচব কি ক'রে? স্রষ্টা মৃদু হেসে বললেন, পালিয়ে। মানুষ পালাল প্রাণের দায়ে। ছুটতে ছুটতে একটা বড় গাছে উঠে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, মনে মনে বললে, যাক, বাঘ সিংহের হাত থেকে বাঁচলুম। অনেকক্ষণ গাছে ব'সে থেকে তার মনে হ'ল, পেটের ভেতর যেন জ্বালা করছে। সে আবার বললে, ঠাকুর, পেটের ভেতর জ্বালা করছে কেন? ঠাকুর বললেন, তোর খিদে পেয়েছে, গাছের ফল খা; দেখিস সবাই যেন একসঙ্গে খাস নি; যদি বিষফল হয়, তা হ'লে গুষ্টিসুদ্ধ ম'রে যাবি। আগে একজন খেয়ে দেখ্; যদি না মরিস, তা হ'লে সকলে খাস, জন্ম জন্ম ধ'রে খাস। মানুষ খেয়ে দেখলে, ফলটা ভাল, তার খিদে তেষ্টা দুইই দূর হ'ল। তৃপ্ত হয়ে আরাম করে সে ব'সে ব'সে পৃথিবী

দেখছে, এমন সময় একটা বাঁদর তেড়ে এল, বললে, আ মুখপোড়া, আমার গাছে তুই আবার কোন্ চুলো থেকে এলি? শিগগির নেবে যা, তা না হ'লে এক্ষুনি কামড়ে দেব। এই ব'লে সে এমনই দাঁত খিঁচুলে যে, মানুষের পিলে চমকে উঠল; ভয়ে ভয়ে সে বললে, দাঁড়াও বাবা, আমি নেবে যাচ্ছি।

গাছ থেকে নেমে মানুষ আবার স্রষ্টাকে বললে, হে ঠাকুর, এবার কোথায় যাই? স্রষ্টা বিরক্ত হয়ে বললেন, ভ্যালা আপদ হ'ল তো! এতবড় পৃথিবী তৈরি ক'রে দিয়েছি, তবুও যাবার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিস না? আমার কাছে তুইও যা, আর ঐ বাঁদরটাও তাই; সকলেরই স্রষ্টা আমি, সকলকেই দিয়েছি বাস করার জায়গা আর আত্মরক্ষার বুদ্ধি; বুদ্ধি যদি খাটাতে পারিস, তবেই বাঁচবি, না হ'লে গোল্লায় যাবি। স্পষ্ট কথা ব'লে দিচ্ছি সোনার চাঁদ, আমার কাছে বেশি খাতির আশা ক'রো না, তোমার ওপর একচোখোমি করতে পারব না। আমার কাছে সবাই সমান। মানুষ মনে মনে বললে, ঠাকুর, তোমার কাছে মুড়ি-মিছরির কি একই দর? সেদিন তার বুঝতে বাকি ছিল না, কত অসহায় সে। সে জেনেছিল, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে একই পৃথিবীতে বাস করতে হ'লে গায়ের জোরে কুলোবে না, প্রচুর বুদ্ধির দরকার।

তারপরে হাজার বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে বাঁচবার জন্যে মানুষ কি বুদ্ধিই না খরচ করেছে! বাঁচার উপায় বার করতে সে কত কঠোর পরিশ্রম করেছে, কত রকমের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে, অকাতরে কত প্রাণ দিয়েছে। কোন্‌টা খাদ্য আর কোন্‌টা অখাদ্য তা আবিষ্কার করতে গিয়ে কত লোক বিষ খেয়ে মরেছে; রোগে ভুগে কত লোক বিনা ওষুধে মরেছে; ঘরের অভাবে কত লোক বাঘ-ভালুকের পেটে গেছে, কত লোক সাপের কামড় খেয়েছে। স্রষ্টার কাছে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার না পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ হাজার হাজার বছর ধ'রে বেঁচে আছে; তার বংশ লোপ পাবার দিকে না গিয়ে বাড়তির পথেই চলেছে। এর জন্যে স্রষ্টার কেরামতি কানাকড়িও নেই, সবই মানুষের কৃতিত্ব।

মানুষের কৃতিত্ব আজ জগৎ-জোড়া। জীবনকে নিরাপদ আর সুখময় করবার জন্যে সে কি না করেছে! বন-জঙ্গল কেটে সাফ ক'রে নিজের বাসভূমি রচনা করেছে; তারপর তৈরি করেছে ঘরবাড়ি; বাঘ-ভাল্লুকগুলোকে বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে বনবাসে আর ছাড়তে হয়েছে নর-রক্তলোলুপতা। জীবনের নিরাপত্তা লাভ করার পর শুরু হয়েছে তার আরাম-অন্বেষণ; তার জন্যে তাকে চরকা তাঁত চালাতে হয়েছে, কল-কারখানা বসাতে হয়েছে, খাদ্যগুলোকে সে তো জেনেছেই; কোন্‌গুলো ভাল খেতে, কোন্‌গুলোতে শরীরের উন্নতি হয়, তাও তার অজানা নেই; কাঁচা খাবারের স্বাদ কম ব'লে রান্নার সহায়তায় স্বাদবৃদ্ধি করেছে; মসলা আবিষ্কার ক'রে সাধারণ খাদ্যকে অসাধারণের পর্যায়ে তুলেছে। ওষুধের আবিষ্কার ক'রে সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে সাহসী হয়েছে; চশমা দিয়ে সে ফিরিয়ে এনেছে ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টিশক্তিকে।

মানুষ যেদিন কথা কইতে শেখে নি অথচ ভাবতে পারত, সেদিন ভাষাহীন স্বর দিয়েই সে প্রকাশ করত তার প্রাণের আনন্দ, আবেগ, ব্যথা; তা থেকেই জন্ম হ'ল গানের। এই গান নিয়ে মানুষ কত সাধনা করেছে; ভাষাহীন গান গেয়ে কখনও মূর্ত করেছে রুদ্রকে, কখনও কল্যাণকে; কখনও জ্বালিয়েছে আগুন, কখনও নামিয়েছে বর্ষা; কখনও গলিয়েছে পাথর, কখনও নাচিয়েছে কাল-সাপ। তারপরে যখন সে ভাষা খুঁজে পেল, তখন সে সৃষ্টি করলে কাব্য। এই ভাষা নিয়ে মানুষ কি বাহাদুরিই না দেখিয়েছে!

সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার যতটুকু কার্পণ্য ছিল, মানুষ নিজের সাধনায় তা দূর করেছে; অসুন্দরকে সুন্দর করেছে, সুন্দরকে করেছে অতিসুন্দর। সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যে অতীতে সে প্রিয়ার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিত, মুখে মাখাতো ফুলের রেণু, অঙ্গে পরাত ফুলের গয়না। আর আজ? স্নো সেণ্ট পাউডার সে সৃষ্টি করেছে, আবিষ্কার করেছে সোনা-রূপো-হীরে-মুক্তো, আরও কত কি! তার ওপরে কখনওবা পাথর কুঁদে, কখনও ছবি এঁকে সে তার সৌন্দর্যপিপাসা মিটিয়েছে।

মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে বিজ্ঞানের কঠোরতম সাধনায়।

বিজ্ঞান থেকে সে যে কি পায় নি তার হিসাব মেলানো খুবই কঠিন। আজ সে উড়তে শিখেছে, স্রষ্টার বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে ফিরে আসছে; অদূরভবিষ্যতে দেখা যাবে, সে হয়তো স্রষ্টার বৈঠকখানায় ব'সে দাবা খেলছে আর তামাক টানছে।

এই হ'ল মানুষের হাজার হাজার বছরের জয়যাত্রার জীবন্ত ইতিহাস। এই জয়যাত্রা আজও শেষ হয় নি; মানুষ যতদিন পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন তার অগ্রগতিও থাকবে অব্যাহত। তার সৃজনী প্রতিভার বিরাটত্ব কল্পনাতীত। স্রষ্টা যদি চক্ষুষ্মান হন, যদি তাঁর চক্ষুপীড়া না থাকে, তা হ'লে তিনিও না ব'লে পারবেন না—তাই তো, এরা করছে কি? আমার জারিজুরি এরা সব ভেঙে দিলে!

* * *

এল দুর্দিন, এল বিপর্যয়; মনুষ্যত্ব হারিয়ে গেল, মানুষ পেলে বাঘ-সিংহের হিংস্রতা; শুরু হ'ল আরণ্যক মহাযুদ্ধ। মুহূর্তের মধ্যে সব গেল; হাজার হাজার বছর ধ'রে যে ঘর সে গড়েছিল, সেই সুখের ঘর পুড়ে গেল; সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল; স্নেহ-স্নেহপাত্র, প্রেম-প্রেমাস্পদ সব হারিয়ে গেল। হাজার হাজার বছরের সাধনালব্ধ সভ্যতা, প্রতিভালব্ধ উচ্চাসন, বুদ্ধিলব্ধ নিরাপত্তা—সব যেন হাওয়ায় উড়ে গেল। এক ধাক্কায় তাকে হটিয়ে দিলে সেই বিস্মৃত-অতীতে, যেদিন তার প্রথম জন্ম হয়েছিল; তেমনই অসহায় অবস্থায় জিজ্ঞাসা-ভরা চোখ দিয়ে সে আবার মহাশূন্যের দিকে তাকাল। চারিদিকে হিংস্রতা, সবাই তাকে গিলতে আসছে। আবার তাকে ছুটতে হ'ল, কোথায় যাবে, কে আশ্রয় দেবে, কোথায় তার নিরাপত্তা, কিছুই সে জানে না; সে ছুটল, দিকে দিকে দলে দলে, ছুটল বেঁচে থাকার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এরা বাস্তহারা।

* * *

সেদিন দেখলুম, থানার উঠোনে রাশীকৃত বাঁশ-বাখারি-হোগলা প'ড়ে আছে। ভাবলুম, দারোগাবাবু কি আজকাল ছোলা-বাঁশের কারবার করছেন? তা তো নয়। তবে কি এগুলো পুনর্বসতি-দপ্তর থেকে বিলোনো হচ্ছে? না, তাও নয়। খবর নিয়ে জানলুম, উদ্বাস্তরা

কোথায় নাকি রাতারাতি একটি পল্লী গড়েছিল, পুলিস সেই বে-আইনী ও বেদখলী পল্লী ভেঙে দিয়ে বাঁশ-বাঁখারিগুলো লুটে এনেছে। এ খবর শুনে প্রশ্ন জাগল, শুধু বুদ্ধির জোরে যে মানুষ হিংস্র বাঘ-সিংহের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল, সেই মানুষই আজ মানুষের তৈরি আইনের কবল থেকে নিজের দীনতম কুঁড়েটুকু রক্ষা করতে পারল না কেন? এটা কি তার বুদ্ধিহীনতার পরিচয়? আইন কি বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও বেশি হিংস্র?

থানার উঠোনটাকে মনে হ'ল মানুষের সৃজনী-প্রতিভার মহা-শ্মশান। সেখানে রাজত্ব করছে শক্তি-সাধক কাপালিক, যার নাম 'আইন,' আইনের হৃদয়ে নেই দয়া মায়া মমতা।

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী

ভয় কি?

বরাবর মোরা আসছি দেখে
পলায় যাহারা প্রথমে ঠেকে
শেষটা তারাই লড়াই জেতে,
বিধাতা তাদের স্বপক্ষেতে।
দু-দুবার দেখ ব্রিটিশ লায়ন
ঊর্ধ্বশ্বাসে সে কি পলায়ন!
প্রথম পলাল 'মন্‌সে' হেরে
হ্যাঁথা ক্যাঁথা যত সকলি ছেড়ে
দুবারের বার ডনকার্কে
জেবরে উঠিল ডুব মারুকে।
শেষটা কিন্তু জিতল সেই
জার্মানদের পাত্তা নেই।
রুশ-ভল্লুকও খায় নি কম
কভু উত্তম কভু মধ্যম,
ফাটায়ে গগন আর্তনাদে
ওয়ারশ হতে তালিনগ্রাদে।
সেই রুশিয়ার ভয়েতে আজ
বিশ্ব পরিছে যুদ্ধ-সাজ।

সশস্ত্র যদি পলানো চলে,
নিরস্ত্রে ভীরু কে তবে বলে?
আঁধার রাত্রে ভূতের ভয়
মানুষ মাত্রে সবারই হয়।
প্রভাতে যখন সূর্য উঠে
ভূত প্রেত সব পলায় ছুটে।
নিষ্ঠুর মূঢ় অত্যাচারী—
প্রথম জিৎ তো হবেই তারই।
বিধির বজ্র দেরিতে নামে
তখন তাদের নাচন থামে।
অতএব কোন চিন্তা নেই
লড়াই থামে না পলায়নেই।
দুধে-ভাতে নেতা আছেন বহু
তাঁদের চরণে প্রণাম রহু।
আঁক ক'ষে তাঁরা দেখান ভয়
মেনে নিতে হবে এ পরাজয়।
জীবন-মরণ-সন্ধিক্ষণে
কত কথা আজ পড়ে যে মনে।

বাংলায় আর নেই কি কেউ
লাগামে ফেরাবে প্রলয় ঢেউ ?
সে তরঙ্গের ধরিয়া ঝুঁটি
ঝঞ্ঝার সাথে চলিবে ছুটি ?
না থাকে না থাক্, কিসের ভয়—?
হবে হবে হবে মোদেরি জয়।
আবার আমরা ফিরব দেশ,
হব না হব না নিরুদ্দেশ।

ঝুলির ভিক্ষা ঝুলিতে থাক্
পেয়েছি সত্য ক্ষুধার ডাক।
পশ্চিম পারে না পেয়ে খেতে
পূবে ফিরে যাব ক্ষুধায় তেতে।
তখন মোদের রুখবে কে ?
দোর দেবে ঘরে ভাব দেখে।
ম্যয় ভুখা হুঁ—ক্ষুধার ঝণ্ডা
তুলে, বুঝে নেব আপন গণ্ডা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বিশ্বাসে মিলয়ে

অলক্ষ্যে গেয়েছ গান সুর তার আসে নাই কানে
নীরবে বেসেছ ভাল রেশ তার জাগে নাই প্রাণে
স্বপ্নে মোরে দেখিয়াছ, হয় নাই চক্ষের মিলন
কায়াহীন আলিঙ্গনে হয় নাই প্রণয় শীলন।
তব কবরীর গন্ধ, হে প্রেয়সী, দখিন-বায়ুতে
ভেসে এসে জাগিয়েছে আজ মোর শিরায় স্নায়ুতে
তীব্র মাদকতা কোন্ অজানার আহ্বান চঞ্চল
নিশাকাশে পাতিয়াছ স্বর্ণরেখ তব বস্ত্রাঞ্চল।
জ্যোৎস্না-স্নাত বক্ষ তব অন্তরীক্ষে অদৃশ্য গৌরবে
শোভে শতদল সম, কোন্ এক অপূর্ব সৌরভে
দশদিক সঞ্জীবিত। আমি হায় ঘুরে মরি হাটে!
বিশ্বাসে কি মিলে রাধা ? তবু মগ্ন রহি গীতাপাঠে।
লাগাই 'আপ্রাণ' মন। কষ্টে কেষ্ট আসে। কই রাধা ?
হে রাধিকা, ওগো রাধে, কেন বল, কেন এত বাধা ?:

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

৯ই ভাদ্র ১৩৫৭

আমরা দূরের যাত্রী আপনার পথে পথে চলি ;—
হঠাৎ পথের বাঁকে কারো সাথে দেখা হ'লে পরে

কাছে আসি, কথা কই, প্রিয়সঙ্গী হই পরস্পরে,
তারপরে ভুলে যাই দুদিনের কূজন-কাকলি।
আমরা দূরের যাত্রী হৃদয়ের পথে পথে চলি,
কারো সঙ্গ মনে থাকে, কারো রঙ্গ ভুলি অনাদরে,
কারো ঠোঁটে বাঁকা হাসি, কারো সুধা নয়নে অধরে,
তাই নিয়ে হাসি কাঁদি তাই নিয়ে রচি পদাবলী।

কিছুদিন কাছে-থাকা, কিছু ক্ষণ পিছে ফেলে-যাওয়া,
মিলন-বিচ্ছেদ-পথে আমাদের এই ত জীবন;
কিছু দিয়ে খুশি হওয়া, কিছু পাওয়া কিছু-বা না-পাওয়া,
কারো স্মৃতি মনে রাখা কারো প্রেম চিরবিস্মরণ।
আমরা দূরের যাত্রী সঙ্গীহীন পথে পথে চলি—
বিচ্ছেদের বেদনায় মিলনের রচি পদাবলী।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

কোরিয়া = ০

কেমন করিয়া কোরিয়া যুদ্ধ বাধালো,
উত্তর কিবা দক্ষিণ বেশি দোষী;
পিছে থেকে বুঝি রাশিয়া দু চোখ ধাঁধালো-—
মার্কিনী মতে দেখেছি অঙ্ক কষি।
সাত পাতা শুধু যোগ-বিয়োগের পর
ফল যা মিলিল—'শূন্য' তাহারে কয়;
ফিরে আর বার গুণ করি সত্বর,
ভাগ ক'রে দেখি—'শূন্য' ছাড়া সে নয়।
রাজাজীর মতে 'যুদ্ধ গিয়াছে মিটে,
'এই সবে শুরু'—বলিছে পণ্ডিচেরী।
কেহ বলে—'বোমা পড়িবে সবার পিঠে,'
চোখ বুজে কেহ ভাবে—'আছে বহু দেরি'।
সকালবেলায় কাগজেতে যাহা লেখে
বিকালবেলায় মনে হয় তাহা ফাঁকি—

সরকারী পাঠশালে যাহা যাহা শেখে
ঠিক সেই সুরে গান গায় পোষা পাখি।
যত হাততালি প্রধান মন্ত্রী পায়
তত হাততালি শ্যামাপ্রসাদেরও জোটে ;
বেকুব পাঠক আমি করি হায় হায়,
কোরিয়ার মানসাঙ্ক মেলে না মোটে॥

শ্রীপ্রভাত বসু

কবিলাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সংকলন-গ্রন্থে এবারকার 'আই. এ., আই. এস্. সি'.র ছাত্রদের পাঠ্য আলাওলের "ঈশ্বরস্তোত্র" কবিতাটির চতুর্থ চরণে একটি শব্দ আছে 'কবি-লাস'। কবির লাস্য ইত্যাদি ইহার নানা প্রকার অদ্ভুত অর্থ ছাপা হইতেছে। সম্ভবত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কোষগ্রন্থটিতে ছাড়া অন্য কোন অভিধানে শব্দটি নাই, সেখানে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'বাদ্যযন্ত্রবিশেষ'।

বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত কবিতাটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' 'কবি-লাস' শব্দটির অর্থ দিয়াছেন "কবির লাস অর্থাৎ আদি কবির (ব্রহ্মার) ইচ্ছা"। কিন্তু লিস্ ধাতুর অর্থ 'দীপ্তি পাওয়া'। দন্ত্য স না হইয়া বানানে অবশ্য মূর্ধন্য ষ থাকিলে শব্দটির 'ইচ্ছা' এইরূপ অর্থ হইত,—লিষ্ ধাতুর অর্থ 'ইচ্ছা করা'। কিন্তু দীনেশচন্দ্র অর্থ করিয়াছেন বানান উপেক্ষা করিয়া, সম্ভবত ইহার কারণ পুরাতন বাংলায় শ, ষ, স-এর অনেক সময়ে যথেচ্ছ প্রয়োগ হইত।

কবি আলাওল "ঈশ্বরস্তোত্র"টি মালিক মহম্মদ জায়সীর কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেকটা হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন, সে যুগে অবশ্য প্রামাণিক অনুবাদ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল না। নীচে প্রথমে "ঈশ্বরস্তোত্র" কবিতার প্রথম চারিটি চরণ ; পরে তাহার মূল উদ্ধৃত করা হইতেছে।

আলাওল—"প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীব-দানে স্থাপিল সংসার॥

করিল পর্ব্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাস ॥"

জায়সী—"সুমিরউ[১] আদি এক করতারূ।
জিন[২] জিউ[৩] দীন্হ[৪] কীন্হ[৫] সংসারূ ॥
কীন্হেসি প্রথম জ্যোতি পরকাসূ।
কীন্হেসি তিনহিঁ প্রীতি কৈলাসূ ॥"

দেখিতেছি আলাওল মূলের অন্ত্যানুপ্রাসটি পর্যন্ত বাংলায় রাখিয়াছেন। সুর করিয়া পড়িবার সময়ে মিষ্টতার জন্য পদান্তে অনুচ্চারিত অকার স্থলে আ-কার উ-কার ব্যবহার [সংসারূ, করতারূ, কৈলাসূ], অথবা যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরবর্ণ দিয়া ভাঙিয়া মসৃণ করিয়া পদ ব্যবহার করিবার রীতি [প্রকাশ = পরকাশ] প্রাচীন হিন্দীতে খুব দেখিতে পাওয়া যায়। 'হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা'—তুলসীদাস। 'রাম' তুলসীর কাব্যে অনেক স্থানেই 'রামু' অথবা 'রামা' হইয়াছে। এই রকম বানানের সামান্য বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে হিন্দী ও বাংলা চরণের অন্ত্যানুপ্রাসের শব্দগুলি একেবারেই এক। মূলটি মিলাইয়া পড়িলে 'কবি-লাস' যে 'কৈলাস', ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিবার কথা নয়।

আলাওলের কাব্যটি বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও ফারসী লিপিতে লিখিত ছিল। ফারসী হইতে বাংলাতে লিখিবার সময়ে খুব সম্ভব 'কৈলাস' 'কবি-লাস'-এ পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সে সম্ভাবনাও কম, কারণ ফারসী বর্ণ 'কাফ'-এর (ক) সহিত 'য়ে (য়) যুক্ত করিয়া সচরাচর কৈলাসের 'কৈ' লেখা হয়, সুতরাং ফারসী হইতে বাংলাতে লিখিবার সময়ে 'য়' আসিতে পারে, 'ব' আসিবে কেমন করিয়া? হিন্দীতে অন্তস্থ ব দিয়া কৈলাস স্থলে 'কবিলাস' লেখার রীতি আছে, হিন্দীতে তাহার উচ্চারণ অনেকটা কৈলাসের অনুরূপই হইবে। আলাওল তাহা হইলে তাঁহার মূলের ভাষার প্রচলিত বানান অনুসরণ করিয়া 'কবিলাস' লিখিয়াছেন, বলিতে হয়।

---

(১) স্মরণ করি। (২) যিনি। (৩) জীবন। (৪) দিয়াছেন। (৫) করিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র যেরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তদনুযায়ী অযথা একটি ছোট হাইফেন ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন 'কবি-লাস'। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে 'কবি-লাস'-এর হাইফেনটুকু তুলিয়া দিলে ভাল করিবেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন 'কবিলাস,' 'কঙ্গলাস' অথবা 'কৈলাস' এইগুলির মধ্যে কোন্ পাঠটি সঙ্গত।

শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিন্নসূত্র

শহর আর স্টেশন। নামে এক হ'লেও আকাশপাতাল তফাত দাঁড়িয়ে গেছে মর্যাদায়। জংশন স্টেশন। সিঙ্গল লাইন, ডবল লাইনের যোগসূত্র দিয়ে কাণায় কাণায় ভরা স্বাস্থ্য। পয়েণ্টম্যান, লাইনম্যান, ক্লীনার, খালাসী, কুলি, মেথর, ভেণ্ডর, পানিওয়ালা, ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড, হুইলার স্টল, সোরাবজীর রেস্তোঁরা, যাকে বলে পুরোমাত্রায় জমজমাট।

হঠাৎ কেঁপে-ওঠা স্টেশন। পাশেই প'ড়ে আছে শহর, খোলা নর্দমা আর তেলের আলোয় টিমটিম করছে প্রাণ। তবুও স্টেশনের চেয়ে অনেক বেশি তার বয়স, আর এই বিগতকালের কোন অনির্দিষ্ট স্তরে হয়তো হারিয়ে গেছে তাদের যোগসূত্র—স্রষ্টা ও সৃষ্টির নেপথ্য আদান-প্রদানের ইতিহাস।

স্টেশনের চারপাশ জুড়ে রেলওয়ে কলোনি। কুলিবস্তির খুপরি থেকে আরম্ভ ক'রে কম্পাউণ্ড-ঘেরা সুদৃশ্য বাংলোর থাক-মেলানো সমন্বয়। জল আর বিদ্যুতের অফুরন্ত খয়রাতে স্বাচ্ছন্দ্যের রসটুকু ষোল আনা ভোগ করে এখানকার অধিবাসী। লম্বা পিচ-ঢালা রাস্তা আর অশোক বকুল কৃষ্ণচূড়ার ঘন বিন্যাস স্বাতন্ত্র্যের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে এখানকার যাযাবর গোষ্ঠীকে। ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার আর ডি. ডি. টি.র ধুলোপড়া দিয়ে শহরের ভূতকে সরিয়ে রাখে কলোনি।

হ্যালো! দেখুন। এইবার ডাউন লাইনে গাড়ি আসছে। আপনারা প্লাটফরমের ধার থেকে স'রে আসুন। হ্যাঁ, আরও স'রে

যান।—মাইকের কথকতা। সামান্য কদিনের ভেতর আগাগোড়া বদলে গেছে স্টেশনের রূপ। নিত্য নূতন ঘটনায়, ভয়াবহ অভিজ্ঞতায়, শোক দুঃখ বেদনার অজস্র প্রতিঘাতে অসাড় হয়ে যাচ্ছে স্টেশন, এমন কি শহর। দুপুরের খর রোদ আর করোগেট টিনের শেড, আপ ডাউন প্লাটফরমের দু মুখে অতিকায় ইঞ্জিনের বয়লার আর ফার্নেস, শহরের ময়লা মাটিতে ভরা উত্তপ্ত বাতাসের ঝলক, কালো ধোঁয়া আর পাথুরে কয়লার কুচি, সেইখানেই সারি সারি বাসা বেঁধেছে অগণিত সংসার, রোদ বৃষ্টি জল ঝড় শীত আতপের পুরোপুরি অনুভবশক্তি নিয়ে।

দেখুন, বরিশালের গৌরনদী থানার রসিক কর্মকারের স্ত্রী আজ সকালে ট্রেন থেকে নামবার সময় তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে মালতীকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন। ফরসা মেয়ে, গায়ে ময়লা ছিটের ফ্রক। যদি কেউ সন্ধান জানেন, আমাদের ক্যাম্পে খবর দিন। ইত্যাদি।—যন্ত্রযোগে অবিশ্রান্ত তাগাদা চলেছে দিনে রাতে, একভাবে—একস্বরে। সাহায্য-প্রতিষ্ঠান, সেবা-সমিতি, রেড-ক্রসের ঝাণ্ডা ওড়ে। কলেরা ইন্‌অকুলেশন, বসন্ত-প্রতিরোধের তোড়জোড় চলে। খয়রাতী অন্নছত্র আর সভ্য মানুষের পেটের ক্ষুধা—দুই মিলিয়ে চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। অজস্র দুঃখের টাটকা অভিজ্ঞতা নিয়ে তবুও আশ্বাস খোঁজে মানুষ বিশ্বস্ত মাটির বুকে, হোক সে পাথর, হোক সে ধুলো, তা হ'লেও আত্মীয়তার স্পর্শ আছে সেখানে। স্বল্পমেয়াদী বিশ্রামের দিন ফুরিয়ে আসে। যথাকালে আসে ভলান্টিয়ার, আসে পুলিসের লোক স্থানান্তরের হুকুমজারি নিয়ে, হয়তো শহরের রেস্ট ক্যাম্পে, নয়তো অন্য কোন জায়গায়; দেখতে দেখতে স্টেশন খালি হয়ে আসে। আবার লোক আসে। আবার ভ'রে ওঠে স্টেশন।

সারাদিন আগুন ছড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বাতাস। গরমে ধুলোয় ক্লান্তিতে দৈনন্দিন অপচয়ে ক্রমশই ঝিমিয়ে পড়েছে আশ্রয়চ্যুত ক্যারাভান দল। বিছানা সুটকেস বস্তার বেড়া ডিঙিয়ে কোন রকমে ভিড় সরিয়ে রেল-পুলিসের লোক সটান এগিয়ে গেল প্লাটফরমের শেষ সীমানায়। সত্তরের ওপর বয়স, ময়লা গেঞ্জি আর

ছেঁড়া কাপড় পরা, আগাগোড়া মাথাটায় প্রকাণ্ড টাক, মাঝারি আকারের একজন লোক তেলচিটে শতরঞ্জির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মুখখানা প্রায় মাটিতে গোঁজা, মনে হয় সমস্ত শক্তি এক ক'রে সে জমি আঁকড়ে প'ড়ে আছে। জি. আর. পি. ইন্‌স্পেক্টর একেবারে তার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে ভিড় এসে জ'মে গেল জায়গাটায়।

লোকটা বোধ হয় পাগল। আজ আট-দশ দিন এইখানে প'ড়ে আছে। নড়তে বললেও নড়বে না।—হাতপাখায় হাওয়া খেতে খেতে মন্তব্য করলেন একজন।

এই মশাই, শুনছেন? উঠুন।—পুলিস কর্মচারী হুকুম করলেন।

উঠে বসল লোকটি। পাগলের কোন চিহ্ন ছিল না তার চেহারায়। নিতান্ত গতানুগতিক মুখাবয়ব, চোখ দুটো বেশ বড় বড়।

কে? মাস্টার মশাই নাকি? আপনি কতদিন? গুরুসদয়দা চ'লে গেছেন? কবে গেলেন?

কি বলছেন?

বলছি, আপনি বড়বাবু তো? এর আগে কোথায় ছিলেন? ভেড়ামারা, না, দামুকদিয়া? ডি. টি. এস. টমসন সাহেবকে চেনেন? বলুন তো, অমন সাহেব হয়? এক কুড়ি ডিম দিয়েই রাখালদা সটান চ'লে গেল উল্লাপাড়া।—আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে কি যেন খুঁজতে লাগল লোকটা। পাগলই বটে, তবে প্রলাপ শোনবার মত সময় ছিল না ইন্‌স্পেক্টরবাবুর।

আপনাকে এখান থেকে যেতে হবে। প্লাটফরম আটকে রাখলে চলবে না। আসুন, চ'লে আসুন। আদেশের ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন দারোগাবাবু।

ও, বুঝেছি আপনি ছোটবাবু। বড়বাবুকে নিজে আসতে বলুন। যা বলতে হয় আমার সামনে এসে ব'লে যান। এই তো ইষ্টিশন ছেড়ে চল্লিশ বছরের ওপর কাটিয়ে এলাম।—রাগে গরগর ক'রে উঠল লোকটা।

বড়বাবু ছোটবাবু জানি না। আমি পুলিসের লোক। আপনাকে সরিয়ে দিতে এসেছি।

কি, আমাকে সরিয়ে দেবেন? দেশে কি মানুষ নেই নাকি মনে করেন? দিন দিকি সরিয়ে? মধু মল্লিক, পরাণ হাজরা সব কি ম'রে গেছে?

মধু মল্লিক! একটু যেন চমকে উঠলেন ইন্‌স্পেক্টর সাহেব। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বয়োবৃদ্ধ মধু মল্লিক। সবাই তাঁকে চেনে, শুধু চেনে কেন, ভয় করে। বেশ একটু কৌতূহল হ'ল দারোগাবাবুর। হাত নেড়ে ইশারা করতেই সিপাই কন্‌স্টেবলরা স'রে গেল।

কোথা থেকে আসছেন আপনি? এখানে আগে ছিলেন বুঝি?

ছিলাম মানে? আমি না থাকলে এ ইষ্টিশন দেখতে পেতেন কোনদিন? অতিকায় স্টেশনটার এ-দিক থেকে ও-দিক পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলে লোকটি। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব মমতায় চকচক ক'রে উঠল তার দৃষ্টি।

আপনি এখানে থাকতে চান?—ঘুরিয়ে কথাটা পাড়লেন দারোগাবাবু। সঙ্গে সঙ্গে সর্পদষ্টের মত লাফিয়ে উঠল লোকটি।

না, না, একদিনও নয়। এ ছোটলোকের জায়গায় মানুষ থাকে? গায়ের রক্ত জল ক'রে ইষ্টিশন তৈরি করেছিলাম মশাই। ঘর থেকে দুধ বল, মাছ বল, তরিতরকারি বল, এনে জুগিয়েছি, তবে না শ্রীধর মুখুজ্জে, কালী ঘোষ, সদরুদ্দি মুন্সী এদের রাখতে পেরেছি। নইলে এই ম্যালেরিয়ার দেশে মানুষ থাকত?—আগাগোড়া অসংলগ্ন টুকরো টুকরো প্রলাপ, তবুও যেন আত্মদানের দরদে ভরা, বিকৃতমস্তিষ্কের খেয়াল হ'লেও আন্তরিকতার প্রকাশযন্ত্রে অতিমাত্রায় বলিষ্ঠ। বেশ একটু কৌতূহল হ'ল দারোগাবাবুর।

দিন কতক একে আটকে রাখলে কেমন হয়?

আচ্ছা বসুন, আবার দেখা হবে।—চলতে আরম্ভ করলেন দারোগাবাবু।

বড়বাবুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন, ললিত চাটুজ্জে ডাকছে।

সম্মতি জানিয়ে চ'লে গেলেন দারোগাবাবু।

অসম্ভব কাজের চাপে ব্যাপারটাকে দিন কতক ভুলে রইলেন দারোগাবাবু। হঠাৎ একদিন খুঁজতে এসে লোকটিকে আর দেখতে পেলেন না। জিনিসপত্তর যেমন তেমনই আছে, মরচে-ধরা টিনের সুটকেস, ময়লা শতরঞ্জি—সমস্ত।

এখানকার লোকটি কোথায় গেল বলতে পারেন?

অত্যন্ত অসুস্থ বছর তিন-চারের একটি ছেলেকে হাওয়া করতে করতে উত্তর দিল পাশের একটি লোক, কি জানি সার্? কি রোগ ছিল লোকটার। কদিন থেকেই জ্বর হয়েছিল, কাল থেকে একেবারে বেহুঁশ। সকালে উঠে আর দেখতে পাচ্ছি না।

আধা সিনিয়র দারোগাবাবুর পোড়-খাওয়া ভেতরটা হয়তো একটু টনটন ক'রে উঠল। একটু খুঁজলেই পাওয়া যেতে পারে, হয় ম'রে কাঠ নয়তো মরমর, এসব তো একেবারে নিত্য-নৈমিত্তিক, পুলিসের চাকরির বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

মধু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা। শহর আর স্টেশনের বাছাই করা প্রতিনিধি মিলিয়ে নিমন্ত্রণ-সভা। রেল-পুলিসের দারোগাবাবুও বাদ যান নি। স্টেশন পাওয়ার-হাউসের ধার-করা আলোয় বাগানের অতিকায় বিস্তারকে চোখের ওপরে ধরিয়ে দিচ্ছে।

মিঃ মল্লিক, আপনার বাগানে জায়গা তো নেহাত কম নয়। অন্তত হাজার দুই রিফিউজি হেসে খেলে থাকতে পারে। ষোল আনা অধিকারীর মত মন্তব্য করলেন মহকুমা-হাকিম।—অত্যন্ত গভীর জলের মাছ মিঃ মল্লিক।

নট্ অ্যান্ ইঞ্চ্। প্রস্পেক্টিভ্ স্টক্ টেকিঙে এর হিসেব নিয়ে গেছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।—বাস্তহারা সমস্যাকে ঘাড় থেকে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন মিঃ মল্লিক, সঙ্গে সঙ্গে একটু টীকা জুড়ে দিলেন উপসংহারে, বাগানের আর কি আছে স্যার্? অতবড় রেলওয়ে ইয়ার্ডটা তো এই বাগানেরই জায়গা।

তাই নাকি?—এ গ্রেড স্টেশন-মাস্টার দু চোখ কপালে তুললেন।

টিলটিং চেয়ারে দেহের সমস্ত ভারটুকু ছড়িয়ে দিয়ে কতকটা স্বগত

উক্তি করলেন মিঃ মল্লিক, পুরনো ম্যাপ দেখলেই বুঝতে পারবেন কি ছিল স্টেশনের! ছোট্ট একখানা ঘর আর খানকতক বাহাদুরী কাঠ, এই ছিল প্লাটফরম। দিনে শেয়াল ডাকত, রাতের কথা আর নাই বা বললাম। তিন দিনের বেশি একজন মাস্টারও টিঁকত না। ভাগ্যে ছিল ললিত চাটুজ্জে, যাকে বলে বদ্ধ পাগল, তাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল স্টেশনটাকে।

হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠলেন রেল-পুলিসের দারোগা। এই রকমের একটা উপাখ্যান যেন তাঁর কানে এসেছিল দিনকতক আগে—অবান্তর অপ্রকৃতিস্থ আলাপের ভেতর দিয়ে।

কি রকম?—জিজ্ঞাসা করলেন একজন।

অসম্ভব গরমের পর আকাশ ভেঙে পড়েছে তখন। ছড়ানো আসরটা একটু গুটিয়ে এল মল্লিক মশাইকে কেন্দ্র ক'রে।

লোকটার বাড়ির অবস্থা ভালই ছিল, তবে সুখ ছিল না বাড়িতে। চার বছরের মধ্যে পর পর দুটো বউ মরল আত্মহত্যা ক'রে। কেউ বলত—বাড়ির দোষ, আবার কেউ দোষ দিত ললিতের মাকে। আমার মনে হয়, সমস্ত দোষ তার নিজের।

ভাইস ছিল বুঝি?—শহর-কোতোয়াল সজাগ হয়ে উঠলেন।

পুরুষের ভাইসে মেয়েরা মরে না, বরং সচ্চরিত্র লোকের ঘরেই এ সব দুর্ঘটনা বেশি হয়। ললিত ছিল ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত খামখেয়ালী। দেশের যে কোন কাজ সে প্রাণ দিয়েই করত, নাম নেবার জন্যে নয়। নামমাত্র স্টেশন, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। স্টাফ বলতে একজন রিলিভিং ইন্‌চার্জ আর একটি বুকিংবাবু, তাও আজ আসে তো তিন দিন পাত্তা নেই। মনে হ'ল, স্টেশনটা আর থাকে না। হয়তো থাকতও না, যদি ললিত রাখবার চেষ্টা না করত।—চোখ বুজে বোধ হয় একটু ডুবে গেলেন মল্লিক মশাই। বাইরে তখন ঝড়, জল আর বিদ্যুতের একটানা মহড়া চলেছে।

ভোর হতে না হতেই হুঁকো নিয়ে স্টেশনে এসে বসত ললিত। কখনও টিকিট দিচ্ছে, ক্যাশ মিলোচ্ছে, রিটার্ন লিখছে আবার ট্রেন পাস করাচ্ছে, হাতল ঘুরিয়ে টেলিফোন করছে। ঘরের গরুর দুধ, পুকুরের

মাছ, বাগানের তরিতরকারি—ডাবটা নারকোলটা আম কাঁঠাল জাম এসব তো স্টেশন-স্টাফের খাসমহল হয়ে উঠল। তা ছাড়া অসুখ করলে ওষুধ, শিশি শিশি কুইনাইন, ডিঃ গুপ্ত, দুধ, সাবু, মিছরি, এমন কি রাত জেগে দেখাশোনা পর্যন্ত। এর ওপর টি. আই. নয় তো ডি. টি. এস. এলে ললিতের বাড়িতে ডেকচি চাপত, মাংস পোলাও, ভুনিখিচুড়ি—সে আবার এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার! নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে স্টেশন-ইয়ার্ডে যাত্রা বসাত, বড় বড় নামকরা দল। শেষকালে মাসের মধ্যে আদ্ধেক দিন রাত্তিরেও থাকতে লাগল স্টেশনে। দেশের লোক বিনা মাইনের মাস্টারবাবুকে টিটকিরি দিতে লাগল আড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে হু-হু ক'রে হাল বদলাতে লাগল স্টেশনের। নতুন স্টেশন কন্‌স্ট্রাকশনের সময় নিজের প্রকাণ্ড দেশী সেগুনের বাগানটাই দিয়ে দিল পাঞ্জাবী ঠিকেদারকে।—এই পর্যন্ত ব'লেই হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন মল্লিক মশাই, কিন্তু কেমন একটা অকারণ কান্না ফুটে উঠল সেই হাসির আগাগোড়া রেখাগুলো জুড়ে।

রেল-দারোগার মনে হ'ল বাইরের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সঙ্গে অসম্পূর্ণ একটা কান্নার ইতিহাস আউড়ে চলেছেন মল্লিক মশাই, যার শেষ পরিণতির সাক্ষী বোধ হয় তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।

স্টেশনটা যত বাড়ল তত ছোট হ'য়ে গেল ললিত। শেষ পর্যন্ত উঁচু গ্রেডের স্টেশন-মাস্টার গুরুসদয়বাবু একদিন গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিলেন তাকে। ললিতের তখন মা মরেছে, স্ত্রী দুটি তার আগেই সরেছে। দিন কতক পরে সমস্ত সম্পত্তি জলের দরে বিক্রি ক'রে কোথায় চ'লে গেল।

কোথায় গেলেন তিনি?—জিজ্ঞাসা করলেন মহকুমা-হাকিম।

শুনেছিলাম বরিশাল, না, ফরিদপুর কোথায় গেছে।

বরিশাল তো হতেই পারে না। বরিশালে রেল নেই।—টিপ্পনী কাটলেন স্টেশনের বড়কর্তা।

রেল কি হবে?—জিজ্ঞাসা করলেন মল্লিক মশাই।

অন্তত লাইনে মাথা দিতেও তো দরকার।

ঘরসুদ্ধ লোক হেসে লুটিয়ে পড়লেও রেল-দারোগার মুখে হাসি ফুটল না।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু অত গম্ভীর কেন?—জিজ্ঞাসা করলেন একজন।

ওঁর বোধ হয় খিদে পেয়েছে।

আর একদফা হাসির রোল উঠেই সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল। বাইরে তখন বিকট শব্দ ক'রে একটা বাজ পড়েছে।

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

পূজোর ছুটি

পূজোর ছুটির নাম শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।

কথাটা আলঙ্কারিক অতিশয়োক্তি নয়। এই সময়টাই জ্বর-জ্বালার সময়; যে কোন ডাক্তারই স্বীকার করবেন যে এই সময়টায় যত রকমের রোগী আসে, এ রকমটা অন্য সময়ে, এমন কি বর্ষাকালেও, আসে না। ডাক্তারদের এই সময়টাই মরসুম, মনসুনের সময় নয়। বর্ষার শেষ; হেমন্তের আরম্ভ; ভিজে মাটি, স্যাঁতসেঁতে বাতাস, চড়া রোদ্দুর, রাত্রের শিশির—সব কটা মিলিয়ে ত্রিদোষ কেন, একেবারে চার পোয়া দোষের সমাবেশ। এই জন্যেই বলে যে, আশ্বিন-কার্তিক মাসে যমের দুয়ার খোলা, সেই খোলা দুয়ারের সামনেই বাজে পূজোর জয়ঢাক। পূজোটা হয়তো মহাকালী দুর্গাদেবীর উদ্দেশে, কিন্তু ঢাকটা বাজে মহাকালের বলির কাতর ক্রন্দন চাপা দেবার জন্য। পূজোর সময় বড়লোকেরা করে 'পালাই পালাই,' তারা পালাতে চায় কোনও মধুময় মধু-পুরে বা পুরীতে, আর পালাতে না পেরে গরিবেরা যূপকাষ্ঠবদ্ধ পশুর মত ডাকে, মা, মা! ডাকটা ভক্তির নয়, ভয়ের।

শুধু গায়ের জ্বর নয়, 'চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং'—সেও এসে আক্রমণ করে। বারোমেসে "ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন-চিন্তা"র ওপর পূজোর মাসে এসে জোটে পূজোর কাপড়ের চিন্তা। চারিদিকে কাপড়ের কালো বাজার, সেই বাজারের কালিমা প্রবেশ করে মনে, ফুটে ওঠে চোখের কোলে। সেই কালিকে সাদা করার মত শ্বেত চক্রের অভাব, কাজেই চোখের সামনে দেখা দেয় শরতে শ্বেতপদ্মের

জায়গায় পীত সরষের ফুল। যাদের মেয়ে-জামাই আছে, তাদের মনে জেগে ওঠে একটা ব্যাকুলতা—সে ব্যাকুলতা মেয়ের তত্ত্বে কি পাব সেই ভাবনায় নয়, জামাইয়ের তত্ত্বে কি দেব তারই চিন্তায়।

এর মধ্যে পূজোর আনন্দই বা কোথায়, পূজোর পবিত্রতা-ই বা কোথায়? কারুর মনে সংসারের ভাবনা, কারুর মনে সংসারের কামনা। পূজোর নাম ক'রে চার ধারে যত ব্যবসাদার ফাঁদ পাতছে, সাত টাকার জিনিস সতেরো টাকায় বেচছে, আর বিলাসমুগ্ধ যত সব ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সেই ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের মজাচ্ছে। প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা পরস্পরের জামা কাপড় জুতোর তুলনা ক'রে কেউ হিংসায়, কেউ দেমাকে ফেটে পড়ছে। বড়দের মধ্যে রেষারেষি মন-কষাকষি সমানই চলেছে। বিজয়া-দশমীর কোলাকুলি তো একটা মামুলী ভড়ং, তার জন্য কারুর যে মনের কোন পরিবর্তন হয় তার তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরতির রোশনাই সত্ত্বেও মানুষ "যে তিমিরে, সে তিমিরে", সেই তামসিকতার অন্ধকূপেই সে থেকে যায়।

যে কোন পূজোর আসরে গিয়ে দেখ, আসলে কোন ধর্মভাবই নেই। "নমো নমঃ" ক'রেই পূজো সারা হচ্ছে। কোন প্রাণও নেই, কোন সত্যও নেই; বরঞ্চ তার চেয়ে বেশি সত্য আছে আজকাল পলিটিক্সে, ফুটবল ক্লাবে, 'লাল ঝাণ্ডাকি জয়ে'র মিছিলে। পূজো-মণ্ডপে ভিড় জমাচ্ছে ছোটদের দল, তারা সিংহের দাঁত আর অসুরের গোঁফ নিয়েই ব্যস্ত; বউ ঝি যারা আসছে তারা জর্জেট ভয়েলের কথাই চিন্তা করছে। বড়রা কেউ বিদেশে, কেউ বাজারে, আর না হয় নিজ নিজ আড্ডায়। পুরুত ঠাকুর চৌদ্দ আনা দু আনা চুলে টেরি কেটে চা খেয়ে পূজো করছেন, পূজোর পাণ্ডারা খেলো শাড়ি দিয়েছে দেখে বিমর্ষ বোধ করছেন। ইতর লোকেরা এই অবসরে একটু বেশি ক'রে "কারণ" করছে, শুঁড়ী ভায়ার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

পূজোর নাম ক'রে আমরা একটু বেসামাল হই, এইটুকুই এর যা বিশেষত্ব। যেটুকু সংযম, যেটুকু সুবুদ্ধি আমাদের অন্য সময়ে থাকে, পূজোর সময় সেটুকুও আমরা হারিয়ে বসি। পূজো উপলক্ষ ক'রে

আমাদের কোন সদ্‌গুণ বা মহত্তর বৃত্তি প্রকট হয় না,—স্নেহ, প্রীতি, করুণা ইত্যাদি কোন কিছুরই বিকাশ হয় না। ঠাকুর-দেবতার নাম ক'রে কোন ধর্মভাব, কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, কোন মহারহস্যের বোধ কিছুই আমাদের প্রাণে জেগে ওঠে না; এমন কি যে একটা গদ-গদ বা ভীত-ভীত ভাব আগেকার দিনে লোকের মনে দেখা দিত, এখন তাও হয় না। অন্য দিনও যা, পূজোর দিনও তাই,—"সেই দিবা, সেই নিশা, সেই ক্ষুধা, সেই তৃষা"—তবে কেন এই ভণ্ডামি, আর এই ন্যাকামি? আর কেনই বা এই "বর্বরস্য ধনক্ষয়:"?

* * * *

এই পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখি, এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রাত্রিবেলায় ইনি কে, কোত্থেকে এলেন—এই কথা ভাবছি, এমন সময় বৃদ্ধ আমাকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে উঠলেন, ভায়া, তুমি দেখছি ঘোরতর নাস্তিক।

কথাটা শুনে হঠাৎ চমকে উঠলাম, একটু বিরক্তও হলাম। একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করলাম, কে মশাই আপনি? আমাকে নাস্তিক বলছেন কেন?

বৃদ্ধ একটু হাসলেন। হেসে বললেন, ভায়া, একটু চটেছ যে! আমার পরিচয়—সে অনেক কথা, পরে হবে 'খন। কিন্তু তুমি নাস্তিক নও? তবে এতক্ষণ ধ'রে 'নেই, নেই, নেই', 'সব ঝুট্‌ হ্যায়' এই সব কি লিখছিলে?

বুঝলাম, উনি পেছন থেকে আমার লেখাটা পড়েছেন। প্রকাশ্যে বললাম, কেন, আমি কি মিথ্যা কথা কিছু লিখেছি?

ভায়া, মিথ্যা নানা রকমের আছে। তুমি যেটুকু দেখেছ, তা সত্যি। কিন্তু আরও যে ঢের জিনিস দেখ নি। তাতেই সব গোল ক'রে বসেছ। ভায়া, একবার জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

দেখলাম। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘ, তার উপরে পড়েছে উপচীয়মান শরচ্চন্দ্রের অস্ফুট জ্যোৎস্না। হাওয়ায় একটা শীত-মধুরস্পর্শ।

ভায়া, দেখছ না যে একটা আবির্ভাব হয়েছে। মাটির দিকে চেয়ে দেখ, বর্ষার কাদা শুকিয়ে এল, মাঠে মাঠে সবুজের সঙ্গে সোনালী রঙ মিলে গেল, দীঘি আর নদীর শান্ত বক্ষে শিহরণ উঠেছে,—শারদীয়া দেবী আসছেন।

ওটা তো নৈসর্গিক ব্যাপার। মানুষের মনে প্রাণে দেবীর আবির্ভাব হয়েছে কই?

হয়েছে বইকি। এই আবির্ভাব ছড়িয়ে পড়ছে স্বর্লোক থেকে ভূলোকে। প্রথম দেখা দিয়েছে শিশুদের চোখে মুখে মনে। আজ তারা বন্ধন-শাসন ছাড়িয়ে কলরব করতে করতে চলেছে; তারা লাভ করেছে নবজীবন, সেই নবজীবনের ঢেউ জেগে উঠছে তাদের চঞ্চল গতিতে, তাদের কলরবের মধ্যে। তারা দিব্য স্পর্শ লাভ করেছে ওই রঙিন কাপড়-জামার মধ্যে, ওটা বিলাস-বিভ্রম নয়। আজ তারা জেনেছে যে, তারা বিশ্বমায়ের ছেলে, যাকে তোমরা বল 'অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

তা হ'লে, আপনার মতে, জামা-কাপড়ই হ'ল অমৃত?

ভায়া, তোমাদের হয়েছে গোড়ায় গলদ। কতকগুলো সূক্ষ্ম তর্ক তোমাদের মাথায় ঢুকেছে ব'লে তোমাদের স্থূল বোধটা নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা ধ'রে নিয়েছ যে, ঈশ্বরও নিরাকার, আনন্দও নিরাকার —একেবারে বৃন্তহীন পুষ্প। নইলে জামা-কাপড়ের ওপর রাগ ক'রে ব'সে থাকতে না। ভায়া, বুঝে দেখ, পূজোর সময়টাতেই আমরা সংসারের নিয়মের বন্ধন থেকে পাই কথঞ্চিৎ মুক্তি, যাকে লোকে বলে—ছুটি। এই ছুটিতেই হয় আমাদের মনের মুক্তি, এ ছুটিই হ'ল সংসারে "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ"। পূজোর সময় লোকে যখন ট্রেনের বা দোকানের ভিড়ের মধ্যে মহোৎসাহে চলেছে. টো-টো ক'রে পূজামণ্ডপে বা আড্ডায় ঘুরছে, নিষ্কর্মার মত শুয়ে ব'সে খোসগল্প করছে, পড়াশুনা চাকরি কাজকর্ম তোমাদের দর্শন সাহিত্য সব ভুলে লাভ-ক্ষতির বিচারের ঊর্ধ্বতর লোকে বিহার করছে, সেইখানেই তো মুক্তি, সেই খানেই তো আনন্দ।

কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ।
গরবে মাথা তুলি, থেকো না তুমি আজ॥

আজ বৈদান্তিক না হয়ে একটু তান্ত্রিক হও; "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মে"র ফাঁকা ধ্যান ছেড়ে একটু খাঁটি সিদ্ধির প্রসাদ পাও। এই যে জীবনের চঞ্চলতা, স্বার্থসিদ্ধির চঞ্চলতা, তার মধ্যেও আজ একটা রঙ ধরেছে, একটা নতুন আমেজ এসেছে, সেই কথাটা একটু বোঝ দেখি। লোকে আজ ঠকছে—শখ ক'রেই যে ঠকছে, আর যারা ঠকাচ্ছে তারাও ব'লে-ক'য়ে আমোদ ক'রে ঠকাচ্ছে, এটা কি বুঝতে পার না? চণ্ডীপাঠ নয় ভায়া, এই যে বেপরোয়া (তোমার কথায়, বে-সামাল) জীবনের উচ্ছলতা—এই দিয়ে পূজো হয় "যা দেবী সর্বভূতেষু মায়ারূপেণ সংস্থিতা" তাঁর। তোমার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতির বিচার ছেড়ে একবার দলে মিশে যাও দেখি, আমাদের মত একটু নেশায় বুঁদ হতে শেখো; তা হ'লে আর আনন্দের ছায়ার পিছনে ঘুরতে হবে না, তার কায়াটাকেই পেয়ে যাবে। এই ক'রেই মিলে যাবে জীবসিদ্ধি।

* * * *

হঠাৎ দেখি, বৃদ্ধ ঘরে নেই, জানলার বাইরে। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, কই, আপনার পরিচয় তো দিলেন না? বৃদ্ধ হেসে বললেন, আমার নাম—কমলাকান্ত চক্রবর্তী। পর-মুহূর্তে দেখি তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

"বেতালভট্ট"

—

"সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরঙ্গিণী সভা, হাটে হাটভঙ্গিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা-সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।"—বঙ্কিমচন্দ্র

রামের দুর্মতি

(শূন্যাঙ্ক নাটিকা)

১ম অদৃশ্য

নড়বড়ে ভাঙা সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বর। কথা বলতে বলতে উত্তেজনার মুহূর্তে সাবধান হচ্ছেন, পাছে ভেঙে পড়ে। মাথায় জীর্ণ মুকুট, মুকুটশীর্ষ খ'সে ঝুলছে মুখের উপর, বার বার চোখের উপর এসে পড়ছে, বিরক্ত হয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন। সর্বাঙ্গে পাড়াগেঁয়ে যাত্রার দলের রাজার মত রঙ-চটা অতি পুরাতন ছিন্নমলিন সজ্জা। ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষু কোটরগত, পাকা চুল, ভ্রূ দুটো নেমে এসেছে। গাল-বসা দন্তহীন মুখ, মাথায় টাক, মুকুটটা একবার প'ড়ে যাওয়াতে প্রকাশ পেল। ওঠা-ওঠা চুল দাড়ি যা আছে, সব পাকা, কিন্তু তামাটে। কিং লিয়র কিংবা তাঁর ভারতীয় বন্ধু শাজাহানের শেষজীবনের উন্মাদ-মূর্তির সঙ্গে তুলনা চলে, বরং আরও খারাপ। তবে হরিশ্চন্দ্রের অবস্থায় আসতে কিছু দেরি আছে।

পার্শ্বে হাতল-ভাঙা চেয়ারে তাঁর একান্ত-সচিব (প্রাইভেট সেক্রেটারি) বিচিত্রগুপ্ত। মাথায় ময়লা শামলা, গায়ে শতচ্ছিন্ন চাপকান, যুদ্ধের বাজারে অল্প-মাইনের আমলা এবং মক্কেলহীন উকিল মোক্তারদের যে দুর্দশা হয়েছিল। প্রাচীন কাব্যপুরাণ নাটকাদিতে তাঁর নামোল্লেখ নেই। দরকারও ছিল না, কারণ বর্তমান রচনার মত ঐসব রচনায় খাঁটি ঈশ্বরকে (জেন্যুইন গডকে) টেনে আনা হয় নি। ইনি চিত্রগুপ্তের ছোট ভাই, গ্র্যাজুয়েট ব'লে 'হাইয়ার পোস্ট' পেয়েছিলেন। সেইজন্য চিত্রগুপ্ত কেরানীমাত্র, বিচিত্রগুপ্ত সেক্রেটারি। সবাই জানেন চিত্রগুপ্তের উল্লেখযোগ্য 'এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন' ছিল না।

ঈশ্বরের দুটি কানে হেড-ফোন। সহসা হেড-ফোন ছুঁড়ে ফেলে উন্মত্তের মত ব'লে উঠলেন—

ঈশ্বর। দিই লাফ।* মর্ত্যবাসীর দুঃখ আর আমি সইতে পারছি না।

বিচিত্রগুপ্ত। প্রভু, নিরস্ত হোন। পা ভাঙবে। বুড়ো বয়সে পা

* দ্বিজেন্দ্রলাল : 'শাজাহান'

ভাঙলে আর জোড়া লাগবে না। (নিকটস্থ 'বিশ্ব-বিক্ষণ' যন্ত্রে মাথা গলিয়ে) তা ছাড়া যুদ্ধ তো দেখছি থেমে গেছে।

ঈশ্বর। থেমে গেছে? বাঁচা গেল। তা হ'লে তাদের মতিগতি ফিরেছে, বল?

বিচিত্রগুপ্ত। ফিরতে বাধ্য হয়েছে।

ঈশ্বর। কারণ?

বিচিত্রগুপ্ত। কারণ—অ্যাটম বোম।

ঈশ্বর। ও, বুঝেছি। হর হর বম বম! তবু ভাল। ভারতবর্ষের খবর কি?

বিচিত্রগুপ্ত। হিন্দু-মুসলমানে লেগে গেছে। মারামারি, কাটাকাটি, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, ধর্মনাশ—

ঈশ্বর। দিই লাফ?

বিচিত্রগুপ্ত। একটু অপেক্ষা করুন। দেখাই যাক না কি হয়!··· থেমে গেছে।

ঈশ্বর? থেমে গেল? কেমন ক'রে?

বিচিত্রগুপ্ত। ওরা স্বাধীনতা পেয়েছে। 'পার্টিশানে'র কৃপায়, মানে, ভারতকে ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে।

ঈশ্বর। মন্দ করে নি, ঝগড়াঝাঁটি করার চেয়ে—

বিচিত্রগুপ্ত। দলে দলে লোক সব দেশ ছেড়ে ঘরবাড়ি ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে, বিধর্মীর ভয়ে। তাদের দুর্দশায়···(সহসা চমকে উঠে) সর্বনাশ!

ঈশ্বর। কি হ'ল?

বিচিত্রগুপ্ত। গান্ধীহত্যা!

ঈশর। ও আমার জানা ছিল। বায়না ধরেছিল, ১২৫ বছর বাঁচবে। বাঁচতও। তবে আমার তা ইচ্ছা ছিল না। আমার কথা মতই—

বিচিত্রগুপ্ত। গড—সে—

ঈশ্বর। হ্যাঁ, গডসে তাকে গুলি করেছে। গান্ধী এসেছে?

বিচিত্রগুপ্ত। এসেছেন নিশ্চয় এতক্ষণ। দেখি, খবর নিই।

ঈশ্বর। আমার কাছে ডাক। তারও অবস্থা আমারই মত। আহা, বড় কষ্ট পেয়েছে সারাজীবন।

বিচিত্রগুপ্ত। (টেলিফোন ধ'রে) ঢং ঢং ঢং ঢং। শূন্য, শূন্য, শূন্য, শূন্য। হ্যালো...হ্যাঁ, আমি বিচিত্রগুপ্ত। মহাশূন্য থেকে কথা বলছি। গান্ধী এসেছেন?...বেশ, বেশ...তাঁকে একবার ঈশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দিন...কি বললেন?...আসতে রাজী নন?...'ভাঙ্গি কলোনি' খুঁজছেন? পবিত্র স্বর্গে—

ঈশ্বর। থামো। বুঝতে পেরেছি। যোগবলে ওকে আমি আকর্ষণ করব। (যৌগিক ক্রিয়ায় গান্ধীর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মাকে টেনে এনে টপ ক'রে গিলে ফেললেন। পানতুয়ার মত মিষ্টি নরম আত্মা—মুখে দিতেই মিলিয়ে গেল।) আপাতত ওকে আত্মস্থ করলাম। পৃথিবীর লোক যখন হিংসা-বিদ্বেষ ভুলবে—

বিচিত্রগুপ্ত। তা কি কখনও হবে?

ঈশ্বর। হবে হে, হবে। হর হর বম বম! তুমি ওসব কি বুঝবে? কেরানী, কেরানীর মতই থাক, বার বার সাবধান করেছি, পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামিও না।...(ঢেকুর তুলে) কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না।

বিচিত্রগুপ্ত। আবার কি হ'ল?

ঈশ্বর। অহিংসা হজম করেছি, কিন্তু রামরাজ্য হজম হ'তে চাইছে না। ঢেকুর উঠছে, রামরাজ্যের চোঁয়া ঢেকুর। (ঘন ঘন ঢেকুর তুলছেন)

বিচিত্রগুপ্ত। এখন উপায়?

ঈশ্বর। (অস্থিরভাবে) রামকে ডাক।

বিচিত্রগুপ্ত। কোন্ রামকে?

ঈশ্বর। তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি দিন দিন লোপ পাচ্ছে। তুমি বরং পেনশন নাও, বুঝলে?

বিচিত্রগুপ্ত। আপনারই বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে প্রভু। রাম তো আর একটা নয়। বলরাম, পরশুরাম ইস্তক রামমোহন, রামকৃষ্ণ, মায় রাম-সে (রাম-কহো) ম্যাক্‌ডোনাল্ড।

ঈশ্বর। তুমি একটি আস্ত গাধা। বলি, রামরাজ্য বলতে কোন্ রামকে বোঝায়?

বিচিত্রগুপ্ত। (লজ্জিতভাবে ফোন ধরলেন) শূন্য, শূন্য, শূন্য, শূন্য, শূন্য—মানে পাঁচ শূন্য। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অবতার-কলোনির সেক্রেটারিকে চাইছি···আপনিই?···গুড! দয়া ক'রে রঘুপতি রাঘব রাজারামকে একবার পাঠিয়ে দিন, ঈশ্বর তাকে তলব করেছেন। (ফোন ছাড়তেই উজ্জ্বল রাজবেশে ৺রামচন্দ্রের প্রবেশ।)

রাম। প্রভু আমায় ডেকেছেন?

ঈশ্বর। হ্যাঁ, তোমায় আবার মর্ত্যে যেতে হবে, রামরাজ্য স্থাপন করতে। (পুনরায় ঘন ঘন ঢেকুর তুললেন)

রাম। কিন্তু সেবার বড় কষ্ট পেয়েছি। ওখানকার জনমতকে আমার বড় ভয়, যার ঠেলায় আজও সীতা মাটির তলায়—এবার পেলে আমাকেও মাটিতে পুঁতবে।

ঈশ্বর। ভয় নেই, এবার সূক্ষ্মদেহে যাবে। সঙ্গে শুধু হনুমান, তাও সূক্ষ্মদেহে। বুঝলে?

রাম। (কি যেন ভেবে নিয়ে মুচকে হেসে) যে আজ্ঞে।

২য় অদৃশ্য

অবতার-কলোনি। হনুমানের কোয়ার্টার্স্। চারিদিকে কদলীবন, পাকা পাকা কলার কাঁদি। সুপক্ক ফলভরনত অন্যান্য ফলের গাছও পর্যাপ্ত। ৺রামচন্দ্র রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন—

রাম।—বৎস হনুমান! হনু আছিস? হনু রে! ও হনু!

হনুমান। (নেপথ্যে) কে?···(দরজা খুলে রামকে দেখে) একি! প্রভু রামচন্দ্র? এত সকালে? (নাটকীয় ভঙ্গিতে)

চিরদাস হনু হে তোমার,
ডেকে পাঠাইলে আমি নিশ্চয় যেতাম।
তুমিও তা জান, তবু, হে ভক্তবৎসল!
কষ্ট ক'রে পায়ে হেঁটে এলে!

রাম। বুজরুকি রাখ, চল, ভেতরে চল। গোপনে পরামর্শ আছে। রাজনীতি। (ভিতরে গিয়ে মুখোমুখি ব'সে) বৎস হনুমান!

হনুমান। বলুন।

রাম। বৎস হনু রে!

হনুমান। বলুন না, কি বলতে চান।

রাম। হনু রে! (কেঁদে ফেললেন)

হনুমান। কি আপদ্! এই না বলছিলেন, পলিটিক্স। পলিটিক্সে কান্নাকাটি নেই।

রাম। ঠিক বলেছ হনুমান। রাজনীতিতে কান্নাকাটির স্থান নেই। ত্রেতায় তা বুঝতে পারি নি। একটু শক্ত হ'লে জনকনন্দিনীকে হারাতে হ'ত না। এবার আর সে ভুল করব না। এবার প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! সীতা-নির্বাসনের প্রতিশোধ! (সানুনয়ে) চল হনুমান, তুমি আমার সঙ্গে চল।

হনুমান। না প্রভু, আমার এবার যাওয়া হবে না।

রাম। কেন?

হনুমান। শুনছি, ওরা 'ফসল ফলাও' আন্দোলনকে সফল করতে হনু-মারা আইন করবে। কাজেই আমার যাওয়া হবে না।

রাম। ভয় নেই, আমরা এবার সূক্ষ্ম শরীরে যাচ্ছি। আমি হব রাজনীতি, তুমি হবে অর্থনীতি। বুঝলে? জনমত! রাজধর্ম! সীতানির্বাসন! হা-হা-হা-হা! (বেগে প্রস্থান)

হনুমান। হা প্রভু রামচন্দ্র! হা রঘুকুলতিলক! হা প্রজারঞ্জন-কারিন্! (একটু ভেবে নিয়ে) কিন্তু ওরা হনু মারতে চায়। দাঁড়াও সব। ফসল তোমাদের ভাল ক'রেই ফলাচ্ছি! ব্রহ্মণ্যদেব! জ্ব'লে ওঠ লেজের আগুন হয়ে! (দাঁত কড়মড়াতে) হনু মারবে! ফসল ফলাবে! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! হুঁপ! (লম্ফ প্রদান)

৩য় অদৃশ্য

পূর্ববৎ সিংহাসনে ঈশ্বর, ভাঙা চেয়ারে বিচিত্রগুপ্ত। ধীরে ধীরে হেড-ফোন নামিয়ে রেখে—

ঈশ্বর। কই, কিছু শোনা যাচ্ছে না। বোধ হয় রামরাজ্য স্থাপিত হয়েছে।

বিচিত্রগুপ্ত। ('বিশ্ব-বিক্ষণে' মাথা রেখে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঈশ্বর। রাম কি করছে ?

বিচিত্রগুপ্ত। রাজনীতি : মানে, ভাষণ—বিবৃতি—সফর। অবশ্য সূক্ষ্ম দেহে এবং নানা মূর্তিতে, মগজে এবং কাগজে।

ঈশ্বর। আর হনুমান ?

বিচিত্রগুপ্ত। চোরাকারবার। চালে কাঁকর, ময়দায় পাথরগুঁড়ো, তেলে শেয়ালকাঁটা। চিনির বস্তা নিয়ে এচাল-ওচাল। অবশ্য সূক্ষ্ম শরীরে, অর্থাৎ আইন বাঁচিয়ে, অর্থাৎ ধরা পড়বার ভয় নেই।

ঈশ্বর। অকালমৃত্যু ?

বিচিত্রগুপ্ত। নেই। তার বদলে পা ফুলে ফুলে সকালমৃত্যু।

ঈশ্বর। জনমত ?

বিচিত্রগুপ্ত। প্রথমে তালগোল পাকিয়েছিল। এখন দেখছি, রোটারি মেসিনে আর লিনোটাইপে চেপটে গেছে। গরম গরম লুচির আকারে বেরিয়ে আসছে। রোজ রোজ রকম রকম।

ঈশ্বর। ও, বুঝেছি। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ। (হেড-ফোন লাগিয়ে) তাই তো, সাড়াশব্দ কিছু নেই। সব চুপ। মর্ত্যের লোক কি সব মারা গেছে ? (নিমগ্নভাবে) বনের পশু হনুমানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বলতে পার বিচিত্রগুপ্ত, রাম কেন এমন কাজ করলে ?

বিচিত্রগুপ্ত। আমি আজকাল পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাই না।

ঈশ্বর। (হেড-ফোন নামিয়ে উন্মত্তভাবে) ওরে আমার সোনার পৃথিবী, হায় আমার সাধের ভারত ! সব গেল ! সব গেল ! ভারত ! ভারত ! তোকে যে আমি বুকের রক্ত দিয়ে 'মানুষ' করেছি ! আমার শৈশবের লীলা, যৌবনের স্বপ্ন, বার্ধক্যের সম্বল ! ভগবান ! ভগবান ! যদি তুমি থাক—

বিচিত্রগুপ্ত। ও আবার কাকে ডাকছেন ? আপনিই তো—

ঈশ্বর। চুপ কর বেরসিক। উচ্ছ্বাসের সময় কথা বলতে আছে ? এমন সুন্দর ম্যাডসিনটাই মাটি ক'রে দিলে ! হ্যাঁ, কি বলছিলাম ? ভগবান্ ! ভগবান্ ! আমি জানি, তুমি আছ—

নইলে আমি হলাম কেমন ক'রে? যদি থাক, যদি কেন নিশ্চয় আছ, থাকতে বাধ্য—বল দাও, আমার এই বার্ধক্য-জীর্ণ দুর্বল দেহে শতহস্তীর বল দাও। একবার শেষ শক্তি দিয়ে দেখি, রামের এ দুর্মতি রোধ করতে পারি কি না! (সহসা উজ্জ্বলবেশী পূর্ণযৌবন জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ ক'রে স্মিতহাস্যে) দিই লাফ?

বিচিত্রগুপ্ত। দিতে পারেন। এইবার সময় হয়েছে।*

ভোলা সেন

শতকরা

শচীকান্ত স্কুল হইতে ফিরিবা মাত্র চঞ্চলা একখানা চিঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল।—শুনেছ?

স্ত্রীর আচমকা প্রশ্নে অভ্যস্ত শচীকান্ত ছাতাটা রাখিয়া দিয়া জামার বোতাম খুলিতে লাগিল। নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, না।

চঞ্চলা জ্বলিয়া উঠিল।—তা শুনবে কেন? চিঠিখানা পড়ে দেখ।

কাদের চিঠি?—শচীকান্ত নির্বিকার চিত্তে প্রশ্ন করিয়া জামা খুলিয়া সযত্নে আলনায় রাখিতে গেল।

বা: বা:! কাদের চিঠি!—চঞ্চলা ভেংচাইয়া উঠিল।—স্বপ্ন দেখছ নাকি? হিমুর চিঠি।

এবার কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিল শচীকান্ত।—ও, তাই নাকি? কি লিখেছে বল তো?

বিষয়টা ঝগড়ার চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক বলিয়া চঞ্চলা আর বিলম্ব করিতে পারিল না। বলিল, লিখেছে ভাল আছে। আর, সুবোধ প্রমোশন পেয়ে এখন সাড়ে চার শো টাকার পোস্টে কাজ করছে, তাই লিখেছে।

তাই লিখেছে নাকি?—শচীকান্ত খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল,

* প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আর. জি. ভাণ্ডারকর লিখেছেন, "The Rama culture represents a saner and purer form of Hindu religious thought than Radha-Krishnaism." (Vaishnavism, p 87)—এইজন্যই দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ-কালচারের লোকেরা মালা-তিলক ও নামাবলী ছেড়ে গান্ধী-টুপি ও খদ্দর প'রে রামা-কালচারের পক্ষপাতী হয়ে উঠছে।

বেশ তো, সুখবর। তাতে তুমি খেপছ কেন? এতে দুঃখের কি আছে?

দেখ দেখি, কি রকম কথা!—চঞ্চলা প্রায় কান্নার সুরে বলিল, আমার ছোট বোনের বর! তার মাইনে বেড়েছে, কত সুখের কথা। আমি বড় বোন হয়ে করব দুঃখু? তোমার মত ছোটলোক কিনা সবাই?

না, সবাই কেন হবে!—নিরীহভাবে বলিয়া শচীকান্ত বাহির হইয়া গেল ঘর হইতে।

কিছুক্ষণ পরে শচীকান্ত একখানা বই লইয়া বারান্দায় ক্যাম্বিসের আরাম-চেয়ারে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

চঞ্চলা এক প্লেট চিঁড়াভাজা আর এক কাপ চা আনিয়া পাশে একটা টুলের উপর সশব্দে রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শচীকান্ত বই বন্ধ করিয়া ডাকিল, শোন।

চঞ্চলা ফিরিল।

শোন, ঝগড়ার কথা নয়;—শচীকান্ত খাইতে খাইতে বলিতে লাগিল, সুবোধ এখন সাড়ে চার শো পাবে শুনে তোমার তো আনন্দ হয়েইছে, আমারও হয়েছে। আনন্দেরই তো কথা।

বেশ তো, আনন্দ কর।—চঞ্চলা ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, তা আমাকে খুঁচিয়ে আনন্দ না করলে কি তোমার আনন্দ হবে?

আঃ, আবার ঝগড়া শুরু করলে! ছিঃ! আমি ডাকলাম দুটো ভাল কথা বলবার জন্য—

ভাল কথা! তাও আবার তুমি জান নাকি?

জানি গো জানি।—শচীকান্ত হাসিমুখে বলিল, কিন্তু বলি না সব সময়। এখন বলছি, শোন। আচ্ছা, সুবোধ যেন এর আগে কত পাচ্ছিল? মনে আছে?

তিন শো।

আর এখন হ'ল সাড়ে চার শো। ঠিক দেড়া। তা হ'লে দেখ, হিমুর সুখও দেড় গুণ হয়ে গেল।

যার হাতে পড়েছে সে যদি মানুষের মত মানুষ হয়, তা হ'লে সুখ হবে না কেন?—চঞ্চলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

ঠিক কথা।—দুঃখের সঙ্গে যেন সায় দিল শচীকান্ত।—অথচ দেখ, সুবোধ আমার চেয়ে পাসও একটা কম।

পাস হ'লেই মানুষ হয় নাকি?

জলজ্যান্ত আমাকে সামনে দেখে এ কথা কে বলবে? কেউ না। ইস্কুলের মাইনে আর টুইশনির টাকা নিয়ে আমি পাচ্ছি মোটমাট দু শো, না, দু শো পঁচিশ।

আবার পঁচিশ হ'ল কোত্থেকে?—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল চঞ্চলা।

পঁচিশ টাকার একটা ছাত্র পেয়েছি নতুন। আজ থেকেই পড়াতে হবে।

কিছু খুশি হইল চঞ্চলা।—তাই নাকি? এতক্ষণ বল নি কেন?

পরে বলছি, কেন বলি নি। তা ছাড়া বলবার সময়ই বা পেলাম কোথায়? এসেই হিমুদের সুখবরটা পেলাম। সেই থেকেই ভাবছি। আমার ঠিক ডবল পাচ্ছে সুবোধ। আমার দুশো পঁচিশে যে সুখ পাচ্ছ তুমি, ঠিক তার ডবল সুখ পাচ্ছে হিমু।

আহা, কি সুখ রে আমার!

যতটুকু হোক না। ধর এক সের।

এক সের? কিসের সের?

সুখের। তোমার এক সের হ'লে হিমুর সুখ হচ্ছে দু সের।

কি আবোল-তাবোল বকছ! মাথা খারাপ হয়েছে?

মাথা আরও পরিষ্কার হচ্ছে ক্রমশ।—একটু হাসিয়া বলিল শচীকান্ত, সবচেয়ে ভাল হয় শতকরা এক সের ধরলে। মানে, এক শো টাকায় যদি এক সের সুখ হয়, তা হ'লে তোমার হ'ল সওয়া দু সের আর হিমুর হ'ল সাড়ে চার সের।

সাড়ে চার সের সুখ?

হ্যাঁ।

চঞ্চলা এবার আমোদের মজা পাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

শচীকান্ত মহা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিল, আর আমার ইস্কুলের সেক্রেটারি কালীপদবাবুর মাসিক আয় হচ্ছে প্রায় দু হাজার। তা হ'লে তার সুখ হচ্ছে আধ মণ! ইস্!

চঞ্চলা একটা ভেংচি কাটিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে শচীকান্ত চঞ্চলাকে ডাকিয়া আনিল।

গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিল, তোমাকে সুখে রাখি সত্যি আমার খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু—। আচ্ছা, মোটরে চ'ড়ে বেড়ালে বোধ করি সুখ হয়। বড়লোকেরা নইলে অত মোটরে বেড়াবে কেন? চল, রবিবার দিন একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে সারাদিন বেড়াব। দেখা যাক।

ট্যাক্সিওয়ালারা তো তোমার বোনাই নয়? তারা যে পয়সা চাইবে!—চঞ্চলা বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

পয়সার ভাবনা তো বরাবরই আমার।—শচীকান্ত ধীরস্বরে বলিল, সেখানে আমার বোনাই বল, তোমার বোনাই বল, কেউ কাজে লাগবে না।

একটুক্ষণ যেন চিন্তা করিয়া একটু হাসিয়া গূঢ় ভঙ্গীতে আবার বলিল, তোমাকে বলি নি কোনদিন, কিন্তু আছে। কিছু টাকা আমারও আছে।

চঞ্চলা কিছু অবিশ্বাস, কিছু আশামিশ্রিত হাস্যে বলিল, মিথ্যে কথা বলছ। এতদিন বল নি কেন? কত টাকা?

ওরে বাপ রে! মেয়েদের কাছে তাই বলে নাকি লোকে? না না না না।

একটা কলরব সৃষ্টি করিয়া উঠিয়া পড়িল শচীকান্ত। বলিল, তা হ'লে সেই কথা রইল। রবিবার। এখন যাচ্ছি। আমার সময় হয়েছে।

তুমি যেয়ো।—চঞ্চলা হঠাৎ আবার ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল।—মোটরে চ'ড়ে বেড়াবার মত কত শাড়ি-গয়না দিয়েছ তুমি! পেত্নী সেজে ট্যাক্সি চড়তে চাই না।

শচীকান্ত থামিল। ঠিক কথা। কাল সকালবেলা শাড়ি কিনতে হবে। গয়না তোমার তো যথেষ্টই আছে।

চঞ্চলা ঠন করিয়া বাজিয়া উঠিল যেন।—সে তোমার ক্ষমতার নয়।

ওই হ'ল। আছে তো?—বলিয়া আর সময় দিল না শচীকান্ত।

পরের দিন চমৎকার শাড়ি ব্লাউজ কিনিয়া শচীকান্ত চমৎকৃত করিয়া দিল চঞ্চলাকে এবং রবিবার সত্যই একখানা ঝকঝকে ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

রাত্রিতে শচীকান্ত চক্ষু নাচাইয়া পুলকের ইঙ্গিতে বলিল, কেমন?

কি?

কেমন সুখ?

ইস্! একদিন মোটরে বেড়ালেই জীবনের সুখ হয়ে গেল?

না, তা নয়। জীবনের কথা নয়। আমি বলছি যে হেঁটে বা রিক্শতে বা ট্রামে বাসে বেড়ানোর চেয়ে মোটরে বেড়াতে বেশি সুখ লাগে না?

লাগেই তো।—চঞ্চলা ফোঁস করিয়া উঠিল।—লাগলে কি হবে! একদিনের বাদশা তো! ও আমি চাই না।

তা তো বটেই। তবু সুখের রকমটা তো জানা হ'ল? এখনকার মত এই থাক্। আর কিসে কিসে সুখ হয় ভেবে বার কর দেখি?

চঞ্চলা অনুকম্পামিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল, ভাবতে হবে না আমার। তুমি পারবে তো? বলব?

বল না। দেখা যাক।

একটা বাড়ি চাই, একটা গাড়ি চাই, ঠাকুর চাকর চাই, দাসী চাই। শাড়ি গয়না সমস্ত চাই। পারবে এ সব দিতে?

শচীকান্ত হাসিয়া বলিল, গাড়ির সুখ তো হয়েই গেল। একদিন ভাল বাড়িতে বাস করতে হবে। একটা ঠাকুর রাখব সাত দিনের জন্যে। চাকর আর ঝিও কয়েকদিনের জন্য রাখা যাবে। তাতেই সুখটা কেমন তা তো বোঝা যাবে?

সাত দিনের সুখ কে চায় তোমার কাছে?

শুধু সুখের স্বাদটা বুঝতে, বুঝলে না? তোমাদের হিমুর সাড়ে চার সের আর আমাদের কালীপদবাবুর আধ মণ সুখের দৈনিক গড়পড়তা হিসেবটা অন্তত বুঝে নেওয়া—এই আর কি। স্বাদটা—

স্বাদটা তুমিই চাখ। আমি চাখতে চাই না। আমার দরকার নেই।

আছে আছে। দরকার আছে। তা ছাড়া সাত দিন এমনি বললাম। বরাবরই থাকবে। আমার কি টাকা নেই মনে কর? আছে, টাকা আছে। বলি নি তোমাকে।

আমাকে বলবে কেন?—চঞ্চলা অভিমান করিয়া বলিল, থাক্, তোমার টাকা তোমার কাছেই থাক্। ঠাকুর চাকরই যদি অদৃষ্টে থাকবে, তবে আর—

তোমার মত লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে কেন?—শচীকান্তই বাকিটা বলিয়া দিল।—ঠিক কথাই তো। কাজেই এই অদৃষ্টেও যতটা পারা যায়, বুঝলে না! তা ছাড়া আমি ছাই ঠিক বুঝতেও পারি না কিসে সুখ। কথাটা খুব সোজা মনে ক'রো না। কিসে সুখ হয় জানা খুব কঠিন কথা। আমাদের দেশের এক জমিদার দু লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিল শুধু কিসে সুখ হয় জানবার জন্যে।

কি হ'ল তার?

কি আর হবে? হার্টফেল ক'রে মারা গেল শেষে। প্রথমেই গোটা বিশেক মেয়েমানুষ রাখল। একজন আঙুল টিপে দেবে, একজন স্নান করাবে, একজন— বিশ রকম আর কি! কিছু হ'ল না। আরও অনেক রকম ক'রে শেষে ভাবলে, টাকার নোট জ্বেলে রান্না ক'রে খেলে বোধ করি সুখ হবে। তাও করেছিল কিছুদিন। তারপরে জমিদারি নিলামে যাবার পরে ম'রে গেল। বেচারা!

চঞ্চলা হাসিয়া বলিল, মূর্খ জমিদারদের ওই রকমই হয়।

অথচ শতকরা এক সের রেটে বেচারার সুখ হওয়া উচিত ছিল, ধর, প্রায় চার মণ।

চঞ্চলা এবার একটা মুখনাড়া দিয়া সরিয়া গেল।

তিন-চার দিনের মধ্যে শচীকান্ত ঠাকুর, চাকর ও ঝি ঠিক করিয়া ফেলিল। কিন্তু চঞ্চলা বাঁকিয়া বসিল। আড়ালে ডাকিয়া বলিল, কি সব পাগলামি হচ্ছে! ছেলে-ভুলনো হচ্ছে আমাকে?

শচীকান্ত বুঝাইতে চেষ্টা করিল। আহাঃ, দেখই না ব্যাপারটা। হিমু এসে ঠাকুরের গল্প করবে, আমারই যে সহ্য হবে না।

ইস! কার সঙ্গে কার তুলনা! ক্ষমতা থাকে বরাবরই রাখ। সাত দিন পরে পাড়ার লোক হাসবে যখন?

শচীকান্ত যেন রাগ করিয়া উঠিল, সাত দিন কে বললে? যদ্দিন তোমার ইচ্ছে।

হঠাৎ গলার স্বর এক ধাপ নামাইয়া আবার বলিল, কয়েকদিন পরেই হিমুর কাছে চিঠিতে লিখতে পারবে যে, ঠাকুরটার ছ দিন থেকে জ্বর, ভারি অসুবিধে হচ্ছে।

ঠাকুরটার জ্বর! কয়েক দিন পরে ওর জ্বর হবে নাকি?

শচীকান্ত তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, হবে বইকি। হবে হবে। তা হ'লে ওদের কাজে লাগিয়ে দাও। আমি চললাম।

কিন্তু চঞ্চলা টানিয়া ফিরাইল। বলিল, বেশ, চাকরটাকে রেখে দাও। আর ঠাকুর আর ঝিয়ের বাবদ টাকাটা আমার কাছে দাও। আমি এক জোড়া চুড় বানাব।

ওঃ, চুড়!—শচীকান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল।—ঠিক, চুড়েও সুখ হয়। বলিয়া একটু স্তিমিত হইয়া পড়িল। মুহূর্ত ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, দেখা যাক।

শুধু চাকরটাই বহাল রহিল।

রাস্তায় একদিন চঞ্চলার জ্ঞাতিভাই মণিলালের সঙ্গে শচীকান্তের দেখা হইল। দেখা ইতিপূর্বেও অনেকদিন হইয়াছে। এতটা আগ্রহ-সহকারে শচীকান্ত আর কোনদিন আলাপ করিতে ব্যস্ত হয় নাই। আজ হঠাৎ জড়াইয়া ধরিয়া এক চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পড়িল।

কি খবর বলুন?—শচীকান্ত চায়ের হুকুম দিয়া আরম্ভ করিল, কই, আমাদের ওদিকে বেড়াতে-টেড়াতে যান না যে? সেই কাপড়ের দোকানেই আছেন তো?

মণিলাল লজ্জিত সুরে বলিল, আর কোথায় যাব? আমাদের মত লোকের দোকান ছাড়া গতি কি বলুন?

না না, দোকান খারাপ কি? আপনি তো পুরনো লোক, আপনাকে তো ভালই দেবার কথা।

হ্যাঁ। তা ভাল দিচ্ছে বইকি।—মণিলাল একটা ছোট হাসি হাসিয়া বলিল, এবার পাঁচ টাকা বেড়ে পঁচাশি টাকা হ'ল। আমার মত মাইনর পাস লোকের পক্ষে আর কত হবে?

শচীকান্ত পাশ কাটাইয়া গেল।—বাসার সব ভাল তো?

ভাল—হ্যাঁ, ভালই তো। একটু জ্বর, একটু আমাশা, একটু সর্দি-কাশি তো থাকবেই।

শচীকান্ত সমবেদনায় হাসিল। বলিল, ছেলেমেয়ে যেন কটি?

তিন মেয়ে, দুই ছেলে।

ও।—বলিয়া বাক রোধ হইয়া গেল শচীকান্তের। ধীরে ধীরে বলিল, তা হ'লে তো, যা দিনকাল পড়েছে—

কি ক'রে চলে?—বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল মণিলাল।—চলে না। কিন্তু চলে। বলিয়া একটু হাসিল। বলিল, চঞ্চলা ভাল আছে?

হ্যাঁ।

ওর তো কিছু আর—

নাঃ। কিছু হয় নি। ছেলেপিলের কথা বলছেন তো?

হ্যাঁ।—এবার মণিলাল সমবেদনা প্রকাশ করিল।—আপনি তো তাবিজ-কবজ কিছু মানেন না। আমার কিন্তু ফল হয়েছে।

হাসি পাইল শচীকান্তের। বলিল, তাই নাকি? আচ্ছা, যাব একদিন চঞ্চলাকে নিয়ে।

গরিবের বাসায় যদি যান খুব খুশি হব।

•

রবিবার দিন বৈকালে চঞ্চলাকে লইয়া শচীকান্ত মণিলালের বাসায় বেড়াইতে গেল। মণিলাল সস্ত্রীক উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। আদর করিয়া বসাইয়া মণিলাল আলাপ করিতে লাগিল, আর স্ত্রী অশেষ আনন্দ ও ব্যস্ততার সঙ্গে দুইখানা পিঁড়ি পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। আলোচাল ফল মিষ্টি ইত্যাদি দুইখানা রেকাবে সাজাইয়া আনিয়া হাসিমুখে ডাকিল, দিদি, একটু আসুন।

আর আমি?—শচীকান্ত রসিকতা করিয়া আগেই উঠিয়া পড়িল।

মণিলাল বলিল, একটুখানি পুজোর প্রসাদ।

চঞ্চলাও উঠিয়া শচীকান্তের পাশের পিঁড়িতে বসিল।

শচীকান্ত খাইতে খাইতে বলিল, কি পূজো ?

মণিলাল ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া অবশেষে হাত দুইটা কচলাইয়া সঙ্কোচের সঙ্গে বলিল, পূজো মানে, কালী-বাড়িতে পূজো পাঠানো হয়েছিল। মানে, ছোট বাচ্চাটার মুখে একটু মায়ের প্রসাদ আনিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তো কিছু করবার উপায় নেই।

ও, অন্নপ্রাশন ?

হ্যাঃ, এর নাম আবার অন্নপ্রাশন !—মণিলাল লজ্জিত কিন্তু খুশি সুরে বলিল, মুখে একটু প্রসাদ না দিলে নয়, তাই আর কি !

ফিরিবার পথে শচীকান্ত বলিল, মণিবাবুর মাইনে কত জান ?

কত ?

পঁচাশি টাকা। শতকরা সের-দরে মণিবাবুর হিসেব বার করা শক্ত। ছটাকে গিয়ে পড়ল কিনা।

চঞ্চলা মুখের একটা ঝামটা দিয়া কহিল, কি এক ছাই কথাই যে শিখেছ ? বুলি হয়েছে একটা !

মাস শেষ হইলে ভৃত্য কাঞ্চা ষোল টাকা বেতন চাহিয়া লইল। তিন দিন পরে একটা নূতন ফ্লাইং শার্ট আর একটা হাফপ্যাণ্ট কোথা হইতে লইয়া আসিল। আর দিন তিনেক পরে সেগুলি ধোবার বাড়ি দিয়া ধোয়াইয়া ইস্তিরি করাইয়া আনিয়া রাখিয়া দিল। আর দিন তিনেক পরে একদিন বৈকালে শচীকান্ত চা খাইতে খাইতে লক্ষ্য করিল, কাঞ্চা তাড়াতাড়ি মাথায় একটু জল বুলাইয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে হাফপ্যাণ্ট পরিয়া ফ্লাইং শার্টটা গায়ে দিয়া মাথায় পরিপাটি সিঁথি বাগাইয়া কাঞ্চা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বলিল, আমাকে তিনটা টাকা দিতে হবে।

কেন ?

আজ টকি দেখতে হোবে।

তাই নাকি ?

হাঁ।

টাকা তো নেই এখন।

তা হ'লে ছ টাকা দিতে হোবে।

শচীকান্ত আর বাক্যব্যয় না করিয়া দুইটা টাকা দিয়া দিল।

কাঙ্কা চলিয়া গেলে শচীকান্ত চোখ টিপিয়া চঞ্চলাকে বলিল, কেমন?

চঞ্চলা ঝাঁকিয়া উঠিল, তুমি আশকারা দিয়েই তো ওর মাথাটা খাবে।

শচীকান্ত বৃথা মনে করিয়া চুপ করিয়া গেল।

রবিবার দিন গরমে ঘরে টিকিতে না পারিয়া শচীকান্ত বাহির হইয়া আসিল। কাঙ্কা মেঝের উপর চিত হইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। মাথার নীচে বালিশ নাই। নাকের উপর মাছি।

শচীকান্ত চঞ্চলাকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইয়া বলিল, ষোল টাকার সুখ দেখেছ? দেখ। মোটে ষোল টাকার। শতকরা সের-দরে—

চঞ্চলা ভেংচি কাটিয়া চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে হিমুর চিঠি আসিল। সে আসিতেছে। স্টেশনে থাকিতে হইবে। শচীকান্ত স্টেশনে গেল। হিমু আসিয়াছে। কিন্তু একা।

বাড়িতে আসিয়া চঞ্চলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হিমু অনেকক্ষণ শুধু কাঁদিল। কোন কথার জবাব দিল না।

পরে বলিল সব কথা। মরিয়া গেলেও অমন স্বামীর ঘরে সে আর যাইবে না। বাহিরে যেখানে যা খুশি করিত সে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু যে দিন হইতে তাহার নিজের ঘরে তাহার চোখের সামনে অপরকে লইয়া—

বলিতে বলিতে আবার কাঁদিয়া ফেলিল হিমু।

শচীকান্ত চঞ্চলার দিকে একবার মাত্র তাকাইয়া দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

রবীন্দ্রনাথের একটি গান শোনবার পর

ভাষা নয়, ভাষা নয়, সুর দাও, দাও শুধু সুর—
আমার সমস্ত প্রাণ প্লাবনের বেগে ভেসে যাক,
নিঃসীম সীমার মাঝে প্রসারিত সুচির সুদূর
নৈকট্য-নিবিড়ে এই জীবনের গূঢ় স্পর্শ পাক।
মহাকাল বন্ধু ব'লে আজ যেন ধরা দিল বুকে
বিপুল প্রাণের মূর্তি দেখা দিল স্বচ্ছ মহিমায়
আত্মার হারাল সীমা, সীমাহীন কি মিলন-সুখে
জাগিল বোধন-বাণী জীবনের অস্ফুট সীমায়।
কত দূরে যেতে পারি ? নিয়ে যাবে আরও কত দূরে ?
সত্তার গভীর লোকে আত্মার এ কোন্ পরিচয় ?
আপনার সীমা নেই এই বাণী বেজে ওঠে সুরে
পাশে পাশে জন্মমৃত্যু চিরকাল লীলার সময়।
আমার সমস্ত কথা শূন্যে মিলে যাক ধীরে ধীরে
স্বপ্রকাশ প্রাণবাণী দেখা দেয় আত্মার তিমিরে॥

অসিত কুমার

সংবাদ-সাহিত্য

ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল এমন লক্ষ্যহীন অনির্দিষ্ট অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয় নাই। ১৯৪৭—১৫ আগস্টের পূর্বে দলে দলে দলাদলি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতভেদ যতই থাকুক না; নেতারা ত্যাগ ও লোভ, সহস ও ভয়, বর্জন-প্রতিরোধ ও আবেদন-নিবেদনের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে ঘন ঘন যতই কেন স্থান পরিবর্তন করুন—সকলেরই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা—মায়ের মুক্তি। যদি সিপাহী-বিদ্রোহের দিন হইতে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের হিসাব ধরি, তাহা হইলে ১৮৫৭ হইতে ১৯৪৭—এই নব্বই বৎসর কালের মধ্যে ভারতগৌরব ও মাতৃ-মুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সন্তানদের মধ্যে মান-অভিমান, পার্শ্ব-পরিবর্তন, পরস্পর-বিমুখতা, জুতা-ছোঁড়াছুঁড়ি, ছোরা-মারামারি, এমন কি ইংরেজের আদালতে মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত বহু হইয়াছে, স্রোত থামিয়া

যায় যায় হইয়াছে; কিন্তু তখনই এক এক ভগীরথের সাধনায় বিপ্লবের নবমন্দাকিনীধারা প্রবল বেগে নামিয়া আসিয়া সকল বিরোধ, সকল নিশ্চেষ্টতাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার স্থির লক্ষ্যে সকলে হাতধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই নব্বই বৎসরকে যদি দুই অর্ধে বিভক্ত করি তাহা হইলে বলিতে পারি, প্রথমার্ধের সঞ্জীবনী-মন্ত্র ছিল—"গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়", এবং শেষার্ধের মন্ত্র ছিল—"বন্দে মাতরম্"। তখন পরাধীন ভারতে "ফরেন পলিসি"র বালাই ছিল না, বিশ্বের মুখ চাহিয়া আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় নাই। তখন খুঁটিনাটি লইয়া ঘরে ঘরে বিবাদ ছিল, কিন্তু বাহিরের পোশাক ও আচরণ লইয়া ঘরে কলহ-কোন্দলের সূত্রপাত হয় নাই; বাহিরে জাহির করিবার জন্য দেশে দেশে ঘাঁটি স্থাপনেরও প্রয়োজন ছিল না; ভারতমাতার বহিষ্কৃত ও পলাতক সন্তানেরাই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া দরিদ্র লাঞ্ছিত হৃতসর্বস্ব ভারতের প্রতীকরূপে নিজেদের মৃত্যুপণ একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষকে সর্বত্র পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; লালা লাজপৎ রায়ের নির্বাসন হইতে সুভাষচন্দ্রের পলায়ন পর্যন্ত এই একই ইতিহাস। ইঁহারা বিদেশে বসিয়া বুকের রক্তে মায়ের পূজা করিয়াছেন; গরিব দেশের অর্থে কর্মহীন নিরুদ্যম বিলাসের পঙ্কে কখনই নিমজ্জিত হন নাই।

বাহিরে যাহা মনোহারী নয়নসুখকর পুষ্পরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার মূল এই ভারতের মাটিতেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রিভি-কাউন্সিলের রায়ে মামলা জিতিয়া যাঁহারা সর্বপ্রথম ভারত-তালুকের দখল লইয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় হইলেও শিক্ষাগুণে বিদেশী-ভাবে অনুপ্রাণিত। তাই দীর্ঘকালের বেহাত সম্পত্তি হাতে পাইয়া প্রথমেই যাহা করা উচিত ছিল—ঘর সামলানো, তাহা না করিয়া তাঁহারা বাহিরের কুটুম্বিতা বজায় রাখিবার দিকে বেশি দৃষ্টি দিলেন; বাহিরের চাকচিক্য তত্ত্বতালাস মানসম্ভ্রম তাঁহাদিগকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল। ফলে ঘরের বিপুল জনসাধারণের সামনে তাঁহারা কোন নূতন আদর্শ স্থাপন করিলেন না। কোনও নূতন লক্ষ্যে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন না। তাহারা যুদ্ধশেষে সৈন্যদের মত

লক্ষ্যহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়া অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পতিত হইল।

*　　*　　*

ইহাই বর্তমান ইতিহাস, এবং এই ইতিহাস গৌরবের নয়। বিভক্ত বাংলায় দুই ভাগের কোটি কোটি লোক যে সর্বনাশের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা ইন্দোনেশীয় সফরকে বড় করিয়া দেখেন, ভারতবর্ষে এখন তাঁহারাই প্রধান। আকাশের আকর্ষণে ধরাপৃষ্ঠ হইতে উর্ধোত্থিত হইয়া ত্রিশঙ্কু হইতে আজ পর্যন্ত অনেকেই ভারতবর্ষের মানুষকে দোটানায় ফেলিয়া বিহ্বল ও বিভ্রান্ত করিয়াছেন, এখন সেই বিহ্বলতা ও বিভ্রান্তির চরম পরিণতি দেখিতেছি। প্রতিক্রিয়া যে না হইয়াছে তাহা নয়। দিল্লীর তখ্‌ত-তাউসের আশেপাশেই গোপনে ও প্রকাশ্যে ঘোরতরভাবে মুক্তিকামুখী ব্যক্তিরাও দল বাঁধিতেছেন। কেহ কেহ দোটানার আকর্ষণ সহিতে না পারিয়া ছিটকাইয়া বাহির হইয়াও আসিয়াছেন। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন লইয়া যে অভিমান ও মনোমালিন্য দৈনিক-পত্রের পৃষ্ঠায় এবং বেতারযন্ত্রের মুখরতায় ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেছি, তাহাতেও শেষ পর্যন্ত সেই "ফরেন পলিসি"র দোহাই পাড়া হইতেছে। সম্মুখে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন। আজিকার এই মনকষাকষি সেদিন যে চরম বিরোধে পরিণত হইবে, তাহার আভাসও দেখা যাইতেছে। সাধারণ মানুষ অন্নহীন বস্ত্রহীন, এই দলাদলিতে রস পাইবার মত মনের অবস্থা তাহাদের নহে। তাহারা সুতরাং নিদারুণ হতাশায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং যে হতাশার মধ্যে পড়িলে সতীসাধ্বীও সতীধর্মে জলাঞ্জলি দেয় সেই হতাশার সুযোগ লইয়া নবসাম্যবাদ ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তা ও কল্পনাকে অধিকার করিতেছে।

*　　*　　*

সাবধান ও সতর্ক হইবার এই সময়। কিন্তু নেতা কোথায়? যে নেতা বিদ্যার অহঙ্কারে বা শক্তিমদমত্ততায় অথবা অভিমানে নাক তুলিয়া "দূর ছাই" বলিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবেন না, অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে—অশিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিত হইয়া, গ্রাম্যের সঙ্গে

গ্রাম্য হইয়া, দুঃখীর সঙ্গে দুঃখী হইয়া ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত আশ্রয় এবং পরিপূর্ণ ভরসার মধ্যে সাধারণ মানুষকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন, ভারতবর্ষে সেইরূপ নেতার প্রয়োজন হইয়াছে। ইঁহারা চোখ রাঙাইতেছেন, ধমক দিতেছেন, হয়তো হৃদয়ের আবেগে কাঁদিয়াও ফেলিতেছেন, কিন্তু সে সকলই অহমিকার লীলা। ভালবাসিয়া সকলের সঙ্গে একাত্ম হইয়া ইঁহারা সকলকে আপন করিয়া লইতে পারিতেছেন না। সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া দুইয়ের খেলা চলিতেছে—একের নয়। স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে বাংলা দেশ একবার এই অবস্থায় পড়িয়াছিল। তখন দেশপ্রাণ সর্বস্বত্যাগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার 'স্বরাজে' (১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪) মূর্খ কালিদাসের বিবাহের গল্পচ্ছলে একের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন। রাজকন্যার সমস্যা ছিল দুই, মূর্খ গোঁয়ারগোবিন্দ কালিদাস তাঁহার দুই আঙুল দেখিয়া ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া এক আঙুল অর্থাৎ তর্জনী লইয়া রাজকন্যার চোখে খোঁচা দিতে ছুটিয়াছিলেন, ফলে রাজকন্যার চৈতন্য হইয়াছিল। গল্পটি বলিয়া উপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, আজ তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে। তবেই বর্তমান এই অশান্তি এবং হতাশা হইতে আমরা উদ্ধার লাভ করিব।

তিনি বলিতেছেন—

"শুন নাই কি ঘোষণা—স্বরাজ-লক্ষ্মী স্বয়ম্বরা হইবেন? কিন্তু সম্মুখে ঘোর সমস্যা—দুই না এক। এই সমস্যা পূরণ করিতে আমাদের বড় বড় লোকেরা বা বিদ্বানেরা পারিবেন না। যাহারা মূর্খ ভবঘুরে—যাহারা যে ডালে বসে, সেই ডালই কাটে—এইরূপ আত্মভোলা লোকে ঐ সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে।

আজকাল বড় কাহারা—বিদ্বান্ কাহারা? যাহারা ফিরিঙ্গি বিদ্যায় পারদর্শী—ফিরিঙ্গি বুলি ব্যবহারে পরিপক্ক—তাহারাই বিদ্বান্। যাঁহারা ফিরিঙ্গির আশ্রয়ে ধনী মানী হইয়াছেন, তাঁহারাই এখন বড়। যাঁহারা এখন আমাদের নেতা বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদের সকলেই ঐ ফিরিঙ্গিয়ানার গুণে গণ্যমান্য হইয়া

উঠিয়াছেন। যদি ফিরিঙ্গিয়ানার পালিশ মুছিয়া দেখ ত দেখিতে পাইবে—ওঁদের উপরে চ্যাকণ চিকণ, ভিতরেতে খ্যাড়। ফিরিঙ্গি বুলিটি ছাড়িয়া দাও—আর তোমার আজকালকার স্বদেশী নেতার জিহ্বাযন্ত্রটি বন্ধ হইয়া যাইবে। ফিরিঙ্গি বিদ্যাকে সরাইয়া দাও—আর তোমার সুপরিচিত বিদ্বানেরা যে অবিদ্যার দাস, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ফিরিঙ্গির আশ্রয় কাড়িয়া লও—আর তোমার প্রসিদ্ধ বড়লোকগুলি—ছোট—অতি ছোট হইয়া যাইবে।

এই ফিরিঙ্গি-মায়া-পরিপুষ্ট বিদ্বান্ বড়লোকেরা স্বরাজ-লক্ষ্মীর সমস্যা পূরণ করিতে অক্ষম। সমস্যার প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই তাঁহাদের অক্ষমতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সমস্যাটি কি?

সমস্যা—দুই না এক? ইহার তত্ত্ব বুঝিতে গেলে প্রথমেই একটু গূঢ় কথার অবতারণা করিতে হইবে।

বস্তু এক—দুই হইতে পারে না। একই বহুরূপে দৃষ্ট হয়। সূর্য্য চন্দ্র তারা গিরি নদী সাগর পশু পক্ষী কীট মানব দেব অসুর যক্ষ রক্ষ: কিন্নর—সমস্তই সেই একের বিকাশ। অহো—কি মহদ্বস্তু, উহার অখণ্ড পূর্ণতা খণ্ডভাবে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিলসিত হইয়াছে! মুক্তি-সাধনায় ঐ সমস্যা—দুই না এক। যদি বুঝি—বস্তু একই—আর ঐ একের পূর্ণতায় জগতের দ্বৈতভেদ—অহম্-বুদ্ধির ভেদদ্বন্দ্ব মিশাইয়া দিতে পারি—তবেই সিদ্ধি লাভ হইবে।

এখন দেশের মুক্তি সাধনাতেও ঐ সমস্যা উঠিয়াছে—দুই না এক। স্বরাজ-লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরে মীমাংসা করিতে হইবে।

কালচক্রের ফেরে দূরদেশান্তর হইতে আসিয়া ফিরিঙ্গি-লক্ষ্মী আমাদের হৃদয়ে আসন পাতিয়াছে—স্বদেশ-লক্ষ্মীর আসন ফেলিয়া দিয়াছে—তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া নিজের বেশবিন্যাস করিয়াছে। আমরাও তাহার বিদেশীরূপে মুগ্ধ হইয়া আমাদের সমস্ত হৃদয়টি তাহাকে অধিকার করিতে দিয়াছি—আর ঘরের লক্ষ্মীকে ভিখারিণী করিয়া বিদায় দিয়াছি। ভিখারিণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে,—কিন্তু তাহার ক্রন্দনে আমরা এতদিন কর্ণপাত করি নাই।

কিন্তু কালের গতি বুঝি ফিরিতেছে—আমাদের হৃদয়ে বেদনার অনুভূতি জাগিতেছে। বিতাড়িতা স্বরাজ-লক্ষ্মী দ্বারে আঘাত করিতেছে—হৃদয়-যোড়া আসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। এ দিকে আবার ফিরিঙ্গি-লক্ষ্মীর গুরুভারে হৃদয় ব্যথিত প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এখন কি কর্ত্তব্য?

স্বরাজ-লক্ষ্মীর ঐ প্রশ্ন—দুই না এক? প্রশ্নের উত্তর না দিলে—লক্ষ্মী হৃদয়ের আসন গ্রহণ করিবে না। যাঁহারা আধুনিক বড়-লোক বিদ্বান্ ধনী মানী তাঁহারা বলিতেছেন, দুই লক্ষ্মীকেই না হয় রাখা যাউক। তাঁহারা বিদ্বান্ হইয়াও মূর্খ হইয়াছেন—তাঁহারা বস্তুতত্ত্ব বুঝেন না। এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। একেরই পূজা করিতে হইবে, তবে সিদ্ধি লাভ হইবে। যদি ফিরিঙ্গি-লক্ষ্মীকে তোমার হৃদয়ের কোনও স্থান দাও ত স্বরাজ-লক্ষ্মী তোমায় স্বীকার করিবে না। আর ফিরিঙ্গি-লক্ষ্মীও তোমার হৃদয় যুড়িয়া বসিয়া থাকিতে চায়—অপরকে স্থান দিতে চায় না।

আমাদের বিদ্বান্ নেতারা এই দুই না এক—সমস্যার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বড়ই গোল বাধাইয়াছেন। তাঁহারা একের স্থানে দুইকে বসাইয়া ভেদদ্বন্দ্বের সমন্বয় করিবেন মনে করিয়াছেন। উহাতে সমন্বয় হওয়া দূরে থাকুক—ভয়ানক বিবাদই বাধিয়াছে। কি সাহিত্যে—কি ধর্ম্মে—কি সমাজে—কি শিক্ষায়—কি রাজ-নীতিতে—সকল বিভাগেই স্বদেশ ও বিদেশের ভাগাভাগি করিয়া মিলনচেষ্টা চলিতেছে। খাঁটি বাংলা বহি কিন্তু উহা ফিরিঙ্গিস্থানের পিতৃভক্তি ও সত্যনিষ্ঠার আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। সুন্দর উপন্যাস—কিন্তু লেখাটা আধা ফিরিঙ্গি আধা সংস্কৃত—আর উহাতে হিন্দু ললনার চিত্রগুলি ফিরিঙ্গি ধরণের উচ্ছৃঙ্খল ভাবভাবিত। নূতন নূতন ধর্ম্ম গঠন করিবার চেষ্টা চলিয়াছে—ঐগুলিতেও স্বদেশী বিদেশী ঢঙে গড়া। সমাজ ত ফিরিঙ্গিয়ানার রসানে মজিয়াছে। জাতীয় বিদ্যালয় সকল ব্রাহ্মণের তৈয়ারি পাঁউরুটির মত—ছাঁচটা উইলসন হোটেলের কিন্তু দেশীয় তাড়িতে উহা টকিয়া উঠিয়াছে। আর রাজনীতিতে ত ঐ বিড়ালাক্ষী লক্ষ্মী ও সোণার লক্ষ্মীকে

এক আসনে বসাইবার জন্য আমাদের নেতারা কতই না প্রয়াস করিতেছেন!

একের মহিমা না বুঝিয়া দুইকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দেশের শক্তির ক্ষয় হইয়াছে—ধর্মকর্ম—শিক্ষাদীক্ষা—সমাজনীতি রাজনীতি সমস্তই মলিন ও স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে—স্বরাজ-লক্ষ্মী অস্বীকৃতা আসনচ্যুতা হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছেন। দুই না এক—এই সমস্যা যত দিন না পূরণ হয়, ততদিন স্বরাজ-লক্ষ্মীর সম্মাননা হইবে না। ঐ দেখ—যাহারা ফিরিঙ্গিয়ানার সম্পর্কে বড় হয় নাই—যাহাদের তোমরা অসভ্য বর্ব্বর বল—যাহারা ফিরিঙ্গির আলোকে ধাঁধাগ্রস্ত হয় নাই—যাহাদের ফিরিঙ্গির প্রভাবগুণে কোনও সুবিধা হয় নাই—যাহাদের হৃদয় ফিরিঙ্গি-লক্ষ্মীর চাপে প্রপীড়িত—যাহারা আপাততঃ সুখদ স্বার্থ কাটিয়া ফেলিতেছে—সেই মূর্খ কালিদাসেরাই ঐ স্বরাজ-লক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। তাহারাই তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া দেখাইতেছে—দুই নয়—এক। ফিরিঙ্গি-লক্ষ্মীকে হৃদয়ের আসন হইতে নামাইতে হইবে ও ঘরের লক্ষ্মীকে হৃদয়ে বসাইতে হইবে।

ঐ শুন লক্ষ্মীর ঘোষণা—দুই না এক? প্রশ্নের উত্তর দাও। এক—এক—এক ছাড়া দুই নয়। স্বরাজ-লক্ষ্মীকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাও—আর ফিরিঙ্গি-লক্ষ্মীকে দাসী করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর। তাহা হইলে—সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাইবে—একের মহিমায় সকল ভেদবিরোধ ঘুচিয়া যাইবে।"

বোম্বাই হইতে কুসুম নায়ার সম্পাদিত ইংরেজী সাময়িক পত্র 'ইণ্ডিয়া'র ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে উদ্ধৃতি—

Very few people know that *Subhas Chandra Bose* was ever married. It is generally believed that he remained and died a bachelor. Well it is not true. Subhas did marry—way back in 1930's. He married an Austrian girl and he had a daughter by her. The mother and daughter are both living and are in Vienna now. Unfortunately they are both extremely hard up and sometimes do not have money enough even to have a square meal. Pandit Nehru very kindly sent our roving Ambassador in Europe Sir Raghavan Pillai to contact them. He has also tried to send some financial assistance. But it is not enuogh.

Why not bring Bose's wife and child back to India. Surely Bose did enough for this country, to deserve this much consideration. That

his wife and child should be living in want and misery in a foreign land is a disgrace to us. I understand there are some diplomatic difficulties. But surely these can be overcome if we make sufficient effort.

It is a matter on which we urge the government take immediate action. Whether all of us agreed with Subhas Babu in his politics or not we cannot allow his wife and child to live in exile and without any money, help or sympathy!

১৯৪৭ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন বেলেঘাটায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন আমরা সর্বপ্রথম সংবাদ পাই, তাঁহার নিকট দিল্লীর সরকারী দফ্‌তর হইতে সুভাষচন্দ্রের পত্নী ও কন্যার নিদারুণ দুরবস্থা সম্পর্কিত চিত্র-সম্বলিত একটি পত্র আসে। মহাত্মা গান্ধী তথা ভারত সরকার যখন এরূপ সচিত্র সংবাদ পাইয়াও কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, অথবা প্রকাশ্যে কোনও বিবৃতি দেন নাই তখন স্বতই সন্দেহ করিয়াছিলাম, ঘটনা সত্য নহে। তারপর হঠাৎ কুসুম নায়ারের এই মন্তব্য। মনে হইতেছে সুভাষচন্দ্র মরিয়াও শত্রুপক্ষের উষ্মার অবসান ঘটাইতে পারেন নাই। সহানুভূতিসূচক পিঠচাপড়ানি সত্ত্বেও মন্তব্যটি সুকৌশল "ভিলিফিকেশনে"র একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। প্রসিদ্ধ 'কিম্বণ্ডিয়া'র বাবুরাও প্যাটেলের মত কোনও বিখ্যাত প্যাটেল এই সংবাদ সরবরাহের পিছনে নাই তো? কুসুম নায়ার যে ভাবে ভালবাসিয়া 'সুভাষ সুভাষ' করিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতে পারে তিনি সুভাষের দিদিমা। কিন্তু আসলে তাহা নয়, তিনি দিল্লীর রাজতথ্‌তের হোমরাচোমরা কাহারও বান্ধবী হইবেন।

—

'লোকসেবক' গতকল্য ২৮ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লোক-সেবার দ্বিতীয় নিদর্শন দিয়াছেন—"বহুশ্রুত ও বহুপ্রত্যাশিত বিশ্ববিদ্যালয়-তদন্ত-কমিটি রিপোর্টের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত" করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের হেঁটমাথা আর একটু হেঁট হইবে এই মাত্র।

আমাদের আসল বক্তব্য এই, যে কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সে কাজই হইতেছে না। অকর্মণ্যদের লইয়া বাহিরে যত সমালোচনা হইতেছে তাঁহাদের রাগ তত গিয়া পড়িতেছে নিরীহ পরীক্ষার্থীদের উপর এবং তাঁহারা ফেল করাইবার কলটিকে ততই মজবুত করিতেছেন। যে বিদ্যানুশীলন ও গবেষণার জন্য এই প্রতিষ্ঠান, তাহার

কিছু কি এখানে হয়? বাংলা বিভাগের কথাই ধরি। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের পর এই বিভাগে কি কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ হইয়াছে? রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রও তবু টাইটেল-পেজ ও ভূমিকায় চাঁটি মারিয়া কিঞ্চিৎ আওয়াজ তুলিয়াছিলেন, কিন্তু ডক্টর শ্রীকুমার? বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সর্বনাশ ঘটাইতেছে এই দিক দিয়া, টাকা আনা পাইয়ের হিসাব কিছুই নয়। এ সম্পর্কে তদন্ত কমিটি বসাইয়া অবিলম্বে পরিবর্তনসাধন প্রয়োজন।

—

বাংলা দেশে, শুধু বাংলা দেশে কেন, সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে নারী-জাতির সাধনা এখন পর্যন্ত প্রধানত পুরুষের অনুকরণেই চলিতেছে। মেয়েরা নিজেদের মত করিয়া নিজেদের কথা বড় একটা বলেন নাই। বাংলা দেশে 'শুভবিবাহ'-রচয়িত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণী ইহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তিনি অপূর্ব নিজস্ব ভঙ্গিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলার অন্তঃপুরের কাহিনী লিখিয়াছেন; রচনা যেমন নিপুণ, বর্ণনাও তেমনি যথাযথ; ফলে যে ছবি ফুটিয়াছে তাহা স্বভাবতই চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই মহিলা-শিল্পীর রচনাবলী প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের একটি লুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার করিলেন। শরৎকুমারী আজ পাঠক-পাঠিকাকে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক আনন্দ দিবেন না, জীবন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব আনন্দ দিতে পারিবেন।

—

বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভুল কোটেশন, ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি নিতান্ত দুঃখদায়ক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের দেওয়া গানের সুরে বিকৃতি ঘটানোর ফলে শ্রোতার যে দুঃখ, তাহা সত্যই অসহনীয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় এই দুঃখ কথঞ্চিৎ পূরণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে খণ্ডে খণ্ডে নিখুঁত স্বরলিপি সহ গানগুলি প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীন কাঙালীচরণ সেন হইতে আধুনিক শৈলজারঞ্জন মজুমদার পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিকারদের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এই স্বরলিপিমালার 'স্বরবিতান' নামটিও চমৎকার। এখন পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড 'স্বরবিতান' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 'বসন্ত' 'ফাল্গুনী' 'প্রায়শ্চিত্ত' 'কেতকী' 'তাসের দেশ' প্রভৃতি

গীতিনাট্যগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত, ভবিষ্যতে 'গীতপঞ্চাশিকা' 'চণ্ডালিকা' 'শ্যামা' প্রভৃতিও হইবে।

—

গত জন্মাষ্টমীর দিন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আশীতম জন্মতিথিতে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে তাঁহার 'ভারত শিল্পে মূর্তি' প্রকাশ করিয়া সকলের পক্ষে শিল্পগুরুর প্রতি কর্তব্য পালন করিয়াছেন। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে এই রচনা ও মূর্তিগুলি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এই প্রথম এগুলি পুস্তকাকারে বাহির হইল।

—

ঘোর পলিটিশিয়ান চক্রবর্তী রাজগোপালাচার্যকে সভয় ভক্তিতে দূর হইতে নমস্কার করিতাম। আনন্দ-হিন্দুস্থান-প্রকাশনীর কৃপায় তাঁহার মুখে মুখে মহাভারতের গল্পের বাংলা রূপ 'ভারত-কথা' পড়িয়া ভদ্রলোককে একান্ত আপনার বলিয়া মনে হইল। তিনি আমাদেরই গোষ্ঠীর লোক। চিরপুরাতন গল্পগুলিকে তিনি নূতন এবং অতিশয় সহজ হৃদয়গ্রাহী শিল্পরূপ দিয়াছেন। এক অবাঙালী দক্ষিণী পণ্ডিত এই বাংলা রূপ দিয়াছেন, ইহাও পরম বিস্ময়ের বিষয়। এই বইখানি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করিল।

—

'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন-সংখ্যা পূজা-সংখ্যারূপে মহালয়ার পূর্বে আত্মপ্রকাশ করিবে। প্রতি বৎসরের মত আকারে বৃহৎ হইবে, সুতরাং মূল্যও কিছু বৃদ্ধি পাইবে। এই সংখ্যার মূল্য আমরা এক টাকা ধার্য করিয়াছি। গ্রাহকদের কোন অতিরিক্ত মূল্য লাগিবে না। এজেণ্টেরা যথাসম্ভব সত্বর কত কপি চান জানাইয়া মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

—

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৭

আত্মা

ওঁ তৎ সৎ—ইহাই ব্রহ্মের নির্দেশ। ব্রহ্মের অমূর্ত রূপই সৎ। তিনিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্ রূপে বিরাজিত। তিনিই ভোক্তা-রূপে সকল ভোগ্যের অধিকারী হন। তিনিই চতুর্বিধ অন্ন (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়) জঠরাগ্নি-রূপে প্রাণ ও অপানের সহিত যুক্ত হইয়া পরিপাক করিয়া থাকেন। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। সেই আত্মা হইতে প্রাণীমাত্রের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলুপ্ত হয়। (গীতা ১৫।১৫)

ঈশ্বর ফলদাতা হইলেও তাঁহাতে বৈষম্য নাই। তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম বলিয়া পুরুষোত্তমপদবাচ্য (গীতা ১৫।১৮)। আত্মা হইতে শরীরের পৃথক্ত্বজ্ঞানই বিদ্যা। তিনি ইচ্ছাময়, "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৯)। "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং, স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।" তিনিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করেন। তিনিই স্বমহিমায় বরিষ্ঠ। অন্তর্যামী ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা এবং বিজ্ঞাতা নাই। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি অনভিধেয়।

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং ॥"

—অদ্বিতীয় তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥" (৯।৪)

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং অধিকরণ ও আধার। এই সৃষ্টি শ্রীভগবানের ব্যক্ত মূর্তি।

"আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥
(মহানির্বাণতন্ত্র ২।৪৬)

—তিনিই সর্বকারণের কারণ এবং অব্যয়।

"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥"

তিনি মাত্র এক অংশের দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। মনকে ভগবৎমুখী করার নামই সাধনা। আমাদের জীবন ভগবৎ-নিয়ন্ত্রিত। 'অহং' লুপ্ত হইলে যোগিগণের মনের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণচতুষ্টয় এবং পঞ্চ প্রাণ সহিত সুখদুঃখের এই ভোগায়তন শরীরকেই ক্ষেত্র বলা হয়। এই শরীরমধ্যে থাকিয়া যিনি 'অহং,' 'মম' এইরূপ অভিমান করেন, সেই চৈতন্যময় অব্যক্তকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। শ্রীভগবান্‌ই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। (গীতা ১৩।১) তিনিই শরীরে থাকিয়া শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক সুখদুঃখাদি ফলভোগ করেন। একমাত্র সূর্য যেমন সমস্ত জগৎকে আলোকিত করেন, সেইরূপ এক পরমাত্মাই সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। ক্ষেত্র মায়ারচিত এবং ক্ষেত্রজ্ঞ মায়াধীশ। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ—এই দুইটির পৃথক্ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। (গীতা ১৩।৩) (এই প্রসঙ্গে গীতায় ১৩।৫, ১৩।৬, এবং ১৩।৩৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য)

আমরা পূজা করি সেই অব্যক্তকেই, প্রতিমার মূর্তিকে পূজা করি না। দেহরথে সেই অব্যক্ত পুরুষই রথী। তিনি নির্লিপ্ত। ঈশ্বরের নানা বিভূতি গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্বে 'সৎ'স্বরূপ ছিল। সৎ পদার্থের উৎপত্তি অসৎ হইতে হইতে পারে না। মহাপ্রলয়ের সময়ে কেবল পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন এবং সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল। 'তিনি' এই বিশ্বের রচনা ও সংহার করেন। অব্যক্ত হইলেও 'তিনি' মায়ার দ্বারা ব্যক্ত হন। 'তিনি' জগৎপাতা, রক্ষাকর্তা, এবং কর্মের ফলপ্রদাতা। গীতায় 'তিনি' বলিয়াছেন, আমি আত্মমায়ায় লীলাদেহ ধারণ করি (৪।৬)। কেহই 'তাঁহাকে' লুকাইয়া কোনও কার্য করিতে পারে না। আত্মা বা ব্রহ্ম মনের অগোচর, অচিন্ত্য। মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ 'তাঁহা' হইতে অভিন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ জগৎটি 'তিনি' হইয়া যায়।

মন পাঞ্চভৌতিক পদার্থে নির্মিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কৃত মহাভারতের অনুবাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। মহাভারতে শান্তিপর্বে অশীত্যধিকশততম অধ্যায়ে ৩৪, ৩৫, ৩৬ শ্লোকে ভৃগু বলিয়াছেন—

"মনের চৈতন্য নাই। কিন্তু এক জীবাত্মাই এই শরীর পরিচালনা করেন এবং সেই গন্ধ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ অনুভব করেন এবং অন্য যে সকল সংযোগ ও বিয়োগ প্রভৃতি গুণ আছে, সে সমস্তও এক জীবাত্মাই অনুভব করিয়া থাকেন।"

গীতায় ৭।৪-৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই অষ্টপ্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত।" এইখানে ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতির দ্বারা গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্র বুঝিতে হইবে। ক্ষিতি = গন্ধতন্মাত্র, অপ্ = রসতন্মাত্র, তেজ = রূপতন্মাত্র, মরুৎ = স্পর্শতন্মাত্র, আকাশ = শব্দতন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চভূতের অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা। মনের কারণভূত অহঙ্কার, বুদ্ধির কারণভূত মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কারের কারণভূত অবিদ্যা। পূর্বশ্লোকে উক্ত অষ্ট বিভিন্ন প্রকৃতি 'অপরা' অর্থাৎ জড় বলিয়া নিকৃষ্ট। ইহা হইতে বিভিন্না, জীবরূপা, (চেতনময়ী) 'আমার' প্রকৃতি অবগত হও, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে। সমস্ত ভূতই এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন।

এই পাঞ্চভৌতিক দেহে সেই সর্বাঙ্গব্যাপী এক জীবাত্মাই শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চগুণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনিই এই দেহে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই জীবাত্মার বিয়োগ হইলে এই দেহে কিছুই অনুভূত হয় না। যখন পাঞ্চভৌতিক দেহে প্রকৃত রূপ, স্পর্শ ও উত্তাপ থাকে না, তখন দেহের অগ্নি নির্বাণপ্রাপ্ত হয়; সেই সময়ে জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিয়াও অবিনশ্বর বলিয়া বিনষ্ট হয় না।

বায়ু যেমন পুষ্পগন্ধ বহন করে স্থানান্তরে,
তেমনি দেহত্যাগের পরে, ইন্দ্রিয় মন দেহান্তরে
কর্মবশে দেহস্বামি-ঈশ্বর যান সঙ্গে ক'রে।

(গীতা)

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠক পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে উপাগত হইয়া মৃত জীবকে ব্রহ্মলোক প্রাপণ করে। ইহাই শারীরক মীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোক গমনের জন্য এই দেবযানপথ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণরহিত যে চিন্ময়, মুনিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়াছেন। দেহে যিনি আছেন, তিনিই জীবাত্মা। সেই জীবাত্মা নিজের সৎকর্মের গুণে সমস্ত লোকের হিতৈষী থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি জীবের গুণ। জীব-সংসৃষ্ট সত্ত্বাদি গুণ স-চেতন হয়। জীব-গুণই কার্য করে ও সকলকে কার্য করায়। পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ। দেহ নষ্ট হইলেও জীবাত্মা নষ্ট হয় না। জীবাত্মা মৃত্যুসময়ে এক দেহ হইতে অপর দেহে চলিয়া যায়। এই ভাবে জীবাত্মা মায়াবৃত হইয়া গূঢ়রূপে সমস্ত ভূতে বিচরণ করে। প্রাণিগণের শরীরে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় পরমাত্মার অংশকেই জীব বলা হয়।

অনুগীতা (৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কৃত অনুবাদ) ১৯।৪৮ শ্লোকে আছে—

"চক্ষু দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহেন। তিনি কেবল মনোরূপ প্রদীপ দ্বারাই মনুষ্যের জ্ঞাননয়নগোচর হইয়া থাকেন। তিনি সর্বত্রগামী, সর্বদর্শী, সর্বশিরা, সর্বানন, এবং সর্বশ্রোতা ও সর্বগ্রাহী। তিনি সমস্ত বিশ্ব আবৃত করিয়া আছেন। সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুই চিত্ত। জ্ঞান সেই চিত্তকে প্রকাশ করে। যখন আমরা ঘট দেখি, তখন আমাদের মন ঘটাকারে আকারিত হয়। নিদিধ্যাসন সময়ে যখন চিত্ত চিন্মাত্রে অবস্থান করে অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় আমাদের মন সেই ব্রহ্মাকারে আকারিত হইয়া যায়।"

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্তই পাঞ্চভৌতিক পদার্থে নির্মিত, তবে সূক্ষ্মতার তারতম্য আছে। কামনার বীজই শোক। ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছাই প্রাণের ধর্ম। শোক ও মোহ মনের ধর্ম। জরাই দেহের বিপরিণাম। মৃত্যুই দেহের বিচ্ছেদ।

শরীর, মন ও প্রাণের ধর্মের দ্বারা আত্মা অস্পৃষ্ট। দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, শ্রবণের যিনি শ্রোতা, মনোবৃত্তির যিনি মননকারী, বুদ্ধিবৃত্তির যিনি বিজ্ঞাতা, সেই অজ্ঞাত সাক্ষীই আত্মা। তিনি ভিন্ন সমস্তই বিনাশী। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বগত, স্থাণু এবং সনাতন, অচল। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য (গীতা ২।২৩-২৪)। প্রত্যগাত্মা সকলের অন্তর্নিহিত। ইনিই ব্রহ্মাত্মা। এই দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টি ইঁহার দ্বারাই আত্মবান্। ইঁনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া, অপানের দ্বারা অপানক্রিয়া, ব্যানের দ্বারা ব্যানক্রিয়া এবং এবং উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন। প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আত্মা সত্যের সত্য। আত্মা অতিপ্রশ্নের বিষয় নহেন। প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি অতিপ্রশ্ন্য। তিনি অন্তরবর্তীরূপে জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি অন্তর্যামী, অমৃত এবং জীবের আত্মা। তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। বাহিরের উপভোগ্য বিষয়গুলি বাসনাকারে হৃদয়ে অবস্থান করে। চিন্তা মানসী, জ্ঞান মানস। জ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষ। উপাসনার দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। একাগ্রতাই সমাধিতে পরিণত হয়। উপাসনা মানে তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া। চিত্তকে বিষয়শূন্য করিয়া স্থির করিতে হইবে। বিচিত্ররূপিণী মায়া ব্রহ্মদ্বারা সৃষ্ট বলিয়াই ব্রহ্মকে গুণযুক্ত দেখা যায়। তিনিই উপাস্যরূপে সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ এবং সর্বরস। অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হয়। সুপ্ত ব্যক্তি যেরূপ জাগরিত হয়, অব্যাকৃত জগৎও সেইরূপ নামরূপাকারে ব্যাকৃত হয়। সুষুপ্তিকালে প্রাণ জাগরিত, কিন্তু জীব নিদ্রিত। নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রাণের কার্য। কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা এবং ভয়, এই সমস্ত লইয়াই মন। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এবং এই অন, এই সমস্তই প্রাণ। এই দেহ ইহাদেরই বিকার। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে (১০।৩।৩।৬-৮) মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তাহার বাক্ প্রাণে, মন প্রাণে, চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে লীন হয়। যখন জাগ্রত হয়, তখন প্রাণ হইতেই এইগুলি পুনরুৎপন্ন হয়। বুদ্ধির ধর্ম তাঁহাতে আরোপিত হয় বলিয়াই তাঁহাকে সক্রিয় মনে হয়। বুদ্ধি স্বপ্নাকারে পরিণত হইলে আত্মা তদ্রূপেই

প্রতিভাত হইয়া এই জাগ্রতকালীন জগৎকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধিসদৃশ হন। বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ আত্মার স্বপ্ন ও জাগরণ হয়। কাচের ভিতরকার আলো যেরূপ তাহার আবেষ্টনকে জ্যোতির্ময় করে, আত্মজ্যোতিও সেইরূপ বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সচেতনপ্রায় করে।

চিত্ত কি এবং তাহার ধর্ম সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে ৭ম অধ্যায় ১ম খণ্ডে যাহা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"চিত্তই কোনও বিষয় অনুভবকারী। উপস্থিত বস্তু সম্বন্ধে যথাকালে যথোচিত চেতনাখ্য অন্তঃকরণবৃত্তি বা অনুভূতি এবং অতীত ও অনাগত বস্তুর প্রয়োজন নিরূপণ করিবার যে সামর্থ্য, তাহাই চিত্তের ধর্ম। চিত্ত সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে প্রথমে সঙ্কল্প করে, তার পরে সে চিন্তা করে, পরে বাক্‌কে পরিচালিত করে।"

কর্ম ও কর্তার সম্মেলন হইলে কর্মফল উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণ চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট। মনই আত্মা। মনই ব্রহ্ম। আত্মবিৎ শোক অতিক্রম করেন। আগে চিন্তা, তার পর বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার। অতএব মন শ্রেষ্ঠ। শব্দার্থজ্ঞানের দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান হয় না। আত্মা শব্দটিও লক্ষণা অবলম্বন না করিয়া বাক্য-মনের অগোচর আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান দিতে পারে না। প্রতিমাকে যেমন বিষ্ণুবুদ্ধিতে উপাসনা করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতে 'নাম'কে উপাসনা করা হয়। (স্থূল মূর্তিকে ব্রহ্মবোধে ভক্তিসহকারে অর্চনা সম্বন্ধে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।) 'ঋগ্‌বেদ' প্রভৃতি নামমাত্র। বাক্ নাম হইতে শ্রেষ্ঠ। যদি বাক্ না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম বা অধর্ম, সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ কিছুই বিজ্ঞাপিত হইত না।

বাক্য ও মনের সংবাদ : (অনুগীতা ২১।১৪ শ্লোক হইতে অনূদিত)

"একদা বাক্য ও মন উভয়ে ভূতাত্মা জীবের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'বিভো, আমাদের উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?'...বাক্ বলিলেন, 'মন, তুমি শ্রেষ্ঠ কিসে? তুমি যাহা চিন্তা কর, আমি তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি, সুতরাং আমি তোমার কামধুক্, অতএব তোমার চেয়ে

আমি শ্রেষ্ঠ।' মন কহিলেন, 'মদ্ভিন্ন তো নাসা গন্ধ, রসনা রস, চক্ষু রূপ, ত্বক্ স্পর্শ, শ্রোত্র শব্দ গ্রহণে সমর্থ হয় না; যে জন্মান্ধ, তাহার মন আলোকের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মন রূপরসাদি বিষয় জানিতে পারে।' শেষ সিদ্ধান্ত হইল যে, বাক্ যখন মনের নিকট আসিয়া থাকেন, তখনই মন উচ্ছ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া বাক্য কহিয়া থাকে। বাক্ দ্বিবিধ—ঘোষিণী এবং অঘোষা। অঘোষা বাক্ হংসমন্ত্রস্বরূপ। ঘোষিণী অপেক্ষা অঘোষা বাক্ শ্রেষ্ঠ। উত্তম-অক্ষরশালিনী ঘোষিণী বাক্ অর্থ প্রকটন করিয়া থাকেন। বাক্ সূক্ষ্ম ও স্পন্দমান।

চিত্তের ক্রিয়া:

উপসংহারে পাতঞ্জলদর্শন হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম:—বাহ্য-ব্যাপারবিমুখকারিণী মনোবৃত্তির নাম ধৃতি। চিত্তকে এই ধৃতির অনুগত করিতে হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি জড়বর্গরূপ ক্ষেত্র। কৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার গীতায় এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মনের সমস্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার: (১) প্রমাণ, (২) বিপর্যয়, (৩) বিকল্প, (৪) নিদ্রা, এবং (৫) স্মৃতি।

(১) প্রমাণ—ইন্দ্রিয়োপলব্ধ বিষয়ে মনের অনুভববিশেষ।

(২) বিপর্যয়—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তিভেদে মিথ্যাজ্ঞান।

(৩) বিকল্প—শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ অর্থবাদশূন্য চিন্তাবিশেষ। যেমন অশ্বডিম্ব, বন্ধ্যাপুত্র শ্রবণে একটি অলীক চিন্তার উদ্রেক হয়।

(৪) নিদ্রা—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি—এই বৃত্তিনিচয় যখন তমোগুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না।

(৫) স্মৃতি—পূর্বানুভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধের নাম যোগ অর্থাৎ সঙ্কল্পাদি ত্যাগ করিলেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হয়।

চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ—এই পাঁচটি অবস্থা। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি অতিক্রম করিয়া যোগারূঢ় হইতে হয়।

গীতায় আছে, মানুষের যখন চিত্ত প্রসন্ন থাকে, তখনই তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নির্মল হইলেই সত্য, মিথ্যা, হিতকর, সুখকর, দুঃখকর এবং অপমানজনক বিষয়ে বোধ জন্মে। মলিনচিত্ত ব্যক্তিদের ভ্রান্তি ঘটে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতনী

কয়েক দিন পূর্বে দীর্ঘকালসঞ্চিত পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হাতের লেখা কয়েকটি পৃষ্ঠা আবিষ্কার করিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র চিঠির কাগজে বিভিন্ন হাতে লেখা কবিতার পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি—তন্মধ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা পাঁচটি পৃষ্ঠা। স্মৃতি-সমুদ্র আলোড়িত হইল। মনশ্চক্ষুতে পুরাতন দিনটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম :—

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর। 'শনিবারের চিঠি' বৎসর-কালের অজ্ঞাতবাসের শেষে ৩২।৫।১ বীডন স্ট্রীটে সদ্য-স্থাপিত নিজস্ব ছাপাখানা "শনিরঞ্জন প্রেস" হইতে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে (আশ্বিন, ১৩৩৮)। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় পাকাপাকি রকম ডেরা বাঁধিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'-আপিসে প্রত্যহ নিয়মিত আড্ডা জমিতেছে—প্রায় নন্-স্টপ ; তবে তেজটা সন্ধ্যার ঝোঁকেই বেশি। দীর্ঘ বিরোধের পর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়াছে। তিনি প্রায় আসিতেছেন এবং হাসি গান ও পানের পিকে আসর সরগরম করিয়া তুলিতেছেন ; পাশেই অবস্থিত চায়ের দোকানটি কাজেই দ্রুত কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমাদের ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইডের কাজ করিতেছেন। মনিটার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' আপিসের চাকুরি অন্তে বৈকালে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের মুখে দৈনিক রোঁদ সারিয়া চলিয়া গেলে আমাদের নিশীথ মজলিস বসিত, শত্রুরা অন্যায় করিয়া বলিত—ভৈরবী-চক্র। নলিনীকান্ত সরকার প্রায়শই প্রথমার্ধের উৎসাহ বর্ধন করিয়া দ্বিতীয়ার্ধে কাটিয়া পড়িতেন, রাত্রির গভীরতার সঙ্গে আমাদের

সাহিত্য-সাধনা নিবিড়তর হইত, পাশেই দুই হাতের বস্ত্রহীন ছাপাখানায় কম্পোজের কাজ চলিতে থাকিত।

একদিনের বৈকালিক সভা, তারিখ ঠিক মনে নাই; এইটুকু স্মরণ আছে—১৯৩০-এর অসহযোগোত্তর-আন্দোলন প্রশমনের জন্য সরকার কি একটা কঠিন আইন জারি করিয়াছেন, সেই দিন প্রাতেই দুঃসংবাদ দৈনিকপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্র মৈত্র খালি গায়ে একটি মোটা কম্বল চাদরের মত জড়াইয়া খবরের কাগজ বগলে প্রবেশ করিলেন, হাতে কলেজ স্ট্রীট প্রাঙ্গণ হইতে সদ্য-কেনা একটি বই—রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনী ও অনেকগুলি কৌতুকাবহ পাদপূরণ-কবিতার সংগ্রহ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নূতন মেরুন-রঙের ক্রাইসলার গাড়ি হইতে তাম্বূলরাগরঞ্জিতবক্ষ কাজী নজরুলের প্রবেশ এবং হুঙ্কার, "দে গরুর গা ধুইয়ে"। এটি তাঁহার সন্ধ্যা-ভাষায় চায়ের হুকুম। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পাশের দোকান অভিমুখে ছুটিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও কম্বলের খোলস ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার মুখখানা বজ্রবর্ষী মেঘের মত থম্‌থম্‌ করিতেছিল। চা আসিতেই সর্বাগ্রে একটি বাটি টানিয়া লইয়াই তিনি বোমার মত ফাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, এবার এই নতুন নাগপাশের জ্বালায় ছেলেরা আর কেউ বাঁচবে না। আমরা চায়ের বাটিতে হাত রাখিয়া প্রশ্নাতুর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতেই তিনি বজ্রনির্ঘোষে নূতন আইনের সংবাদ ঘোষণা করিয়া টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, প্রতিবিধান চাই। নিশ্চেষ্ট ব'সে থাকবে তোমরা! নজরুল এই অবসরে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত বইখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, বেশ, কাজে লেগে পড়া যাক। রসসাগরের পাদপূরণ-পদ্ধতিতে আমরা এর প্রতিবাদ করি এস। বলিয়াই তিনি শুরু করিলেন—

পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ
ভাগো ভাগো, মীন-বৎস!

আমরা জুড়িয়া দিলাম—

আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য।

সকলের সমবেত চেষ্টায় শেষটা এইরূপ দাঁড়াইল—

ফেলিয়া খ্যাপ্‌লা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই কাৎলা,
চুনোপুঁটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাৎলা।
পুকুরের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশ্‌টে গন্ধে,
এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলের পিঁঠানো রন্ধ্রে।
লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বটিতে;
অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়ায়ে
ভরিবে কোঁচড়ে কটিতে।
কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মরিয়া যাইবি তরিয়াই।

এই পাদপূরণ-খেলায় রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ অনেকখানি প্রশমিত হইলে তিনি প্রস্তাব করিলেন, এই পংক্তিগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কবিতা লেখা হোক এবং তা কাগজে প্রকাশ করা হোক।

আবার উৎসাহের সঙ্গে বসা গেল, এবার কাগজ-কলম লইয়া। শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা হইতে একে একে অনেকেই সরিয়া দাঁড়াইলেন। সঞ্চিত পাণ্ডুলিপি আজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরে প্রমাণ দিতেছে যে, কাজী নজরুল ও আমরা শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিলাম। যে দুইটি 'মহাকাব্য' রচিত হইয়াছিল, তাহা তখন প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই, না, পুলিসের ভয়ে প্রকাশ করা হয় নাই, আজ তাহা মনে নাই। এইটুকু মনে আছে, 'জেলে' শব্দের দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জনার তারিফ সকলেই করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে শুধু পুরাতন দিনের ইতিহাস হিসাবে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি দুইটি হুবহু মুদ্রিত করিলাম।—

বেড়াজাল

পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ,
ভাগো ভাগো মীন-বৎস !
আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য ।
ফেলিয়া খ্যাপ্‌লা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই-কাৎলা,
চুনোপুঁটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাৎলা ।
পুকুরের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশ্‌টে গন্ধে,
এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলের গিঁঠানো রন্ধ্রে ।
চটিয়াছে আজ জেলেরা ভীষণ,
সেদিন নাকি রে দৈবাৎ
এড়াইতে জাল রুই গোটা দুই
লাফ দিয়েছিল দুই হাত ;
লাফের সময় লেগেছিল চাপ
তলপেটে এক জেলিয়ার,
সজ্ঞানে নাকি 'পুকুরলাভ' রে
হ'ল সে জেলের ছেলিয়ার ।
নাহিকো বাঁচোয়া, আজিকে প্যাঁচোয়া
জাল বিছায়েছে জেলে তাই,
শান্ত-শিষ্ট লেজ-বিশিষ্ট !
উঠিস্ নে আর ঠেলে ভাই !
লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বঁটিতে,
অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়ায়ে
ভরিবে কোঁচড়ে কটিতে ।

বিশ-শ সনের গিঁট দেওয়া জাল
গাব দিয়ে মাজা তায় রে,
এ জাল ছিঁড়িতে হবি পয়মাল
চুপ ক'রে মরি আয় রে!
কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মরিয়া যাইবি তরিয়াই।
রোহিত-মৃগেলে ভয় নাই বাবা
হউক যতই বড় সে,
আগেভাগে মাথা-মোটা কাৎলারা
খাবি খেয়ে মর মর সে!
ওরা অহিংস জলান্দোলন
করিবে খানিক খুব জোর,
মাগুর, সিঙ্গি, ট্যাংরা ও কই—
ইহারাই মেছো জোচ্চোর
হউক না চুনো, কণ্টকিত যে
উহাদের ক্ষুদে অঙ্গ,
কাঁটা মারিয়াই লুকায় গর্তে,
মরিতেও করে রঙ্গ!
কান্‌কো বাধিয়া ধরা প'ড়ে গেলে
তবুও ধরিতে ডর পায়,
আঁশ-বঁটি দিয়া কুটিয়া উন্থনে
চড়ালেও তবু তড়্‌পায়!
চুনো পুঁটি সব ভয় আমাদেরি
উহাদের সাথে মোরা যে
নিষ্কণ্টক—লাফাতে জানি না
তবুও উঠিব তরাজে।
নদীর পাশেই আটঘাট-বাঁধা
আমাদের পুষ্‌করিণী,

ঢোকে নাকো যেন বেনোজল সাথে
কুম্ভীর-হাঙ্গরিণী !
খেত আমাদেরে, সেই সাথে সাথে
দু-একটা জেলে-বৎস
ধরিয়া খাইত ! দাঁত বের ক'রে
হাসিত চিতল-মৎস্য !

কাজী নজরুল ইসলাম

মৎস্যগন্ধার আবেদন

মৎস্য পুরাণে লিখেছিল কবে
মৎস্য-বন্দ্য কে এসে,
ঘটেছিল যাহা এ মৎস্য-দেশে
একদা নিশীথে, খেয়ে সে
আসিল যতেক জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য,
পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল হাঁকে—
ভাগো ভাগো মীন-বৎস।
কে হাঁকে ? হাকিছে মাছের জননী
অভাগী মৎস্যগন্ধা—
হাঁকে আর কাঁদে, ভাবে হ'ত ভাল—
যদি হইতাম বন্ধ্যা !
ফেলিয়া খ্যাপ্‌লা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই কাৎলা,
চুনোপুঁটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাৎলা।
পুকুরের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশ্‌টে গন্ধে,
এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলের পিঁঠানো-রন্ধ্রে।

লোলুপ হইয়া জেলের ছেলেরা—
জাল ফেলিয়াছে পুকুরে,
রাগেরও কি যেন ঘটেছে কারণ ;
শুনিনু সেদিন দুপুরে—
ফেলেছিল জাল, এড়াইয়া জাল—
হতভাগা ছেলে রোহিতে,
লাফ দিয়ে পেটে হানিল আঘাত—
সে কোন্ জেলের, শোণিতে
রাঙা হ'ল কালো পুকুরের জল—
তারি শোধ নিতে জেলেরা
আজিকে এসেছে রুদ্র মুরতি—
চুপ ক'রে থাক্ ছেলেরা।
লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বঁটিতে,
অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়ায়ে
ভরিবে কোঁচড়ে কটিতে,
কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মরিয়া যাইবি তরিয়াই !
দুষ্টামি বাছা কে ঢোকাল শিরে—
মায়ের আদরে বাঁচিয়া—
কাদা আর জলে পার যত দিন
বেড়াও কুঁদিয়া নাচিয়া।
দেখ তো, কাতলে মৃগেলে তাহারা
হিংসা করে না কাহারে
জলের উপরে নির্ভয়ে থাকে—
লুকায় না পাঁক-পাহাড়ে !
যত গোল কর মাগুর সিঙ্গি
ট্যাংরা ও কই তোমরা—

সোজাপথে তোরা চলিলি না আজো—
পিছে পিছে মুখ গোমড়া
করিয়া ফিরিস, সুবিধা পেলেই
কুচ ক'রে কাঁটা ফুটায়ে
জেলের অঙ্গে, কোন্ সে গর্তে
থাকিস নিজেরে গুটায়ে।
আমি জানি তোরা দুষ্টপ্রকৃতি—
শিখেছিস কাছে গরিলার—
নতুন পন্থা—গোপনে থাকিয়া
মারিয়া শত্রু মরিবার!
তোদের জন্যে বৃথা মার খায়
চুনো পুঁটি রুই কাৎলা—
মার খেয়ে খেয়ে হ'ল বুঝি পুরু
তাদের চামড়া পাৎলা!
যা হবার হ'ল, চুপ ক'রে থাক্
লাফাস না বেশি বাইরে—
শোন্ অভাগিনী জননীর কথা—
রাত বেশি আর নাই রে।
এ-কোণে ও-কোণে চারি কোণে ঘুরে
ভাবিল মৎস্যগন্ধা—
দুরযোগ হেরি মনে হয়, ভাল
হ'ত আমি হ'লে বন্ধ্যা।

—

প্রশ্ন

হাত-বদলের কুজ্ঝটিকায়
আসলের দামে মেকিও বিকায়,
তিনটি বছর গেল, ভগবান,
এখনো যাবে না কুয়াশা কি?
গুরুর দোহাই চলে কদ্দিন,
আসছে প্রলয় উঁচিয়ে সঙিন—
সিংহ সাজিয়া দেখাইবে ভয়
এখনো হুক্কাহুয়ারা কি?

জাতীয় ঐক্য

ভারতে জাতীয়তা-বোধের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ইহা ধিকিধিকি জ্বলিয়া স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগেকার কালে লোকে নিজের দেশ বলিতে গ্রামকে বুঝিত। তাহার পর ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধভাব বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে একজাতীয়ত্বের আকর্ষণ, অর্থাৎ সারা ভারতই আমার দেশ—এই বোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আজ যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর বঙ্গ বিহার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশকে এক-একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইতেছে, তখন সারা ভারতের আকর্ষণ ভুলিয়া মানুষ আবার একান্তভাবে নিজেকে বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, তামিল বা অন্ধ্র বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে অসুবিধাও ঘটিতেছে। বাঙালীর রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে অপরে তাহার জন্য তত মাথা ঘামায় না; বাঙালীর রাষ্ট্রে উৎসাহী কমিউনিস্ট-মতাবলম্বীর উপদ্রব বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে অপরে অল্প বিচলিত হয়, বাংলা দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি নদীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কোন অংশে যদি বাঁধ বাঁধিতে হয় তবে তাহাতে বাধা দিবার জন্য অছিলার অভাব হয় না। প্রত্যেকেই নিজের স্বদেশকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ভারতমাতা এই টানাটানির ফলে মারা যাইতে বসিয়াছেন। কথায় বলে, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। আমাদের দেশমাতৃকার এখনও গঙ্গাপ্রাপ্তির সময় হয় নাই, কারণ তিনি এক মতে ছেচল্লিশ বৎসরে পড়িয়াছেন (স্বদেশী-যুগ হইতে ধরিলে) অপর মতে তিরানব্বই বৎসরে পা দিয়াছেন (সিপাহী-বিদ্রোহ হইতে গণনা করিলে)। যত বয়সই ধরি না কেন, মাতৃদেবীকে গঙ্গাযাত্রা করানোর সময় সত্য সত্যই আসে নাই। তথাপি ছেলেদের অনাদরের ফলে তাঁহার অবস্থা কিঞ্চিৎ কাহিল হইয়াছে। এ অবস্থায় কি করা যাইতে পারে?

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও অঞ্চলে অঞ্চলে ভেদাভেদ আছে। বাভেরিয়া, প্রুশিয়ার মধ্যে যেমন প্রভেদ, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের মধ্যেও তেমনই কিছু কিছু প্রভেদ বর্তমান। কিন্তু এই সকল প্রভেদ সত্ত্বেও

ব্রিটিশ বা জার্মান জাতি একতার বলে, অর্থাৎ জাতীয়তার ধর্মকে আশ্রয় করিয়া, শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইউরোপের জাতীয়তাবাদের মূলে যুদ্ধের দামামার আওয়াজ বড় জোর শুনিতে পাওয়া যায়। অপরে আমাদের শত্রু, আমাদের দুর্বল মনে করিয়া বিশ্বের সকল জাতি আমাদিগকে পিষিয়া মারিতে চায়—এইরূপ ধুয়া তুলিয়া, অর্থাৎ মানুষের মনে অবস্থিত ভয় এবং আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিকে ভিত্তি করিয়া আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে এক প্রকার জাতীয়-ঐক্যবোধ গড়া যে সম্ভব, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু এরূপ রাজসিক ঐক্যকে টিকাইয়া রাখিতে হইলে সব সময়ে রাজসিক আয়োজনেরও প্রয়োজন। অর্থাৎ সকল সময়েই কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের মনে যদি এই আশঙ্কা বর্তমানে থাকে যে, তাহাদের বিপদ আজও দূর হয় নাই, তবেই ওইরূপ জাতীয়-ঐক্যের বোধও বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে। বলাই বাহুল্য যে, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বহু জাতি এইরূপে স্বীয় শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু ভয়ের বশে যে জাতীয়-ঐক্য বর্ধিত হয়, তাহাকে কখনও সুস্থ বস্তু বলা যায় না। শান্তির সময়ে পরস্পরের মধ্যে যদি কোনও অন্তর্নিহিত ঐক্য রচিত হয়, যাহাতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা সত্ত্বেও এক দেশের মানুষ অপরকে নিজের গোষ্ঠীর বলিয়া মনে করে, আপন বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে সে ঐক্য স্বাস্থ্যের লক্ষণ হয় এবং মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বরং বর্ধিত করে।

ভারতবর্ষের মানুষ ইংরেজের সঙ্গে যত দিন লড়িয়াছে, তত দিন তাহাদের মধ্যে যে পরিমাণ ঐক্যের বোধ ছিল, আজ তাহা নাই। তাই বলিয়া ভয় পাইবারও কোন কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তানের বা অপর কোনও দেশের সহিত আমাদের লড়াই বাধিতে পারে, এইরূপ একটা রব তুলিয়া যদি ঐক্যবোধের সঞ্চার করা হয়, তবে একদিন সেই প্রতিজ্ঞাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য সত্য সত্যই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেও হইবে। কেহ কেহ

ইউরোপীয় আদর্শে জাতীয়তার পূজা সম্পাদনের জন্য মনে মনে হয়তো কামনা করেন, হিট্‌লারের মত দুর্ধর্ষ ডিক্টেটর আসিয়া পিটাইয়া যদি এই বহুধাবিভক্ত জাতিকে এক করিয়া দিত, তাহা হইলে ভারত একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারিত; তাহাই আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায়। বাড়ির কাটারি, খুন্তি, বঁটি সব ফেলিয়া সকল লোহাকে যুদ্ধের আগুনে পিটাইয়া যদি ধারালো তলোয়ারে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে সেই শাণিত অস্ত্রের বলে আমরা ভারতবাসীরা একটি শক্তিমান জাতিতে পরিণত হইতে পারি।

কিন্তু ঐক্য কি ফুলের মালায় হয় না? ফুলের মালায় ফুলের বর্ণ বা গন্ধ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক মালায় তো তাহাদের গাঁথা যায়। অবশ্য ফুলের মালা যুদ্ধের অস্ত্র নয়, সেই মালার দড়ি দিয়া শত্রুকে ফাঁসি দেওয়া যায় না সত্য, কিন্তু সকল সময়ে অপরকে ফাঁসি দিতে হইবে বা তাহাদের মারিতে হইবে—এ 'গেল গেল' ভাবই কি সভ্যতার লক্ষণ?

ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয়, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে যদি ভাষা সাহিত্য শিল্প শিক্ষা অর্থাৎ এক কথায় সংস্কৃতি-গত বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়, তাহা ভাল ভিন্ন মন্দ নয়। প্রধান কথা হইল, এই সংস্কৃতিগুলিকে অন্তর্নিহিত কোনও সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ করিতে হইবে, এবং পরস্পরের মধ্যে খাদ্য-খাদক অথবা দুইটি হুলো-বিড়ালের মধুর সম্পর্ক দূর করিতে হইবে। যদি সে চেষ্টা সফল হয়, যদি বিভিন্ন প্রদেশ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখে, যদি তাহারা পরস্পরের ভাষা অধ্যয়ন করে, পরস্পরের আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তবে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিপদের আকর না হইয়া স্বাস্থ্যের বস্তু হইয়া উঠিবে।

যুদ্ধের ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে নয়, পরস্পরের প্রতি ভালবাসার মুক্ত আকাশতলে ভারতের ঐক্য পুষ্পসম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠুক, ইহাই আমাদের সকলের অন্তরের কামনা হউক।

২রা অক্টোবর, ১৯৫০ শ্রীনির্মলকুমার বসু

উৎসব-দেবতা

স্বপ্ন নাকি সফল হয়েছে, উৎসবের ধুম প'ড়ে গেছে তাই। বাজছে কাড়া-নাকাড়া, বাজছে জগঝম্প। লাফাতে লাফাতে চাকিগুলোর ঊর্ধ্বশ্বাস উঠছে, তবু থামবার উপায় নেই। উৎসব যে, থামলে চলবে না। লাফাতে লাফাতে বাজিয়ে চলেছে তাই ক্রমাগত। থামলেই চাকরি যাবে। বাঁশি-ওলা, কাঁসি-ওলা, শানাই-ওলা, সকলেরই ওই এক দশা।

শব্দ হচ্ছে ভয়ঙ্কর। সাধারণ লোকের কথাবার্তা শোনা যায় না। উৎসবের হট্টগোলে চাপা পড়েছে সব।

উৎসব-দেবতা স্থাপিত হয়েছেন উৎসব-মণ্ডপে। সাড়ম্বরে সজ্জিত করা হয়েছে তাঁকে—বহু বর্ণে, বহু অলঙ্কারে। বহু ঋত্বিক, বহু পুরোহিত, বহু অধ্বর্যু, বহু উদ্‌গাতা সমবেত হয়েছেন। উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ চলছে, আরতি হচ্ছে নানা ভঙ্গীতে, শঙ্খঘণ্টার রোলে দশ দিক প্রকম্পিত হচ্ছে মুহুর্মুহু।

কবি দাঁড়িয়ে ছিলেন নাটমন্দিরের প্রাঙ্গণে উৎসব-দেবতার প্রতিমূর্তির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে। তিনি অনুভব করলেন, উৎসব-দেবতা আসেন নি। যাকে ঘিরে কোলাহল চলেছে, তা খড়-মাটি রঙ-রাংতার পিণ্ডমাত্র, উৎসব-দেবতা আবির্ভূত হন নি ওর মধ্যে।

অভিমান হ'ল কবির।

স্বপ্ন সফল হয়েছে, অথচ উৎসব-দেবতা এলেন না কেন?

নিজের ঘরে গিয়ে তিনি সেতারে বাজাতে লাগলেন ভৈরবী। ভৈরবীর করুণ-মধুর সুরের পথ ধ'রে গেলেন তিনি উৎসব-দেবতার দ্বারে।

এস এস, কবি এস, তোমারই আশাপথ চেয়ে আছি।

উৎসব-দেবতা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন কবিকে।

কবি বললেন, আমাদের উৎসবে গেলেন না কেন আপনি?

ডাক তো আসে নি। কোন সাড়াশব্দও তো পাই নি।

এত ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া বাজছে—

কই, শুনি নি তো

তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন।

হ্যাঁ, কতকগুলো লোক লম্ফঝম্প করছে বটে, কিন্তু উৎসবের বাজনা তো শোনা যাচ্ছে না!

কবিও এগিয়ে গিয়ে দেখলেন। ঠিকই তো, লাফালাফিটাই দেখা যাচ্ছে কেবল, সুর শোনা যাচ্ছে না।

উৎসব-দেবতা মৃদু হেসে বললেন, আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। ও তোমাদের মণ্ডপেই নিবদ্ধ আছে। উৎসব কিন্তু জমেছে এক জায়গায়। চল, সেইখানে যাই।

কোথায়?

চলই না।

নিমন্ত্রণ পাই নি যে!

এখনই পাবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চারিদিক। একটা অদৃশ্য আনন্দ-সমুদ্র যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

হ'ল তো? কত সহজ সরল ওদের নিমন্ত্রণের ভাষা! চল, যাই।

এই বেশে?

এই বেশে কি যাওয়া যায়! বেশ পরিবর্তন করতে হবে। ওরা যেন বুঝতেও না পারে যে, আমরা গেছি ওরা নিমন্ত্রণও করেছে অজ্ঞাতসারে, আমরা উৎসবে যোগও দেব ' দর অজ্ঞাতসারে। জানাজানির টানাটানিতে উৎসব যায় মাটি হয়ে।

গলির গলি, তস্য গলি। সেখানে নর্দমার ধারে খেলা জমেছে দুটি শিশুর। ধুলো স্তূপীকৃত ক'রে মন্দির তৈরি করছে তারা। ধুলোর মন্দির ধূলিসাৎ হচ্ছে বার বার। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি জমছে না একটুও, ভেসে যাচ্ছে অনাবিল হাসির তোড়ে। ঠিক তাদের পিছনে নামহীন এক বন্যগুল্মে ফুল ফুটেছে একটি, আর সেই ফুলকে ঘিরে গুঞ্জন ক'রে চলেছে এক মধুকর। গাছের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদের টুকরো এসে পড়েছে তাদের উপর।

"বনফুল"

কালপুরুষ

তা হ'লে আপনি মত দেবেন না?

শেষবার উত্তর দেবার আগে মাথা তুলে তাকালেন নৃসিংহ ভট্টাচার্য পঞ্চতীর্থ। বাঙ্‌লা-চন্দ্রদ্বীপের স্বনামধন্য পণ্ডিত। তাঁর পূর্বপুরুষকে পরম সমারোহে সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ব-বাংলার গৌরবসূর্য মহারাজা দনুজমর্দন দেব।

শুভ্র পুষ্ট দুটি ভ্রূরেখা। ত্রিসন্ধ্যা প্রাণায়াম, উপবাস আর সংযমে মেদবিহীন ঋজু শরীর। পুরনো হাতীর দাঁতের মত গায়ের রঙ, বুকে ক্ষার দিয়ে যত্ন ক'রে কাচা পরিচ্ছন্ন উপবীত। সাদা ভ্রূর নীচে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল তাঁর দৃষ্টি, স্থির হয়ে রইল বহু ধূপের গন্ধে আরক্তিম তাঁর চোখ।

না, তোমরা আমায় ক্ষমা কর।

বেশ।—তারা উঠে চ'লে গেল।

যাক। পারবেন না নৃসিংহ, কিছুতেই পারবেন না। বাষট্টি বছর ধ'রে যে পথ দিয়ে চ'লে আসছেন, আজ সে পথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব। স্পষ্ট বক্তব্য, নির্ভুল লক্ষ্য। কিছুতেই ব্রতচ্যুত হতে পারবেন না তিনি, ভুলতে পারবেন না অমরেশ্বর ভট্টাচার্য সার্বভৌমের তিনি বংশধর।

বিপর্যয়, হ্যাঁ, বিপর্যয় বইকি। কিন্তু দুর্যোগের পরে নতুনতর দুর্যোগ তো এসেছে ইতিহাসেও। ব্রাহ্মণের পথ কোনদিনই মসৃণতা নিয়ে গ'ড়ে ওঠে নি। পাঞ্জা লড়তে হয়েছে 'নাস্তিকাঃ বেদনিন্দকাঃ' বৌদ্ধের সঙ্গে; মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে ইসলামী তলোয়ারের। তাঁরই এক অন্যতম পূর্বপুরুষের কাহিনী ভেসে উঠল মনের সম্মুখে। মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করেছে মন্দির, আর মন্দিরের ভেতর বিষ্ণুবিগ্রহ বুকে আঁকড়ে ধ'রে উবুড় হয়ে প'ড়ে আছেন তিনি। তলোয়ারের ঘায়ে তাঁর মাথা ছিটকে চ'লে গেল, অথচ তখনও তিনি বিগ্রহ ছাড়লেন না।

অসম্ভব। পারবেন না নৃসিংহ।

যুক্তি? হ্যাঁ, যুক্তি তোমাদের অনেক আছে। জীবনের এই বাষট্টি বছর ধ'রে অনেক যুক্তি আমি শুনেছি, অনেক তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠেছে আমার চারপাশে। কিন্তু সে তো বুদ্বুদের মত। আজকের

তর্ক কাল থাকে না, এ দিনের যুক্তি দশ বছর পরে যেমন ফাঁকা, তেমনই মিথ্যে হয়ে যাবে। বুদ্বুদ! কিন্তু সত্য? হিমালয়ের মত চিরদিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সায়ন-বিচারে, শাঙ্কর-ভাষ্যে, জীমূতবাহনের দায়ভাগে, পারাশরীয় সংহিতায়। তোমাদের পুঁথি দু দিন পরে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে পারে কি কোনও মহামারী, কোনও রাষ্ট্রবিপ্লব, কোনও বিপর্যয়, কোনও কীটের উপদ্রব। না, অসম্ভব।

প্রণাম ভট্টাচার্য মশাই।

চমকে তাকালেন নৃসিংহ। ফরিদপুর ক্যাম্পের বনমালী।

জয় হোক।—অভ্যস্ত গলায় নৃসিংহ আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন।

এই সন্ধ্যেবেলায় এখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে যে?

ভাবছিলাম।—সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন নৃসিংহ।

তা বটে। ভাবনার কি আর শেষ আছে? বনমালী দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কি ছিল কি হয়ে গেল! কোথায় প'ড়ে রইল দেশ, পদ্মার জল, ধানের ক্ষেত, চোদ্দপুরুষের ভিটে। আজ এই প'ড়ো মাঠের ভেতর সাপ আর বুনো শূয়োরের সঙ্গে দিন কাটাতে হচ্ছে।

হুঁ।—নৃসিংহ আরও সংক্ষেপে সাড়া দিলেন। না, ওর জন্যে আর দুঃখ নেই। ওই পুরনো ব্যথার কাঁদুনি গেয়ে লোকের সহানুভূতি কাড়তে আজ সম্মানে বাধে। যা গেছে, তা যাক। যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই নিলেন। ভবিতব্যং ভবত্যেব। কিন্তু—

একটা খবর শুনলাম ভট্টাচার্য মশাই।—বনমালী একটু এগিয়ে এল; গলায় কৌতূহলী অন্তরঙ্গতার সুর। নৃসিংহের কপাল কুঁচকে উঠল। জানেন, কি বলবে বনমালী। এক প্রশ্ন, এক জিজ্ঞাসা। মুহূর্তের জন্যে ভুলতে দেবে না। চারদিক থেকে আঘাত করতে থাকবে, ক্রমাগত তাঁর মনকে রক্তাক্ত ক'রে তুলতে চাইবে।

শুনলাম, বলাই দাসের ছেলের সঙ্গে নাকি বিয়ে হচ্ছে উমেশ চক্রবর্তীর মেয়ের?

বনমালীর গলার অন্তরঙ্গতার সুর আরও নিবিড়, কৌতূহলের আঘাতটা আরও নিষ্ঠুর। নৃসিংহের সারা শরীর অসহ্য রাগে জ্বালা ক'রে উঠল।

শুনেইছ যদি, তবে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করা কেন ?

কিন্তু আপনার মত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত থাকতে এমন অনাচার ! নমঃশূদ্রের ছেলের সঙ্গে বামুনের মেয়ের বিয়ে !

এতক্ষণের সংযম হারিয়ে ফেটে পড়লেন নৃসিংহ।

তার আমি কি করব ? আমার কি দায় ? সমাজ যদি উচ্ছন্নে যায়, তা হ'লে আমি কেন একা বাঁচাতে যাব তাকে ? যা খুশি তোমাদের কর। আমাদের তো ফুরিয়ে এসেছে, এখন দুটো দিন শান্তিতে কাটিয়ে মরতে দাও।

হকচকিয়ে গেল বনমালী। পিছিয়ে গেল দু পা।

ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায় !—বিড়বিড় ক'রে বলতে চাইলে বনমালী, দেখবেন, প্রলয় হয়ে যাবে এর পরে। আচ্ছা, চলি এখন, প্রণাম।

চেষ্টা ক'রেও এবার নৃসিংহ আর আশীর্বাদ করতে পারলেন না। একটা পাথরের টুকরোর মত জিভটা তাঁর আটকে রইল তালুর সঙ্গে। পাট কেটে নেওয়া ফাঁকা ক্ষেতের তরল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বনমালী মিলিয়ে গেল।

প্রলয় হয়ে যাবে !—ঠাট্টা ক'রে বললে নাকি বনমালী ? অপমান ক'রে গেল তাঁর লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণত্বকে ?

অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রলয় আসবেই। রাঙা ঘোড়ায় আগুনের তলোয়ার হাতে নামবেন কৃষ্ণবর্ণ বিরাট পুরুষ যুগাবতার। চারদিকে তারই সূচনা। আজকের এই বিপাক তারই পূর্বাভাস।

একটা কাঠের চৌপাই টেনে ঘরের বারান্দায় বসলেন নৃসিংহ।

রাত্রির মাঠ, তিন দিকে আকাশের তারা ছুঁয়ে আছে। শুধু উত্তরে হিমালয়ের কয়েকটা জংলা পাহাড় থাবা গেড়ে ব'সে আছে বিভীষিকার মত। একটু দূরে এক সার শিমুলগাছের পাড়ির নীচে পাহাড়ী নদীর জলটা প'ড়ে আছে মরচে-পড়া ইস্পাত যেন। কোথাও কোথাও বেনার বন আর বিলিতী পাকুড়ের ঝাড়। দূরে দূরে ক্যাম্পের আলো। ঢাকা ক্যাম্প, ময়মনসিংহ ক্যাম্প, ফরিদপুর ক্যাম্প। বরিশাল ক্যাম্পের দাওয়া থেকে আগুন-ঝরা চোখে তাকিয়ে রইলেন নৃসিংহ।

দেশ নয়, মাটি নয়, ক্যাম্প। জংলা প'ড়ো মাঠে উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন। তবু এই মাটি থেকেই ফসল তুলেছে ক্যাম্পের লোক, হাজার হাজার মণ ধান, রূপোর মত সাদা পাট। এখন কালো মাটিতে আলুর চারা উঠছে, আখের ক্ষেত ভরন্ত হয়ে উঠছে টাটকা মিঠে রসে। সব হারিয়ে আবার নতুন ক'রে ফিরে পেতে চাইছে মানুষ। ভাল কথা, খুব ভাল কথা। নিজের ভাগে যে জমি পড়েছিল, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও কড়া রোদে দাঁড়িয়ে তার তদারক করেছেন নৃসিংহ, সাহায্য করেছেন কাজে, কাস্তে হাতে ধানও কেটেছেন। তাতে তাঁর অমর্যাদা হয় নি, বরং সম্মান বেড়েছে, বেড়েছে প্রতিষ্ঠা; লোকের চোখ শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে চকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু—

কিন্তু এ কি? এ কোন্ দিকে চলেছে সব? দেশ গেছে ব'লেই কি সব যাবে? যে হিন্দুত্ব রাখবার জন্যে এমন ক'রে পালিয়ে আসতে হ'ল, সে হিন্দুত্বকেই কি এমন ক'রে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে?

তাকিয়ে রইলেন নৃসিংহ। মস্তিষ্কের ভেতর কোনও কিছুর ছাপ পড়ছে না, কোনও জিনিস ধরা দিচ্ছে না স্পষ্ট আকার নিয়ে। সব আবছা, সব এলোমেলো। দমকা হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে যাওয়া কাশফুলের মত লক্ষ্যহীনভাবে সব ভেসে ভেসে চলেছে। পাহাড়, রাত্রি, তারা; বেনাবন, শ্রীহীন শিমুলগাছের সার, নদীর জল। আর— আর ক্যাম্পে ক্যাম্পে আলো। ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল।

দেশচ্যুত, কেন্দ্রচ্যুত। তাই ব'লে গোত্রচ্যুত হবে? যে ধর্মের জন্যে এতবড় দুঃখবরণ, তাকেই এইভাবে দ'লে ফেলবে পায়ের তলায়?

কত রাত হয়ে গেল, সন্ধ্যা-আহ্নিক করবে না আজ?

স্ত্রী সুবাসিনীর গলা। রান্না শেষ ক'রে উঠে এলেন।

গোটা দশেক তো প্রায় বাজে;—আকাশের তারার দিকে চোখ মেলে সুবাসিনী বললেন, এখনও আহ্নিক করবে না? খাবে কখন?

দৃষ্টি ফেরালেন না নৃসিংহ।

আজ আর খাব না। আজকে আমার উপবাস।

উপবাস? কিসের উপবাস?—বিদ্যানিধির মেয়ে, পঞ্চতীর্থের স্ত্রী

সুবাসিনী আশ্চর্য হয়ে বললেন, আজ কোন তিথি আছে ব'লে তো জানি না।

নৃসিংহ উত্তর দিলেন না।

তবে আজ সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি?

হ্যাঁ, নাস্তি, চিরদিনের মত নাস্তি।—নৃসিংহ চেঁচিয়ে উঠলেন, তোমরা কি সবাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে? বিশ্রাম দেবে না, ছুটি দেবে না—একটা রাতের জন্যে? যাও, চ'লে যাও আমার সামনে থেকে।

কি হয়েছে বল তো?

কি হবে?—অগ্নিগর্ভ গলায় নৃসিংহ বললেন, কি আবার হবে? আকাশ থেকে কালপুরুষ নামছেন, দেখতে পাচ্ছ না? যাও, এখন আমায় বিরক্ত ক'রো না।

তোমার খুশি।—সুবাসিনী নিঃশব্দে চ'লে গেলেন।

আবার ব'সে রইলেন নৃসিংহ। অসম্ভব, কিছুতেই মানতে পারবেন না নৃসিংহ। তাঁর পূর্বপুরুষের ছবিটা মনে আসছে। বুকের নীচে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরা বিগ্রহ, মৃত্যুর পরে হাতের মুঠি লোহার মত কঠোর হয়ে উঠেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরের পাষাণ, একরাশ শুভ্র গন্ধরাজ রক্তজবার রঙ ধরেছে। নাঃ, কিছুতেই নয়।

চারটি ক্যাম্পের মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু টিলার ওপর সভাঘর, ধর্মগোলা। মস্ত টিনের আটচালা। ওখানে দু-তিনটে বড় বড় আলো জ্বলছে। কিছু কিছু লোকও জড়ো হয়েছে যেন। কি আজ? কোন সভা নাকি? কেউ তো কোন খবর দেয় নি?

মরুক গে। কোনও কৌতূহল নেই আর। যা খুশি ওরা করুক।

দূরে কাছে শেয়ালের ডাক উঠল। সত্যিই রাত হয়েছে তা হ'লে। নাঃ, আর অপেক্ষা করা যায় না। আহ্নিকটা তা হ'লে সেরে ফেলাই উচিত।

ভারগ্রস্ত দেহটাকে টেনে উঠে দাঁড়ালেন নৃসিংহ।

রাতে আর ঘুম আসছে না।

মাথার মধ্যে যেন ঘুণে বাসা করেছে, কুরকুর ক'রে কেটে চলেছে অবিশ্রাম। কানের মধ্যে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। ঘাড়ের তলাটা গরম হয়ে উঠছে। ঘুম আর আসবে না।

নৃসিংহ বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

আরও কালো, আরও নিস্তব্ধ। পাহাড়ের গায়ে একটা আগুনের সাপ খেলছে লকলকিয়ে। দাবানল জ্বলেছে। দৃশ্যটা নতুন নয়, আরও কয়েকবারই চোখে পড়েছে নৃসিংহের। একটা শুকনো বাতাস এল। সেই বাতাসে নৃসিংহ স্পষ্ট অনুভব করলেন, শুকনো ডাল-পাতা পোড়ার গন্ধ। পুড়ে যাচ্ছে জীর্ণতা, সঞ্চিত আবর্জনা। নতুনের অগ্নি-অভিষেক নিচ্ছে অরণ্য।

ক্যাম্পগুলোর আলো নিবে গেছে। ঘুম। মধ্যরাত্রির ঘুম নেমেছে। কিন্তু—

নৃসিংহের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এত রাতেও কেন অত আলো জ্বলছে সভাঘরে? কেন অত মানুষের ভিড় ওখানে? এত রাত অবধি কিসের সভা?

হঠাৎ একটা সন্দেহের চাবুক পড়ল গায়ে। চিন্তা চমকে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। হতে পারে। হ্যাঁ, খুব সম্ভব।

আকাশের দিকে তাকালেন নৃসিংহ। ঝলমলে নক্ষত্র-জ্বলা নির্মল আকাশ। এক টুকরো মেঘের চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। ধূমকেতুর জ্যোতিঃপুচ্ছ তো দেখতে পাচ্ছেন না, এমন কি একটা উল্কাও তো ঝ'রে পড়ছে না কোথাও! কালপুরুষ ঢ'লে পড়ছেন পশ্চিমে, যেন বিষের জ্বালায় আচ্ছন্ন। কোনও অমঙ্গলের আভাস কোথাও ফুটছে না, কোথাও নেই প্রলয়ের সঙ্কেত।

নৃসিংহ দাঁড়িয়ে রইলেন। হৃৎপিণ্ডের ওপর যেন একটা পাথরের ভার চাপানো। শুকনো বাতাসে বুকটা ভ'রে উঠছে না, যেন ভেতর থেকে সব ফাঁকা ক'রে উড়িয়ে নিচ্ছে।

যদি তাই হয়? সত্যিই যদি তাই হয়? এই রাত্রে যদি এমন একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘ'টে যায়? আর ভাবতে পারলেন না।

অস্থির পায়ে নেমে পড়লেন, হেঁটে চললেন সভাঘরের দিকে। পায়ের তলায় পাট-কাটা ক্ষেতের তীক্ষ্ণাগ্রগুলো বিঁধতে লাগল, টেরও পেলেন না নৃসিংহ।

যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে দেখে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সব।

নমঃশূদ্র পাত্রের হাতে ব্রাহ্মণের মেয়ের হাত সমর্পিত, এক ছড়া কুন্দফুলের মালা দিয়ে জড়ানো। শাস্ত্রমতেই বিয়ে হচ্ছে। সম্প্রদান করছে উমেশ চক্রবর্তীরই ছেলে। মন্ত্র পড়ছে ময়মনসিংহের ইঁচড়ে-পাকা কলেজে-পড়া ছোকরাটা, সব ব্যাপারে সকলের আগে যে নাক গলায়।

সমাজ গেল, ধর্ম গেল।—বলতে চাইলেন নৃসিংহ। তাড়িয়ে দাও, আড়িয়ে দাও ওদের সমাজ থেকে।—বলতে চাইলেন চীৎকার ক'রে।

কিন্তু কাকে সমাজচ্যুত করবেন নৃসিংহ? সমস্ত সমাজ যে তাঁরই বিরুদ্ধে। সবাই জুটেছে, সবাই। একজনও বাদ নেই। সমস্ত ক্যাম্প থেকে সকলে এসেছে, এমন কি বনমালীও। আর—আর তাঁকে দেখে ছায়ার মত পেছনে লুকিয়ে গেল কে মেয়েদের আড়ালে? সুবাসিনী? তবে কি সুবাসিনীও এসেছে?

মুহূর্তের আচ্ছন্নতা কেটে গেল সকলের মনের ওপর থেকে। কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না, কেউ আর লক্ষ্য করল না নৃসিংহকে। একসঙ্গে সকলে মিলে অস্বীকার করল তাঁর অস্তিত্বকে। ইঁচড়ে-পাকা ছোকরাটা আবার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করল—উঁচু গলায়, স্পষ্ট, নির্ভয়ে।

নিজের চারদিকে তাকালেন নৃসিংহ। একা, নিঃসঙ্গ। কাকে সমাজচ্যুত করবেন তিনি? আজ নতুন সমাজ তাঁকেই বিচ্যুত ক'রে দিয়েছে। দনুজমর্দন দেবের সভাপণ্ডিতের বংশধর নৃসিংহনাথ ভট্টাচার্য পঞ্চতীর্থ আজ নিজেই সমাজ থেকে নির্বাসিত।

অসম্ভব! এ হতে পারে না।

নৃসিংহ কপালের ঘাম মুছলেন। নতুন সমাজ। নতুন মাটি। নতুন মানুষ। সব আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। বারটি বছর পরে তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু পৃথিবী? পৃথিবী তো সেই সঙ্গে থেমে দাঁড়াবে না।

নৃসিংহ এগিয়ে গেলেন। স্থির গলায় ছোকরাটাকে বললেন, ওঠ, যথেষ্ট হয়েছে। আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। ও-রকম অশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত পড়তে নেই, ওতে মন্ত্রের গুণ থাকে না।

মাথার ওপর তারা-ঝলমলে নির্মল আকাশ। কালপুরুষ যেন মৃত্যুর আচ্ছন্নতায় ঢ'লে পড়েছে। ওদিকে পাহাড়ের গায়ে দাবানল জ্বলছে, পুড়ছে শুকনো পাতা, জ্ব'লে যাচ্ছে জীর্ণতার সঞ্চিত স্তূপ।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রাধা

আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে।
রাধা আমার রইল কোথা, গোলকধাঁধার কোন্ গোপনে।

বহুবল্লভ বৈরাগীর গানের ভাঁড়ারের প্রথম ভাঁড়ে ওই গানটি আছে। যে কোন গৃহস্থের দরজায় এসে একতারা বাজিয়ে ওই গানটি সে ধরবেই।

এ কথা কেউ বললে সে বলে, গুরু ওই গানটিই পেরথমে শিখিয়েছিলেন বাবা। ভাঁড়ারের কৌটো-বাটার পয়লা কৌটোয় আছে। ভাঁড়ার খুললেই ওই কৌটোতেই হাত পড়ে যে।

বুড়ো হয়ে এসেছে বহুবল্লভ। চেহারাখানি ভাল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ, লম্বা পাকা চুল, দাড়ি-গোঁফ কামানো; বহুবল্লভ গৃহস্থ বৈষ্ণবের ছেলে। পরিচ্ছন্ন ক্ষারে-কাচা কাপড় পরিপাটি ক'রে পরে, গায়ে দেয় একখানি চাদর, বেশ মিহি ক'রে তিলক রচনা করে, বুড়া বহুবল্লভের বয়স হ'লেও বিলাস যায় নাই। মাথায় গন্ধ-তেলও মাখে। নগরের বিলাসপরায়ণ বৃদ্ধদের সঙ্গে বহুবল্লভের তুলনা করা যায়। বিলাসপরায়ণ নাগরিক-বৃদ্ধেরা গাম্ভীর্যের মাত্রা বাড়িয়ে সম্ভ্রম দিয়ে বৃদ্ধ বয়সের বিলাসের লজ্জাকে ঢাকেন। বহুবল্লভের সঙ্গে এইখানে তাঁদের পার্থক্য, বহুবল্লভের শরমও নাই, সম্ভ্রমেরও ধার ধারে না। এ কথা ব'লে তাকে কেউ লজ্জা দিতে চাইলে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক্, বহুবল্লভ হাসে।

হাসতে হাসতেই বলে, যার যা, তা না হ'লে চলবে ক্যানে গো বাবা? মদনমোহন ছাড়া আর কাউকে রাধা দেখা দেয়? আর

মদনমোহন তো শুধু রূপ থাকলেই হয় না, মদনমোহনের বেশও তার রূপের মতন। মোহনচূড়া চাই, তা'তে থাকা চাই ময়ূরপাখা, তাও আবার বাঁকা ক'রে লাগাতে হয়, পীতধটী চাই, পায়ে নূপুর চাই, কপালে অলকাতিলকা চাই—

হ্যাঁ, মোহনবংশী চাই হাতে।

হা-হা ক'রে হেসে ওঠে বহুবল্লভ। বলে, ওখানে বহুবল্লভ টেক্কা মেরেছে বাবা। বহুবল্লভের গলাতেই আছে বাঁশী। তার জন্মে আর বাঁশের পাবে ছেঁদা করতে হয় না।

বিচিত্রচরিত্র মানুষ! লোকে বলে, অদ্ভুত! সেই প্রথম জীবন থেকেই চরিত্রে বহুবল্লভ একই রকম। মধ্যে মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শুধু হাতে-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, বাস্, নিখোঁজ হয়ে যায়। একতারা বাঁয়া আর ঝুলিটা অহরহ সঙ্গে থাকে ব'লেই ওগুলি ফেলে যায় না। ঘরে তালা ঝোলে, বাইরে উঠানেই দড়িতে কাপড় শুকায়, দাওয়ার এক কোণে খেজুরপাতার চ্যাটাই এবং মাদুরখানা ঠেসানো থাকে, ছোট একটা জলচৌকি থাকে, রান্নাঘরের দাওয়ায় এক পাশে খানিকটা রাঙা মাটি ও খানিকটা কাঁচা গোবর থাকে, উনানের পাশে ঘুঁটে থাকে, কিছু ডালপালা থাকে, লাউমাচায় লাউ ঝোলে, লঙ্কাগাছে লঙ্কা ধ'রে থাকে অজস্র, ফুলগাছে ফুল ফুটে থাকে, এমন কি ব্যবহারের জলের পাত্র ছোট মাটির পাতনাটা পর্যন্ত জলে পরিপূর্ণ থাকে। বাড়ির চারিদিকে পাঁচিল নাই, বেড়া আছে, রাস্তা থেকে বেড়ার ওপারে বাড়িখানাকে দেখে মনে হয়, মানুষটা বোধ হয় এলো ব'লে। কিন্তু কোথায় কে? এক দিন, দু দিন, তিন দিন, তিন মাস, চার মাস, ছ মাস, আট মাস চ'লে যায়, সে মানুষ আর ফেরে না। বাড়িতে ধুলো জমে, কাপড়খানা অদৃশ্য হয়, খেজুর চ্যাটাই ও মাদুরটাকে ঘিরে উইপোকার ঘর ওঠে, জলচৌকিখানাও যায়, জালাটা ভাঙে, রান্নাঘরের দাওয়ায় কাঁচা গোবর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, ঘুঁটেগুলো কাঠগুলো ধুলোয় ঢাকা পড়ে, লাউমাচার লাউ যায়, লাউডগা যায়, লঙ্কাগাছটার লঙ্কা ফুরিয়ে যায়, ক্রমে ম'রেও যায়; ফুলগাছগুলি তো যায় সর্বাগ্রে। গ্রামের লোকে বিস্মিতও হয় না,

চিন্তিতও হয় না। অঞ্চলের লোকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করে, কোথায় গেল সুকণ্ঠ সুন্দর মানুষটি!

হঠাৎ আবার একদিন দুয়ারে বেজে ওঠে একতারার শব্দ—গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও। তারই সঙ্গে বাঁয়াতেও ওঠে বার দুয়েক গুবুং-গুবুং শব্দ।

রাধে, রাধে! রাধে রাধে বল মন। রাধারাণীর জয় হোক!—এসে দাঁড়ায় সেই বহুবল্লভ। এক হাতে একতারা, অন্য হাতে বাঁয়া, পরনে পরিপাটী পরিচ্ছন্ন কাপড়, গায়ে চাদর, কপালে তিলক, সোজা সরু সিঁথি-কাটা সযত্নবিন্যস্ত লম্বা চুল, মুখে হাসি। এসেই বেশ আসন-পিঁড়ি হয়ে ব'সে কোলের উপর বাঁয়াটিকে তুলে নেয়, ডান হাতে একতারা বেজে ওঠে—গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও; বাঁ হাতে বেজে ওঠে—গুব্ গুব্, গুব্ গুবুং, গুবুং, গুবুং গুবুং। লোকে প্রশ্ন করে, বহুবল্লভ!

হ্যাঁ বাবা। ভাল আছেন?

তা আছি। কিন্তু তুমি—

আজ্ঞে বাবা, বহুবল্লভ মন্দ থাকে না। ভালই ছিলাম

তা তো ছিলে। কিন্তু ছিলে কোথা এতদিন?

এই ঘুরে এলাম দিন কতক।

দিন কতক? দিন কতক কি হে? মাস ছয়েক তো বটেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বটে।

তবে?

তবে—। হাসে বহুবল্লভ। বলে, রাধার সন্ধানে ছুটলে দিন তো দিন—মাস, বছর, জন্ম হুঁশ থাকে না বাবা। কত দিন হুঁশও ছিল না, হিসেবও নাই।

তা হ'লে তীর্থে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, তা যা বলেন। ছান, এখন গান শুনেন। বলতে বলতেই একতারা আর বাঁয়া একসঙ্গে বেজে ওঠে—গ্যাঁও গ্যাঁও, গুবুং গুবুং, গ্যাঁও, গ্যাঁও। নিজেও গান ধ'রে দেয়, আ—আহা—

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে।

তারপর পদাবলী, শ্যামাবিষয়, দেহতত্ত্ব—গানের পর গান। গানে মেতে ওঠবার আশ্চর্য ক্ষমতা বহুবল্লভের।

মিথ্যা বলে না বহুবল্লভ। সত্যটা একটু ঘুরিয়ে বলে শুধু। বৈষ্ণবী ভেকে যেমন ঢাকা পড়েছে ওর আসল চেহারাটা, তেমনই কথাগুলির উপরেও রাধানামের রঙের ছোপ প'ড়ে নগ্ন অর্থ রঙচঙে হয়ে পড়েছে—সে ঢাকা পড়ারই সামিল। কিন্তু তার জন্য বহুবল্লভের অপরাধ নাই। কেউ তাকে পরিষ্কার প্রশ্ন করলে পরিষ্কার উত্তর দিতে এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা করবে না। প্রশ্ন কেউ করে না। কারও প্রয়োজন হয় ন'। নিজে থেকে বলবে, এমন অন্তরঙ্গ এঁরা নন। তা ছাড়া অন্তরঙ্গই বা কে আছে বহুবল্লভের। আপন জন তো নাই-ই, বন্ধু বলতেও কেউ নাই। সংসারে আশ্চর্য রকমের একা। মা ছিল, অনেক আগেই সে খালাস পেয়েছে। বিয়ে করেছিল, স্ত্রী বৎসর কয়েক পরই মালাচন্দনের মালা ছিঁড়ে এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে চ'লে গিয়েছে। সুতরাং নিজে থেকে সকল কথা পরিষ্কার ক'রে বলবেই বা কাকে বহুবল্লভ?

একজন আছে সে বিভূতি দাস। বিভূতি দাসও এখানে নাই, এখান থেকে ক্রোশ ছয়েক দূরে গিয়ে বাস করছে। সে এখন ঘোর সংসারী, স্ত্রীপুত্র জমিজমা পুকুর গরু-বাছুর—অনেক কিছুর মধ্যে সে একেবারে ডুবে রয়েছে।

অথচ—। বিভূতির কথা মনে হ'লে ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসে বহুবল্লভ।

বিভূতির আসল নাম বিভূতি কর্মকার। ও-ই তাকে ওই 'মনের রাধা'র গানখানি শিখিয়েছিল।

মনের রাধা! মনের রাধা!—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বহুবল্লভ।

পরনে কালো মখমলের ঘাঘরা, লাল মখমলের জামা, মাথায় এলো-চুলের ওপর ময়ূরপাখা-দেওয়া মুকুট, হাতে কঙ্কণ, বাঁ হাতে বাজুবন্ধ তাবিজ, গলায় চিক মুক্তার মালা, পায়ে নূপুর, কপালে অলকাবিন্দু, নাকে ও মাঝকপালে তিলক, বংশীধারীর বাঁশীর সুরে পাগলিনী রাধা!

চোখ বুজলে আজও দেখতে পায় বহুবল্লভ। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গাছতলায় ব'সে চোখ বুজে সেই রাধাকে মনে পড়লেই কানে গানের সুরও বেজে ওঠে।

ও নিঠুর কালিয়া—অবলার দুখ দিলি রে নিঠুর কালিয়া !

চোখ মেলে ওঠবার জন্য প্রস্তুত হয়েও বহুবল্লভ উঠতে পারে না ; কিছুক্ষণের জন্য সর্বাঙ্গ যেন অবশ মনে হয়, দিন-দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখে সে কিছু দেখতে পায় না।

দশ বছরের বহুবল্লভ তার গ্রামের লোকের সঙ্গে রায়বল্লভপুরে বাবুদের বাড়ি যাত্রাগান শুনতে গিয়েছিল। রাধাগোবিন্দজীর দোলে যাত্রা হ'ত বাবুদের বাড়ি। অধিকারী বৃন্দাবন মুখুজ্জের কৃষ্ণযাত্রায় পালা হচ্ছিল মাথুর। সেই পালায় দেখেছিল ওই রাধাকে।

আশ্চর্য, রাধাময় হয়ে গেল সব। বাড়ি ফিরল, কেমন যেন হয়ে গেছে তখন। সাতটা দিন পর পর স্বপ্ন দেখেছিল রাধাকে। তারপর আবার সহজ হ'ল ক্রমে ক্রমে। কিন্তু যখনই শুনত কীর্তন গান, ভাগবতের কথা, রাধাকৃষ্ণের নাম, তখনই মনে প'ড়ে যেত।

বৎসর ঘুরে আবার এল দোল।

এবার সে আবার ছুটল। সেই বারই তার পালানোর শুরু। সেবার ফাল্গুন মাসে দোলের সময় নেমেছিল অকাল বাদল। শীতের আমেজ তখনও যায় নি, তার উপর বৃষ্টি, সে বৃষ্টিতে বৃন্দাবন মুখুজ্জের যাত্রা শুনতে গাঁয়ের লোকের উৎসাহ ছিল না, বৃন্দাবনের যাত্রা বাবুদের বাড়িতে তারা বিশ বছরেরও বেশি শুনে আসছে। বহুবল্লভ কিন্তু পাগল হয়ে গিয়েছিল! মাকে কিছু না ব'লেই সে সন্ধ্যের আগেই-রওনা হয়েছিল।

সেই রাধা! মাথায় এলোচুলের উপর ময়ূরপাখা-দেওয়া মুকুট, কপালে অলকা-তিলক, হাতে কঙ্কণ বাজুবন্ধ তাবিজ, গলায় চিক-মালা, সেই রাধা!

বাবুদের ঠাকুর-বাড়িতে প্রসাদ চেয়ে খেয়ে নাটমন্দিরের এক পাশে কুকুরগুলির সঙ্গে শুয়ে রাত্রি কাটিয়ে তিন দিন যাত্রা শুনে সে বাড়ি ফিরল।

যতবার রাধা আসর থেকে বেরিয়ে সাজঘরে গেল, সেও গেল তার পিছনে পিছনে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সাজঘরের সামনে ; রাধা আসরে এলে সেও এসে আসরে বসল। যাত্রা ভাঙল, সাজঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ। দলে দলে বেরিয়ে গেল যাত্রার দলের

লোকেরা ছেলেরা, তারা শোবার জন্য চ'লে গেল বাসায়, বহুবল্লভ দাঁড়িয়েই রইল টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে। কোথায় রাধা? গভীর রাত্রিতে একা পথের উপর দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে নাটমন্দিরের কোণে গুটিগুটি মেরে শুয়ে পড়ল। সকালে উঠে দেখলে, তার দু পাশে শুয়ে আছে দুটো কুকুর। উঠে আবার দাঁড়াল গিয়ে সাজঘরের সামনে, সেখান থেকে যাত্রার দলের বাসায়। সারাটা দিন ঘুরলে। কোথায় রাধা?

রাত্রে যাত্রা শুরু হ'ল। সে দাঁড়িয়ে ছিল সাজঘরের সামনে। রাধা বেরিয়ে এল। বহুবল্লভ সতেজ হয়ে উঠল, উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গিয়ে সে আসরে বসল।

পর পর তিন দিন। কিন্তু আশ্চর্য, তিন দিনই রাত্রের ওই যাত্রার আসরের রাধাকে দিনে সে যাত্রার দলের ছেলের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারে নি। এমন কি মালকোঁচা মেরে, গেঞ্জি গায়ে, মুখে অলকা তিলকা এঁকে বিভূতি পোশাক পরবার আগে বিড়ি খেতে বাইরে এসেছে, তবু চিনতে পারে নি।

তিন দিন পর যাত্রার দল বিদায় নিলে সে বাড়ি ফিরল।

ফেরবার পথে গাছতলায় বিশ্রাম করতে ব'সে দেখতে পেলে রাধাকে; সে দেখা আজও সে দেখতে পায়, সে দেখার শুরু সেই। কেঁদেছিল সেদিন বহুবল্লভ।

দুই

আজও প্রৌঢ় বয়সে বহুবল্লভ কখনও কখনও কাঁদে। কেঁদেই আবার চোখ মুছে হাসে। রাধে রাধে! মনে মনে বাল্যকালের বুদ্ধি এবং বোধের অসারতা উপলব্ধি ক'রে হাসে। রাধে রাধে!

হাসি মিলিয়ে গিয়ে আবার বহুবল্লভের মুখ কেমন হয়ে যায়। চোখে ফুটে ওঠে আকাঙ্ক্ষা-প্রখর দৃষ্টি, তার সঙ্গে যেন একটি প্রশ্নও জেগে ওঠে। দাড়ি-গোঁফ-কামানো নিটোল মুখে প্রৌঢ়ত্বের যে রেখাগুলি পড়েছে, সেই রেখাগুলি ধ'রেই অতৃপ্তির বেদনার বার্তা দেখা যায়। জীবনের যে অবিস্মরণীয় কথাগুলি সাংকেতিক অক্ষরে অদৃশ্য কালিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, অন্তরের আগুনের আঁচে উত্তপ্ত হয়ে সে লেখা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাধা কোথায়—এ খোঁজে ঘোরা তো কম হ'ল না। যাত্রার সাজঘরে রাধা নাই—এ ভুল যেদিন ভাঙল সেদিন থেকেই ঘুরছে সে।

ওই বিভূতিই তার ভুল ভেঙে দিয়েছিল, খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছিল, বলেছিল—। রাধে রাধে! বিভূতি ছিল অশ্লীল কথার ঘুঘু। যা বলেছিল তার অর্থ, যাত্রার দলে কি রাধা থাকে! রাধা রাধা—ওই দেখ দল বেঁধে রাধা চলেছে। ওরাই হ'ল আসল রাধা।

শেখরেশ্বর শিবের শিবচতুর্দশীর মেলায় ঘুরতে ঘুরতে দুজনে কথা হচ্ছিল। বিভূতির সঙ্গে তার আগেই আলাপ হয়েছে রায়বল্লভপুরের যাত্রা-গানের আসরে। তিন বছরে সাহস হয়েছিল, আলাপের পথও পেয়েছিল, রায়বল্লভপুরের ছেলেরা পান ছুঁড়ে দিচ্ছিল রাধাকে। সেও সাহস ক'রে পান ছুঁড়ে দিয়েছিল। রাধা উপেক্ষা করে নাই, পানের খিলিটি কুড়িয়ে নিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। একটু হেসেওছিল। আসরের বাইরে সাজঘরের সামনে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেই রাধা কথা বলেছিল, তুমি তখন পান দিলে না?

হ্যাঁ।

বেশ পান। কোন্ দোকানের?

আর খাবে? আনব?

আন। ওরা পান দিলে, ছাই পান। না সুপুরি, না মসলা, না তাম্বুলবিহার।

পান আনতে ছুটেছিল বহুবল্লভ।

পিছন থেকে ডেকে রাধা বলেছিল, শোন।

অ্যাঁ?

সিগরেট এনো ভাই।

সিগরেট?

হ্যাঁ। একটা সিগরেট এনো।

পাঁচটা সিগারেট এনেছিল—রেলওয়ে মার্কা সিগারেট। চার পয়সা বাক্স ছিল তখন। রাধার সাজে সেজেই সেদিন সে বহুবল্লভের গলা জড়িয়ে ধ'রে পানের দোকান থেকে আসরের মুখ পর্যন্ত গিয়ে বলেছিল, আমি বেরিয়ে এলেই তুমি উঠে এস। আচ্ছা?

পর পর তিন দিন আলাপের পর বিভূতি বলেছিল, শিবচতুর্দশীতে শেখরেশ্বর-তলার মেলায় যাবে না?

শেখরেশ্বরের মেলা!

হ্যাঁ, এই তো এখান থেকে চার কোশ পথ। ওখানে আমাদের বায়না আছে।

আসবে তোমরা? তা হ'লে আসব।

মেলায় গিয়ে দুজনে নিবিড় আলাপ হয়ে গেল। কথায় কথায় বহুবল্লভ বললে জান, রাধা সাজলে ভারি সুন্দর দেখায় তোমাকে। মনে হয় সত্যিই রাধা। তোমাদের সাজঘরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকতাম যাত্রা ভাঙলে রাধার সঙ্গে যাব ব'লে, তা তুমি পোশাক ছেড়ে বেরুলে আর—

বাকিটা বলতে দিলে না আর বিভূতি, খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বললে, যাত্রার দলে কি রাধা থাকে! রাধা রাধা! ওই দেখ না দল বেঁধে রাধা বেরিয়েছে। মেলার পথে পাঁচ-সাতটি তরুণী মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের দেখিয়ে দিলে আঙুল দিয়ে। তারপর বললে, এস, রাধাদের সঙ্গে কথা বলি।

না।—তার উপরের হাতটা চেপে ধরেছিল বহুবল্লভ।

কেন?—খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছিল বিভূতি।—ভয় লাগছে?

* * *

ভয় চ'লে গেল যাত্রার দলে ঢুকে। টানলে বিভূতি। বললে, আয় দলে, দেখবি বাঁশীর সুরে রাধা কেমন আপনি ফিরে তাকায়!

বিভূতি তখন চুম্বক আর বহুবল্লভ তখন লোহার টুকরো। বিভূতির আকর্ষণ-প্রতিরোধের শক্তি তখন ছিল না তার। তখনও বিভূতি রাধা সেজে আসরে নামলে ও সব ভুলে যেত। ঢুকল যাত্রার দলে। অধিকারী সাগ্রহে নিলেন তাকে। সুন্দর চেহারা, বাঁশীর মত কণ্ঠ। সমাদর ক'রে দলে নিয়ে অধিকারী বললেন, এক বছর পরে দেখবে তোমার কদর!

সখীর দলে নামল প্রথম। প্রথম দিন ভাল ক'রে চাইতে পারে নি আসরের দিকে। যে দিন চাইতে পারলে, সে দিন অবাক হয়ে গেল। কত চোখ জলজল ক'রে তাকে দেখছে!

তারপর—

তারপর আর ভাবতে পারা যায় না। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে চায়। একদিনের কথা মনে হ'লেই বহুবল্লভ হঠাৎ ঘাড় নেড়ে ব'লে ওঠে, দুর! যা!

বিভূতি তাকে একটা মেলার আসর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, স্টুট্ ক'রে চ'লে আয়, আর কেউ যেন না দেখে।

মেলার দোকানের সারির একটা গলি দিয়ে অন্ধকার পিছনে এসে দাঁড়াল।

কি?

এই নে রাধা।—চাপা হাসি হেসে উঠল বিভূতি।

* * *

হে—ই! হে—ই!

চীৎকার ক'রে ওঠে বহুবল্লভ। নির্জন প্রান্তরে গাছতলায় ব'সে থাকতে থাকতে চীৎকার ক'রে উঠল। রুক্ষপ্রকৃতি লাল মাটির প্রান্তর চারি দিকে চ'লে গিয়েছে; মধ্যে মধ্যে বটের গাছ এখানে-ওখানে। হঠাৎ গাছের ডাল থেকে ঝুলে ঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়ল সাঁওতালদের মেয়ে। গাছের উপর উ'ঠে সে আঁচল ভ'রে বটবিচি সংগ্রহ করছিল, চীৎকার শুনে লাফিয়ে পড়েছে। ভেবেছে, নীচের বুড়া তাকেই হাঁক মেরে তিরস্কার করছে।

কি বুলছিস?

ভুল ক'রে সোনায় না গ'ড়ে রাধাকে কালো কষ্টিপাথরে গড়লে কোন্ কারিগর? মাথায় লাল জবাফুল? অবাক হয়ে চেয়ে রইল বহুবল্লভ।

হঁকাইছিস ক্যানে তু?

গান শুনবি? গান?

হাতের একতারা বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, গ্যাঁও গ্যাও। বাঁয়াটাও বেজে উঠল, গুব গুবুর।

লে, গান কর্। লে ভাই, শুনি তুর গান। হ্যাঁ হ্যাঁ, লে, গান কর্।

আ-হা—আ—

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে।

কে জানত, এই তেপান্তরের মাঠে গাছের তলায় তাকে দেখা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল!

গান শেষ ক'রে বহুবল্লভ বললে, ফুল নিবি? ফুল?

ফুল? দে।

ভিক্ষেয় গিয়ে বাবুদের বাগান থেকে তুলে এনেছিল কটি দোলন-চাঁপা ফুল। আশ্বিন মাসের আকাশে সাদা মেঘের মত নরম সাদা ফুল। তেমনি মৃদুমদির গন্ধ।

নে। মাথার জবাফুল ফেলে দে। ছাই! ভাল নয়।

কুথা আছে ই ফুল? তুর বাড়িতে?

আছে। তোকে আমি রোজ দেব। দুপুরবেলা এইখানে থাকিস? রোজ দেব।

গান শুনাবি না? গান? ভাল গান তুর।

শুনাব। রোজ—রোজ—রোজ—

অ-ন-ন্ত-কা-ল শুনাবে সে। এতদিন তো তাকে শুনাবার জন্যই সে পথে মাঠে ঘাটে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে এসেছে।

হাতের একতারা আবার বেজে ওঠে—গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও।

মাসখানেক না-যেতেই বুড়া বহুবল্লভ আপন মনেই বলে, রাধে! রাধে! রাধে! রাধে! কোথায় রাধা? আঃ, ছি ছি ছি!

বহু দিন—বহু দিন হয়ে গেল, যাত্রার দলে থাকতেই বিভূতি তাকে একদিন মদ খাইয়েছিল। ওঃ, ওঃ! বুকটা জ্ব'লে গিয়েছিল। দেহের সমস্ত অভ্যন্তরটা একেবারে কুঁকড়ে পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। সেদিনের পর আর সে মদ খায় নি, কিন্তু এমনি ভাবে হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়।

আঃ, ছি!

বটতলার অনেকটা আগে সে অন্য দিকে পথ ভাঙে। অনেক দূর এসে একটা গ্রামের প্রান্তে পুকুরের ঘাটে এসে বসে। চোখ বন্ধ ক'রে একটা গাছে ঠেস দিয়ে ব'সে থাকে।

বন্ধ চোখের দুটি কোণ থেকে দুটি ধারা নেমে আসে।

মনে হয় গান শুনতে পাচ্ছে—

অবলায় দুখ দিলি রে নিঠুর কালিয়া—

ও নিঠুর কালিয়া—

মাথুর পালায় রাধা গান গাইছে!

অনেকক্ষণ পর উঠে ঘুরে ঘুরে এসে বাড়ি উঠল। পরের দিন-কয়েক বাড়ি থেকে বের হ'ল না। তার পরদিন বের হ'ল। এবার রায়বল্লভপুরের দিকে নয়, পথ ধরলে বিপরীত মুখে, ক্রোশ আড়াইয়েক দূরে হাটচরণপুর। রায়বল্লভপুরের পথে রাধা নাই। ভুল। ভুল। ও রাধা নয়, ও তার মরণ। ও-পথে গেলে অবধারিত মৃত্যু।

ও পথে অবধারিত ধ্বংস।

—এই কথাটা বলেছিলেন, তার গুরু সতীশ মুখুজ্জে।

যেদিন সে মদ খেয়ে ছল, ঠিক তার পরদিন মুখুজ্জে এসে পৌঁছেছিলেন। মুখুজ্জে ছিলেন দলের বাজিয়ে গিরিশ মুখুজ্জের বড় ভাই। আগে তিনিও বৃন্দাবন অধিকারীর দলে ছিলেন। বছর তিনেক আগে সন্ন্যাস নিয়ে দল থেকে চ'লে গিয়েছেন। তবুও দেশে ফিরে একবার দলের খোঁজ না নিয়ে পারেন নাই। এসেছিলেন রাত্রে। সকালে ডাকলেন বহুবল্লভকে। রাত্রের আসরে ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনে ভাল লেগেছে, আরও কিছু ভাল লেগেছে। মুখুজ্জেকে আগে দলের লোকে বলত, পাকা জহুরী। গান কার হবে, কার হবে না—এ তিনি একবার মুখ খুললেই ব'লে দিতে পারেন। নিজে সুকণ্ঠ গায়ক, তার উপর তিনি মুখে মুখে গান রচনা ক'রে গাইতেন, একেবারে আসরে দাঁড়িয়ে গান বেঁধে গান গাইতেন সতীশ মুখুজ্জে। এখন সন্ন্যাস নেওয়ার পর লোকে তাঁকে বলে—সাধক মানুষ, সিদ্ধ গায়ক। যাকে তাকে তিনি ডাকেন না। বহুবল্লভকে ডাকতেই বহুবল্লভ কেমন হয়ে গেল।

তার গায়ে যে এখনও মদের গন্ধ উঠছে! মাথা খ'সে পড়ছে! মুখ বিস্বাদ হয়ে রয়েছে! নিজের নিশ্বাসে নিজেই যে দুর্গন্ধ অনুভব করছে!

তবুও সতীশ মুখুজ্জে ডেকেছেন, না গিয়ে উপায় ছিল না। সংকুচিত হয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল না।

মুখুজ্জে নিজেই উঠে কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বোধ হয় অভয় বা আশীর্বাদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার পরিবর্তে হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, আরে রাম রাম! এর মধ্যে এ শিখলি কি ক'রে, কার কাছে? যা যা, চান-টান কর্ গে যা। আঃ, এমন সুন্দর কণ্ঠ—

লজ্জায় ম'রে গিয়েছিল বহুবল্লভ। পালিয়েই আস'ছল। মুখুজ্জে ডেকে বলে'ছিলেন, শোন্ শোন্, কত দিন ধরেছিস?

উত্তর দিতে পারে নাই বহুবল্লভ।

মুখুজ্জে বলেছিলেন, আর যেন খাস না। বুঝলি? মরবি।

বিকেলে তাকে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে শেষে বলেছিলেন, এ পথে অবধারিত ধ্বংস।

মদ সে আর খায় নি।

মুখুজ্জেই তাকে দল ছাড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোর মূলধন আছে, তোকে দিয়ে কারবার হবে। আমার গানগুলো শেখ্, আর অন্য পদও শেখ্। যাত্রার দলে থাকিস নে। মরবি শেষ পর্যন্ত। বৈষ্ণবের ছেলে, গান গেয়ে অনেক বেশি রোজগার হবে। আমারও পদগুলো থাকবে।

মুখুজ্জেই দল থেকে নিয়ে গিয়ে গান শিখিয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন, বিয়ে দিয়ে তিনিই তাকে সংসারী করে'ছিলেন।

বিয়ে ক'রে কদিন মনে হয়েছিল, পেয়েছে রাধাকে।

বউয়ের নাম ছিল কুসুম, কিন্তু ও তাকে ডাকত 'রাধে' বলে।

* * *

বহুবল্লভের মনে হয়, সে মনে হওয়া তার গুরুর মায়ায়। তিনিই তাকে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। নইলে—। হাসি দেখা দেয় বহুবল্লভের মুখে।

হাটচরণপুরে রেল ইষ্টিশান আছে। ইষ্টিশানের মুসাফেরখানায় গান গাইতে যায় বহুবল্লভ। কত মানুষ আসে যায়। গান গায় আর চারিদিকে প্রচ্ছন্ন অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে তাকায়। বার বার সে চেষ্টা করে চোখ দুটোকে ইষ্টিশানের ওপারের গাছের মাথার উপরে তুলে নিস্পলক হয়ে চেয়ে থাকতে; রোদের ছটায় ফিকে নীল আকাশের

টুকুরোটুকুর গায়ে গাছটার ওই একটা ডালের মাথার টুকরোটুকু ছাড়া বাকি সব কিছু মুছে যাক। চোখের পলক সে কিছুতেই ফেলত না। পলক পড়লেই ওইটুকু পলকেই গোটা আকাশ ফুটে উঠবে, গাছটা গোটা চেহারা নিয়ে দাঁড়াবে সামনে, গাছটার গোড়ার মাটিটুকু চারি পাশে ছড়িয়ে যাবে। নিষ্পলক হয়ে গাছের মাথার দিকে চেয়ে গান গায়।

হঠাৎ বেজে ওঠে ঝুম-ঝুম শব্দ, অথবা ঠিন্-ঠিন্ ধ্বনি, কিংবা কণ্ঠস্বর, শোন শোন! ওগো! বুকের ভিতরটা চমকে ও'ঠে বহুবল্লভের—আসরে রাধা ঢুকল! পায়ের নূপুর, হাতের কঙ্কণ ধ্বনি তুলেছে। মুহূর্ত্তে ওই চমকে তার পলক প'ড়ে যায় চোখে। চোখ যখন খোলে, তখন চোখের সামনে প্লাটফর্মের লোকারণ্য ফুটে ওঠে। তার দৃষ্টির সন্ধান, অন্ধকারে আলোর ছটার মত ছু'টে যায় এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্য্যন্ত।

কোথায় রাধা?

রাধে! রাধে! কি কুৎসিত মেয়ে! কি তেল-চকচকে মুখ, মাথার চুল বাঁধার কি বিশ্রী ভঙ্গি! আরে রাম রাম, পাশ দিয়ে চ'লে গেল, কি গন্ধ ছড়িয়ে গেল উৎকট!

তালের ফাঁক দেখে বহুবল্লভ কাঁধের গামছা টেনে নাক মু'ছে নেয়, মাথার গন্ধতেল-মাখা চুলে আঙুল ঘ'ষে নিয়ে নাকে বুলিয়ে নেয়।

আঃ, হাসছে, কি বিশ্রী দাগ-ধরা দাঁত বেরিয়েছে!

রাধে, রাধে!

কোথায় রাধা?

গুরু দেহ রাখলেন, তার কিছু দিনের মধ্যেই বহুবল্লভের ভুল ভেঙে গেল—গুরুর মায়া নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি পলক প'ড়ে কেটে যাওয়ার মত কেটে গেল। বহুবল্লভ দেখলে, কোথায় রাধা!

রাধে রাধে! কি বিশ্রী কুসুম! ঠিক এই এদের মত। কোন তফাত ছিল না এদের সঙ্গে। তবু সে নিজেকে বেঁধেছিল। গুরুর কথা স্মরণ করেছিল। মুখুজ্জে তাকে গান শেখাতে গিয়ে প্রথম শিখিয়েছিলেন ওই গানখানি—

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে
রাধা আমার কোথায় থাকে গোলকধাঁধার কোন্ গোপনে!

গুরুর কাছে ব'সে ছিলেন হেরম্ব ভট্টাজ; মস্ত বড় কালীসাধক। তিনি তামাক খাওয়া বন্ধ ক'রে সতীশ মুখুজ্জেকে বলেছিলেন, পেলি? রাধা পেলি? বামুনের ছেলে বোরেগী হলি, কচুপোড়া খেলি, তা পেলি সন্ধান?

সতীশ মুখুজ্জে বলেছিলেন, খুঁজতে খুঁজতে মিলবে। এ জন্মে না হয়, অন্য জন্মে। হেসেছিলেন।

তিন

বিভূতি এ কথা শুনে হা-হা ক'রে হেসে বলেছিল, দুর শালা! তুই কি রে! ভাগ্ ভাগ্! শালা, মানুষ হয়ে জন্মেছি—খাই দাই ঘুমুই। বেটাছেলে হয়ে জন্মেছি, মেয়েদের যাকে চোখে ভাল লাগবে তাকে পেলে আলাপ করব, আনন্দ করব, তবে জান বাঁচিয়ে বাবা, মার খেয়ে মরতে পারব না, বাস্! তুমি আমার লগনচাঁদা ভাই, তুমি যে এমনি ক'রে ঘোরো, তাকে ফুল-জল দিয়ে পূজো ক'রে পটের ছবির মতন দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে? না? কই, বল নিজের বুকে হাত দিয়ে বল।

প্রথমটা উত্তর দিতে পারে নাই বহুবল্লভ। কিন্তু কিছুক্ষণ পর স্বীকার করতে হয়েছিল তাকে। বিভূতির কাছেও স্বীকার করেছিল. নিজের কাছেও স্বীকার করেছিল, বিভূতির কথাটাই সত্য। বিভূতি আর তাতে কোথায় তফাত?

বিভূতি বলেছিল, ওরে শালা! লজ্জা হচ্ছে তোমার? কিসের লজ্জা? দুর দুর! লজ্জা-ফজ্জার ধার ধারি না বাবা।

বিভূতি সে কি হাসিই হেসেছিল। মদ খাব তো গায়ে গন্ধ উঠবে, লোকে মাতাল বলবে, ভেবে মদ খাব না? মদ খাব, খেয়ে নালাতেই প'ড়ে থাকব। বলব, হ্যাঁ, মদ খেয়েছি, নালাতে পড়েছি, তুমি না হয় থুতু দাও, না হয় এক লাথি মার। কিন্তু ওতেই যে আমার স্বর্গ-সুখ প্রভু।

বিভূতির হাতে-পায়ের ভঙ্গি এবং মাতালের অভিনয় দেখে

বহুবল্লভও প্রাণ খুলে বিভূতির সঙ্গে হাসতে শুরু করেছিল। লজ্জাই যেন দূরে পালিয়েছে সেদিন থেকে।

ওঃ ছি-ছি। রাধে রাধে!

স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে হঠাৎ উঠে পড়ে বহুবল্লভ।—না, আজ আর না। আজ চললাম বাবা। আবার আসব একদিন। কবে তা বলতে পারছি না। আর ভাল লাগছে না বাবা। সারাদিন চেঁচিয়ে পয়সা রোজগার আর ভাল লাগছে না। না, ভাল লাগছে না।

* * *

বিভূতির সঙ্গে বহুবল্লভের দেখা হয়েছিল সাড়ে চার বছর পর।

গুরু তাকে যাত্রার দল থেকে ছাড়িয়ে নিজের গাঁয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘর ক'রে দিয়েছিলেন। বেঁচেছিলেন তিন বছর। গুরুর দেহরক্ষার পর মাস তিনেকের মধ্যেই বহুবল্লভের কাছে বউ কুসুম ওই মেয়েগুলির মত বিশ্রী হয়ে উঠল। বহুবল্লভকে তখন জীবিকার জন্য ঘুরতে হয় গ্রামে গ্রামে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় ব'সে চোখ বন্ধ হয়ে আসে, ঝুমঝুম শব্দ শুনতে পায়, দেখতে পায় রায়বল্লভপুরের আসর, রাধা ঢুকছে আসরে, পায়ে নূপুর, হাতে কঙ্কণ বাজুবন্ধ, গলায় চিক, মাথায় মুকুট। সমস্ত দেহের অণুপরমাণুতে এক অসহনীয় অস্থিরতা জেগে ওঠে। ছুটতে ইচ্ছা হয় উন্মাদের মত। ক্রোধ জেগে ওঠে অন্তরে অন্তরে। দাঁতে দাঁত ঘষে আপন মনেই।

হঠাৎ দেখা হ'ল কাদম্বিনীর সঙ্গে, কাদুর সঙ্গে।

গঙ্গাস্নানের যোগ। পায়ে হেঁটে যাত্রীদল চলেছে। তরুণী বিধবা মেয়ে হাস্যে লাস্যে দলটিকে কলরবমুখর ক'রে চলেছে।

মুহূর্তে বহুবল্লভের মনে হ'ল, এই তো। একেই তো সে এতদিন কামনা ক'রে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল সে। কোন কিছুর কথা মনে হ'ল না। চলল সঙ্গে সঙ্গে।

কাদুই বলেছিল, অ মাগো! তুমি কে গো? সঙ্গ ধরলে যে!

বহুবল্লভ বলেছিল, আমিও গঙ্গাস্নানে যাব।

কাহু তার দিকে তাকিয়ে ভাল ক'রে দেখে শুনে বলেছিল, গান শোনাতে হবে কিন্তু।

বহুবল্লভের হাতের একতারা সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠেছিল—গ্যাঁও গ্যাঁও গ্যাঁও!

গান ধরেছিল,—ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে!

গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও।

মনের রাধা কোথায় থাকে গোলকধাঁধার কোন্ গোপনে।

স্তব্ধ হয়ে যাত্রীরা পথ চলছিল। কাহুও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, কাহুর পাশেই চল'ছল বহুবল্লভ; কাহু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। গান শেষ হ'লে কাহু তার দিকে তাকালে। সে কি মুখ, সে কি দৃষ্টি, মুখরা মেয়েটা যেন এইটুকু সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে গিয়ে স্বপ্ন দেখছে!

এই তো সেই।

না। সে নয়। কাহু আর কুসুমে তফাত নেই। মাস তিনেক না যেতেই বহুবল্লভ বুঝতে পারলে।

গঙ্গাস্নানের ঘাট থেকেই স'রে পড়েছিল ওরা দুজনে। নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে চ'লে গিয়েছিল অন্য পারে। একা নদী বিশ ক্রোশ।

তিন মাস পর ভুল বুঝে একদিন রাত্রে কাহুকে ফেলে আবার গঙ্গা পার হয়েই ফিরল। ফেরার পথে বিভূতির সঙ্গে দেখা। বিভূতির কাছে সে কেঁদেছিল। বিভূতি হেসে'ছল। বিভূতির হাসির ছোঁয়াচে হাসতে হাসতে সহজ মানুষ হয়ে ঘরে ফিরল। ঘরে ফিরে দেখলে কুসুম নেই। চ'লে গেছে, অন্য লোককে সে বৈষ্ণবধর্মমতে পত্র করেছে।

বহুবল্লভ স্বস্তির-নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। মনে মনে বললে, ভালই করেছে কুসুম।

মাস ছয়েক পরে আবার দেখা হয়ে গেল, একজনের সঙ্গে।

সুবাসীর সঙ্গে।

আট মাস পর সুবাসীকে ছেড়ে দেশে ফিরল বহুবল্লভ। এবার আর লজ্জা ছিল না তার। লোকের প্রশ্নের জবাব দিল হাসি মুখে।

হ্যাঁ, তা, তীর্থও বলতে পারেন। আন, এখন গান শোনেন। গ্যাঁও-গ্যাঁও-গ্যাঁও শব্দে একতারা বাজিয়ে কথ ঢাকা দিয়ে গান ধ'রে দিল—

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে।

চার

খুঁজে পাওয়া যাবে না—এই কথাই স্থির জেনেছিল রহুবল্লভ। মনকে শক্ত ক'রে বেঁধে সে এবার হাটচরণপুরের রেল-প্লাটফর্মে ব'সে আকাশের দিকে চোখ রেখে গান গেয়ে যেতে লাগল; চোখ সে নামাবে না।

হঠাৎ হাসি—খিলখিল হাসির শব্দ কানে এসে ঢুকল। নিখিল ভুবনে কিসের ঝিলিক খেলে গেল। চোখ নামিয়ে বহুবল্লভ অন্তরে অন্তরে কেঁপে উঠল। ও কে? কে? ট্রেনের কামরায়?

ট্রেনখানা ছাড়বে এখুনি।

এই তো।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঝোলা-ঝাপটা নিয়ে উঠে পড়ে বহুবল্লভ, একেবারে ট্রেনে চড়ে বসে। দেখতে পেয়েছে একজনকে।

স্টেশন-মাস্টারকে বলে, চেকারবাবুকে ব'লে দেন বাবু, গাড়িতে পয়সা নিয়ে আমাকে টিকিট দিতে।

যাবে কোথা?

এই আসি, একবার ফিরে আসি।

ঝুমুরের দল। আলাপ হতে পাঁচ মিনিট লাগল না। লজ্জাও নাই বহুবল্লভের, এক গাড়ি লোকের সামনেই বললে, চল, তোমাদের সঙ্গেই যাব।

আমাদের সঙ্গে? হেসে উঠল মেয়েটি—বহুবল্লভের রাধা।

হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে।

পাপ হবে না?

নাঃ।

মরণ তোমার বুড়ো বোরেগী!

তোমার হাতে মরণ হলে আমি সগ্গে যাব গো।

আমাদের হাতে মরণ ভিখেরী-ফাকরের হয় না বুড়ো।—মুখ মচকালে মেয়েটি।

হাসলে বহুবল্লভ। কোন উত্তর দিলে না।

মেয়েটির সঙ্গের বয়স্কা দলনেত্রী মেয়েটিকে বললে, কি সব বকছিস যা-তা ?

তাকাচ্ছে দেখ না !—ফিরে বসল মেয়েটি।

একটা বড় জংসন-স্টেশনে গাড়িটা খালি হয়ে গেল। রইল শুধু ওরা কজনে। তাদের মধ্যেও কজনে নামল খাবার কিনতে।

নিরালা পেয়ে বহুবল্লভ আপনার কোমরে বাঁধা গেঁজেটা নাড়া দিয়ে বললে, আছে। দেখতে ভিখিরী হ'লেও ভিখিরী নই।

মেয়েটি ফিরে তাকাল। চোখ ঝলকে উঠল তার।

বহুবল্লভ একতারা বাজাতে লাগল—গ্যাঁও-গ্যাঁও-গ্যাঁও-গ্যাঁও।

গাড়ির ঘণ্টা পড়ল।

-

দশ দিন না-যেতে বহুবল্লভের মন বললে, নাঃ, আর না। দেহ-ব্যবসায়িনী ঝুমুর দলের মেয়েকে বলতে দ্বিধা কিসের ? বললে, চলব এবার।

চলবে ?—ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে গোলাপ ওর দিকে তাকালে।

হ্যাঁ। ছুটি দাও।

আচ্ছা। আজ নয়, কাল।

কেন ?

না।

বহুবল্লভ বিস্মিত হয়ে গেল। সন্ধ্যায় গোলাপ একেবারে মহোৎসব বসিয়ে দিলে। আয়োজন কত ! কিন্তু—

কিন্তু মদ তো আমি খাই না।

আমি খাব। তুমি গাইবে, আমি নাচব। আর এ বাজাবে।

দলের বাজিয়েকে নিয়ে এল। গোলাপ বলে, ও আমার ভাই। কিন্তু বহুবল্লভ জানে। হাসলে বহুবল্লভ।

বেশ, তাই। কিন্তু আমি যা গাইব, তার সঙ্গেই নাচতে হবে।

হ্যাঁ, তাই নাচব। গাইবে তো তুমি, মনের রাধা ? ধর। তাই ধর।—গোলাপ হঠবে না।

গ্লাস পরিপূর্ণ ক'রে নিয়ে মদ খেয়ে গোলাপ পায়ে ঘুঙুর বাঁধলে।

তারপর বললে, দাঁড়াও। কি? আমরা মদ খেলাম, তুমি শুধুমুখে আছ? ব'লে সে চ'লে গেল। ফিরে এল শরবৎ নিয়ে। খাও শরবৎ। মাথা খাও আমার।

বহুবল্লভ হেসে শরবৎ খেয়ে বললে, নাও।

গ্যাও, গ্যাও, গ্যাও, গ্যাও।

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে!

ঝুম ঝুম, ঝুম ঝুম।—বাজতে লাগল গোলাপের পায়ের ঘুঙুর।

হঠাৎ চমকে উঠল বহুবল্লভ। গোলাপ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। নেশায় পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা। রাধে রাধে! রাধা খুঁজতে বেরিয়ে সে এল কোথায়, পড়ল কোথায়? মুহূর্তে মনে হ'ল, কাদু, সুবাসী, যাদের মধ্যে সে রাধা খুঁজেছে, তারাও আজ সবাই এই মুহূর্তে ঠিক এমনি ক'রে নেশায় উন্মত্ত হয়ে নাচছে। আঃ, ছি ছি-ছি!

চীৎকার ক'রে উঠল বহুবল্লভ, আঃ—

নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় সে অভিভূত হয়ে গেল! আঃ—

চোখ মুদলে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আবার চোখ খুললে। সব যেন কেমন থরথর ক'রে কাঁপছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

ওঠ্, উঠে পড়্! কি হ'ল, রক্ত তোর সর্বাঙ্গে?

দাঁড়া। গেঞ্জলেটা খুলে নিই।

গোলাপ ঝুঁকে পড়ল। উত্তেজিত মত্ত হাত কাঁপছে গোলাপের, হাতের কাচের চুড়ি ঝিন্‌ঝিন্ শব্দে বাজছে। পা দুটো ঠকঠক ক'রে কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুরের মৃদু শব্দ হচ্ছে।

বহুবল্লভ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে। এ কি? রাধার পায়ের নূপুর বাজছে! কঙ্কণের শব্দ উঠছে। রাধা আসছে! রাধা! রাধা!

গোলাপ উঠে দাঁড়াল। বহুবল্লভের চোখের দিকে চেয়ে আতঙ্কিত হয়ে আবার ব'সে প'ড়ে দুই হাত চেপে চোখের পাতা দুটো নামিয়ে দিল। পিঠে ছোরা মেরেছিল বাজিয়ে, সেই ছোরাখানাকে টেনে বের ক'রে বসিয়ে দিলে বুকে।

রাধা এসেছে। বহুবল্লভের সমস্ত দেহটা নিষ্ঠুর আক্ষেপে একবার ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন ফসল

করুণানিধান, এ কি এ বিধান তব—
মনেরে রাখিয়া শ্যামল-সবুজ দেহেরে করিছ পীত,
রুদ্ধ করিয়া কণ্ঠ, মরমে জাগাইছ সঙ্গীত—
চিত্ত ভরিছ আশা-আনন্দে নব ?
বয়স ধর্মে-অন্ধ নয়নে শিশুর কৌতূহল
জাগাইছ প্রভু, এ কি বল, তব ছল !
নিজে আশ্রয় দিতে দয়াময়,
সব আশ্রয় করিছ বিলয়
খঞ্জ করিয়া পা দুখানি তুমি আগুন দিতেছ ঘরে,
মর্ম ভেদিয়া তব স্তবগান তবু ওঠে অম্বরে।
হে অজানা, আমি জানিয়াছি তব লীলা,
আঘাতে আঘাতে ব্যথা বেদনায়
তোমার মহিমা বক্ষে ঘনায়
কঠিন উপল-খণ্ডের তলে করুণা অন্তঃশীলা !
সব ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া খুলিছ চিত্ত-দ্বার—
আলোর প্লাবন ভিতরে আমার, বাহিরে অন্ধকার।

* * *

অন্তরে কোথা কান্না জমিয়া আছে
হয়তো কারণে, হয়তো বা অকারণ ;
কিছু-না-করার ব্যথা চলে পাছে পাছে
যেন বন্ধ্যার এ অশ্রু-বিমোচন।
বিশ্ব জুড়িয়া চলে সৃষ্টির লীলা
মাটির আঁধারে নবাঙ্কুরের গান,
নির্ঝরমুখে ভেঙে খান্ খান্ শিলা
জড় পাষাণের সেই তো পরিত্রাণ !
আমার জড়তা পথ খুঁজে নাহি পায়,
মৃত জলধারা আমার পাষাণ-তলে
নয়নের জলে কাঁদিছে ব্যর্থতায় ;
যৌবন-তাপে তুষার শুধুই গলে।
তাই মনে খুঁজি ভূমিকম্পের আশা,
মৃতেরে নড়াক জাগুক সর্বনাশা !

* * *

পুরাতন কাল নতুনে ডাকিয়া কহে,
"সকল প্রগতি সুখের তো ভাই নহে ;
যদিও এসেছি মথুরা বৃন্দাবন,
তবু দেখি শুনি, সুতরাং বলি শোন্—
কাজটা তো ভাই, ঠিক হ'ল না, লাজটা গেল ভেঙে
এবার ঠেলা সামলাতে প্রাণ দেদার খাবি খাবে !
ঘোমটা-টানা আড়চোখেতে হানা নয়ন-বাণ,
কঠিন হ'লেও মিষ্টি ছিল বিরলবৃষ্টি ব'লে।
নিশীথ-রাতে নিশিত ছুরি হ'লেও ভয়াবহ
ঠেকত মধুর প্রিয়-বধূর অকস্মাতের লীলা,
দিনের আলোয় ঘটলে দীনের সামলানো দায় হ'ত।
একটু আড়াল একটু ছোঁয়া—ধোঁয়ার মত দেখা,
আছে ব'লেই বাঁচে মানুষ যায় না বেবাক্ পুড়ে !
ঢাক্নাটুকু খুললে ওদের পাখনা গজায় মনে,
ফুড়ুৎ ক'রে পালিয়ে যাবে কালিয়ে দিয়ে দিল্।"

* * *

নিশীথ-রাত্রি নামে চৌদিক ঘেরি
মহাযাত্রার আর বেশি নাই দেরি।
এবার ভাঙুক আসরের সমারোহ,
পানের পাত্র ছাড়—মদিরার মোহ।
একে একে বাতি নিবিছে জলসা-ঘরে,
মৌন খুঁজিয়া মন যে কেমন করে।
সারাদিনভোর অনেক হল্লা হ'ল
আপনার হাতে এবার তল্প তোল ;
নতুবা রাজার পেয়াদা লাঠির জোরে
হঠাৎ আসিয়া দেবে তছনছ ক'রে।

* * *

গজাতে না দিয়ে ডাল কচি গাছে পাতা ছেঁড় যদি,
তা হ'লে যা ক্ষতি হয়, তাই হয় লিখলে চৌপদী।
হয়তো সহজ লেখা মনোভাব কুটি কুটি কেটে,
পাকিতে দিলেই তারে মহাকাব্য হয় ফুটি ফেটে।

কল্যাণ-সঙ্ঘ

১০

অপরাহ্ণে এলেন গুণেনবাবু। লম্বা, দোহারা, দশাসই চেহারা। ধবধবে ফরসা রঙ। বলিষ্ঠ দেহ। লম্বা ধরনের মুখ; বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে যদিও, মুখে বয়সের ছাপ পড়ে নি এখনও। সুগঠিত নাক। চোয়াল দৃঢ়। মাঝারি চোখ। কেশবিরল ভ্রূ। পিঙ্গল চোখের তারা। গোঁফ-দাড়ি নির্মূল ক'রে কামানো। এঁকে দেখলেই মনে হয়, জীবনে ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, এবং প্রতিষ্ঠায় পৌঁছুবার জন্যে পথের বিচার করেন নি। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে আয়ত্ত করবার জন্যে ভাল-মন্দ বিচার করবার দুর্বলতা এঁর নাই। পরনে ধোপদস্ত ধুতি ও গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে চকচকে পাম্পশু। এক হাতে কোঁচা ধ'রে আছেন, আর এক হাতে চুরুট টানছেন। বাঁ হাতে জামার হাতার নীচে সোনার ঘড়িটি চিক্‌চিক করছে।

সমরেশের ডাকনাম—ভোঁদু ব'লেই ডাক দিলেন। সমরেশকে ছোটবেলা থেকে দেখছেন; নিজের শ্যালকের মতই ব্যবহার করেন ওর সঙ্গে।

সমরেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, আপ্যায়নসহকারে বাইরের বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে বসাল, নিজে একটা চেয়ার এনে পাশে বসল।

গুণেনবাবু ঈজিচেয়ারে অর্ধশয়ান হলেন। এক পায়ের উপর আর এক পা চাপিয়ে নাচাতে নাচাতে চুরুট টানতে লাগলেন। চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে সমরেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কি করছিস এখন?

সমরেশ বললে, কি আর করব? জেলে গিয়েছিলাম, বেরিয়ে এসে এম. এ. পরীক্ষা দিলাম। পাস করেছি কোনমতে। এখন একটা টিউশনি করছি।

ওতেই চলবে নাকি?

চলুক তো এখন। তারপর দেখা যাবে।

বে-টে করবি না?

সমরেশ হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, পাগল! আপনি খেতে পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে! তা ছাড়া এই বয়সে—

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে গুণেন বললেন, কত বয়স তোর?

ব'ত্রিশ-তেত্রিশ।

ওদের দেশে বত্রিশ-তেত্রিশ তো যৌবনের সকাল; চল্লিশে ভর্তি দুপুর, যা এখন আমাদের চলছে। আচ্ছা, আমাকে দেখে কত বয়স ব'লে মনে হয় বল্ দেখি?—ব'লে ভ্রূ দুটি তুলে সমরেশের দিকে তাকালেন।

সমরেশ বললে, তা চল্লিশের কাছাকাছি ব'লে মনে হয়।

গুণেনবাবু বললেন, কাছাকাছি নয়, চল্লিশের অনেক কম ব'লে মনে হয়। যে দেখে, সে-ই বলে।—ভ্রূ নাচিয়ে বললেন, কেমন দেহটা রেখেছি বল্ দেখি? মিলিটারিতে চাকরি করি। ডাল-আটার তৈরি শরীর। সিমেণ্ট-জমানো পাথরের মত শক্ত। অর্ধদগ্ধ চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তবে একটা কথা। তোরা একটা আদর্শ নিয়ে চলেছিস। দেশকে স্বাধীন করা হ'ল তোদের কাজ। দেশের মাটি স্বাধীন হয়েছে, দেশের মানুষ এখনও হয় নি। সেটাও তোদেরই করতে হবে। কাজেই, এতদিন যেমন জেলেই কাটিয়েছিস, এর পরও তাই করতে হবে। বিয়ে ক'রে একটা মেয়েমানুষকে কষ্ট দেওয়া তোদের উচিত নয়। তা ছাড়া যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তারা তোদের হাতে মেয়ে দেবেও না।

সমরেশ চুপ ক'রে রইল। গুণেনবাবু আর একটা চুরুট ধরিয়ে লম্বা টান দিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, মিলিটারিতে চাকরি ক'রে এই কথাটা বেশ বুঝেছি, টাকাই হ'ল মানুষের আসল দাম। টাকা না থাকলে কিছু না। তবে টাকা থাকলেই হয় না, ভোগ করতে জানা চাই। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, একা একা ভোগ ক'রে সুখ নেই। ভোগের ভাগীদার চাই।

বক্তৃতার বক্তব্যটা আন্দাজ করতে পেরে সমরেশ একটু হাসল। গুণেনবাবু তা লক্ষ্য করলেন না। সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে, উর্ধ্বমুখ হয়ে, পর পর কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করলেন। তারপর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, যখন ভাবি, এত টাকা রোজগার করলাম, একটা মাত্র মেয়ে, তাও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে দুদিন পরে, খাবে কে? তা ছাড়া জীবনটা তো সবটাই প'ড়ে। কাটবে কি ক'রে?

সত্যি বলছি ভোঁত্থ, ভাল লাগে না। ভাবতে গেলেই বুকটা সাত হাত ব'সে যায়।

সমরেশ বললে, বিয়ে করুন না।

সমরেশের দিকে তাকিয়ে গুণেনবাবু বললেন, তুইও ওই কথা বলছিস ? একটু হেসে বললেন, সবাই ওই কথা বলে। যাকে পরিচয় দিই, সে-ই। বলে—কেন নিজে মাটি হচ্ছেন, আর একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ মাটি করছেন ? বাংলা দেশে মেয়েদের পাত্র জোটানো দায়। তার ওপর আপনাদের মত লোকেরা যদি ভীষ্ম হয়ে ওঠেন, তা হ'লে তো বিপদ ! ভেবে দেখছিও। এটা ঠিক নয়। বাংলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা হু-হু ক'রে ক'মে যাচ্ছে। শতকরা পঁয়তাল্লিশে নেমে এসেছে। মার খেয়ে লোপাট হয়ে গেছে কত লোক। আমরা এমন করলে, নগণ্য মাইনরিটি হয়ে নাকালের সীমা থাকবে না হিন্দুদের।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, তবে কি জানিস, মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে এতদিন বিয়ে করি নি। ভাবতাম, কি ভাববে মেয়েটা ! তবে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বড়লোকের ঘরে পড়ছে। ননদ দেওর নেই ; শাশুড়ী আছে, তা দুদিন পরেই টেঁসে যাবে। তারপর সংসারে সর্বে-সর্বা। বাবার কথা মনেই থাকবে না তখন। তবে আমার তো মেয়েকে ভুললে চলবে না। সময়ে অসময়ে আনতে-টানতে হবেই। তাই, যদি বিয়ে করতেই হয়, একেবারে অপরিচিত মেয়ে বিয়ে করলে চলবে না। জানাশোনা মেয়ে হবে, বয়সে একেবারে বেমানান হবে না, মেয়েটাকে টানবে—

সমরেশ ব'লে ফেললে, তিনুকে বিয়ে করুন না।

গুণেনবাবু হেসে বললে, তোর ওই কথা মনে হচ্ছে ? আমারও তাই। আজ তো সারাদিন ধ'রে তিনুকে দেখলাম ; ও হ'লেই চলবে।

চেয়ারটা একটুখানি টেনে সমরেশের আরও কাছে ঘেঁষে বসলেন গুণেনবাবু। মুখটা বাড়িয়ে, কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন, তিনুর সঙ্গে তো তোর অনেক দিনের ভাব। ভাই-বোনের মত তোরা। তোর কথা শোনেও—

সমরেশ বললে, ভুল করছেন। তিলু আমাকে কথা শোনায় বটে, আমার কথা বিশেষ শোনে ব'লে মনে হয় না।

ভ্রূ নাচিয়ে গুণেনবাবু বললেন, ওরে, শোনবার মত কথা হ'লেই শুনবে। সম্প্রতি আমার কথাটা শোন্। তিলুর কাছে কথাটা তোল্ না বেশ কায়দা ক'রে। গুরু-গম্ভীরভাবে নয়, হালকাভাবে; যেন ঠাট্টা ক'রে বলছিস, এমনই ভাবে আর কি। মনের ভাবটা ওর কি, তাতে বোঝা যাবে। তোরা তো কাব্য-টাব্য নানা রকম পড়েছিস। নায়িকাদের মনের ভাবটা মুখে চোখে কথায়-বার্তায় কেমন ফুটে ওঠে, জানিস তো সব।

সমরেশ নীরবে মনে মনে হাসতে লাগল।

গুণেনবাবু বললেন, কাকাবাবুর অমত নেই, বরং আগ্রহ আছে।

সমরেশ বললে, তাই নাকি! এর মধ্যেই কথাবার্তা বলেছেন বুঝি?

ঠিক এ কথাটা বলি নি। বলেছিলাম, চাকরি-বাকরি আর করব না। রোজগার ক'রে যা জমিয়েছি, গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে এসে বাড়িতে ব'সে ব্যবসা করব। জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম জমিয়েছি? বললাম, লতুর বিয়েতে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করলেও দু-আড়াই লাখ হাতে থাকবে। ঘাবড়ে গেলেন শুনে। বললেন, তা হ'লে একটা বিয়ে কর বাবা। এমন ক'রে একা একা থাকা আমাদেরও ভাল লাগছে না দেখতে। বুঝলাম, টোপ খেয়েছেন। সুতো ছাড়লাম। বললাম, এ বয়সে বিয়ে? তেমন মেয়ে কই? কচি-কাঁচা বিয়ে করা সাজে না এখন। কাকাবাবু বললেন, কেন? আমাদের তিলু? বেমানান তো হবে না। গোঁ ধ'রে ব'সে আছে, বিয়ে করবে না। নিজে চাকরি করে, দাদাও টাকাকড়ি রেখে গেছেন কিছু, বাড়িটা আছে, খাওয়া-পরার মাথা গুঁজে থাকার কষ্ট হবে না কোনদিন। কিন্তু আমি চোখ বুজলে দেখা-শুনো করবে কে? কি যে ওর ইচ্ছে তা তো বুঝি না। আবার ধর্ম বাতিক হয়েছে আজকাল। ওইটাই সাংঘাতিক। কি যে করি ওকে নিয়ে? বললাম, ও বাতিক সেরে যাবে বিয়ে হ'লে। বললেন, ভুলিয়ে-

গুলিয়ে নাও না বাবা ওকে। ওর একটা গতি হয়ে গেলে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই দুটো দিন।

সমরেশ বললে, নিশ্চিন্ত হয়েই তো ঘুমোচ্ছেন চব্বিশ ঘণ্টা। এর চেয়ে বেশি ঘুমুনো মানে শেষ ঘুম—

শুণেনবাবু বললেন, পাগল! অত বড় আইবুড়ো মেয়ে চোখের সামনে থাকলে আত্মীয়-স্বজনদের ঘুম হয় ভাল ক'রে? আমার হচ্ছে? এখন তো আমাকে দেখছিস এক রকম, লতুর বিয়েটা হয়ে যাক, দেখবি আর এক রকম পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত দিগ্বিদিকে উড়ে বেড়াব।

সমরেশ হেসে বললে, তিলু পিঠে চড়লে এত উড়তে হবে না। দেহের বহরটি দেখেছেন তো!

শুণেনবাবু বললেন, দূর! কি যে বলছিস! তিলু তো খুব মোটা নয়। বেশ মানানসই চেহারা। ওই রকম সুস্থ সবল ভোগালো মেয়েই ভাল। ওর দিদি যেমন ছিল বেঁটে, তেমনই রোগা, ডিগডিগে। পাশে থাকলে, লোকে ওকে আমার মেয়ে ব'লে ভুল করত। তা ছাড়া লতু হবার পর থেকে কেবলই ভুগল। একটা দিন ভাল থাকল না।—ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। একটু পরেই চাঙ্গা হয়ে উঠে বললেন, কাকাবাবু এক রকম মত দিয়েছেন। তবে কথাটা নিয়ে-নাড়া-চাড়া করতে এখন নিষেধ ক'রে দিয়েছি। লতুর বিয়েটা হয়ে যাক। তুই পাঁচ কান করিস নে। ঠারে-ঠোরে ওর মনের কথাটা জেনে নিয়ে একেবারে চুপ।—ব'লে ঠোঁটের উপর খাড়াভাবে ডান হাতের তর্জনী চেপে ধরলেন।

একটু পরে আবার বলতে শুরু করলেন, এতে তিলুর উপকারই হবে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা দরকার। নিজের বাড়ি-গাড়ি, ধন-দৌলত, ছেলে-মেয়ে এ সবের শখ সব মেয়েমানুষেরই হয়। আমাকে বিয়ে করলে তিলুর সব হবে, বরং পাঁচজনের চেয়ে বেশিই হবে। অথচ এক পয়সা খরচ করতে হবে না। ঘাড় নেড়ে বললেন, তিলুর এই উপকারটি করতে চেষ্টা কর্ না। ও তোর উপকার করবার জন্যে এত চেষ্টা করছে—

সমরেশ বললে, আমার আবার কি উপকার করবার চেষ্টা করছে ও?

শুণেন বললেন, তুই বেকার ব'সে আছিস, এজন্যে ভারি চিন্তা ওর। আজ কবারই বললে, ভোঁদুর একটি ভাল চাকরি ক'রে দিন জামাইবাবু। কি রকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কাকীমা কান্নাকাটি করছেন। বললাম, ওকে ভাল চাকরি তো ক'রে দিতে পারি, কিন্তু জেলের ভেতর থাকলে করবে কখন? তা বললে, আবার জেলে থাকবে কেন? দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে। বললাম, জেলের মানুষ ওরা। দেশ স্বাধীন হ'লেও কোন ফন্দি-ফিকির ক'রে জেলে গিয়ে ঢুকবে। শুনে মুখটি শুকিয়ে গেল ওর। তোকে ভারি স্নেহ করে তো! ঠিক নিজের বোনের মত।

সমরেশ চুপ ক'রে রইল। অনেকক্ষণ চুরুট টেনে মুচকি হেসে শুণেনবাবু বললেন, তবে একটা কথা। যে রকম ফুর্তিতে আছিস এখানে, জেল বা চাকরি কিছুর জন্যেই বাড়ি থেকে আর বেরুতে পারবি ব'লে মনে হয় না।

সমরেশ বিস্ময়ের সহিত বললে, তার মানে?

শুণেবাবু বললেন, সকালে তো দেখলাম, বেশ দুটিকে জুটিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছিস।

সমরেশ বললে, জোটাই-টোটাই নি। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওঁরা গাড়িতে তুলে নিলেন।

শুণেনবাবু হেসে বললেন, তুলেই তো নেয় রে ভাই! আবার ফেলেও দেয়। যত দিন এঁটে ধ'রে থাকতে পারিস, তত দিনই লাভ। তপনের কাছে শুনলাম—একটি মুসলমানের মেয়ে। খুব নাকি খেলোয়াড়। বোকা হাবলা ছেলেদের খেলানোই নাকি ওর খেলা। ওটি সুবিধের হবে না। তবে ওই যে বিধবাটিকে পাকড়েছিস—। চোখ ঠেরে বললেন, ওটিকে যদি হাতাতে পারিস তো বর্তে যাবি, স্বাধীন ভারত হ'লেও অত সুবিধে করতে পারবি না। খুব ভাল মেয়ে ও; দিলও খুব উঁচু; যখন দেয়, তখন মুঠো খুলেই দেয়। ওকে জানতুম এক কালে। আলাপ-পরিচয়ও ছিল। তখন ও

বিধবা হয় নি; স্বামী শ্বশুর—দুই বেঁচে ছিল। স্বামীটা ছিল ইডিয়ট, পছন্দ করত না তাকে; এর তার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করত। শ্বশুর ছিল জাঁদরেল; সুবিধে পেত কম; তবে পেলে ছাড়ত না। এখন তো সব ফরসা হয়ে গেছে। বেওয়ারিস, বেপরোয়া বিধবা এখন—

সমরেশ বললে, কি যে বলেন! আমার সঙ্গে আলাপই হয় নি এখনও।

চোখ দুটি বুজে ঘাড় নেড়ে গুণেনবাবু বললেন, এই রকমেই আলাপ হয়। তারপর ভাব জ'মে ওঠে। মিলিটারি চাকরি করতে করতে সব রকম জানা হয়ে গেছে। সমরেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোকে অপছন্দ হবে না। খদ্দর-টদ্দর এঁটে জবড়-জং হয়ে থাকিস, না হ'লে চেহারা তোর মন্দ নয়। ওর হাতে পড়লে, মাজা-ঘষা হয়ে চকচকে ঝকঝকে হয়ে উঠবি দু দিনে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, একদিন দেখা করতে যাব ভাবছি। তোর আপত্তি হবে না তো?

সমরেশ বললে, আমার আপত্তি কিসের? একটু হেসে বললে, তবে ক দিক সামলাবেন?

গুণেনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, ওরে, তা নয়, তা নয়। এমনই পুরনো পরিচয়টা একটু ঝালিয়ে রাখব আর কি! এখানেই তো বাস করব। তপন জায়গার চেষ্টা করছে। এখান থেকে রায় বাহাদুরের সঙ্গে ব্যবসা করব। ওর সঙ্গে আলাপ রাখা ভাল। অনেক টাকার মালিক ও।—ব'লে ভ্রূ দুটি নাচালেন। তারপর বললেন, তবে তোর যদি নেহাত আপত্তি থাকে—

সমরেশ ব'লে উঠল, না না, আপত্তি নেই। যা ইচ্ছে করুন গে। তবে তিলুকে যদি বিয়ে করেন তো ওসব চলবে না। মেরেই বসবে একদিন।

গুণেন বললেন, তাই নাকি! তিলুকে দেখে তো তা মনে হ'ল না! বেশ শান্ত শিষ্ট মোলায়েম মেয়ে! কাল থেকে কত যত্ন করছে! ওর দিদির কাছ থেকে অত যত্ন কখনও পাই নি।

যত্ন-টত্ন খুব করবে, তবে একটু চুলবুলোনি দেখলেই চাবুক কষবে।

গুণেনবাবু হেসে বললেন, ওই রকম ঝাঁজালো মেয়ে ভাল লাগে আমার। ওর দিদি ছিল মিনমিনে। সাত চড়েও কথা বলত না। কেমন পানসে লাগত।

১৪

সন্ধ্যার দিকে সমরেশ প্রতুলের বাড়িতে গেল। ওর মায়ের অসুখ; তাই খোঁজ নেবার জন্যে।

দু হাতে মাথা রেখে টেবিলের উপর ঝুঁকে ব'সে ছিল প্রতুল। অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাব।

সমরেশ ঘরে ঢুকতেই প্রতুল মুখ তুলে বললে, কে? সমর?

সমরেশ বললে, মা কেমন আছেন?—ব'লে একটা চেয়ারে বসল।

প্রতুল বললে, ভাল নয়। বিকেলে ডাক্তার ডেকেছিলাম। বললেন—বুকে কফ বসেছে; নিমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। ম্লান-হেসে বললে, বার্ধক্যের বান্ধব তো! ফেলে যাবে না বোধ হয়।

আলো জ্বালা হয় নি যে?

কই আর হয়েছে! শৈলী তো মায়ের পাশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে। সারাদিন মুখ ভার হয়ে আছে ওর।

দুজনে চুপ ক'রে ব'সে রইল কিছুক্ষণ। অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল। মশার গুঞ্জনধ্বনি শোনা যেতে লাগল। ভ্যাপসা গরম।

সমরেশ বললে, চল, বাইরে গিয়ে বসি।

দুজনে বাইরে রোয়াকে এসে বসল।

প্রতুল বললে, তিনুর বোনঝির সঙ্গে তপনের বিয়ের কথা নাকি আজ পাকা হচ্ছে?

সমরেশ বললে, হ্যাঁ। তিনুর জামাইবাবু এসেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিতে চান। আজ তিনুদের বাড়িতে তপনদের বাড়ির সকলের নেমন্তন্ন। আমিও বাদ পড়ি নি।

প্রতুল চুপ ক'রে গালে হাত দিয়ে সামনে আঁধারের মধ্যে চেয়ে রইল।

সামনে বাউরীপাড়ার দু-চারটে ঘরে আলো জ্ব'লে উঠেছে। বাড়ির পুরুষরা মদের ভাটি থেকে ফিরে হল্লা করছে; কতকগুলো মেয়ে সমস্বরে গান করছে, 'ওলো বকুল ফুল! কাহুর লেগে মিছেই দিলাম কুল। আঃ ছিঃ ছিঃ মা!' কৌতুকে ও হাসিতে ফেটে পড়ছে মেয়েগুলো।

কিছুক্ষণ পরে প্রতুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, একটা কথা তোমাকে বলছি সমর; তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে পড়েছি, খেলেছি, কাজ করেছি। অনেক দিনের অনেক সুখ-দুঃখের সাথী তুমি। তোমার কাছে গোপন করবার কিছুই নেই আমার।

সমরেশ নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রতুল বলতে লাগল, আজ বিকেলে পদ্মা এসেছিল মায়ের খবর নিতে। ও-ই তপনের বিয়ের খবর দিয়ে গেল। যাবার আগে কয়েকটা কথা ব'লে গেল। তা শুনে আমি একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছি।

সমরেশ সাগ্রহে বললে, কি?

প্রতুল বললে, শৈলী তপনকে ভালবাসে। তপনও নাকি ওকে ভালবাসত। পৌষ মাসে শৈলী যখন বাসুদেবপুরে গিয়েছিল, ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। শৈলী ওকে আমার কাছে কথাটা পাড়বার জন্যে ব'লে দিয়েছিল। তারপরই তপন অসুখে পড়ে। কিছুদিন পরে এখান থেকে চ'লে যায়। এখান থেকে যাবার পরে তপন দু-চারখানা চিঠি আমাকে লিখেছিল। কিন্তু ও-কথা লেখে নি। তারপর চিঠিপত্র বন্ধ হয়ে যায়। তপন এমনই চিঠিপত্র লেখে কম। তা ছাড়া বিদেশে বেড়াতে গিয়ে নতুন নতুন জায়গা দেখায়, নতুন নতুন লোকের সঙ্গে মেলামেশায় লোকে এত মশগুল হয়ে পড়ে যে, দেশের কথা প্রায় ভুলেই যায়। কাজেই তপনের এই নীরবতায় আমি তত ব্যস্ত হই নি। কিন্তু শৈলী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। ওদের কাজের ক্ষতি হচ্ছে ব'লে এই উদ্বেগ—ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখানে এসে তপন যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না, দূরে স'রে রইল, তখন লক্ষ্য করলাম, শৈলী রীতিমত অস্থির হয়ে উঠেছে। তখন ওর

মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে একটু চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, পদ্মাকে ডেকে ওর মনের খবর নেব। কিন্তু নানা কাজের মধ্যে সুবিধে ক'রে উঠতে পারি নি। আজ পদ্মাকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞাসা করতেই ও সব কথা বললে।—ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ পরে প্রতুল বলতে লাগল, শৈলী তপনের সঙ্গে কাজ করেছে। তপনের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছে, উৎসাহ পেয়েছে, স্নেহ পেয়েছে। তপনের মহানুভবতার, নিঃস্বার্থপরতার অনেক পরিচয় পেয়েছে। তপনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের কথা এই, পদ্মা ব'লে গেল—শৈলী শুধু আকৃষ্টই হয় নি, তপনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

সমরেশ সোদ্বেগে বললে, তাই নাকি ?

পরম পরিতাপের সঙ্গে প্রতুল বললে, হ্যাঁ, তাই। শৈলীর কাছ থেকে এতটা দুর্বলতা আশা করি নি।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, বার বার বলেছি শৈলীকে, দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্যে যে মেয়েরা কাজে নেমেছে, তাদের চিত্ত ও চরিত্রকে দৃঢ় করতে হবে ; মনকে রাখতে হবে সর্বদা সতর্ক ও সজাগ ; ভাবপ্রবণতাকে সর্বথা বর্জন করতে হবে। কাজ করতে গেলে পুরুষের সঙ্গে মিশতে হবেই। শ্রদ্ধার যোগ্য যদি কেউ হয়, শ্রদ্ধা করতে হবে। কিন্তু কোন রকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। অনিবার্য কারণে যদি কোন দিক থেকে মনের ওপর টান পড়েই, জোর ক'রে মনকে টেনে রাখতে হবে। কোনমতে রাশ ছাড়া চলবে না। নিজের ভাল করবার যাদের ক্ষমতা নেই, পরের ভাল করবার চেষ্টা তাদের বৃথা।

মিনিট খানেক চুপ ক'রে ভেবে প্রতুল বললে, শুক্তির সঙ্গে এত দিন মিশেও শৈলীর যে এ শিক্ষা হয় নি, তা জানব কি ক'রে ?

সমরেশ বললে, শৈলী কোথায় ?

প্রতুল বললে, বললাম যে, মায়ের পাশে প'ড়ে আছে। কদিনই মুখ শুকনো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, বাড়ি থেকে বেরোয় নি, বাড়ির কাজ যা না করলেই নয় করছিল, কিন্তু বাইরের কাজ কিছু করে নি।

পান্নার কাছ থেকে খবরটা শোনবার পর থেকে একেবারে ভেঙে পড়েছে। কি যে করা যায়, ভেবে স্থির করতে পারছি না। একবার ভাবলাম, তপনের কাছে যাই, ওকে বুঝিয়ে বলি। তারপরই মনে হ'ল, ও বৃথা। নিজেকে নীচু করাই সার হবে, কাজ কিছু হবে না। তা ছাড়া তপন যখন শৈলীকে চায় না, তখন জোর ক'রে শৈলীকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া শৈলীর পক্ষে মঙ্গলেরও নয়, সম্মানেরও নয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তপন শৈলীকে সত্যই স্নেহ করত। তার অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি। ওর দ্বারা শৈলীর কোন ক্ষতি হতে পারে—এ সন্দেহ আমি কোন দিন করি নি।

সমরেশ বললে, তপনকে কি আগে চিনতে না?

প্রতুল বললে, চিনতাম বইকি! বড়লোকের ছেলে; বাবু মানুষ; ফুর্তিবাজ; মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসে; একটু তরল-প্রকৃতির। কিন্তু ১৯৪৩এ ওদের গ্রামে যখন মড়ক শুরু হ'ল, তখন ওর অন্য পরিচয় পেলাম। এত বড় আরামী শৌখিন মানুষ, সব ভুলে রাতের পর রাত রোগীর সেবা করলে, মরণের সঙ্গে লড়াই করল, গরিব প্রজাদের বাঁচাবার জন্যে দু-হাতে পয়সা খরচ করলে। ভাবলাম, মানুষের দুঃখের আগুনে ওর চরিত্রের খাদ সব উবে গিয়ে খাঁটি সোনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পরেও ওর আচার-আচরণের কোন পরিবর্তন দেখি নি। এমন কি, আমার এখনও বিশ্বাস, ও যদি রায় বাহাদুরের কবলে না পড়ত, শৈলীকে ও এমন ক'রে ফেলে দিত না।

দুজনে চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সমরেশ বললে, কি করবে স্থির করেছ?

প্রতুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, কি আর করব? যা হয়ে গেছে, তার ফল ভোগ করবার জন্যে প্রস্তুত হব দুজনেই। শৈলীকে ভেসে যেতে দেব না কিছুতেই, যতদিন বেঁচে থাকব। শৈলীর ভাগ্যে থাকে, সুখী হবে আবার।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, বাসুদেবপুরের কাজ আর আমাদের

চলবে না। তপন আমাদের সঙ্গে থাকাতে, রায় বাহাদুরের সমস্ত বাধা ও বিরোধ আমরা এতদিন কাটিয়ে এসেছি। তপন রায় বাহাদুরের সঙ্গে যোগ দিলে ওখানের কাজ চালানো অসম্ভব।

১৫

সমরেশ বাড়ি ফিরল। রাত নটা বেজে গেছে। শুক্লা-দ্বিতীয়ার চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে মেঘের প্রলেপ। অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছে ক্রমশ। রাস্তার দু পাশে ছোট ছোট বাড়ি। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের। প্রায় চার শো হাত দূরে দূরে ল্যাম্প-পোস্ট। কোনটায় আলো জ্বলছে, কোনটায় জ্বলছে না। স্বায়ত্ত-শাসনের সুচারু নমুনা বাংলা দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি। রাস্তার পাশে নানা রকমের গাছ। বাতাস বইছে পশ্চিম দিক থেকে। গাছের পাতায় সরসর শব্দ উঠছে। দূরে কোথায় শিরিষফুল ফুটেছে, তারই গন্ধ আনছে ভাসিয়ে; আর আনছে বাউরী-পাড়ার মেয়ে-গুলোর গান, পুরুষদের উন্মত্ত কোলাহল।

তিলুদের বাড়িতে উৎসবের ঢেউ লেগেছে। বাড়ির সামনে একটা মোটর দাঁড়িয়ে আছে—ঝকঝকে নূতন। ডে-লাইটের আলোতে বাড়িটা ঝলমল করছে। সামনের বাগানে গোল ক'রে চেয়ার পাতা হয়েছে, মাঝখানে টেবিল। চেয়ারে ব'সে আছেন রায় বাহাদুর, আরও জনকয়েক ভদ্রলোক—মহেশবাবুর চাকুরি-জীবনের সহকর্মীরা বোধ হয়। এক পাশে ঈজি-চেয়ারে মহেশবাবু ব'সে আছেন; বাম হাত দিয়ে বাম হাঁটুটা মালিশ করছেন আর গড়গড়ায় তামাক টানছেন। টেবিলের উপর গোটা কয়েক খালি চায়ের পিরিচ ও পেয়ালা, একটা রেকাবিতে পান ও সিগারেট।

রায় বাহাদুরের বেশ দুপুরবেলার মতই। একটা সিল্কের চাদর যোগ করেছেন শুধু। আলো প'ড়ে সোনার চশমা, বোতাম ও ঘড়ির চেন চিকচিক করছে। আর চিকচিক করছে সামনের সোনা-বাঁধানো একটি দাঁত। এটা দুপুরবেলায় লক্ষ্য করা যায় নি। রায় বাহাদুর গল্প করছেন সেই টানা-টানা সুরে; ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নীচের অংশটা ঘষছেন।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা আসতে পারলেন না তা হ'লে ?

মহেশবাবু মুখ ভেংচেই ব'সে ছিলেন। সেই ভাবেই বললেন, কই আর পারলেন! তিলু গিয়েছিল বিকেলে। ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নী তো ওর কলেজের বন্ধু। বলেছেন, ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে ডিনার আছে।

একজন ভদ্রলোক বললেন, না হ'লেও আসতেন না। সাধারণ ভদ্রলোকদের বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করলে প্রেস্টিজের হানি হয় ওঁদের।

রায় বাহাদুর বললেন, ওঁরা আসুন আর নাই আসুন, আমাদের তো আহ্বান জানাতেই হবে।

সমরেশ ঢুকল। একটু পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। মহেশ-বাবুর চোখ এড়াতে পারলে না। মহেশবাবু হেঁকে বললেন, ভোঁদা না? আগিয়ে যেতে হ'ল সমরেশকে। মহেশবাবু বললেন, কোথায় ছিলি অ্যাঁ! বাড়িতে একটা কাজ, আর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? জ্ঞানগম্যি কবে হবে, অ্যাঁ? অন্যান্য ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের দ্বারিকদার ছেলে। কেমন চৌকস করিতকর্মা লোক ছিলেন তো, তাঁর ছেলে কেমন হয়েছে দেখ! বলতে লাগলেন, কোথায় পরের ছেলে—এখনও তো পরের, দু দিন পরে অবশ্য নিজের হবে—সে এসে গা ঢেলে দিয়েছে, আর তুই একবার উঁকি মারলি না! বউদিদি দুঃখ করছিলেন কত! যা যা। আর দেখ্, হাঁদাকে একবার ডেকে দে দিকি? কলকেটা বদলে দিয়ে যাক। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হে, আর এক পেয়ালা ক'রে হবে নাকি? খেতে দেরি হবে বোধ হয়। বন্ধুরা সিগারেট টানছিলেন। একযোগে ঘাড় নেড়ে 'না' বললেন। বার কয়েক চা গিলে খিদেটা নষ্ট করতে রাজী নন তাঁরা, বিশেষ—পোলাওয়ের গন্ধ যখন নাকে আসতে শুরু করেছে। মহেশবাবু বললেন, তা হ'লে আমার জন্যে এক কাপ পাঠিয়ে দিতে বল্।

ঘরের ভিতরে ভিড়। এক পাশে একটা ঘরে জমায়েৎ হয়েছে

মেয়েরা। পাড়ার মেয়েরা, তিলুদের আত্মীয়া ও আলাপী, আর রায় বাহাদুরের বাড়ির মেয়েরা। হাসি গল্পে গানে ঘর জম-জমাট। একটা হ্যাসাগ জলছে ঘরের ভিতরে। রূপ, অলঙ্কার ও অহঙ্কারে ঠিকরে পড়ছে ঝলমলে রূপালী আলো। বারান্দায় একটা ডে-লাইট জলছে, তার আলোতে বারান্দা ও সারা উঠান আলোকিত হয়ে উঠেছে। উঠোনে ছোট ছেলে-মেয়েরা কোলাহল সহকারে খেলা জমিয়েছে।

সমরেশ রান্নাঘরের দিকে চলল। ঘি-মসলার সুরভিতে বাতাস ভরপুর। হাতা-বেড়ির, কড়া-খুন্তির শব্দ শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সমরেশ। ভিতরেও একটা ডে-লাইট জলছে। ও-পাশে বামুন-ঠাকুর রান্না করছে। এ-পাশে উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে তিলু পোলাও তৈরি করছে। এক পাশে দাঁড়িয়ে গুণেনবাবু। গুণেনবাবু গুণী ব্যক্তি, ভাল ভাল মোগলাই রান্নায় ওস্তাদ। তিনিই তালিম দিচ্ছেন তিলুকে।

ধোপদস্ত মিহি, কালোপাড় শাড়ি পরেছে তিলু, আর শেমিজ। আঁচলটা কোমরে জড়িয়েছে। মাথার একরাশ কুচকুচে কালো চুল এলো খোঁপায় আটকেছে। হাতের চারগাছি ক'রে চুড়ি উপরে তুলে দিয়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে, দু হাতে পেতলের হাঁড়ির কানার দু পাশ ধ'রে ঝাঁকানি দিচ্ছে। শুভ্র পরিপুষ্ট বাহু দুটির মাংস-পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে; আগুনের আঁচে মুখ লাল হয়ে উঠেছে; মুক্তা-বিন্দুর মত স্বেদ-বিন্দু জ'মে উঠেছে কপালে গালে চিবুকে।

গুণেনবাবু মালকোঁচা মেরে কাপড় পরেছেন। গায়ে সাদা সিল্কের ফুটো গেঞ্জি। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ ফুটে বেরুচ্ছে ফুটো দিয়ে। চুরুট টানতে টানতে উপদেশ দিচ্ছেন; দু চোখের দৃষ্টি দিয়ে তিলুর সর্বাঙ্গ ধীরে ধীরে লেহন করছেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল সমরেশ। গুণেনবাবুর নজর পড়ল তার ওপর। ব'লে উঠলেন, কি রে? কতক্ষণ?

সমরেশ বললে, এই মাত্র। কথাটা পাড়লেন নাকি?

চোখ মটকে সতর্ক ক'রে দিলেন তাকে গুণেনবাবু।

সমরেশ বললে, লতুর বিয়ের কথা।

আশ্বস্ত হয়ে গুণেনবাবু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কাকাবাবু পেড়েছেন। ওর আর পাড়াপাড়ি কি? ছেলের যখন মন হয়েছে, হয়ে যাবে।

তিনু রান্নায় খুব ব্যস্ত, মুখ ফেরাবার সময় পেল না।

সমরেশ বললে, হাঁদা কোথায়?

তিনু মুখ না ফিরিয়েই বললে, সামনেই তো।

সমরেশ বললে, সামনে হাঁদা নয়, ভোঁদা। হাঁদাকে দরকার। কাকাবাবুর গলা শুকিয়ে উঠেছে, ককাতে শুরু করেছেন। গুণেনবাবুকে বললে, বেশ নামটি বহাল ক'রে দিয়েছে কিন্তু; আমার যে একটা ভাল নাম আছে, সবাই ভুলে ব'সে আছে। গুণেনবাবু বললেন, চা চাই বুঝি? ব্যবস্থা হচ্ছে। তুই যা, মিছেমিছি গরমে পচবি কেন?—ব'লে চোখের ইঙ্গিতে স'রে যেতে নির্দেশ দিলেন।

রান্নাঘর থেকে বেরুতেই উঠোনের এক পাশ থেকে ডাক এল, ভোঁদু না? মায়ের ডাক। সমরেশ কাছে গিয়ে দেখলে, একটা চৌকির উপর ব'সে মা তপনের মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন। মা বললেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? তপনের মাকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেন, প্রণাম কর্। প্রণাম সারা হ'লে বললেন, এই একমাত্র ছেলে; শিবরাত্রির সলতে; সংসারে আর কিছু নেই। কিন্তু ভারী অবুঝ। লেখাপড়া শিখেছে, এম. এ. পাস করেছে; কিন্তু সংসারে মন নেই। কোথায় যে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়! বাড়িতে কাজ। এ বাড়ি আমাদের নিজের বাড়ির মত। তিনুর বাবা যা করেছেন আমাদের, নিজের ভাশুরে তা করে না। তা ছেলে কোথায় কাজে-কর্মে সাহায্য করবে, দেখাশোনা করবে, না, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠাকুরপো দুঃখ করছিল কত! তপনের মার উদ্দেশ্যে বললেন, কিছু হ'ল না মা। কষ্টেই জীবন কাটল, কাটবেও। ছেলে যদি মায়ের দুঃখ না বোঝে, তো মায়ের মরণই ভাল। সমরেশকে বললেন, গা-হাত ধুবি তো ঘরে যা। ভূতের মত চেহারা ক'রে এসেছিস যে! ফরসা কাপড়-জামা প'রে আয়। কত ভদ্রলোক এসেছে!

শোবার আগেই স্নান করব।—ব'লে সমরেশ স'রে পড়ল।

ওদিকে তো একজন ছিপ ফেলে ব'সে আছে, চায় খাওয়াচ্ছে। তপন কোথায়? তার এ পর্ব শেষ হয়ে গেছে। বঁড়শিতে গেঁথেছে মাছ, এখন খেলাচ্ছে মাছটাকে। ডাঙায় তুলতে আর দেরি নেই।

বারান্দার এক পাশে ছাদে যাবার সিঁড়ি। সমরেশ ভাবলে, এ-ঘাটে ও-ঘাটে ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি খাওয়ার চেয়ে ছাদে ব'সে থাকাই নিরাপদ। সিঁড়ির দিকে চলল।

সিঁড়ির সামনে আসতেই দেখলে, লতু তরতর ক'রে নেমে আসছে। হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। সমরেশকে দেখে থমকে দাঁড়াল লতু। দম নিয়ে বললে, ভোঁদু-মামা কখন এলেন? চা খাবেন? শরবৎ?

লতুর দিকে তাকাল সমরেশ। ময়ূরকণ্ঠি রঙের শিল্কের শাড়ি পরেছে লতু, গাঢ় বেগুনী রঙের ব্লাউজ, গলায় হাতায় রূপালী জরির ফুল-তোলা। পরিপাটী ক'রে চুল বেঁধেছে; পিঠে ঝুলছে বেণী। কপালে পরেছে টিপ, চোখে টেনেছে সুর্মা; গাল দুটি লাল—লজ্জায়, না, রুজের রঙে কে জানে! প্রকোষ্ঠে কণ্ঠে স্বর্ণ-অলঙ্কার। অধরোষ্ঠে এক ফোঁটা মিষ্ট হাসি মুক্তার মত টলটল করছে।

সমরেশ তাকাতেই আঁচল দিয়ে মুখ চাপল লতু। এ হাসি কাউকে দেখাবে না সে। অতি দামী জিনিস, যাকে-তাকে দেখানো যায় না। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এমনই ক'রে হাসবে। দেখবে হাসিটি কত মধুর, কত মদির!

হাসি গোপন করল মুহূর্ত মধ্যে; চপল সুরে ব'লে উঠল, মাসী খুঁজছিল আপনাকে। কোথায় ছিলেন? চলুন না, বসবেন।

সমরেশ বললে, ছাদে যাই, কি করব একলা ব'সে ব'সে? সিঁড়ির দিকে এক ঝলক দৃষ্টি হানলে লতু। বললে, ছাদে গিয়ে কি করবেন? বসবেন চলুন। চা খাবেন? ক'রে নিয়ে আসি তা হ'লে।—ব'লে দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

নেমে এল তপন, চোখে ব্যাধের সন্ধানী দৃষ্টি। তীর হানা হয়ে গেছে; অব্যর্থ আঘাত লেগেছে পক্ষিণীর বুকে; কোথায় গিয়ে পড়েছে, সন্ধান করবার জন্তে ঘুরে কাছে দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে নামছে।

সমরেশকে দেখে স্বাভাবিক হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। ব'লে উঠল, কখন এলেন? বেশ লোক কিন্তু! সকাল থেকে একা খেটে খেটে মরছি। বাজার করা, চেয়ার-টেবিল সাজানো, আলো জ্বালা, সব একার ওপর। দিব্বি গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। কোথায় ছিলেন বলুন দেখি?

সমরেশ বললে, প্রতুলের ওখানে।

তপন বললে, প্রতুলের ওখানে? Nature abhors vacuum। জায়গা খালি থাকবার উপায় নেই। কেউ সরতে না সরতেই ভ'রে ওঠে। চোখ টিপে বললে, রোসেনারা আর মিসেস রায়কে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরলেন। একেবারে ত্রিভুজের মধ্যবিন্দু।—ব'লে উঠোনের দিকে দৃষ্টি চালাল।

সমরেশ বললে, নতু রান্নাঘরের দিকে গেছে।

তাই নাকি! আচ্ছা, পরে দেখা হবে।—ব'লে পা চালিয়ে দিলে তপন।

ছাদে এসে আলসের কাছে দাঁড়াল সমরেশ। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। সামনে যত দূর দৃষ্টি যায়, পাশাপাশি ঠাসাঠাসি বাড়ি। কোথাও কোন ফাঁক আছে ব'লে মনে হয় না। হাজার হাজার লোক বাস করছে পাশাপাশি—ধনী, দরিদ্র, ভাগ্যবান, ভাগ্যহীন। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আলো-ছায়া টুকরো টুকরো ক'রে ছড়িয়ে রয়েছে সারা শহরে। এক বাড়িতে আনন্দের আলো ঝলমল করছে, আর এক বাড়িতে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। শৈলীর কথা মনে পড়ল। পীড়িতা মায়ের পাশে বালিশে মুখ গুঁজে স্থির হয়ে প'ড়ে আছে। শ্যামলী শৈলী; কি মূলধন নিয়ে প্রেমের খেলায় নেমেছিল? দেহের যৌবন? হৃদয়ের প্রেম? রৌপ্যের রূপালী আলো না থাকলে সব নিরর্থক। ভূপেনবাবুর মত দশ হাজার টাকা নগদ, বিশ হাজার টাকার গয়না দেবার ক্ষমতা ছিল প্রতুলের?

ছাদের পাশেই একটা নিমগাছে ফুল ফুটেছে। মৃদু মিষ্ট গন্ধ আসছে। দূরে কাদের বাড়িতে গ্রামোফোনে গান বাজছে; মেয়ে-গলার মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। আকাশে মেঘ স'রে গিয়ে তারা দেখা যাচ্ছে।

মনের গায়ে যেন একটা পিন ফুটে গেছে সমরেশের। জ্বালা করছে। তিলু ফিরে তাকাল না? একটি বন্ধুত্বের বন্ধন গ'ড়ে উঠেছে ওর সঙ্গে। তিলু যে বছর আই. এ. পাস করলে এখানের কলেজ থেকে, সে তখন কলকাতায় এম. এ. পড়ছিল। তিলু ঝোঁক ধরলে, কলকাতার কলেজে বি. এ. পড়বে। শুধু তার কাছাকাছি থাকবে, তাকে চোখে চোখে রাখবে—এই ছিল তার বাড়ি ছেড়ে বাইরে পড়তে যাবার মূল উদ্দেশ্য। তিলুর বাবা বাধ্য হয়ে মেয়েকে কলকাতায় পাঠালেন। সমরেশকেই তার পড়া ও থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হ'ল। কলেজের হস্টেলে থাকত তিলু। সপ্তাহে দু দিন দেখা দিয়ে আসতে হ'ত; মাঝে মাঝে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যেতে হ'ত। এত বড় জাঁদরেল মেয়ে কলকাতায় কেমন গোবেচারী হয়ে থাকত। রাস্তায় বেরুলে সারাক্ষণ হাত জাপটে ধ'রে থাকত। একবার দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিল দুজনে নৌকো ক'রে। মাঝগঙ্গায় ঝড় উঠল। তিলুর কি ভয়! বার বার বলতে লাগল, কেন ঝোঁক ক'রে তোমাকে টেনে নিয়ে এলাম? বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, সাঁতার জান তো? সমরেশ জবাব দিয়েছিল, আমি জানলে কি হবে? তুমি তো জান না!

তিলু বলেছিল, আমার জন্যে কে ভাবছে? সেটা বোধ হয় ১৯৪২এর জুলাই মাসে। সারা দেশে কালবৈশাখীর স্তব্ধতা থমথম করছে। মহাত্মা গান্ধী দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিলু কালী-মন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতেই সমরেশ জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে, কি প্রার্থনা করলে? তিলু ম্লান মিষ্ট হাসি হেসে জবাব দিয়েছিল, তোমার যেন সুমতি হয়। সুমতি হয় নি তার; জেলে গিয়েছিল সে। কিন্তু তিলুর অন্তরের মধ্যে যে স্নেহময়ী বান্ধবী অকৃত্রিম গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে তার পানে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি মেলে ব'সে আছে, তার পরিচয় পেয়েছিল সমরেশ। গুণেনবাবুর গুণে মুগ্ধ হয়ে তিলু যদি ওকে বিয়ে করে তো করুক। তিলু সুখী হোক, তবু এত দিনের বন্ধুকে এক ফোঁটা চোখের দৃষ্টি দিতে সে কার্পণ্য করলে! এটা সহ্য করতে কষ্ট হ'ল সমরেশের।

ছাদটি বেশ পরিষ্কার, তকতক করছে। ছাদের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সমরেশ।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সমরেশ। জেগে উঠল নাড়া খেয়ে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে, তিনু পাশে ব'সে ডাকছে—ভোঁদু, ভোঁদু, ওঠ।

উঠে বসল সমরেশ। হাত দিয়ে চোখের ঘুম মুছে বললে, কি ব্যাপার? হাঁকাহাকি করছ কেন?

তিনু বললে, আচ্ছা ঘুম তো! ডাকছি এত ক'রে!

সমরেশ বললে, ঘুমোই নি তো। ধ্যানস্থ হয়েছিলাম। লক্ষ্মী-নারায়ণের যে মূর্তি দেখে এসেছি, তারই ধ্যান করছিলাম এতক্ষণ। সত্যি! ভারি ভাল লাগল আজ।

ব্যঙ্গের সুরে বললে তিনু, খু-উ-ব ভাল লেগেছে বুঝি?

সমরেশ বললে, হ্যাঁ, খুব। ভারি মানিয়েছিল তোমাদের।

তিনু ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, ফাজলামি করতে হবে না, ওঠ। খেতে ব'সে গেছেন সব। কাকাবাবু ডাকাডাকি করছেন।—ব'লে উঠে দাঁড়াল।

সমরেশও উঠে দাঁড়াল। তিনু কতক্ষণ সমরেশের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, এই ধুলোর ওপরেই শুয়েছিলে? বাড়িতে কি বিছানা ছিল না?

সমরেশ বললে, যেখানে হোক শুলেই হ'ল। খাট-পালঙ্ক, বিছানা-বালিশ—অত বাবুগিরি কি চলে আমাদের? চল।

তিনু তিরস্কারের সুরে বললে, কি চেহারা করেছ! ওই ময়লা, মোটা খদ্দর! উস্কো-খুস্কো চুল! দাড়ি কামাও নি! মুখে একবার হাত দিলাম তো হাতটা খচখচ ক'রে উঠল! ভদ্রলোকের সমাজে বেরুবার অযোগ্য হয়ে উঠছ তুমি।

সমরেশ বললে, যাব না তা হ'লে। ভদ্রলোকদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাক। চ'লে যান ওঁরা। তারপর নামব।

তিনু ধমকের সুরে বললে, খুব বাহাদুরি হয়েছে। সারাদিন খেটে রাত বারোটা পর্যন্ত তোমার জন্যে জেগে থাকব নাকি? এস, বাথ-রুমে

হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে খেতে বসবে চল।—ব'লে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বললে, আসছ?

তিলুর পিছু পিছু চলল সমরেশ। তিলু মোলায়েম কণ্ঠে বললে, অন্যায় কিছু বলি নি। আয়নায় দেখ গিয়ে চেহারাটা, তাকাতে পারবে না।

সমরেশ বললে, সেই জন্যেই তো তাকালে না, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হেসে বললে তিলু, অভিমান হয়েছে? ভাল জিনিস জুটো হ'লেও ভাল। ভাগ্য আমার ফিরল বুঝি!

সমরেশ বললে, ফিরছেই তো। লক্ষপতির ঘরণী হবে। আমাকে আর একদিন খাইও কিন্তু। মাসী-বোনঝির একসঙ্গে বিয়ে পেকে উঠল! এক খাওয়াতেই সেরে দিও না।

গর্জে উঠল তিলু, ভারী বেড়ে উঠেছ তুমি। খাওয়ার পরে হবে।—ব'লে ঝুমঝুম ক'রে নেমে গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে সমরেশ খেতে বসল। মেয়েদের খাওয়া হয়ে গেছে। তাঁরা সব বাড়ি চ'লে গেছেন। পুরুষেরা খেতে বসেছে। তিলু পরিবেশন করছে। মহেশবাবু সমরেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ছিলি র‍্যা?

তিলু বললে, ঘুমুচ্ছিল।

মহেশবাবু মুখ ভেংচে বললেন, নিষ্কর্মার যা কাজ আর কি!

তপন মুখ টিপে হাসল। রান্নাঘরের বারান্দার দিকে তাকাল। দৃষ্টি ও হাসির বিনিময় হ'ল লতুর সঙ্গে। রান্নঘরের থামের আড়ালে ছিল লতু।

খাওয়ার পরে পান চিবুতে চিবুতে, সিগারেট টানতে টানতে সব বিদেয় হলেন। তপনের আর একটু থাকবার ইচ্ছা ছিল। রায় বাহাদুর টেনে নিয়ে গেলেন তাকে। নিজের গাড়িতে ক'রে বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। গুপেনবাবু ও মহেশবাবু শুয়ে পড়লেন। বাতি সব নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। রান্নাঘরেরটা শুধু জ্বলতে লাগল।

উঠোনের এক পাশে চৌকিতে ব'সে ছিল সমরেশ। তিলু ও লতু সমরেশের মাকে খেতে বসিয়ে দিয়ে সমরেশের কাছে এসে বললে, একা একা ব'সে করবে কি? আমরা খাব। কাছে বসবে এস।

সমরেশ হেসে বললে, খাওয়া দেখতে দেখতে যদি ঢোক গিলে ফেলি?

তিলুও হেসে বললে, এখনও খাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি? পেট ভরে নি বুঝি? বেশ তো, খাবে আমাদের সঙ্গে।

সমরেশ ব'লে ফেললে, তোমার সঙ্গে?

সমরেশের দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে তিলু বললে, কদিনে বেশ তৈরি হয়ে গেছ তো? নাম-করা মেয়েদের সঙ্গে মিশছ! হবে না? চুলের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় নি সারাদিন।

রান্নাঘর থেকে সমরেশের মা ডাক দিলেন, তিলু, এস মা।

তিলু বললে, যাচ্ছি কাকীমা! ভোঁদুকে বলছি একটু থাকতে। আপনাকে নিয়ে যাবে। তা রাজী হচ্ছে না।

মা বললেন, ভাল কাজে কবে রাজী হয় মা? ওর কথা ছেড়ে দাও। তুমি চ'লে এস। যা ইচ্ছে করুক ও। মায়ের ওপরে যা দরদ!

গজগজ করতে লাগলেন মা।

দুষ্টুমি-ভরা চোখে সমরেশের দিকে তাকিয়ে তিলু বললে, কেমন, হয়েছে তো? ব'সে থাক। এস না!—ব'লে তিলু যেতে উদ্যত হতেই সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দেখ তিলু, তোমার যদি আমাকে কিছু বলবার থাকে, মায়ের কাছে ব'লো না। খাবার সময়ে উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। তাতে অসুখ হতে পারে। বুড়ো মানুষ তো। তার চেয়ে মা যখন কাছে থাকবেন না, তখন ব'লো।

তিলু বললে, বেশ, তাই বলব খাওয়া-দাওয়ার পরে।

দুজনে রান্নাঘরের দিকে গেল।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

স্মরণিক

আজি আমি হেরিতেছি কল্প-নেত্রে দিয়া,
একা তুমি ব'সে আছ কপোতাক্ষ-তীরে,
নীরবে নদীর স্রোত চলেছে বহিয়া—
স্মরণের চিতা জ্বলে,—তিতি অশ্রুনীরে।
কি চেয়েছ মোর কাছে? কি দিয়েছি আমি?
প্রেমের নিকষে কবি তাহারে যাচাও;—
কত ভালবেসেছিনু জানে অন্তর্যামী!
কতখানি মূল্য তার তুমি ব'লে যাও?

তোমার ধেয়ান সখি নিয়ে যায় মোরে
সেই লোকে,—যেথা আঁখি পথ ভুলে যায়,
ধূসর-কুহেলি ঘেরা দূর দিগন্তরে,—
স্বপ্নপরী যেথা লাস্যে নূপুর বাজায়।
অসীমের নেশা জাগে,—পদে পদে চাই;
সব চলা শেষ ক'রে দূরে স'রে যাই!

* * * * *

একদিন ফুটেছিলে কুঁড়ি হয়ে তুমি,
মানস-মালঞ্চে মোর,—নিরালা কোণেতে,—
মলয়ের যাদুমন্ত্রে সহসা কুসুমি,
আপনার গন্ধ-ভারে উঠেছিলে মেতে।
গলায় দুলিতে গিয়া পড়িলে ধূলায়,
ঝটিকার অঙ্কে চড়ি নিমেষে মিলালে।
রিক্তডালি মালাকর করে হায় হায়!
তোমার বৃন্তের ক্ষতে নিত্য অশ্রু ঢালে।

আর কি দেবে না ধরা ব্যগ্র-বাহুপাশে,
প্রসারিয়া আছে যাহা দীর্ঘ প্রতীক্ষায়?
আর কি গো উদিবে না মোর চিত্তাকাশে,
প্রভাত-লক্ষ্মীর মত রক্তিম আভায়?

মাধবীর মধু রাতে শোনাবে না গান,
যার লাগি আজও আমি পেতে আছি কান ?

* * * * *

মনে পড়ে একদিন রজনী প্রভাতে,—
আবরিয়া তনুখানি রক্তরুচি বাসে,
এসেছিলে কুঞ্জগেহে ফুলডালি হাতে,
লাজনম্র নত নেত্রে চয়নের আশে।
দুটি কম্র কথা ক'য়ে,—স্নিগ্ধ দিঠি দিয়ে,
উদ্বেলিত করেছিলে শীর্ণ হিয়াখানি।
এক ফুল দিয়েছিলে শত ফুল নিয়ে,
নন্দনের স্বপ্ন-মোড়া পারিজাত-রাণী !

কল্পনা উড়ায়ে আনে চৌমুনির চরে ;
মধ্যাহ্নের খরতাপে ব'সে ব'সে হেরি,—
আগনের ক্ষেতখানি হৈম-শস্যে ভরে,
কিষাণের মুখে হাসি,—আর নাহি দেরি।
আনন্দের রসোচ্ছ্বাসে বনান্তর থেকে,
'বউ-কথা-কও' ওঠে মাঝে মাঝে ডেকে।

* * * * *

চলে দেহ, চলে মন, অবিরাম গতি,—
স্থিতির গণ্ডিতে এসে জ্বালা যেন বাড়ে ;
নির্লক্ষ্য গ্রহাণু ছুটে হারাইয়া জ্যোতি,
নিঃস্বতার ভস্মস্তূপ,—দাহ নাহি ছাড়ে !
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা অনন্ত আকাশ,
বিচিত্ররূপিণী পৃথ্বী,—মোরে ঘেরি তারা,
আপনারে নানা ছন্দে করিছে প্রকাশ,
অসীমের মাঝখানে হই দিশাহারা।

ব্যর্থ দীর্ণ স্বাদহীন খণ্ডিত জীবন,—
পাষাণের বোঝা নিয়ে দেশে দেশে ফিরি ;

আমি শুধু যাযাবর অক্লান্ত চরণ,
উতরিয়া নদী-মরু অরণ্যানী গিরি।
মাধুরীর পেলে সাড়া মুখ তুলে চাই,—
হারানো রূপের যদি কণা খুঁজে পাই।

* * * * *

আর কোন কাজ নাই—স্মৃতি বুকে করি
পথে যেতে গাহি গান তোমারি উদ্দেশে,—
তুমি সাথে নিত্য রহ ধ্যানের ঈশ্বরী,
অলক্ষিতে নিয়ে যাও আলোকের দেশে।
নাহি যেথা প্রেমে গ্লানি ব্যথার বরষা,
দুঃখ দ্বিধা অভিশাপ মান অভিমান;
অতল সৌন্দর্যে ভরা,—অসীম ভরসা,
বিরহের ছায়া যেথা নাহি পায় স্থান।

দিনান্তের রবিরশ্মি ঠিকরিছে চোখে,—
রাখালীয়া বাঁশী বাজে পূরবীয়া সুরে,—
শ্রান্তি নাহি, ক্লান্তি নাহি, কোন্ স্বপ্নলোকে,
ছুটিয়াছে মন মোর দূর হতে দূরে।—
তুমি সখি ওই পারে, আমি হেথা একা,
নাহি জানি খেয়া-শেষে কবে হবে দেখা?

শ্রীশান্তি পাল

—

সন্ধানী

বণিক কহিল, আমি যুগে যুগে খুঁজিয়া ফিরেছি ধন।
ভাবুক কহিল, আমি প্রতি যুগে তালাস করেছি মন।

সংযোগী

দূরের আকাশ দূরেই রহিল মাটির মানুষ কাছে;
কবিরা রচিল সংযোগ-সেতু চির-ব্যবধান মাঝে।

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ফেয়ারওয়েল

চৌদ্দ পোয়া হইয়া আছি।

এক পা বেনাপোলে, এক পা বনগাঁয়ে—দুই পায়ের মাঝখান দিয়া কালস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। একদিন একদিন করিয়া জীবনের জোয়ার তো প্রায় শেষ হইয়া আসিল; তবু মন স্থির করিয়া বলিতে পারিতেছি না, এই দিকেই যাই, ঐ পাটাকে তুলিয়া আনি। পারিতেছি না; ক্রমাগত দ্বিধায় আর দ্বন্দ্বে চৌদ্দ পোয়ার সাড়ে-তিন-সেরী টানে, সাড়ে-তিন-হাত মাত্র দেহের মনের আপাদ-মস্তক টনটন টনটন করিতেছে।

বিধাতাপুরুষ রসিক লোক, আর কিছু দিন না-দিন কান আস্ত দুইখানাই দিয়াছেন, বেশ বড় বড় কান, বড় বড় ফুটা। যাহার ইচ্ছা ধরিয়া আরামসে টানিতে পারে; যে কথা ইচ্ছা অক্লেশে ঢুকিয়া যাইতে পারে। কান থাকিবার ঐটাই অসুবিধা।

ঢুকিতেছেও—খালি ঢোকা নয়, একেবারে মর্ম পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিতেছে। এ-কানে এ-পক্ষের বাণী আর ও-কানে ও-পক্ষের আওয়াজ,—দিশাহারা হইয়া যাইতেছি, কোন্ কথাটা শুনি, কোন্ দিকটাতে যাই ভাবিয়া মনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছে।

ইঁহারা বলেন, সাবধান, ওরা মুরগী খাওয়াইয়া জাত মারিয়া দিবে, সময় থাকিতে চলিয়া আইস।

উঁহারা বলেন, হুঁশিয়ার হো, ওরা স্রেফ নিরামিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে, সময় থাকিতে বুদ্ধি ঘটে আন, ও-দিকে পা বাড়াইও না।

ইঁহারা বলেন, এখনও আছ? ওরা আস্ত কাটিয়া খাইয়া ফেলে, জান?

উঁহারা বলেন, এখনও যাইতে চাও? ওরা নিছক অনাহারেই মারিয়া ফেলে, জান?

দুই ঠ্যাং ধরিয়া, দুই কান ভরিয়া দুই পক্ষ টানাটানি করিতেছে, আমি নিরীহ বেচারী, জরাসন্ধবধ হইবার উপক্রম।

বিশ্বচরাচর পেট ভরিয়া মজা দেখিতেছে; অন্তরীক্ষে দেবর্ষি নারদ মহানন্দে নখে নখ বাজাইতেছেন।

নারদ একা অবশ্য নন, অনুচর শিষ্যপ্রশিষ্যের কিছুমাত্র অভাব নাই তাঁহার। খালের এ-পারে আসিয়া দাঁড়াই। মূল্যবান লোকদের মূল্যবান মতামত শুনি, আর অবাক হইয়া ভাবি, ও-পারের লোকগুলা এতদিন বাঁচিয়া আছে কি করিয়া? আবার ও-পারে গিয়া দাঁড়াই, মূল্যবান লোকদের মূল্যবান মতামত শুনি, আর অবাক হইয়া ভাবি, এ-পারের লোকগুলা এতদিন বাঁচিয়া আছে কি করিয়া? যত কথা শুনি তাহার সমস্তখানি মিথ্যা নয় বুঝি; হইলে এতগুলি মানুষ এতখানি বিভ্রান্ত হইয়া দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করিয়া মরিত না। সমস্তখানি সত্য নয় তাহাও বুঝি; হইলে এতদিনে দুই পারের দুইটি অঞ্চলই জনশূন্য হইয়া যাইত। কিন্তু কথা যা শুনি তাহার কতটুকু ও কোন্‌টুকু সত্য, কতটুকু ও কোন্‌টুকু মিথ্যা, বুঝিব কি করিয়া? বলেন যাঁহারা, তাঁহারা মহান ব্যক্তি, তাঁহাদের সত্য কথা মহাসত্য, মিথ্যা কথাও মহামিথ্যা। তাহার মূল্য ও পরিমাপ যাচাই করিব এমন স্পর্ধা রাখি না। মহামনের মণ-মার্কা মতামত ও মন্তব্য, আমার দেড়-ছটাকী বুদ্ধির সাধ্য কি তাহার মোহড়া লইব?

রেল-লাইনের পাশে আমার ঘর; ঘর হইতে বাহির হইলেই হইল, দুই-পা মাত্র দূরে স্টেশন। সকাল বিকাল স্টেশনে যাইয়া গাড়ি দেখি আর অবাক হইয়া ভাবি, এত মানুষও কি দেশে ছিল? প্রতিদিন প্রতিটি ট্রেন বোঝাই হইয়া এত যে লোক দুই দিকে যাইতেছে, যায় কোথায়? যায় যদি, ফুরায় না কেন? যাওয়ার যা রেট, অঙ্কশাস্ত্রের যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে, তবে এতদিনে দুইটি রাষ্ট্রই মানুষ ফুরাইয়া জনহীন হইয়া যাইবার কথা। অঙ্কশাস্ত্র মিথ্যা, তাই ফুরায় না, তাই রেলগাড়ি আর রেলগাড়ি-বোঝাই মানুষ পার্থিব গতিতে ক্রমাগত ঘুরিয়া মরিতেছে—জ্যামিতিক সার্কলের মতই সে যাত্রায় আদিবিন্দুও নাই, অন্তবিন্দুও নাই।

নাই বলিয়াই, তাহার অন্তহীন যাত্রায় যোগ দিতে দ্বিধা করিতেছি। চতুষ্পার্শ্বে অবশ্য তাহা লইয়া অনুযোগ-অভিযোগের অন্ত নাই। ইনি বলেন, এখনও নড় না? উনি বলেন, এখনও নড়িতে চাও? তিনি বলেন—যা বলেন তা লেখা চলে না, কারণ কথাটি আমার বুদ্ধির বর্ণনাত্মক।

কিন্তু মশায়, বুদ্ধিদাতা বহু, আমার বুদ্ধির আধার একটিমাত্র। এত অসংখ্য-প্রকারের অসংখ্য-সংখ্যক বুদ্ধি আমি রাখি কোথায়? যদি রাবণ হইতাম, বাসুকি হইতাম, এক-একটা মাথায় এক-এক রকম বুদ্ধি বেশ অনায়াসে জমাইয়া রাখিতে পারিতাম। কিন্তু এটা Poll-tax-এর যুগ, একাধিক মাথা থাকা শাস্ত্রের বারণ। কি করা যায় বলুন তো?

*　　*　　*　　*

বলিতে পারিতেছেন না? আপনারও বুদ্ধি ঘুলাইয়া গিয়াছে? তবে শুনুন—বলার সাধ্য যাহার নাই, তাহার শোনাই কর্তব্য। শুনিতে কষ্টও কিছুই নাই, কান বিধাতাপুরুষ আপনাকে তো আস্ত দুইখানাই দিয়াছেন, বেশ বড় বড় কান, বড় বড় ফুটা। যে কথা ইচ্ছা অক্লেশে ঢুকিয়া যাইতে পারে, কান থাকিবার ঐটাই সুবিধা।

শুনুন। আমার জীবনে একটি ফিলজফি আছে: যাহাকে এড়ানো যাইবে না তাহাকে হাসিমুখে মানিয়া লও; যাহাকে জয় করা যাইবে না তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দাও। এই একটি নীতির জোরে আমি বাঁচিয়া আছি; আমি বলিতে পারি, ইহার জোরে প্রত্যেকের পক্ষেই বাঁচিয়া থাকা সম্ভব।

লেখা গম্ভীর হইয়া যাইতেছে? উপদেশ-উপদেশ শোনাইতেছে? ভয় নাই, উপদেশ দেওয়া আমার ব্যবসা নয়। ভয় পাইবেন না, শ্রবণ করুন।

মার্কস বলেন, মন বস্তুটাই নিছক receptive impression-এর ব্যাপার—সংসারে কি ঘটিতেছে, সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হইতেছে, আমি কোন্‌টাকে কি ভাবে গ্রহণ করিলাম, কাহাকে কোন্ ভাষ্য করিয়া বুঝিয়া লইলাম।

একটা উদাহরণ দিই।

কলিকাতায় দাঙ্গা হইয়াছিল। বহু লোক পাড়া ছাড়িয়া, শহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। আমি বাড়ি খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম। আমি জানিতাম, দাঙ্গার ফলে কিছু মানুষ মরিবে এবং আর কিছু মানুষ পলাইবে, আমি এই ফাঁকে একটা বাড়ি ভাড়া পাইয়া যাইতে পারি। প্লেগের ভয়ে আপনারা কাতর হইয়াছিলেন; আমি আশা করিয়াছিলাম, হয়তো এবার ট্রাম ও বাসে ভিড় কিছু কমিবে।

চটিতেছেন? আমাকে দুর্বৃত্ত পাষণ্ড বলিতে ইচ্ছা হইতেছে? তা চটুন, তা বলুন। আমি কিছুমাত্র রাগ করিব না, যাহাদের বুদ্ধি কম, তাহারা সবুদ্ধি শুনিলে মানিয়া লইতে পারে না আমি জানি, নিছক ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সের বশেই চটিয়া যায়। সে চটার জন্য রাগ করার অর্থ হয় না। ওটা অনুকম্পার ব্যাপার। কিন্তু চটুন আর যাই করুন, কথাটাকে মিথ্যা ভাবিবেন না। আপনি অন্ধ, তাই বলিয়া আমি দার্শনিক ব্যক্তি দর্শন করা ছাড়িব কেন?

ছাড়িবার হেতুও দেখি না। পাকিস্তান হইতে হিন্দুরা পলাইতেছে। আমরা যাহারা আছি, দেখিতেছি, চাউল সস্তা হইয়াছে। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে মাছ-তরকারি চলাচল বন্ধ হইল। আমরা সস্তায় প্রচুর মাছ ও দুধ পাইতেছি। দৌলতপুরের বাজারে একটাকা-পাঁচসিকায় একটা দেড় সের ওজনের মুরগী পাওয়া যাইতেছে, জানেন? তারপরও কি বলিবেন, নন্‌-ডিভ্যালুয়েশন খারাপ?

ঐটাই কথা। হতাশ হইবেন না, ঘাবড়াইবেন না, সকল বস্তুরই উজ্জ্বল পার্শ্ব টা দেখিতে শিখুন।

সম্প্রতি দুইটা কথা লইয়া কি আলোচনা কানে আসিয়াছে, তাহাই বলি। আমার পাশাপাশি বহু স্থানে বহু মুসলমান মোহাজের আসিয়াছেন; যে সকল বড় বড় বাড়ি খালি পড়িয়াছিল সেগুলি ভর্তি হইয়া যাইতেছে। ইহাতে অনেকে চটেন। বলেন, কেন, এ রকম করিয়া কেন তোমরা গ্রাম দখল করিবে?

আমি চটি না। আমি জানি, চটিবার কোন কথাই নাই ইহাতে। সেনহাটি গ্রাম রি-পপুলেটেড হইয়াছে। সে তো ভাল কথা।

মানুষজন ছিল না গ্রামে। সে গ্রাম আবার মানুষে ভরিয়া উঠিল। ইহাতে ক্ষোভ বা দুঃখের কি আছে? সে মানুষেরা তোমাদের অপরিচিত বা ভিন্ন জাতীয়, তাই তোমাদের রাগ? বেশ তো, বাড়ি ছাড়িয়া তোমরা চলিয়া না গেলেই পারিতে। প'ড়ো বাড়ি পাইলে ভূতে বাসা করিবে, সে তো জানা কথাই ছিল। গেলে কেন? দুয়ারে ছয় পয়সা দামের তালা লাগাইয়া সাত গাঙের পারে গিয়া বসিয়া ছিলে। যাহাদের দরকার তাহারা বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে। লইবেই তো, আপত্তি করিবার কিছু কি আছে তোমাদের? যাহারা ঢুকিয়াছে, তাহারা তো তোমার ঘাড় বা ঠ্যাং ভাঙে নাই। ছয় পয়সা দামের একটা তালা যদি ভাঙিয়াই থাকে, ছয় পয়সা দামের তালা তোমার প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্য ইহাই যদি তোমার নিজের ধারণা হয়, তবে তোমার মূল্যই বা সাত পয়সার বেশি বলিয়া মানিব কেন?

স্থান শূন্য থাকে না, সহজ কথা, বিজ্ঞানের কথা। প'ড়ো বাড়িতে ভূতে বাসা করে, ইহা শাস্ত্রবচন। তুমি চাও, বাড়ি তোমারই থাকুক? ভাল কথা। সেখানেও বিজ্ঞানের বচন আছে, একই স্থানে একই সময়ে দুইটি বস্তু থাকিতে পারে না। বাড়িতে যদি থাকিতে, অন্যে বাড়ি দখল করিত না। ফিরিয়া আইস, আবার বাড়ির দখল পাইবে। ফেরাটা অবশ্য ফেরার মত ফিরিতে হইবে, স্বজনপরিজন লইয়া, ঢাকঢোল বাজাইয়া পৈতৃক ভিটাতে স্থায়ী বাস করিব বলিয়াই ফিরিতে হইবে।

ফিরিবে না? বেশ কথা, উত্তম কথা।

আমিও কিছুমাত্র দুঃখ করিব না তোমার জন্য, বলিব, আপদ গিয়াছে।

যাঁহারা এখনও আছেন তাঁহাদের নালিশ, এই অপরিচিত ও অজাতি প্রতিবেশী লইয়া বাস করিতে পারিতেছেন না। এ যুক্তিটাও আমি ঠিক বুঝি না। হইতে পারে, যাহারা গিয়াছে তাহারা তোমাদের স্বজাতি স্বগোত্র ছিল। কিন্তু তোমাদের পিছনে ফেলিয়া যাহারা চলিয়া গেল তাহারাই তোমার স্বজন; আর জনহীন গ্রামে তোমাদের পাছে মন খারাপ লাগে ভাবিয়া যাহারা নিজের

দেশ নিজের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া তোমার পাশে বাস করিতে আসিল তাহারাই তোমার অনাত্মীয়? আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়া চলিয়া গেল যাহারা তাহাদের ভুলিয়া যাও, আসিল যাহারা তাহাদেরই প্রতিবেশী বলিয়া মানিয়া লও, দেখিবে, আর মন খারাপ হইবার কারণ থাকিবে না।

তারপরও খারাপ লাগিতেছে? বেশ, বুদ্ধির দুয়ারটা আর একটু খোল। খুলনা জেলা হিন্দুস্থানে পড়িবে বলিয়া বড় আশা করিয়াছিলে, সেনহাটি গ্রাম কলিকাতায় গিয়া উঠিবে এই ইচ্ছা তোমাদের ছিল। মহম্মদ যান নাই, পর্বতকে আসিতে হইয়াছে, সেনহাটি কলিকাতা হইয়া উঠিয়াছে, গোটা মেছুয়াবাজার স্ট্রীটটাই সেনহাটিতে চলিয়া আসিয়াছে, তবুও সংশয়?

আচ্ছা, আরও সহজ করিয়া ফেল কথাটাকে। যাহারা ভরসা করিয়াছিলে, জওহরলাল হুকুম দিবেন আক্রমণ কর আর খুলনা জেলাটা রাতারাতি হিন্দুস্থান লইয়া যাইবে, তাহারা তো এটাও বুঝিয়া ফেলিতে পার—এই মোহাজের পাঠানোর মধ্যে তাঁহাদের কী প্রকাণ্ড সূক্ষ্মবুদ্ধির খেলা থাকিতে পারে। কলিকাতা হইতে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার হইতে যাহারা আসিতেছে, তাহারা তো আসলে হিন্দুস্থানেরই মানুষ। ভাবিয়া লও না কেন, ইহারাই আসলে হিন্দুস্থানের অকুপেশন আর্মি—নিঃশব্দে অনায়াসে আসিয়া গ্রামকে গ্রাম দখল করিয়া বসিল, অকস্মাৎ যে দিন তিনরঙা ফ্ল্যাগ উড়াইয়া দিবে, বাস্, এক তুড়িতে বাজি মাত হইয়া যাইবে। বিহারী বলিয়া যাহাদের পর পর ভাবিতেছ, ভয় পাইতেছ, তাহারা আসলে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের দেশের মানুষ, এই কথাটাকেই বড় করিয়া দেখিতে শেখ না কেন? শেখ, দেখিও, শান্তি পাইবে।

পাকিস্তানে মোহাজেররা ভীষণ আদর পাইতেছে, তাহাদের সুখসুবিধার জন্ম, বাসস্থান যোগাইয়া দিবার জন্ম সকলের চেষ্টার অবধি নাই; আর তোমরা যাহারা যাইতেছ, পশ্চিমবঙ্গে জামাই-আদর পাও নাই, এই দুঃখ তোমাদের? ইহাতেই বা দুঃখ করিবার কি আছে? পাকিস্তানীরা পাকিস্তানী, তাহাদের বুদ্ধি কম, মুসলমান দেখিলেই

তাহাকে পাকিস্তানী ভাবিয়া বসে, মোহাজের আসিলেই তাহাকে স্থান দিবার জন্ম নিঃসংশয়ে অধীর হইয়া উঠে। কিন্তু হিন্দুস্থানীরা পাকিস্তানী নয়, তাহারা হিন্দুস্থানী, তাহাদের বুদ্ধি বেশি। তাহারা জানে, হিন্দু হইলেই হিন্দুস্থানী হইবে, এমন কথা নাই; উদ্বাস্তু আসিলেই তাই তাহারা তাহাকে সমাজের মাঝখানে স্থান দিবার মত নিঃসংশয় হইতে পারে না, 'পাকিস্তান ন্যাশনাল' বলিয়া তাহাদের চিহ্নিত করিয়া রাখে, শহর ও বন্দর হইতে দূরে concentration ক্যাম্পে তাহাদের নজরবন্দী করিয়া রাখে। ইহা দূরদৃষ্টির পরিচয়। নুরুল আমীনের চেয়ে বিধান রায়ের বুদ্ধি কম মনে কর তুমি?

সেদিন একটি নালিশ শুনিলাম। একজন বলিতেছিলেন, পাকিস্তানে হিন্দুকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়া উদ্বাস্তু মুসলমানকে স্থান দেওয়া হইতেছে; ওদিকে হিন্দুস্থানে উদ্বাস্তু হিন্দুকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়া প্রত্যাগত মুসলমানকে স্থান দেওয়া হইতেছে। এই অসম নীতির সার্থকতা কি?

সত্যই ইহা হইতেছে কি না আমি জানি না; কিন্তু আমি হিন্দু, আমি বলিব, যদি হইয়া থাকে, ইহার চেয়ে মধুরতর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারিত না।

একটা কথা মনে রাখিও, গত কয় বৎসরে দাঙ্গাদাঙ্গি-খেলায় যে অসীম উৎসাহ ও পটুত্ব আমরা অর্জন করিলাম, তাহা একদিনে লুপ্ত হইবার নয়। তারপর ভাব, এই দুইটি নীতি যদি সত্যই দুই রাষ্ট্রে থাকে, তাহার ফলে কি গ্র্যাণ্ড ফিউচার হিন্দুদের জন্ম সঞ্চিত রহিল। পাকিস্তান হইতে হিন্দুরা তাড়া খাইয়া চলিয়া যাইবে; শুধু মুসলমানেরাই থাকিবে এ দেশে। তারপর যখন আবার তাহাদের দাঙ্গাদাঙ্গি-খেলার ঝোঁক উঠিবে, আর তো হিন্দু থাকিবে না যাহাকে ধরিয়া কিলানো যায়, কাজেই তখন তাহারা নিজেরাই কিলাকিলি করিয়া মরিবে।

আর হিন্দুস্থানে? হিন্দুস্থানের মুসলমানদের টিকাইয়া জীয়াইয়া রাখা হইল, ইহার পরেও যখনই হিন্দুদের মনে দাঙ্গার জোশ

আসিবে, সেই মুসলমানদের তাহারা কিলাইয়া চ্যাপ্টা করিতে পারিবে। সেমসাইড করার কিছুমাত্র দরকার হইবে না তাহাদের।

এই কথাগুলা ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখ। মনে সান্ত্বনা পাইবে, চিত্তে বল আসিবে। আর তাহা যদি না করিতে চাও, তবে আর কি বলিব, যাহা ভাল বোঝ কর। ঘরবাড়ি বেচ, পিতৃপুরুষের পূজার বাসন ছ-আনা সের দরে বিক্রয় করিয়া দাও, (বাজারে এখনও তাহার চাহিদা আছে। বিশেষত ফুল-আঁকা পুষ্পপাত্রের, সেগুলি দিয়া চমৎকার চা ও খাবার পরিবেশনের ট্রে হয়।) দিয়া সেই টাকায় টিকেট কিনিয়া বেনাপোল পার হইয়া চলিয়া যাও। গিয়া রিফিউজী ক্যাম্পে যাও, শুধু, দোহাই তোমাদের, সে ঘরের চাল দিয়া জল পড়ে কিনা, তাহার পথে বর্ষায় কাদা হয় কিনা. তাহা লইয়া খবরের কাগজে কাঁদুনি গাহিও না। ভিক্ষার চাউলের কাঁড়া-আকাঁড়া বাছিয়া লোক হাসাইও না।

আমার উপর চটিতে পার, আমার উপরে কেইবা চটা নয়? আমি সত্য বলি বা না-বলি, অপ্রিয় কথা বলি; তাহার ফলে ঘরে আত্মীয়স্বজন, বাহিরে পাঠক সম্পাদক আমার উপরে চটা সকলেই, তুমি বুদ্ধিভ্রষ্ট ভিটাভ্রষ্ট পররাষ্ট্রের রাস্তার ভিক্ষুক, তুমি চটিয়া আমার আর বেশি কি করিবে?

তোমার উপরে রাগ করি না। তোমার অবস্থা আমি বুঝি। বুঝি অনেক কিছুই, শুধু একটি কথা বুঝি না। তোমাদের দাপটে দৌলতপুর স্টেশনে গাড়িতে উঠা যায় না। খুলনায় উঠিয়াছ—এই অধিকারের দাপটে তোমরা গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া রাখ। লোক উঠিতে গেলে তাহাকে গালাগালি কর, শিশু বৃদ্ধ নারী নির্বিচারে দরজা ও জানালার পথে ঠেলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা কর, ভুলিয়া যাও তাহারাও তোমারই মত ভীতত্রস্ত। তোমার যেমন পলাইবার প্রয়োজন আছে, তাহারও তেমনই আছে।

তবু ইহাও বুঝি, আমি মানুষ চিনি, পশুও চিনি, মানুষের মধ্যে পশু কখন কেন আত্মপ্রকাশ করে তাহাও বুঝি। বুঝি না শুধু একটি

কথা—এক টাকা ছয় আনার টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিয়াছ, সে গাড়ির সঙ্গে তোমার বড় জোর ছয়টি ঘণ্টার সম্পর্ক। সেই গাড়ির এক ফুট ছয় ইঞ্চি জায়গার অধিকার কমিয়া এক ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি হইয়া না যায়, তাহার জন্য যাহাদের এতখানি দৃষ্টি, এতখানি হিংস্র কর্মপ্রেরণা, চৌদ্দপুরুষের বাপের ভিটা ছাড়িয়া যাইবার সময়ে এই ব্রহ্মতেজ তাহাদের ছিল কোথায়? এই মারামারি, এই কামড়া-কামড়ির এক শতাংশও যদি সেখানে দেখাইতে, তবে তো সে ভিটা ছাড়িয়া যাইবার দরকার হইত না। তাহা তোমরা কর নাই, করিবে না। বসিয়া বসিয়া কাঁদিবে, বলিবে জওহরলাল রটনা করে না কেন? বলিয়া আবার জওহরলালের দেশেই আশ্রয় লইতে যাইবে। গিয়া দিবারাত্রি প্রাণপণে জওহরলালকে গালি দিবে। বেশ, যাও, বিনা দ্বিধায় চলিয়া যাও। আমি একজন অন্তত তোমাদের যাইতে নিষেধ করিব না। ফিরিয়া আসিতে বলিব না। তোমাদের মত প্রতিবেশী থাকার চেয়ে, মাছ ও দুধ সস্তা হওয়ার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। যাও, আপদ বিদায় হও।

দধুদ্ধ

জমি-শিকড়-আকাশ

১৩

বীরেশ্বর পৌঁছিবামাত্র সুনয়না বলিলেন, জল-টল খেয়ে দীপিকার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে এস।

বীরেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিল।—কেন?

আমার চিঠি পাও নি?

না তো।

ও!—বলিয়া সুনয়না একটু থামিয়া বলিলেন, আমি ভেবেছিলাম, আমার চিঠি পেয়েই আসছ তুমি।

নাঃ।

যা হোক, এসে ভাল করেছ।—সুনয়না হালকা ঠাট্টার সুরে গুরুত্ব মিশাইয়া বলিলেন, মেয়েটা তোমার জন্তে কেঁদে কেঁদে ম'ল।

কোন্‌ মেয়েটা বউদি ?

সুনয়না সুরটা সংশোধন করিয়া লইলেন। বলিলেন, ঠাট্টা নয়। দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে তুমি চ'লে গেছ শুনে আমার কাছে ছুটে এসেছিল।

ছুটে এসেছিল! হ্যাঁ, তারপরে ? ফিট হয়ে পড়ল বুঝি ?

সুনয়না একটু হাসিয়া বলিলেন, থাক্‌ এখন। পরে বলব। তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও।

না না। তুমি বল না বউদি! খুব ঠাণ্ডাই আছি আমি। হ্যাঁ, তারপরে কাঁদল ? না, সবগুলো একসঙ্গে ছাড়ে নি বুঝি ?

ভুল রাগ করছ ঠাকুরপো।

রাগ!—বীরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।—রাগ করব কার ওপর ? দুঃখ করছি। এমন একটা খেল তার হাতছাড়া হয়ে গেল! তার দুঃখে আমিও দুঃখিত বউদি।

সব শুনলে আর এ রকম ক'রে বলতে পারতে না ঠাকুরপো।—সুনয়না ধীরে বলিলেন।

ব'লে যাও। শুনতে আমার কোন আপত্তি নেই।

থাক্‌, তার কাছেই শুনো।

তার কাছে ?—বীরেশ্বর হাসিল। তা শুনব হয়তো কোনদিন। দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ার তো কিছু নেই। দেখাও হবে, আলাপও হবে। না হবার কি আছে ?—বীরেশ্বর ভাল-মানুষের মত নিশ্চিন্তে জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইল।

সুনয়না নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

হঠাৎ আবার উঠিয়া আসিয়া সুনয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল বীরেশ্বর। বলিল, সে বুঝি খুব আনন্দ করেছে যে, তারই জন্তে আমি দেশত্যাগী হয়েছি ? না, বউদি ?

কি যে বলছ ঠাকুরপো, আনন্দ করবে কেন ?

হাঁ হ্যাঁ, তাই করেছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।—বীরেশ্বর অবুঝের মত বলিতে লাগিল, তুমি তাই বুঝিয়েছ তাকে! অথচ আমি যখন যাওয়া স্থির করি, তখন জানতামও না যে, ওরা কোথায় গেছে।

এসব কোন কথাই হয় নি ওর সঙ্গে।—সুনয়না হাসিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি ঠাকুরপো।

বেশ, দেখা হ'লে কথাটা ব'লে দিও তুমি।—বীরেশ্বর আবার কাজে লাগিয়া গেল।

সুনয়না চুপ করিয়া গেলেন তখনকার মত। খাওয়ার সময় বীরেশ্বর বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া সুনয়নাকে ফাঁক দিল না।

দাদার শরীর ভাল আছে তো?

হ্যাঁ, তা আছে।

গীতাপাঠ রীতিমতই চলছে নিশ্চয়?

আগের চেয়ে বেশি।

চিঁড়ে দই?—বীরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল।—কলা?

সেদিকে কোন ত্রুটি নেই।—সুনয়না হাসিলেন।—আর সব দিকে খরচ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে।

ও!—বলিয়া বীরেশ্বর গম্ভীর হইল। মুহূর্ত পরে।—স্বামীজীর খবর কি?

স্বামীজীর খবর তো আমি রাখি না।—সুনয়না বলিলেন, হ্যাঁ, আশ্রমের—কি বলে—প্রতিষ্ঠা-দিবস হবে শীগগিরই। স্বামীজী ব্যস্ত খুব।

বেশ। আর—ইয়ে—আর কি খবর বল?

আর তো কোন খবর দেখি না।

কিন্তু বীরেশ্বরের অভাব হইল না। শেষ পর্যন্ত চালাইয়া লইয়া গেল।

ঘরে গিয়া বীরেশ্বর যখন আলমারি হইতে বইগুলি এক-একখানা করিয়া বাহির করিয়া দেখিতেছিল, সুনয়না আবার প্রবেশ করিলেন।

পদশব্দেই বীরেশ্বরের ঘাড় শক্ত হইয়া উঠিল। দীপিকা আসিয়াছে, অনুভব করিল। বইয়ের পাতা একমনে উল্টাইতে লাগিল।

সুনয়না অনেকক্ষণ প্রতিপক্ষ দীপিকায় মিশিয়া গিয়াছে বীরেশ্বরের মনের মধ্যে।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুনয়না আস্তে আস্তে বলিতে

লাগিলেন, ওর কাছে একবার যাও ঠাকুরপো। একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে অনেক মেয়েটা। সে দীপিকাই আর নেই, জান? কাঁদল ব'লে ঠাট্টা করলে তুমি। সত্যি, সেদিন আমার কাছে সব বলতে বলতে সে কি কান্না! কিছুই লুকোয় নি, সব বলেছে আমার কাছে। ঘুমে বলেন্দু কি সব কেলেঙ্কারি করবার মতলব করেছিল, সে সব পর্যন্ত বলেছে আমার কাছে।

বীরেশ্বর এবার সবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইল —কি?

সে অনেক কথা।—সুনয়না একটু গুটাইলেন তখন।

কি কথা?—সংক্ষিপ্ত অধীর প্রশ্ন করিল বীরেশ্বর।

সুনয়না আর একটু বিলম্ব করিয়া তারপরে বলিয়া ফেলিলেন, আবার কি? বদ ছেলেদের যা কাজ তাই। একদিন দীপিকাকে একা বাড়িতে পেয়ে ধরতে গিয়েছিল ঐ বলেন্দু।

কেন?

সুনয়না হাসিয়া ফেলিলেন। শোন বোকার কথা! কেন?

বীরেশ্বর উত্তপ্ত হইয়া লাল হইয়া গেল লোহার মত।

একেবারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আমাদের!—সুনয়না উত্তাপ বাড়াইয়া দিলেন।

তারপরে?—বীরেশ্বর কোনমতে জিজ্ঞাসা করিল।

সুনয়না দীপিকার গর্বে গরবিনী হইয়া উঠিলেন যেন। তেজের সঙ্গে বলিলেন, তারপরে আবার কি? দীপিকাও তেজী মেয়ে, চেঁচাবার ভয় দেখিয়ে তখখুনি বার ক'রে দেয় ঘর থেকে। পরের দিনই চ'লে আসে।

বীরেশ্বর অনুভূতির সীমানা ছাড়াইয়া 'নো ম্যান্‌স ল্যাণ্ডে' পড়িয়া গেল যেন।

সুনয়না বলিলেন, তুমি একবার যাও ঠাকুরপো। আগের দিন তুমি ওকে যে সব কথা বলেছিলে, তার জবাব দিতে পারে নি ব'লেই ওর সবচেয়ে বেশি দুঃখ। বলে কি, শুনবে? বলে যে, তোমার কাছে কথা কটি বলতে পারলেই ওর ম'রে যেতেও আপত্তি নেই। তখন আমার হাসি পেল অবিশ্যি। কিন্তু, সত্যি কষ্ট পাচ্ছে।

শরীরের মধ্যে এবার একটা মোচড় দিয়া উঠিল বীরেশ্বরের।

সুনয়না বলিলেন, তোমরা পুরুষেরা বড় বোকা! এত ভালবাসে তোমাকে, একদিনও বুঝতে পার নি তুমি?

এতক্ষণে তর্ক-প্রবৃত্তির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিয়া গেল বীরেশ্বর। বলিল, তোমরা আবার বেশি চালাক যে! বুঝতে তো দেবেই না, নিজেকেও ফাঁকি দেবে।

নিজেকে দিই বরং। কিন্তু আর কাউকে না।—সুনয়না গর্বের সঙ্গে বলিলেন।

কি জানি তোমাদের কথা!—বীরেশ্বর ক্রমশ সহজ হইয়া আসিতে চাহিল। আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সুনয়না একটু হাসিয়া বলিলেন, আমার কর্তব্য আমি করলাম। এখন যা ভাল বোঝ কর। আমি যাই, কাজ আছে।

বীরেশ্বর নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পিছন ফিরিয়া দেখিয়া লইল। সুনয়না চলিয়া গিয়াছেন।

খুট করিয়া আলমারি বন্ধ করিয়া দিল বীরেশ্বর। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার খুলিয়া ফেলিল। একটার পর একটা বই সরাইয়া সরাইয়া সবগুলি দেখা হইয়া গেল। আবার বন্ধ করিতে হইল। তারপরে? হাতের মধ্যে ধরিবার মত একটা শক্ত অবলম্বন চাই। মনের ফাঁকটা কোনপ্রকারে ডিঙাইয়া যাওয়া দরকার। মুহূর্তের অবসর দিলে মুখোমুখি পড়িয়া যাইতে হইবে সভয়ে পিছনে সরিতে লাগিল বীরেশ্বর। মনের পিছনে।

মিথ্যে, বানানো কথা সব।

কিন্তু সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া প্রভাতের আলোর মত একটা অস্পষ্ট আনন্দের আভাস চারিদিক হইতে বীরেশ্বরের মনটাকে আলোকিত করিয়া তুলিতেছিল। ধীরে ধীরে।

সহসা একটা তীব্র আলোতে মনটা ঝলকিয়া উঠিল। যদি সত্য হয়! দীপিকার দেহটাই তো তাহাকে রক্ষা করিয়াছে! ইন্‌স্টিংট?

একটা সত্য আবিষ্কার করিল যেন। বিবেক কাটিয়া গেল অনেকখানি। মনটা খুশি হইয়া উঠিল দুনিয়ার উপর।

জামা-কাপড় বদলাইয়া ফেলিল। বাছিয়া বাছিয়া ভাল জামা-কাপড় পরিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। মনটা দমিয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। চেহারাটা কোন দিনই খুব ভাল ছিল না। আজ আরও খারাপ মনে হইল বীরেশ্বরের। চোখে মুখে কালি পড়িয়া গিয়াছে যেন। একটু ঘুমাইয়া লইতে পারিলে শরীরটা অনেকখানি ঠিক হইয়া যাইত বোধ হয়।—ভাবিল বীরেশ্বর।

তৎক্ষণাৎ এক টুকরা বক্র হাসি ফুটিয়া উঠিল ঠোঁটে।—আমার ইন্‌স্টিংটের বোধ করি আর ইভলিউশন হয় নি—গাছের আমলের পরে। এক রকমই আছে।

না, হয়েছে। খারাপের দিকে।

আর একটা সত্য যেন ঝলকিত হইল। টুয়ার্ডস পার্‌ফেক্‌শন। কচু! মিথ্যে!

বাহির হইবার পূর্বে সুনয়নার সঙ্গে একটু কথা বলিবার প্রবল বাসনা হইল বীরেশ্বরের। বসিয়া অপেক্ষা করিল কিছুক্ষণ। সুনয়না আসিলেন না ঘরে।

বাহির হইয়া সুনয়নার কাছে গিয়া ভ্রূকুঞ্চিত হাসিমুখে দাঁড়াইল।

যাচ্ছ নাকি?—সুনয়না হাসিয়া বলিলেন।

হ্যাঁ। মিছে কথা কতটা শিখেছ, যাচাই করতে যাচ্ছি।

যাও।

বীরেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়া উঠিল—থাক্। আমি যাব না। না।

কি হ'ল?

না, থাক্।—বীরেশ্বর যাইতে উদ্যত হইল।—আমি আর যাব না।

তোমার খুশি। নাই গেলে।—সুনয়না কাজে মন দিলেন।

ঘরে গিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া একখানা গল্পের বই লইয়া বীরেশ্বর শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, প্রদীপ প্রবেশ করিতেছে। উঠিয়া বসিল বীরেশ্বর।

এস প্রদীপ। ব'স।

কেমন আছেন বীরেশদা? কখন এলেন?—প্রদীপ প্রথামত কুশল-সমাচার হইতে শুরু করিল।

তোমার খবর কি?—বীরেশ্বর জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ভাল।—একটু গম্ভীর হইল প্রদীপ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছ?—বীরেশ্বর আলাপের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করিল।

না, এখানেই। আপনি এসেছেন শুনে—

ও! কার কাছে শুনলে?

লোচন গিয়েছিল।—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিল প্রদীপ।

আমাদের লোচন?

হ্যাঁ।

বীরেশ্বর শান্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল। ভাবিল, সত্য। আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই তার। শান্তিতে মনটা যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

বেরুবেন না? চলুন না, আমাদের পাড়া থেকে বেড়িয়ে আসবেন।—প্রদীপ সংকুচিত কণ্ঠে বলিল।

হাসি ফুটিয়া উঠিল বীরেশ্বরের মুখে।—হ্যাঁ, বেরুব। চল, যাই। তুমি বউদির সঙ্গে দেখা করবে না?

ও, হ্যাঁ।—প্রদীপের মনে পড়িয়া গেল।—আপনি রেডি হয়ে নিন ততক্ষণ।

প্রদীপের সঙ্গে সুনয়না আসিলেন। বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন শুধু। বীরেশ্বরও নীরব হাস্যে কোন কথা না বলিয়া প্রদীপের সঙ্গে রওনা হইল।

প্রদীপের বাড়ি পৌঁছিয়া প্রদীপের মাকে একটা প্রণাম করিয়া লইল বীরেশ্বর। শান্তিলতা মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, ঘরে গিয়ে ব'স বাবা।

বীরেশ্বর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

দরজার সমুখে আসিয়া প্রদীপ বলিয়া উঠিল, ও-হো, আমার একটু কাজ আছে যে! আপনি বসুনগে।—বলিয়া ভারিক্কি চালে সরিয়া গেল।

দীপিকা উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। বীরেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিবার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া এক পাশে বসিল। বীরেশ্বর একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া পাশে বসিল। তারপরে উভয়ে একসঙ্গে উভয়ের দিকে তাকাইল। দীপিকার চোখের পাতা ভারী, দৃষ্টি করুণ—আবেশ-মাখা। বীরেশ্বরের তল্লাশি।

একসঙ্গেই উভয়ে নতচক্ষু হইল। ছিঁড়িয়া নামাইতে হইল যেন।

দীপিকা বুঝিল, এখন বলিবার সময়। গুছানো কথাগুলি বলিতে গিয়া গলায় আটকাইয়া গেল একটু। উঠিয়া হঠাৎ বীরেশ্বরকে প্রণাম করিয়া বসিল একটা। এই অংশটা অন্তত কার্যে পরিণত করিতে পারিয়া তৃপ্ত হইল দীপিকা। লজ্জাও বেশি হইল। বীরেশ্বরের কাছেই মশারি টাঙাইবার খাড়া কাঠটা ধরিয়া দাঁড়াইল।

প্রণামের সময় বীরেশ্বর দীপিকার মাথায় হাত লাগাইয়া ফেলিয়াছে। সেই পথে বাঁধ খানিকটা খুলিয়া গিয়াছে। বলিল, ব'স।

না, যাই।—বলিতে গলাটা ছাড়িয়া গেল দীপিকার। চোখের জলে রচনা করা কথাগুলি এখনই বলা দরকার। বলিল, সেদিন আমি কোন জবাব দিই নি। ভেবেছিলাম, তুমি বুঝেছ।—একটু থামিয়া 'তুমি'র রেশটা ভোগ করিয়া লইল।—যখন শুনলাম—। কণ্ঠ চাপিয়া আসিল।—সব ভুল বুঝে— চোখে জল আসিয়া পড়িল।—তার শাস্তি—। চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল।

করুণার তীরের মত বিঁধিয়া গেল বীরেশ্বরের মর্মে। আহত পশুর মত লাফাইয়া উঠিয়া দীপিকাকে টানিয়া লইয়া বুকের কাছে মাথাটা চাপিয়া ধরিল। বলিতে লাগিল, আর ভুল হবে না, আর ভুল হবে না—

দীপিকা সুখের তীব্রতায় হাঁপাইয়া উঠিল। বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। চাপা 'আসছি' বলিয়া আস্তে আস্তে মুক্ত হইয়া ভারী বোঝার মত অবশ দেহটাকে টানিয়া বাহির হইয়া গেল।

ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল বীরেশ্বর। শ্বাস-প্রশ্বাস আয়ত্তে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

১৪

বীরেশ্বর ভবতোষের কাছে চিঠি লিখিল দিন তিনেক পরে। লিখিল—

আমার বিবাহ এ মাসের পঁচিশে—আর মাত্র পনরো দিন পরে। তোকে আসতে হবে। এলে দেখবি, জীবন আর জীবন-দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এই কদিনে কত পেকে উঠেছে। হাসবার দরকার নেই—জবাবটা আমি বুঝেছি। পচন ধরতে পারে জানি। বিয়ের তারিখটা সেই জন্তেই যতদূর সম্ভব এগিয়ে আনবার ব্যবস্থা করেছি।

কিন্তু বর্তমানে আমি আশাবাদী। মনের শিকড় দেহের মধ্যে—যার নাম ইন্‌স্টিংট, দেহের রসে তার পুষ্টি। পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার দেহে নতুন কিছু আশা করাই অন্যায়।—এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠছিল আমার। মনের লতা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে বটে। কিন্তু শিকড় থাকে জমিতে। ফল প্রত্যক্ষ। 'ভাল দেহ চাই' স্লোগান দিয়ে একটা প্রচণ্ড ডিমন্‌স্ট্রেশন দেবার পরিকল্পনা করছিলাম।

আজ মনে হচ্ছে, দরকার নেই। ইন্‌স্টিংটেরও ইভলিউশন—টুয়ার্ডস পার্‌ফেক্‌শন?—হয়। অন্তত দীপিকার হয়েছে। দীপিকা, মানে—যার সঙ্গে আমার বিয়ে। ঘটনাটা সাক্ষাতে বলব। তোর একটু কৌতূহল হয়ে থাক্।

আরও অনেক কথা আছে—

এই সময়ে সুনয়না প্রবেশ করিলেন ঘরে। বীরেশ্বর চিঠিখানা শেষ করিয়া ফেলিল। মুখ তুলিয়া বলিল, বউদি, ঠিক পঁচিশে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। পঁচিশে, পঁচিশে। বাপ রে!—সুনয়না ক্ষেপাইবার জন্ম বলিলেন।

বীরেশ্বর হাসিল।—এক বন্ধুর কাছে চিঠি দিলাম কিনা। তারিখটা ভুল হওয়া উচিত নয়।

ভুল হবে না, আমি কথা দিচ্ছি।

দেখো, তুমিই একমাত্র ভরসা।—হাসিয়া বীরেশ্বর চিঠিখানা বন্ধ করিয়া উঠিল।—কিন্তু, বউদি—

বল।

আমার বড় ভয় করছে। বিয়ে তো কোনদিন করি নি।

সুনয়না খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।—আগে থেকে যদি অভ্যাসটা ক'রে রাখতে! আজ আর কোন অসুবিধেই হ'ত না তা হ'লে।

ঠিক বলেছ। ভুল হয়ে গেছে। এখন কি করা যায় বল দেখি?

বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দাও। এর মধ্যে অভ্যাসটা ক'রে ফেল।

বীরেশ্বর ইঙ্গিতটা ধরিতে পারিয়া লজ্জিত হইল।

হ্যাঁ, তাই দেখি।—বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইল।

টাকা!

নানা ভাবতরঙ্গের মধ্যে এইটাই ক্রমশ স্পষ্টতর এবং জোরদার হইয়া উঠিতেছিল বীরেশ্বরের। টাকা কিছু অবশ্য প্রয়োজন।

টাকার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি আরও কয়েকটা মুখ ভাসিয়া উঠিতেছিল মনের মধ্যে। সাগরমল—সুবোধ লাহিড়ী—হিরণ মিত্র—

বীরেশ্বর ঝাঁপ দিবার জন্য অগ্রসর হইল।

ঘুরিতে ঘুরিতে রাস্তায় গৌড়ানন্দ-আশ্রমের নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা হইল। বীরেশ্বর আগ্রহভরে আলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

স্বামীজী কেমন আছেন?

ভাল আছেন।

আরে, ভাল কথা, আপনাদের সে ললিতাসুন্দরী গেট হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ। অনেক গোলমালের পরে মিটে গেছে সব।

গোলমাল কিসের?

নিত্যানন্দ আনুপূর্বিক বিবরণ দিলেন। বীরেশ্বর খুশিতে হাসিতে লাগিল।

স্বামীজী আর নতুন বই-টই কিছু লিখছেন নাকি?

লিখছেন। ম্যান অ্যাণ্ড মোক্ষ।

ওঃ!

এটাও ভাল হচ্ছে লেখা।

ও—

একটা স্টেশনারি দোকানের সম্মুখে আসিয়া নিত্যানন্দ থামিলেন।

কিছু কিনবেন বুঝি ?

হ্যাঁ, একটা চিরুনি কিনতে হবে স্বামীজীর জন্যে। যেটা ছিল, দাঁতগুলো নাকি সবই ভেঙে গেছে তার।

চিরুনি ?

হ্যাঁ, একটা ভাল দেখে চিরুনি দিন তো—যশোরের দিন। বড় তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় আর সব।

আচ্ছা, একদিন যাব।—বীরেশ্বর বলিল।

যাবেন। আমাদের প্রতিষ্ঠা-দিবস আসছে। আপনারা যাবেন আমরা আশা করি।

যাব।—বলিয়া বীরেশ্বর বিদায় লইল।

এতে হাসবার কিছু নেই।—বীরেশ্বর নিজের মনে তর্ক করিতে করিতে চলিতেছিল।—আশ্রম করলে মাথায় সিঁথি কাটা যাবে না, এমন কোন কথা নেই। বাজে কথা—

কিন্তু অকারণে বীরেশ্বরের হাসি পাইতেছিল। ম্যান অ্যাণ্ড মোঙ্ক!

সাগরমল টাকা ধার দিল সহজেই। সুবোধ লাহিড়ী আশা দিল, একটা সাপ্লাইয়ের অর্ডার শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। হিরণ মিত্তির ভরসা দিয়াছেন অনেক।

চমৎকার! বীরেশ্বর খুশি হইয়া উঠিল। এই সব পলিমাটিতে যেন বীরেশ্বরের মনটা সাময়িকভাবে ভবিষ্যতের ফুলে ফলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।—

নূতন বই সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দীপিকা মজুত আছে। নিশ্চিন্ত হইয়া আবার লিখিতেছে। আবার লেখা বন্ধ করিয়া দীপিকাকে পাইল। বই বিক্রয় হইতেছে। বইয়ের টাকা আসিতেছে। সাগরমল, সুবোধ লাহিড়ী, হিরণ মিত্রের প্রয়োজন নাই তাহার। এতদিনে মুক্ত সে। সম্পূর্ণ মুক্ত।

কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। পলিমাটি সরিয়া যায়। কঠোর সমালোচক মনাংশ অনাবৃত হইয়া বীরেশ্বরকে যেন ভেঙাইতে থাকে।

সেই মনে দেখে—

আকাশে উড়িতে যায় বীরেশ্বর। দই কলা চিরুনি সাগরমল দীপিকারা সকলে মিলিয়া মাটির দিকে টানে।

হ্যাঁ। দীপিকাও।

বীরেশ্বর স্পষ্ট দেখিতে পায়।

টানাটানির অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বীরেশ্বর চাঙ্গা হইয়া উঠিল দীপিকার নামে। চুপিচুপি চলিয়া গেল দীপিকার কাছে।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

প্রেম-চম্পূ

আজকাল মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় প্রেমের গল্প বড় একটা দেখা যায় না—বাস্তবিক, কতই বা পারা যায়! এই অভাব দূরীকরণার্থে প্রেম-সম্বন্ধে দু-চার কথা যদি বলি, আপনাদের রুচি ফিরবে।

'গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূঃ'—সাহিত্যদর্পণ। গদ্যময় পদ্য কিংবা পদ্যময় গদ্যকে 'চম্পূ' বলে। দেখা যাচ্ছে, প্রকারান্তরে গদ্য-কবিতা সেকালেও ছিল। এর সুবিধা এই যে, কবিতা লিখতে লিখতে মিল নিয়ে বিপদে পড়লে গদ্যে নেমে পড়, আবার কবিতার ঝোঁক ঘাড়ে চাপলে লাফ মেরে কবিতায় উঠে যাও—চরম স্বাধীনতা! 'চম্‌' ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন—অতএব আশা করা যায়, এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার লাফালাফির যুগে উক্ত চম্‌চমে 'চম্পূ' জিনিসটা বাংলা-সাহিত্যে নূতন ক'রে আমাদের কাজে লাগবে।

'আদৌ নমস্ক্রিয়া' এই নিয়ম মানতে হ'লে প্রেমের কাব্য আরম্ভ করতে রতিমদন-বন্দনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই বয়সে আমার পক্ষে তা অসম্ভব। 'নিত্যকর্ম-পদ্ধতি' ও 'পুরোহিত-দর্পণে' এই দুই দেবতার স্তব খুঁজে পাওয়া গেল না। 'মদনভস্ম' যাত্রা-গানে তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ঝম্‌ঝম্ নৃত্যে উভয়ের (দুটোই ছেলে) আসরে প্রবেশ। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর 'দ্বৈরথ সঙ্গীত' আরম্ভ হ'ল—

মদন— আমি বিপদ।

রতি— আমি ঝঞ্ঝা।

উভয়ে— মানুষের মন নিয়া
ছিনিমিনি খেলিয়া
আমরা করি চায় মন্ ষা !

খুব সম্ভব, বিপদ ও ঝঞ্ঝার বেশে বাংলা-সাহিত্যে এই তাদের প্রথম প্রবেশ।

কিন্তু এই আত্মগুণ-বর্ণনা বন্দনা-রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। ভয় নেই, আমার মত ভক্তিহীন লোকদের জন্ম দর্পণকার (Mirror-maker) অন্য ব্যবস্থা ক'রে গেছেন—'বস্তুনির্দেশে বাপি'। 'বাপি' শব্দেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা যথেষ্ট, ভাষ্যে লিখছেন, বন্দনা ও বস্তুনির্দেশের দুটোই কিংবা যে-কোনও-একটা হ'লেও চলবে। অতএব বিষয়বস্তুতে ঝাঁপিয়ে পড়া বিপজ্জনক হবে না—

দাশুর বয়স দশ বৎসর, পাঁচীর বয়স পাঁচ—
এই বয়সেই তাহাদের প্রাণে লাগিল প্রেমের আঁচ।
কিন্তু একদা দাশুর বিবাহ হইল দাসীর সনে,
পাঁচুর সঙ্গে পাঁচীর বিবাহ—'কি ছিল বিধির মনে' !

প্রেম যখন বাংলা গল্পে প্রথম ঢুকল, এর বেশি তার স্কোপ ছিল না, ওই বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। বলা বাহুল্য, আলোচ্য বিবাহ দুইটি সুখের হয় নি। তাদের স্বাধীন প্রেমে বাধা পড়ল, অবশ্য এও একটা কারণ, আরও সূক্ষ্ম সাইকোলজি-গত ভুল র'য়ে গেল এর ভিতরে—

রামের সঙ্গে রামীর বিবাহ হইলেই, সোজাসুজি,
যথাক্রমে তারা পুরুষ-রমণী, আমরা ইহাই বুঝি।
এটা মহাভুল—রাম যদি স্কুল-মাস্টার হয়ে যায়,
গালে চড়াইলে একটিও কথা মুখে নাহি বাহিরায়,
এবং রামীর কোন্দলে যদি গোটা পাড়াটাই ফাটে,
গ্রামোফোন-সম গলাখানি তার শোনা যায় পথে ঘাটে—
সাইকোলজির সূক্ষ্ম-তত্ত্ব মন দিয়া শোন সবে,
রাম যে রমণী, রামী যে পুরুষ—ইহাই বুঝিতে হবে।

মনস্তত্ত্ব যতদিন আবিষ্কৃত হয় নি, প্রেমের ব্যাপার অনেকটা ভদ্র ও

সংক্ষিপ্ত ছিল। অনেক সময় চোখোচোখি হ'তেই কাজ শেষ হ'ত গান্ধর্ব মতে; বড় জোর, হাঁস-মুর্গী-কাক-কোকিলের মুখে প্রেমাস্পদ কিংবা 'পদা'র রূপগুণ-বর্ণনা শুনে। স্বয়ম্বর-সভায় যুদ্ধও বেধে যেত, সেও বরং প্র্যাক্টিক্যাল ছিল। কিন্তু আজকাল মনস্তত্ত্বের ভিয়ানে চ'ড়ে প্রেমের উপন্যাস যেন শামুকের অঙ্কে পরিণত হয়েছে—এক হাত এগোয় তো দশ হাত পিছিয়ে যায়। সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কথা-কাটাকাটি, প্যাঁচ-কষাকষি, ঘ্যান্ঘ্যানানি, প্যান্প্যানানি। অনেকটা এগিয়ে এসেছে ভেবে আশান্বিত হয়ে অ্যাসপ্রো ট্যাবলেট খেয়ে এঁটেসেঁটে বসি, হঠাৎ দেখি, ব্যাপারটা ধপ ক'রে যেখানে ছিল সেইখানেই ফের প'ড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই সব উপন্যাসের পাঠকেরা যেমন 'কাদম্বরী'কে সহ্য করতে পারেন না, ভবিষ্যদ্বংশীয় পাঠকেরাও তেমনই আধুনিক পাঠকদের ধৈর্যশক্তি দেখে অবাক্ হয়ে যাবেন। 'কাদম্বরী'র এক টীকাকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখছেন, 'অহো ধৈর্যং তদানীন্তনানাম্ উপন্যাস-পাঠকানাম্'!

আশা করা যায়, আগামী যুগের নায়ক-নায়িকারা অনেক বেশি বাস্তবপন্থী হবে। ট্রেনে, স্টীমারে, ট্রামে-বাসে এক মিনিটে প্রেম-সমস্যার সমাধান করবে। এক মুহূর্তে তারা 'অনাদিকালের আদিম উৎস'টা চিনে ফেলবে। নায়ক এবং নায়িকা—প্রেম-প্রস্তাবটা যার কাছ থেকেই প্রথমে আসুক, অপর পক্ষ তা তৎক্ষণাৎ মেনে নেবে। একঘেয়ে কলকচকচি তাদের ভালও লাগবে না, সময়ও হয়তো হবে না। এই ধরনের দাম্পত্য-প্রেম-জাত ছেলেমেয়েরা খুব চটপটে হবে, আর দেখবেন, তাদের দ্বারাই আপনাদের বহুবাঞ্ছিত নূতন পৃথিবী তৈরি হবে।

এই বিষয়ে আপনাদের আমি একটু স্থিরপ্রজ্ঞ হয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি—নরনারীর সম্বন্ধ, এই সহজ সরল অতি-স্বাভাবিক জিনিসটাকে আপনারা নাটক-নভেল-গল্পের ভিতর দিয়ে কত বেশি জটিল ক'রে তুলেছেন! হে নূতন পৃথিবীর তরুণের দল, আপনারা না নূতনত্বের পক্ষপাতী? ভেবে আশ্চর্য হই, কেমন ক'রে, কোন্ রুচিতে, আপনারা এই অতি-পুরাতন বিষয়বস্তুটার জের টেনে

চলেছেন? আদিম যুগের চিন্তাহীনতায় ফিরে যেতে বলছি না, কিন্তু এই বুদ্ধির যুগেও কি—এক মিনিটে না হোক, পাঁচ মিনিটেও এই তুচ্ছ ব্যাপারটার মীমাংসা করতে পারেন না? না-হয় দশ মিনিট? না-হয় পনেরো মিনিট?

আ-আ-মি জানতে চাই'—*

যাক্, আপনারা আবার ভাবজগতে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস পছন্দ করেন না। তবু, হে আগামী যুগের ভাইবোনেরা! (নাতী-নাতনী-সম্পর্কে) আপনারা আমার পূর্ব-প্রস্তাবিত 'ঐক-মিনিটিক' নাটিকাটি বিবেচনা ক'রে দেখবেন। দৃষ্টান্ত, যথা—

ট্রেনের কামরায় উচ্ছ্বাস বসু উতলা রায়কে বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি।

খিলখিল হেসে উতলা রায় (হাসি থামলে) জবাব দেবে, তাই নাকি? আমি রাজী আছি।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই কিংবা গাড়িতেই তারা উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। অথচ পরস্পরের পূর্ব-পরিচয় এদের মোটেই কিছু ছিল না।

এর ভিতরে কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। তবু একটা গুরুতর বিপদ আছে। সেই দিক দিয়ে সাবধান করতেই আমার এই অসাময়িক অবতারণা। 'অসাময়িক' এই জন্য যে, প্রেম-ব্যাপারটা এই শিষ্ট সংক্ষিপ্ত রূপ নিতে এখনও অনেক দেরি। এখন থেকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তার কারণ ততদিন আমি বেঁচে থাকব না। আশা করি, সেই সহস্র বৎসর পরে আপনারা আমার কথা স্মরণ ক'রে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতে ত্রুটি করবেন না।

প্রায়ই দেখা যায়, (এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই; কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে স্বচক্ষে আমি প'ড়ে দেখেছি।) একটা মেয়ের পিছনে দুটো ছেলে কিংবা একটা ছেলের পিছনে দুটো মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বলতে বাধ্য যে, এই দ্বিতীয় জোড়া ছেলেমেয়ের আত্মসম্মানজ্ঞান নেই।

* 'গড্ডালিকা'—সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড।

আ-আ-মি জিজ্ঞাসা করি, বাংলা দেশে কি আর ছেলেমেয়ে নেই? ভারতবর্ষে? এশিয়া ভূখণ্ডে? স্বর্গে, মর্তে, নরকে?

২

আলোচনার সুবিধার জন্য মদ্‌বর্ণিত দুই জোড়া নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রথম জোড়াকেই প্রথমে নেওয়া যাক,—দাশু এবং দাসী। বিবাহ-দুর্ঘটনার পর দশ বৎসর কেটে গেছে। মিঃ ডাসু ডাট্—আধুনিক পরিভাষায়—শ্রীদাশরথি দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়ে দাসীকে নিয়ে বরিশালে চ'লে গেলেন, তখন পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় নি। নূতন ক'রে ডেপুটির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—ডেপুটি বঙ্কিম তা সেরে গেছেন। উদারহৃদয় বঙ্কিম, রসিকতার খাতিরে ঘটীরাম-ডেপুটিতে যে-চিত্র এঁকে গেছেন, বাস্তবের সঙ্গে তার কিন্তু মিল নেই। বাস্তব পরিচয়, যথা—

আমলা-উকিল খায় চোরাকিল—আরদালি জোড়হস্ত,
শয়নে স্বপনে মোক্তারগণে সতত শশব্যস্ত ;
বিলাত যাইতে পারে নি এবং রঙটাও নয় কটা,
সেই সে কারণে পুরুষপ্রধান সবার উপরে চটা!

এবং 'দাসী' বলতে মনে ভাববেন না, পল্লীবালিকা। নামে 'দাসী' হ'লেও, আপনারা শুনে স্তম্ভিত হবেন, আসলে সে আই. সি. এস.-এর মেয়ে! এর ভিতরেও একটু মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস আছে। 'নটীর পূজা' অভিনয় দেখে কুঠিতে ফিরে তার বাবা শুনলেন যে, তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে। পাঁচ ছেলের পর মেয়ে—খুশি হয়ে নাম রাখলেন, দেবদাসী। এবং—

বিলাত-ফেরত পিতার কন্যা—কি হ'ল দাসীর দশা—
ডেপুটি সাহেব! এ যেন হায় রে পাখা আছে ব'লে মশা
পক্ষী বলিয়া হইবে গণ্য। না সহে দাসীর প্রাণে
ঝগড়া করিয়া তাই একদিন ধরিল তাহার কানে।
এই রসিকতা সহিত যদি রে ডেপুটি হইত নারী,
কিন্তু ব্যাপার হ'ল সঙ্গিন্—দুজনেই মিলিটারি!
কুচি কুচি চুল, যেথায় হ্যাটের কার্নিশ এসে ঠেকে,
এ হেন কর্ণে হস্ত, এমন আবদার কভু টেঁকে?

রেগে ভানু ভাটু ছুঁড়ে ফেলে হ্যাট, আনিয়া লম্বা কাঁচি
বিলকুল চুল ক'রে নির্মূল দাসীরে পাঠায় রাঁচি।
কিছুদিন পরে রাঁচি হতে ফিরে মিষ্ট মধুর হাসি
দাশুর চরণে প্রণাম করিয়া দূরে দাঁড়াইল দাসী;
ধীরে ধীরে পরে আপনার ঘরে চলিল না করি শব্দ।
দাশু গম্ভীর মনে ভাবে স্থির এবার হয়েছে জব্দ।
পরদিন হায় বেলা দশটায় কাছারি যাইবে দাশু,
ফৌজদারী এক বড় মামলার শুনানি হইবে আশু;
খাওয়া-দাওয়া সারি পশি তাড়াতাড়ি আপন ড্রেসিং-রুম,
আকাশ হইতে মাটিতে পড়িয়া বসিয়া রহিল গুম্!
হ্যাট কোট টাই কিছু বাদ নাই, জুতা ও পেণ্টুলান,
কাঁইচি লইয়া বিরলে বসিয়া দাসী করে শতখান।
কেহ না হারিল, কেহ না জিতিল পতি-পত্নীর রণে
নরের সঙ্গে নরের বিবাহ, 'কি ছিল বিধির মনে'!

এইবার দ্বিতীয় জোড়া—অর্থাৎ পাঁচু ও পাঁচীর প্রতি মনোনিবেশ করুন। বরাবর ম্যাট্রিক ফেল ক'রে পাঁচু হয়ে গেল কেরানী। প্রচলিত ধারণা এই যে, কেরানী উভয় লিঙ্গ—'পুরুষ রমণী রমণী দ্বিবিধ কেরানী'। কিন্তু—

ব্যাকরণ আর মনস্তত্ত্ব এক নহে কভু ভাই—
সকল কেরানী রমণী হইবে, পুরুষ কেহই নাই!

বৃন্দাবনে সবাই নারী; এ ক্ষেত্রেও তাই—
চাকরি তাহার সিঁথির সিঁদুর। মনিব তাহার পতি,
মরণের পর কে রাখে খবর?—জীবনে চরণ গতি;
হাতের শঙ্খ 'সার্ভিস বুক', চাপকান তার শাড়ি,
চাদর ঘোমটা—মাথায় তুলিলে হইত যে বাড়াবাড়ি!

কেরানীর এই বর্ণনা ইংরেজ-আমলের; স্বাধীন ভারতে এই ধরনের বেশভূষা বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না, তবে সাইকোলজির পরিবর্তন একটুও হয় নি।

এবং পাঁচী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। এই সেদিন পর্যন্ত সে কেরাণী

পরেছে—আজও নাকে নোলক, কানে মাকড়ি, পায়ে রূপোর মল। শহুরে পাঠকদের বলা দরকার যে, অল্পবয়স্কা বালিকাদের ব্যবহার্য রঙিন কটীবস্ত্রের নাম 'ফেরাণী'। (যোগেশ বিদ্যানিধির 'বাংলা শব্দকোষ' দ্রষ্টব্য*) ব্যারিস্টারি ছেড়ে গান্ধীজী যখন নেংটি ধরলেন, তার বহুপূর্ব হতে, এমন কি, স্মরণাতীত কাল থেকে ফেরাণীর প্রচলন ছিল, পল্লীগ্রামে আজও আছে। এই—

ফেরাণীর সাথে কেরানীর বিয়ে—বিধাতার কারসাজি—
সাইকোলজির কলা-কৌশল আমি ভেবে মরি আজি!
পাঁচী রাঁধে ভাত, আর দিনরাত পতির চরণ পূজে,
আপিস হইতে ফিরে এসে পাঁচু আশ্রয় পায় খুঁজে
রান্নাঘরের দুয়ারের পাশে—ত্যজিয়া সর্বজনে,
নারীর সঙ্গে নারীর বিবাহ, 'কি ছিল বিধির মনে'!

এই গেল এদের প্রাথমিক, মানে প্রথম জীবনের পরিচয়। আপনারা বলবেন, এর ভিতরে মনস্তত্ত্ব নেই—এ সব খাঁটি 'দেহতত্ত্বের' কথা। মনস্তাত্ত্বিক মাত্রেই স্বীকার করবেন, দেহে মনে কত নিকট সম্বন্ধ!

৩

যুদ্ধের ফল—শান্তি কিংবা ৩য়, ৪র্থ, ৫ম প্রভৃতি মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি; পরীক্ষার ফল—পাস, অথবা ফেল—একবার, দুবার, তিনবার...... ইত্যাদি।

শান্তির জন্যই যুদ্ধ, পাশের জন্যই পরীক্ষা দেওয়া, তেমনই 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। তবে সংসারের সকল বিষয়ের মত এরও একটা উলটো দিক আছে—কন্যাও হতে পারে। ১মা, ২য়া, ৩য়া থেকে ৭মী, শেষ পর্যন্ত সম্বোধন-পদে এসে ঠেকে—দৃষ্টান্ত যথা, "আর না কালী!" এই সম্বোধন-পদ আবার একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনেও ব্যবহৃত হতে পারে।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ব্যর্থ হ'লেও, দেহতত্ত্বের দিক থেকে আলোচ্য

* উক্ত শব্দকোষে 'কৈড়ারী' শব্দ দেখুন। বীরভূম জেলায় কিন্তু 'ফেরাণী' শব্দই প্রচলিত।

দম্পতিযুগলের সমালোচ্য বিবাহ দুটি নিষ্ফল হয় নি। পাচু-পাচীর একটি ছেলে হ'ল—

'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' কটীতট অতি ক্ষীণ,
শশিকলা-সম রূপে অনুপম বর্ধিত দিন দিন;
অঙ্গুলিগুলি চম্পককলি নিন্দিয়া সুপেলব,
মধুর হাস্যে ঘর আলো করে, মিহি ক্রন্দনরব;
গেল শৈশব, গেল কৈশোর, যৌবন গতপ্রায়,
তবু দাড়ি গোঁফ গোপনে রহিল—মুখে নাহি দেখা যায়।
রমণী বলিয়া তাহারে দেখিয়া ভুল হবে ক্ষণে ক্ষণে—
কাহার সঙ্গে হইবে বিবাহ?—কি আছে বিধির মনে!

মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বিচার ক'রে দেখবেন—দুই নারীর বিবাহের এই অতি-স্বাভাবিক ফল। এবং—

কিছুদিন পরে দাশু ও দাসীর হইল একটি মেয়ে,
অধিক পুষ্ট এক বছরের পুং-বালকের চেয়ে!
নাসিকা খর্ব, চক্ষু ক্ষুদ্র, গণ্ড দুইটি স্থূল,
চাঁদের সঙ্গে তুলনা করিলে হইবে বিষম ভুল।
বালিকা হইল কিশোরী এবং জনক-জননী-স্নেহে
শাল্মলীতরু-সমান বাড়িয়া চলিল বিরাট দেহে!
হেনকালে সবে দেখিয়া অবাক—যেন জঙ্গল-ঝোপ,
পনেরো বছর বয়সে বদনে দেখা দিল দাড়ি-গোঁফ!
জনক আকুল, জননী ব্যাকুল, দেখে সেই গোঁফ-দাড়ি,
হইয়া বেজার, সেফ্‌টি রেজার কিনে এনে তাড়াতাড়ি
দিল কামাইয়া। ঘটকে ডাকিয়া আনিল পরক্ষণে—
কাহার সহিত হইবে বিবাহ?—কি আছে বিধির মনে!

দুই পুরুষের বিবাহের ফল—অবশ্য, তারাশঙ্কর যে অর্থে 'দুই পুরুষ' লিখেছেন, সেই অর্থে নয়।

বিধাতা যতই বাদ সাধুন, সেকালে কোনও অবস্থাতেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিয়ে আটকাত না—

লোকে কহে, হায়, ঘটকে ঘটায়—ঘটায় কিন্তু দৈবে,

কেহ কি জানিত, এমন ব্যাপার এত সহজেই হইবে ?
একদা পাঁচুর পুত্র পরিয়া নকল গুম্ফ-শ্মশ্রু,
দাশুর আলয়ে আসি ভয়ে ভয়ে প্রণমে শ্বশুর-শ্বশ্রূ !
তাহারে দেখিয়া দাসীর তনয়া ঘোমটা টানিয়া দিল,
আপন গুম্ফ-শ্মশ্রু যতনে গোপনে কামায়ে নিল।

গোঁফ-দাড়ির চাষ যাঁরা ক'রে থাকেন তাঁরা জানেন, যত বেশি ঘন ঘন কামানো যায় ততই বাড়ে—বড় বড় ক্লকঘড়ির মিনিটের কাঁটা যেমন নড়তে দেখা যায়, দাড়ি-গোঁফের বৃদ্ধিকালীন গতিবেগও তেমনই স্থূলদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। দু দিন যায়, তিন দিন যায়, মেয়েটা তবু ঘোমটা খোলে না। ছেলেটা অবাক্—সে আশা করেছিল, ডেপুটির মেয়ে আপ-টু-ডেট হবে! চতুর্থ দিনে—

দিবা দুপহরে পেয়ে নিজ ঘরে কহিল পাঁচীর পুত্র,—
চিরকাল যদি লজ্জা করিবে বল আমি যাই কুত্র ?
এতেক বলিয়া সজোরে টানিয়া ঘোমটা খুলেছে যেই,
দাড়ি ও গোঁফের কণ্টকবন নজরে পড়িল সেই।
ক্ষণে সামলিয়ে, কহে, এস প্রিয়ে, দুঃখ ক'রো না সই,
তুমিও যেমন দেড়েল রমণী, আমি মাকুন্দ হই !
সোৎসাহে ফেলি শ্মশ্রু-গুম্ফ দূরে নিক্ষেপি টানি
হাসিয়া মধুর সলাজ-বধূর চুমিল বদনখানি।

বাস্তবিক, নকল দাড়ি-গোঁফ প'রে অহোরাত্র থাকা—ছেলেটারও খুব কষ্ট হচ্ছিল। দুজনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলা বাহুল্য, একটু রকম-ফের হ'লেও নরনারীর এই সঙ্গত মিলন সুখেরই হয়েছিল।

নমি প্রজাপতি, আমি হীনমতি বিরচি গদ্য-পদ্য
চম্‌চমে এই প্রেমের চম্পূ বিতরি সদ্য সদ্য।
বিজ্ঞান-বলে যোগ্য-যুগলে হয় যদি পরিণয়,
গল্প-নাটক-নভেল জগতে একেবারে পাবে লয়।
সব গোলমাল চুকিয়া যাইবে অগ্রগতির সনে—
তবু বলি ভাই, বিশ্বাস নাই—কি আছে বিধির মনে !

ভোলা সেন

জটায়ুর ডানা

"Martius : Dost know what it is to die ?
Sophocles : Thou dost not Martius
And therefore not what it is to live ;
To die : is to begin to live."

জটায়ু : কোথা যাও, থাম তুমি মৃত্যুর নির্লজ্জ অনুচর,
তোমার রক্তাক্ত নখে খণ্ডছিন্ন সহস্র প্রহর,
তবু তারা মৃত্যুহীন।

রাবণ : সেটুকু সান্ত্বনা যেন থেকে যায় জটায়ু প্রবীণ
তোমার স্থবির মনে—এ আমার একান্ত কামনা,—
ধ্বংস যার প্রত্যাসন্ন, আশা যার সত্য হইল না,
ধূলি 'পরে ধ্বস্ত হ'ল আজন্মের সাধনা যাহার,
সব যার মিথ্যা হ'ল, আশাটুকু থাকে যেন তার
আত্মার সান্ত্বনা তরে।

জটায়ু : সান্ত্বনা কে খোঁজে বল জীবনের অন্তিম প্রহরে ?
শান্তিও খুঁজি নি আমি। আমি সেই বজ্রবেগ পাখি
বিপুল বিস্তৃত ডানা, শূন্যতটে একান্ত একাকী
জীবনের সাধনায় সর্বলোকে আমার সন্ধান,
সংগ্রামজটিল পথে চিরদিন চিত্ত ধাবমান,
সত্যের সেনানী আমি। কখন মানি নি পরাজয়
আমি নেব ভীতমোহে সান্ত্বনার করুণ আশ্রয় ?

রাবণ : অতীতের ছায়ালোকে বস্তুহীন কীর্তির মিনার
বৃথা বাক্যে গেঁথে তোল, কোন ক্ষতি হবে না আমার।
প্রবল পেশীর বেগে পিষে যাব উদ্ধত পাষাণ,
দুনীতির শবাধার, কী তোমার করুণ বিশ্বাস।
তোমার জীবনধর্ম ভগ্নজানু আহত নিশ্বাস
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। স্বপ্নস্বর্গে করেছে প্রয়াণ
তোমার সাধনা।

আমি একা প্রদীপ্ত মহান ;—
অসঙ্কোচ কামনায় নিত্যমুক্ত আত্মা যে আমার,

আপন অমের বীর্যে বিস্তৃত করেছি অধিকার
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর বুকে।
কবোষ্ণ মদিরাপাত্র পৃথিবীকে ধরিয়াছি মুখে,
নিত্য করিতেছি পান ; প্রতি অঙ্গে অন্তহীন রতি,
আমার শিরার স্রোতে লক্ষধারা মত্ত ভোগবতী
তুলিছে আরক্ত ঢেউ ; আমি নিত্য দ্বিধাহীনগতি
আকাশে মাটিতে।

জটায়ু : আলোক পাবে না তুমি শূন্যছায়া কাটিতে কাটিতে
সুরাপাত্র টান বেগে, বাধা লেগে পাত্র ভেঙে যায়
ধূসর মাটির বুকে স্বর্ণময়ী তপ্ত সুরা ঝরে,
অন্তহীন তৃষ্ণা শুধু, তৃপ্তিহীন প্রহরে প্রহরে
তাড়না করিয়া ফেরে পরিণামহীন অভিঘাতে ;
নিরর্থ জীবন হতে তোমার নিরন্ত পলায়ন,
মত্ততার মাঝে তুমি মুক্তি চাও বন্ধ্যা দিনে রাতে,
যখনি থমকি চাও—শূন্যতারে বিষণ্ণ জীবন
অন্ধকারে বন্ধ খুঁজে মরে !
হে রাবণ,
পাও নি সৃষ্টির স্বাদ, তাই ক্ষুব্ধ প্রহরে প্রহরে
কামনায় ক্লান্ত কর প্রাণ।

রাবণ : থাক্ থাক্ হে জটায়ু, মৃত্যুনত প্রাণের প্রলাপ,
আসন্ন মৃত্যুর মুখে তোমার অস্থির অপলাপ
জীবনে আবিল করে ; চেয়ে দেখ রুক্ষ শিলাতটে,
ফেনলঘু যে রমণী রক্তরাগমত্ত সন্ধ্যাপটে
দাঁড়ায়ে সূর্যের সহচরী—
আমি তারে পেতে চাই মোর প্রতি রোমরন্ধ্র ভরি
তপ্তপ্রাণ মৃত্যুগাঢ় সুখে ;—
আমি তারে পেতে চাই আপনার স্পন্দমান বুকে
পৃথিবীর ভয় ছেড়ে একাকিনী, অগ্নিময়ী নারী
হবে সে আমার-ই।

রাজা আমি রাজা

শঙ্কা ও সঙ্কোচহীন—

জটায়ু: জন্মদীন—

হে ভীত ভিক্ষুক ! নিত্যকাল অতৃপ্ত পিপাসা
কখন পাও নি প্রেম, প্রাণের সহজ ভালবাসা
নিবিড় নির্ভর নত অচপল আশা ও বিশ্বাসে ;
যে প্রেম আলোর মত জীবনের উদার আকাশে
অসীমের সব রূপ জীবনের সীমায় প্রকাশে—
যে প্রেম স্বতই জাগে জীবনের অগম গহনে
মানসের মহিমায় ; চেয়ে থাকে বিশাল নয়নে
নিত্যকাল বিচ্ছুরিত জ্যোতি—

তুমি জান খর্বতা তোমার
আপন আত্মার দৈন্য ; শক্তি নেই প্রেমসাধনার
আশা নেই আপন বিজয়ে।

ভিক্ষার হতাশ প্রাণ, তুমি তাই ভয়ে
কেড়ে নিতে চাও ; দস্যু সেজে হে ভিখারী,
হবে তুমি রাজা—

রাবণ: আমার আপন প্রেম খুঁজে নেয় আপনার পথ
ভিখারী বা দস্যু হই তবু প্রেম স্বতই মহৎ।

জটায়ু: প্রেম নয় হীন আত্মরতি
প্রাণহীন গতিহীন ; আত্মগত আত্মার আরতি
লোভার্ত লোলুপ,
হয়েছে বঞ্চনা ঢের কর কর চুপ।

ঐ অপহৃতা—
বাতাহতা লতা সম একাকিনী যে নারী কম্পিতা,
গাহন কর নি তুমি তার চিরজীবনের স্রোতে,
দেখ নি আপন রূপ তার দুই নয়ন আলোতে
খোঁজ নিকো কি তার পিপাসা—
এ আদিম অন্ধকারে কোটে নিকো জীবনের ভাষা।

রাবণ : জীবনে জান নি তুমি ; দূর হতে করিয়াছ ভয়।
লক্ষ্যমুখী কামনায় পেয়েছি তাহার পরিচয়
বারে বারে। খণ্ডদেহ তুমি ছিন্নডানা
জীবন তোমার কাছে হে জটায়ু, অনামী অজানা
তুমি যে মৃত্যুর ক্রীতদাস—

জটায়ু : সন্ধ্যা নামে শৈলশিরে—তারা ফোটে আকাশে আকাশে,
আমার জীবনবহ্নি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে—
ক'রে যাই চূড়ান্ত ঘোষণা,
প্রাণের প্রেমিক আমি ; মরণের প্রভু আমি তাই
অন্তিমের অন্ধকারে, আদিমের পরিচয় পাই
বিগত সংশয়,
জন্মমৃত্যু একাকার মোর কাছে, শুধু পরিচয়
দিয়েছি প্রাণের—
আসন্ন ধ্বংসের মুখে অবিচল, আমি নির্বিকার
আমার মৃত্যুর মাঝে জীবনের চূড়ান্ত স্বীকার
সর্বশেষ জয়—
যে প্রাণ অজেয় একা, কখনও মানে না পরাজয়
আমি তার প্রাণমূর্তি। আমি সেই বজ্রবেগ পাখি
খরদীপ্তি দুই চোখে, মৃত্যুলোকে একা চেয়ে থাকি
তমোন্ধ মরণ-গর্ভে, বারে বারে দিয়ে যাবে হানা—
প্রতিজ্ঞা প্রবল বেগে বিধূনিত জটায়ুর ডানা ॥

অসিতকুমার

—

গোঁফে-খেজুরে

পাড় হতে তো মন সরে না, এ পার আমার অনেক ভাল ।
এই জনমের পরিচিত প্রিয়জনের সঙ্গটাই
মধুর ততই ঠেকছে, যতই সামনে ঘনায় রাতের কালো—
ভাবতে ভাল লাগছে না আর ঠাঁই-বদলের দম হাই ।

সিনেমা

মিনতি বিছানায় মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে। বড় ভাই পরেশ শার্টের কাঁধ দুটো দু হাতে ধ'রে ধোপার কাপড় কাচার মতন ক'রে ঝেড়ে সেটা পরতে পরতে বললে, না, না, ওসব সিনেমা-টিনেমা হবে না, আমার এখানে থাকতে হ'লে আমার মতেই চলতে হবে। স্টেথেসকোপটা পকেটে গুঁজে বিধবা মায়ের দিকে একবার কটাক্ষপাত ক'রে নিজের ডিস্পেন্সারির দিকে চ'লে গেল পরেশ।

মিনতির সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্তে এই কাণ্ড নয়। সে আগেকার দিনে হ'ত, তখন সিনেমা দেখাটাই প্রগতির প্রতীক হিসেবে ধরা হ'ত। এখন প্রগতির গতি অনেক—অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এখনকার মিনতিরা শুধু সিনেমা দেখেই তৃপ্ত নয়, সারা দর্শকদের দেখাবার জন্তে তাদের সারা দেহ-মন নেচে উঠেছে, অর্থাৎ মিনতি নিজেই সিনেমায় নামতে চায়। পরেশের কিন্তু এই প্রগতিতে আপত্তি, তার মতে এগুলো উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছু নয়। যে ঘড়ি ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক'রে ফাস্ট যায়, সে ঘড়িকে প্রগতিবাদী বলব না, বলব তার কলকব্জায় কোথাও দোষ আছে তার মেরামতের প্রয়োজন। রুগীর প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে সেই কথাই ভাবতে লাগল পরেশ। কি করা যায়? মা আদর দিয়ে দিয়ে মিনুটার মাথা খেয়েছেন। ছোট হ'লে ঠেঙানো যেত। বড় হয়েছে, কালের হাওয়া গায়ে লেগেছে। এর একমাত্র উপায় অবিলম্বে বিয়ে দেওয়া। কিন্তু—। এই 'কিন্তু'টাই একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। 'দাতা' কথাটি আমাদের মনের অভিধানে শ্রদ্ধার পাতায় বেশ চওড়া রকম একটা স্থান পেয়েছে; কিন্তু কন্যাদাতাই একমাত্র দাতা, যিনি সেখানে ব্যতিক্রম, তিনি সেখানে অশ্রদ্ধেয় এবং অবাঞ্ছিত। রুগীর পাল্‌স্ দেখতে দেখতে পরেশ ডাক্তারের নিজের পাল্‌স্ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যেবেলায় পরেশের স্ত্রী চা দিতে দিতে বললে, মিনু তো বদ্ধপরিকর।

তোমাদের মাথা খারাপ নাকি? চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে

উত্তর দেয় পরেশ, আবার আই. এ. পড়ুক, একবার ফেল হয়েছে তাতে কি হয়েছে !

না, ও আর পড়বে না বলছে।

কেন ?

কি জানি ?

তা হ'লে সম্বন্ধ দেখা যাক।

পাত্রই বা কোথায় ?

বিনয় ছেলেটি তো মন্দ নয়, স্টেট্ ট্রান্স্পোর্টে ভালই কাজ করে, মিনুর সঙ্গে আলাপও আছে।

বিনয়কে মিনুর পছন্দ নয়।

কেন ? বিনয় তো ছেলে ভাল।

না, তা নয়। বিনয় দেখতে তেমন ভাল নয়, চাকরিটাও সাধারণ।

মিনু নিজেও এমন কিছু অপ্সরী নয় যে, রাজপুত্তুর এসে ওকে নিয়ে যাবে। ভাল সুপুরুষ বড়লোকের ছেলেরা প্রথমত মিনুকে পছন্দ করবে কি না সন্দেহ। তাও বা যদি করে, ওরা যা চাইবে আমাকে বিক্রি করলেও তা পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ মিনতি নাটকীয় ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরেশকে মাঝপথে থামিয়ে বললে, ও-রকম পারবে না ব'লেই আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

পরেশও গর্জে ওঠে, ও পথে গেলে আর দাঁড়াতে হবে না। হুমড়ি খেয়ে যে গহ্বরে পড়বে, সেখান থেকে আর উঠতে হবে না।

দেখা যাক, আমি উঠতে পারি কি না !—আদর্শবাদিনীর মতন উত্তর দিয়ে আবার ঘরে চ'লে যায় মিনতি। পাশের ঘরে মা নীরবে ভ্রাতা-ভগ্নীর বচসা শুনতে শুনতে পরেশের ছোট ছেলেটিকে ঘুম পাড়াতে থাকেন।

একটা অশান্তির মেঘ গুমট হয়ে জমাট বেঁধে রইল সারা বাড়িটার আনাচে কানাচে।

পরদিন সকালবেলায় বজ্রাঘাতের মতন একটা খবর পরেশের কানে এসে পৌঁছল। মিনতি নাকি কয়েকদিন আগেই কোন এক সিনেমা

কোম্পানির চুক্তিপত্রে সই ক'রে এসেছে, মা নাকি খবরটা আগে থেকেই জানতেন। এ কি শুনছি মা?—পরেশ হতবাক হয়ে প্রশ্ন করে, তুমি এতে মত দিলে?

না দিয়ে যে উপায় নেই বাবা। তাতে কি হয়েছে, অনেক ভদ্রঘরের মেয়েরা নামছে আজকাল।—মা সভয়ে তাঁর আদুরী মেয়ের হয়ে ওকালতি করেন।

না না না।—পরেশ জোরে জোরে মাথা নাড়ে।

আর উপায় নেই বাবা, সই ক'রে এসেছে।—মা আবার ব'লে ওঠেন। পরেশ প্রলয়ঙ্করের মতন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, ও কন্‌ট্রাক্ট আমি ক্যান্‌সেল ক'রে দেব।

না।—প্রতিবাদ ক'রে উঠল মিনতি, তুমি ক্যান্‌সেল করবার কে?

আমি তোর গার্জেন।—গর্জন ক'রে ওঠে পরেশ।

আমি যদি তোমার গার্জেনত্ব না মেনে নিই?—আধুনিকা মিনতি নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা ক'রে বসে।

মানে!—আচমকা একটা সজোর থাপ্পর খাওয়ার মত মনে হয় পরেশের। টাল সামলে গোঁয়ারের মত ব'লে ওঠে, না না না। দাদার অবস্থা দেখে শিক্ষয়িত্রীর মতন বোঝাতে চেষ্টা করে মিনতি, সিনেমা দেখে আনন্দ পেতে পার। আর সেই সিনেমায় পার্ট করাটা কি এমন পাপ তা আমি বুঝতে পারছি না। তখুনি পাল্টা জবাব দেয় পরেশ, আমি তো ডাক্তার, রুগী পেলেই খুশী হই, কিন্তু আমি চাই না আমার বাড়িসুদ্ধ সবাই রুগী হয়ে প'ড়ে থাকুক।

আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।—এই ব'লে পাশের ঘরে গিয়ে দরজাটা দড়াম ক'রে ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দেয় মিনতি। বন্ধ দুয়ারের দিকে চেয়ে চিৎকার ক'রে পরেশ উত্তর দেয়, আমি আবার বলছি, এ বাড়িতে সিনেমা-টিনেমা হবে না।

বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহিণী মিনতি আজ জোর গলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এ আর উনবিংশ শতাব্দীর মানদাসুন্দরী ক্ষেমঙ্করীর মত ছেলেকে দুধ খাইয়ে মুখ পোঁছাতে পোঁছাতে কাজ-থেকে-না-ফেরা স্বামীর দেরি দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠবে না। এ মিনতি ট্রামে

বাসে উঠে লেডিজ সিটে বসা পুরুষদের জোর গলায় উঠিয়ে দিয়ে জানলার কোল ঘেঁষে ব'সে আড়চোখে তাকাতে শিখেছে। আজ বুঝতে শিখেছে, অর্থই বর্তমান সমাজব্যবস্থার একমাত্র মানদণ্ড। তাই পুরুষরা ঘরে ঘরে পূজিত, মেয়েরা লাঞ্ছিতা, কারণ পুরুষরা দশটা পাঁচটা ক'রে অর্থ আনে। মেয়েরা ঘরে ব'সে বংশবৃদ্ধি ক'রে সেই অর্থকে নিঃশেষ ক'রে দেয়, তারা যেন সংসারের প্রতিদিনের হিসেবের খাতায় মূর্তিমতী খরচ। সংসারের এই অর্থের মানদণ্ডের বাটখারাটাকে ভাল ভাবে ঠিক ক'রে দেবে মিনতি।

দুদিন উপরো-উপরি উপবাস ক'রে বিদ্রোহটাকে ভাল ভাবে জাহির করল মিনতি। মায়ের মেয়ের জন্য দুঃখ হয়। ছেলের কথা শুনে চিন্তা হয়।

পরেশও যা-তা লোক নয়। বিদ্রোহিণী মিনতির সে দাদা। জোর গলায় প্রচার ক'রে দিলে, দুটোর মধ্যে একটাকে ছাড়তে হবে। হয় সিনেমা, নয় ওর দাদার ভিটে।

আধুনিকা মিনতির হাসি পায় তার দাদার এই চণ্ডীমণ্ডপ-মার্কা প্রস্তাবে। নিজের ছোট সুটকেসটা গোছাতে গোছাতে বললে, মা, আমি চললাম। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পার।

তুই চ'লে যাবি মা?—প্রগতি আর সনাতন এই দুই ধারার ঘূর্ণাবর্তে মা দিশেহারা হয়ে কূলহারা হয়ে পড়েন। নিমজ্জিতার মত হাত দুটো তুলে শেষ চেষ্টা করেন পরেশের কাছে গিয়ে, রাজী হয়ে যা বাবা, না হ'লে ও চ'লে যাচ্ছে।

যাক—থুতু ফেলার মতন ক'রে কথাটাকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দেয় পরেশ।

মেয়েটা একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে!—মা ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন।

একা কেন? তুমিও সঙ্গে যাও।—যেন খুব শান্ত কণ্ঠেই সান্ত্বনা দেয় পরেশ।

নিজের মা বোনকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস!—শেষ খড়টি ধরবার চেষ্টা করেন মা, কিন্তু পরেশের চিৎকারের উত্তাল তরঙ্গে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মিনতি নিজে গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে আনল। জিনিসপত্র তুলে বললে, এস মা। পরেশের স্ত্রী পরেশের দুটি ছেলেমেয়ে হতবাক হয়ে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল। একগলা ঘোমটা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মা এসে ট্যাক্সিতে উঠলেন।

পাঞ্জাবী ড্রাইভারের সেল্‌ফ স্টার্টারটা দুবার গোঁ গোঁ ক'রে, গর্‌ গর্‌ ক'রে স্টার্ট নিয়ে হুস ক'রে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে মোড় নিল, যেন বর্তমানের উগ্র প্রগতি সনাতন ভাবধারার টুঁটি ধ'রে দুবার ঝাঁকুনি দিয়ে আপন ভবিষ্যৎ জয়-পথে যাত্রা করল।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়ে উঠবি?

মিনতি অম্লান বদনে উত্তর দেয়, একটা হোটেলে জিনিসপত্তর রেখে স্টুডিওতে যাওয়া যাক, সেখানে ওঁরা একটা ব্যবস্থা করবেনই।

ভবিষ্যতের জয়রথ গর্‌গর্‌ ক'রে চৌরঙ্গীর পথ ধরল।

শহরতলির ভাড়াটে এই স্টুডিওটি আজব জায়গা। জীবন্ত প্যারাডক্স। যে যা নয়, সে সেইটেই প্রমাণ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কালো মুখকে রঙ মাখিয়ে বেগুনে ক'রে, বেগুনে ঠোঁটকে লিপস্টিক মাখিয়ে লাল করবার সে কি কদর্য প্রচেষ্টা! গণিকা এখানে সতীতুল্য পূজিতা, সতী এখানে দেখতে দেখতে রূপান্তরিত হয় বারবনিতায়। অদ্ভুত জায়গা এই স্টুডিওটি! মূর্খ হয়েছে মুখ্য। শিক্ষিত কর্মী এখানে নিপীড়িত। মৌখিক বোলচাল, আর দৈহিক সৌন্দর্যই এখানকার উন্নতি-পথের একমাত্র পাথেয়। পোশাক, পরিচ্ছদ, হাবভাব, কথাবার্তা সবটাই যেন কৃত্রিমতায় ভরা। মেয়েরা চুল বব্‌ড করে, রঙ মেখে নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো প্রকটভাবে প্রকাশ করে, চকচকে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে নিজেদের ভ্যানিটিকে জাহির করে। পুরুষরা দামী স্যুট প'রে দামী গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট টানতে টানতে মেয়েগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে খ্যাকশিয়ালের মতন অকারণ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ ক'রে হাসে। ভারতের সমস্ত ঐতিহ্য, সকল সংস্কৃতি এখানে এসে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে পিছু হেঁটে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে যেন। আসামের ভূমিকম্প, বাংলার উদ্বাস্তু, বিহারের বান—কোন কিছুই

এই স্টুডিওর জনতার মধ্যে শিহরণ জাগাতে পারে নি। অদ্ভুত এই শহরতলির স্টুডিওটি! তবে ভাল যে নেই তা নয়, আছে; যেমন কয়লা খনির মধ্যে কয়েক টুকরো হীরে প'ড়ে থাকে তেমনি আর কি। সমর হচ্ছে সেই রকম কোণে-প'ড়ে-থাকা হীরেদের দলে। এরা বলে, চ্যালা, ওকে নিয়ে আগুন ধরানো যাবে না, খুব জোর ছুঁড়ে কুকুর তাড়ানো চলবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কুকুরই তাড়াব, সমস্ত কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দোব এখান থেকে।—বুড়া নরেন মিস্ত্রীর সামনে বক্তৃতা দেয় সমর। প্লাগের তার ঠিক করতে করতে নরেন মিস্ত্রী চালশে-ধরা চোখ তুলে তাকায়, এই রোগা রোগা অ্যাসিস্টেণ্ট বাবুটির দিকে আর মনে মনে হাসে।

আচ্ছা, এ কেন হবে নরেনদা? কতকগুলো শিমুলফুল-মার্কা ছোকরা-ছুকরি স্রেফ চেহারাগুলো ভাড়া দিয়ে আর কতকগুলো ফ'ড়ে কেবল বাক্‌তাল্লার জোরে সব শুষে নিয়ে যাবে? তুমি আর আমি সবচেয়ে বেশি খেটে বেশি কষ্ট পাব? কেন কেন কেন? সাম্যবাদী সমর এ প্রশ্নের উত্তর পাবে কি না নরেন মিস্ত্রী জানে না। সে শুধু এইটুকু জানে, তার হাতের স্পর্শে শত শত ছবির, হাজার হাজার দৃশ্য লক্ষ লক্ষ বার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়েছে। কিন্তু মাসের শেষে তার নিজের বাড়িতে বাতি জ্বালবার জন্যে এক কৌটা তেল কেনবার একটা পয়সাও জোটে নি। সমরকে বাধা দিয়ে বলে, ও-সব বলবেন না সমরবাবু, পুলিসে ধ'রে নিয়ে যাবে।

হবে, হবে নরেনদা হবে।—সমর সান্ত্বনা দেয়।—ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা আসছে এ লাইনে। এর আগে তো কতকগুলো মাতাল চরিত্রহীনের রাজত্ব ছিল।

এখনো বা কি কম! আধপোড়া বিড়িটা ধরিয়ে উত্তর দেয় নরেন মিস্ত্রী।

আমরা এসেছি, তোমরা আছ, পাঁক পরিষ্কার ক'রে ফেলব।—স্বপ্ন দেখে সমর। শিল্পদেবীর সমস্ত শাখা-প্রশাখা—সাহিত্য, গান, অভিনয়, কলা, নৃত্য সমস্ত; বিজ্ঞানও তার সব কটি বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে এই মহাসাগরে, অথচ সেটাকে এরা পচা ডোবা ক'রে রেখেছে। পাঁক

পরিষ্কার করতে হবে, করতেই হবে। উত্তেজিত হয়ে সমর উঠে যায়।

একটু পরেই মিনতিদের ট্যাক্সিটা স্টুডিওতে এসে ঢুকল। মাকে নিয়ে একটা ব্যারাকের মতন বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। খুপরি খুপরি ঘর, প্রত্যেকটি ঘরের সামনে এক-একটি সিনেমা কোম্পানির ছোট ছোট সাইন-বোর্ড ঝুলছে।

'মুখর আখর পিক্চার্সে'র সামনে এসে মিনতি দাঁড়াল। ভেতর থেকে একটা উচ্ছ্বসিত হেঁড়ে গলায় আওয়াজ হ'ল, এই যে, আসুন আসুন। মাকে নিয়ে মিনতি 'মুখর-আখর' অফিসে ঢুকল। ঢুকেই সেকেলে মায়ের সঙ্গে সবার বিদেশী কায়দায় পরিচয় করাতে লাগল। ইনি, আমার মা। ইনি—। কোণের দিকে চেয়ারে বসা চৌকনা-মুখো যে বলিষ্ঠ ভদ্রলোকটি চুরুট টানছিলেন তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে মিনতি, শ্রীঅতীন চৌধুরী, আমাদের ছবির প্রযোজক। অতীনবাবু চুরুটটা হাতে নিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটো তুলে সব কটা দাঁত বার ক'রে খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হেসে ফেললে। অদ্ভুত সে হাসি। যে ওর হাসিতে অভ্যস্ত নয়, সে স্বচ্ছন্দে মনে করতে পারে ভেংচি কাটছে বোধ হয়।

এঁকে মা তুমি নিশ্চয় ছবিতে দেখেছ।—গদগদ হয়ে বলে মিনতি, ইনি চম্পা দেবী। বিখ্যাত অভিনেত্রী চম্পা দেবী লিপস্টিক-মাখা ঠোঁট দুটোকে সঙ্কুচিত ক'রে হাসিটাকে নিয়ন্ত্রিত করলেন। অনেকটা ঠোঁট-ফাটা হাসির মতন। গগল্স প'রে থাকায় কোন্ দিকে তাকালেন বোঝা গেল না। তাঁর পাশেই নেউলের মতন একটা ছাই রঙের হাওয়াই শার্ট প'রে যে ভদ্রলোকটি সিগারেট টানছিলেন, মিনতি তাঁকে চেনে না। অতীন পরিচয় করিয়ে দিলে, ইনি নবীনবাবু, আমার এই ছবির ডাইরেক্টার। ঠিক এমন সময় নবীনের অ্যাসিস্টেন্ট সমর এসে ঢুকল। কেউ ওকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার মনে করল না। সমর একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে—মিনতির মাকে এখানে বড় বেমানান লাগছিল, ঠিক যেন উগ্র ইঙ্গ আধুনিকার এনামেল-করা ললাটের ওপর ঠাকুরবাড়ির চন্দনের তিলকের মতন।

মাকে তা হ'লে রাজী করিয়েছেন?—ব'লে ওঠে নবীন ডাইরেক্টার।

মিনতি একটু হেসে উত্তর দেয়, হ্যাঁ। তারপর একটু ভেবে অতীনের দিকে তাকিয়ে বললে, একটা কথা ছিল।

প্রাইভেট কি কোন?—সাগ্রহে জিজ্ঞেস ক'রে অতীন।

হ্যাঁ।

বাইরে চলুন।

অতীন আর মিনতি বাইরে চ'লে যায়। চম্পা দেবীর ঠোঁট দুটো আবার সঙ্কুচিত হ'ল।

বাইরে গিয়ে মিনতি অতীনকে তার বাড়ির সব কথা বলে—দাদার সঙ্গে ঝগড়া, বাড়ি থেকে চ'লে আসা, সব।

কোথায় উঠেছেন?—চুরুটটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে জিজ্ঞেস করে অতীন।

হোটেলে, কিন্তু সেখানে মায়ের ভয়ানক অসুবিধে হবে।

আচ্ছা!—চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে অতীন, আমার বাড়িতে আসতে পারেন, দুটো ঘর ছেড়ে দিতে পারি।—ভদ্রলোকের যা করা উচিত অতীনও তাই করলে।

দাঁড়ান, মাকে ডেকে নিয়ে আসি।

মিনতি ঘরে গিয়ে মাকে ডেকে নিয়ে এল।

মা, ইনি ওঁর বাসায় উঠতে বলছেন।—কৃতজ্ঞ চিত্তে ব'লে ওঠে মিনতি।

তাতে আপনার অসুবিধে হবে।—মা সভয়ে উত্তর দেন।

অসুবিধে আর কি, আমার বাড়িতে তেমন বেশি লোক নেই। আমার স্ত্রী, দুটি ছেলে আর আমার ভাই, ঘরও আছে গোটা পাঁচ-ছয়। একটানা ব'লে যায় অতীন, আর শীগগির আপনাদের একটা ফ্ল্যাট ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

মিনতি মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে বলিষ্ঠ অতীন চৌধুরীর দিকে।

চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।

অতীন ওদের ভেতরে নিয়ে যায়।

ভেতরে তখন সমরের সঙ্গে নবীন ডাইরেক্টারের তর্ক-গোছের একটা কিছু হচ্ছে।

এ কি ক'রে সম্ভব নবীনদা, গল্পের আইডিয়া উনি তিন লাইনে ব'লে গেলেন, আর প্রতিদিন স্যুটিঙের আগে সিন লিখে দিয়ে যাবেন! অ্যাবসার্ড।

চম্পা দেবী হঠাৎ ব'লে ওঠেন, গল্প কে লিখেছে?

নবীন গজদন্তটা বার ক'রে হাসি হাসি মুখে উত্তর দিলে, জগাই রায়।

এমন সময় মিনতিরা এসে পড়ায় সমরের সম্ভব অসম্ভব সব ধামাচাপা প'ড়ে গেল। সমর কি একটা বলতে যাচ্ছিল, অতীন তাকে হাত তুলে থামিয়ে হুকুম করল, তুমি আমার বাসায় গিয়ে ব'লে এস, এঁরা আজ রাত্রে আমার ওখানে থাকবেন। এঁর কথা বিশেষ ক'রে বলবে। মিনতির মাকে দেখিয়ে বলে।

সমর চ'লে গেল। মিনতি জিজ্ঞেস করলে, উনি কে?

আমার অ্যাসিস্টেণ্ট, নবীন বললে, ছোকরা আদর্শ আদর্শ ক'রেই গেল।

কি বলছিল?—প্রশ্ন করে অতীন।

খোশামোদের আমেজ নিয়ে উত্তর দেয় নবীন ডাইরেক্টার, কি আর বলবে, জগাইবাবুর কাছ থেকে গল্পটা আমাদের কম্‌প্লিট ক'রে নেওয়া উচিত। এই আর কি।

কি উচিত আর কি অনুচিত সেটা কি ওর কাছ থেকে শিখতে হবে নাকি? তাচ্ছিল্য সহকারে উত্তর দেয় অতীন।

আমাদের গল্পের কি আইডিয়া?—সাগ্রহে প্রশ্ন করে মিনতি।

অমানুষিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ফাইট ফর হিউম্যানিটি।—অপরের কাছ থেকে শোনা কথাটা উদ্গার করে অতীন।

তা হ'লে ওই কথাই রইল, মাসে দশটা ক'রে ডেট আপনাদের দোব। আচ্ছা উঠি।

একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন চম্পা দেবী।

এর মধ্যে উঠবেন?—আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে অতীন, একটু চা-টা—

না থাক, আমার আবার নাইট শ্যুটিং আছে।—ঠোঁটটা সঙ্কুচিত ক'রে ছোট্ট নমস্কার ক'রে চ'লে যান চম্পা দেবী।

একটু পরে নেউলমুখো নবীন ডাইরেক্টার নেউলের মতন ছুটে গেল, হোটেল থেকে মিনতিদের জিনিসগুলো অতীন চৌধুরীর বাসায় আনবার জন্যে। 'মুখর-আখর পিক্‌চার্স'এর সবাই উঠে-প'ড়ে লেগেছে—মিনতিকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। চুরুট কামড়ে অতীন পরেশ-ডাক্তার সম্বন্ধে মন্তব্য করলে, ব্রুট, রি-অ্যাক্‌শানারি। এখনও এ রকম গোঁড়া থাকতে পারে পৃথিবীতে!—যেন সব কিছুই জানে এই রকম একটা ভাব নেয় অতীন চৌধুরী।

মায়ের মিনতির দুজনেরই বেশ লাগল অতীন চৌধুরীর বউটিকে। মাঝবয়সী, সাদামাটা, সেকেলে একেলের মাঝামাঝি। ছেলে দুটিও চমৎকার, একটি দু বছরের আর একটি মাস আষ্টেকের, বেশ টুকটুকে, ফুটফুটে।

সহজেই আলাপ হয়ে গেল অতীন চৌধুরীর স্ত্রীর সঙ্গে। মায়ের পরিচয় পেয়ে, একমুখ হেসে ঘোমটাটা একটু ঠিক ক'রে প্রণাম করল মাকে। আধুনিকা মিনতি হাত তুলে নমস্কার করল। তার হাত দুটো ধ'রে মাকে নিয়ে পাশের ঘরে চ'লে যায় অতীন চৌধুরীর স্ত্রী।

পরদিন মা একটু ব্যস্ত হ'লেন নতুন ফ্ল্যাটের জন্যে। এখানে এভাবে থাকাটা তাঁর কাছে বড় অশোভন অস্বস্তিকর লাগছিল। কোন চিন্তা নেই।—তাঁকে নিশ্চিন্ত ক'রে অতীন স্টুডিওয় চ'লে গেল।

'মুখর-আখর' অফিস মুখরিত হয়ে উঠেছে সমরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়—অদ্ভুত লিখেছেন অরুণবাবু, চমৎকার হয়েছে গানটা। লাজুক কবি অরুণ ঘোষ প্রশংসা শুনে আরও লজ্জিত হয়ে ওঠেন। এমন সময় অতীন এসে ঢুকল, অরুণের দিকে তাকিয়ে বললে, গানটা হয়েছে?

চমৎকার হয়েছে।— ওর হয়ে উত্তর দেয় সমর।

দেখি।—গানটা নিয়ে ভুরু কুঁচকে পড়তে থাকে অতীন চৌধুরী।

দুর্ধকটা প'ড়েই গানটা ফেলে দিয়ে বিজ্ঞের মত ব'লে ওঠে, কিছু হয় নি, এ সব ভাসা ভাসা ভাষা চলবে না। ডাইরেক্ট চাই, ডাইরেক্ট—দেখছেন না বম্বেওয়ালারা কি করছে!

হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে অরুণ ঘোষ।

আমি আপনাকে হিন্দী ফিল্মের একটা 'হিট সং' দিচ্ছি। আপনি ঠিক ওই ছন্দে ওটাকে অনুবাদ করুন।—উপদেশ দিয়ে পথ দেখিয়ে দেয় অতীন। সমরের ইচ্ছে হ'ল বারণ ক'রে দেয় অরুণ ঘোষকে, সে যেন আর না লেখে। কিন্তু কি করবে অরুণ ঘোষ, তার অর্থনৈতিক অবস্থা তার হাত পা বেঁধে দিয়েছে। কাগজে তিরিশটা কবিতা লিখে যা পাবে, তার চেয়ে ঢের বেশি পাবে সিনেমায় একটা গান লিখে। অরুণ ঘোষ নিরুপায়। রবীন্দ্রনাথের দেশের কবিকে লিখতে হবে বম্বের এক ফড়েকে কবির অনুকরণে। সমরের মনে পড়ে, তাকে একবার কে একজন বলেছিল, সরস্বতী স্বর্গের গণিকা। সেইজন্যে সমর তাকে মারতে গিয়েছিল। এখন সেই সমরের চোখের সামনে সেই সরস্বতী মর্ত্যে এসে পতিতার বেশে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরেই নেউল-মুখো নবীন ডাইরেক্টার এসে ঢুকল।

যে ফ্ল্যাটটা খোঁজ করতে বলেছিলাম করেছো?—জিজ্ঞেস করে অতীন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। দুটো মাত্র ঘর, ভাড়াও বেশি—দেড়শো। নবীন ডাইরেক্টার সবিনয়ে উত্তর দেয়।

দেড়শোতেই নার্ভাস হয়ে গেলে! এখুনি গিয়ে বুক কর।—অতীন হুকুম করে।

ছ-মাসের অ্যাডভান্স চাইছে।—সভয়ে ব'লে ওঠে নবীন ডাইরেক্টার।

ইমিডিয়েট্‌লি চ'লে যাও। খসখস ক'রে ন শো টাকার একটা চেক লেখে 'মুখর আখর পিকচার্সের প্রডিউসার' এ. চৌধুরী। নেউল চেকটা নিয়ে সুট ক'রে চ'লে যায়।

ডাইরেক্টারের এই পরিণতি সমর কল্পনাও করতে পারে না। ডাইরেক্টার তার ছবির কথা ভাববে। ভাববে হয়তো তার গল্পের

নায়িকার সমস্যার কথা। এ যে দেখছি উল্টো। বাস্তবে হিরোয়িনের ফ্ল্যাটের জন্য বাড়ির দালালের মতন ঘুরে বেড়ানো! সত্যি, নভেলটি আছে নবীন ডাইরেক্টারের। মনকে সান্ত্বনা দেয় সমর।

হ্যাঁ, শোন।—চুরুটটা ধরাতে ধরাতে বলে অতীন। সোমবার থেকে স্যুটিং ফেলছি।

কোন্ সেটটা আগে পড়বে?—প্রশ্ন করে সমর।

কপালে হাত দিয়ে দাঁত দিয়ে চুরুটটা কামড়ে একটু ভেবে উত্তর দেয় অতীন, তুমি একবার জগাইবাবুকে ফোন করে জিজ্ঞেস কর, সোমবার উনি কোন্ সিনটা দিতে পারবেন।

জগাই রায় ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বললেন, হিরোয়িনের ঘরটা ফেলুন।

সমর রিসিভারটা হাতে রেখেই মুখ তুলে খবরটা অতীনকে দিল। অতীন একটু ভেবে বললে, অন্য কোন ঘরের সিন-টিন দিতে পারবেন না?

সমর আবার রিসিভারে মুখ লাগিয়ে বলে, অতীনবাবু বলছেন অন্য কোন সিন দিলে যেন একটু ভাল হ'ত।

আরে না না।—অপর প্রান্ত থেকে বলেন জগাই রায়, আগে হিরোয়িনকে দেখি, সেই ভাবে তো গল্পের ট্রিটমেণ্ট করব। তুমি হিরোয়িনের ঘরটাই ফেল, বুঝলে? আমি সোমবার সকালে সিনটা লিখে নিয়ে যাব?

কোন্ কোন্ আর্টিস্ট থাকবে?—এদিক থেকে জিজ্ঞেস করে সমর।

হিরোয়িন তো থাকবেই, মুশকিলে ফেললে দেখছি, কালকে একবার ফোন ক'রো, বলবার চেষ্টা করব।

তাড়াতাড়ি লাইনটা কেটে দেয় জগাই রায়। ফোনের রিসিভারটা রেখে সমর চ'লে যায় টেক্‌নিশিয়ানদের ঘরে।

সোমবার। মিনতির স্মরণীয় দিন, জাত বদলের দিন। মায়ের সঙ্গে কোম্পানির গাড়িতে সকালবেলায় স্টুডিওতে এসে পৌঁছুল। অতীন, নবীন, সমর, প্রোডাকশন ম্যানেজার অধর আগে থেকেই

এসেছিল। মিনতিরা আসামাত্রই অতীন নেউলকে হুকুম করলে, নেউল আবার হুকুমটা 'রিলে' করল সমরের ওপর,—যাও, ওঁকে মেকআপ-রুমে নিয়ে যাও। আর ওঁর জন্যে যে নতুন শাড়ি ব্লাউজ কেনা হয়েছে, সেগুলো দিয়ে এস।

চম্পাদি এসেছেন?—মেকআপ-রুমের দিকে যেতে যেতে সমরকে জিজ্ঞেস করে মিনতি।

না, উনি একটু বেলাতে আসেন।—উত্তর দেয় সমর।

মা সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। মেকআপ-রুমের কাছে এসে বাইরে থেকে চিৎকার ক'রে ডাকল সমর, জগনদা, জগনদা। মেক-আপ-রুম থেকে বেরিয়ে এল বেঁটে-খাটো টাকমাথা জগন মেকআপ ম্যান।—কি বলছ? সমরকে 'তুমি' 'তুমি' করে জগন মেক-আপম্যান। সমর তাতে খুশিই হয়।

ইনি আমাদের হিরোয়িন, বেশ ভাল ক'রে মেকআপ ক'রে দাও।

রাজরাণী না চাকরাণী? আজকাল তো নানান রকম হিরোয়িন হচ্ছে?—জগন প্রশ্ন করে।

কি যে, তা আমি নিজেও জানি না? সাধারণ একটা মেকআপ ক'রে দাও।—উত্তর দেয় সমর।

আচ্ছা, আসুন। জগন মিনতিকে ডেকে ভেতরে নিয়ে যায়। বেশ লাগে সমরের জগন মেকআপ ম্যানটিকে। খাটে বেশি, পায় কম, কিন্তু হাসিমাখা মুখে রসিকতা লেগেই আছে।

কি বলছ সমর! আমরা হচ্ছি ভগবান। আজ ওকে রাজা, কাল তাকেই ভিখারী, পরশু আবার চাকর, তার পরদিন মেথর, হাতের চাপড়ে যা ইচ্ছে তাই বানিয়ে দিচ্ছি।—রোগা বুকটা চিতিয়ে মধ্যে মধ্যে রসিকতা করে জগন।

কিন্তু পেট আর পকেট?—ঘাড়টা বাড়িয়ে একটু হেসে সমর বুড়ো আঙুল দুটো নেড়ে দেয়।

যাঃ মাইরি, ওসব প্রাইভেট কথা কেন তুলছ? একটা ধোঁয়া ছাড়, ধোঁয়া ছাড়। এই ব'লে রূঢ় সত্যটাকে ঢাকা দেয় চির-হাসিপ্রার্থী রসিক জগন মেকআপম্যান। জগনের কথা ভাবতে ভাবতে সমর আপিসের দিকে এগিয়ে যায়।

মেকআপ-রুমে জড়সড় হয়ে বসে মিনতি। সেলুনের মতন বড় বড় আয়নার সামনে এক একটা ক'রে চেয়ার। দুটি মেয়ে ইতিমধ্যেই মেকআপে ব'সে গেছে। মাঝের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে জগন বলে, আসুন এইটেতে। মিনতি গিয়ে বসামাত্রই গলায় একটা তোয়ালে ঝুলিয়ে দিলে, তারপর স্প্রে দিয়ে মুখটাকে ধুইয়ে দেয়। তারপর? মিনতির সারা দেহটা শিউরে ওঠে, একটা পরপুরুষ তা'র কপালে কপোলে যথেচ্ছভাবে হাত চালাবে! ভাবতে পারে না মিনতি, অসম্ভব! চেয়ারের হাতল দুটো দু হাতে ধ'রে অপারেশন করাবার মত দাঁতে দাঁত চেপে জোর ক'রে চোখ বুজে থাকে মিনতি। ঠিক ক'রে তাকান।—মেশিনের মতন রঙ চড়াতে থাকে জগন মেকআপম্যান। কিছুক্ষণ পরে মিনতি যখন মেকআপ ক'রে বেরুল, তখন তার চেহারা আগাগোড়া পালটে গেছে। রাজার ছেলে এসে সত্যিই পছন্দ করবে মিনতিকে এখন। মিনতির শ্রী ছিল, রঙ ছিল না। জগনের হাতের জাদুতে সত্যিই সুন্দরী হয়ে উঠেছে মিনতি। মা মিনতির রূপ দেখে চমকে যান। এ কি তাঁর মিনতি, না, অন্য কারও মেয়ে! সমর এসে ডেকে নিয়ে গেল মিনতিকে। তারও বেশ লাগল; যেতে যেতে বললে, সত্যি, আপনারা এ লাইনে এসেছেন, আনন্দের কথা, খুবই আশার কথা। গড়গড় ক'রে ব'লে যায় আশাবাদী সমর।

যথাসময়ে জগাই রায় এসে অম্লান এবং সহাস্য বদনে জানালে, সিনটা এখনও লেখা হয় নি,—এখনই লিখে দিচ্ছি। কুছপরোয়া নেই। সিনগুলো যেন ময়দার নেচি, চাকি-বেলুনের মত কাগজের বুকে কলমটাকে কয়েকবার চালিয়ে, কড়ায়ে ফুটন্ত ঘিয়ে লুচি ছোঁড়ার কায়দায় এক-একটা পাতা তাড়াতাড়ি লিখে ছুঁড়ে দিতে থাকে জগাই রায়। কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, বিয়ে-বাড়ির ভাড়াটে রাঁধুনীর লুচি ভেজে ঝুড়ি ভ'রে দেওয়ার মত সিনটাকে এক নিমেষে শেষ ক'রে চ'লে যায় গল্প-লেখক জগাই রায়।

প্রথম দিনই মিনতি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলে—চমৎকার অভিনয় করলে। ঘাগী অভিনেত্রী চম্পা দেবী পর্যন্ত চমকে গেল মিনতির অভিনয় দেখে। আশ্চর্য!

নতুন একটা 'শট' ভাবতে ভাবতে সেটের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল অতীন চৌধুরী। মিনতির অভিনয়ে বুক তার ফুলে উঠেছে, এ যেন তার ব্যক্তিগত সাফল্য।—ক্যামেরাটা ওদিকে রাখছেন কেন?—অতীন ক্যামেরাম্যানকে জোর গলায় ব'লে ওঠে।

নবীনবাবু যে বললেন এদিকে রাখতে।—উত্তর দেয় ক্যামেরাম্যান।

না না, যা বলছি তাই করুন।—চিৎকার ক'রে ক্যামেরার পজিশানটা দেখিয়ে দেয় অতীন। একটু জল—মিনতি চাইল। স্ক্রিপ্টের পাতা উলটে মুখ তুলে হুঙ্কার দেয় অতীন, কি করছ নবীন, শুনছ না মিনতি দেবী জল চাইছেন? তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জল আনতে বলে নবীন ডাইরেক্টার।

চম্পা দেবী, আপনি এখানটায় দাঁড়ান—কমলবনে মত্ত হাতীর মত দাবড়ে বেড়ায় অতীন চৌধুরী।

সন্ধ্যেবেলায় মিনতি মায়ের সঙ্গে নিজেদের নতুন ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। অতীনবাবু কিছু ফার্নিচার পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজকে মিনতির খুব ভাল লাগছে, সব ভাল লাগছে। এমন কি যদি পরেশও এসে দাঁড়ায়, মিনতি দাদা ব'লে তখুনি তাকে প্রণাম ক'রে ফেলবে। আজকে তার এই অভিনয়ের সাফল্য—তার সকল প্রচেষ্টা, সব আশঙ্কা, সমস্ত আশার সমাধান হয়ে গেল যেন। পারবে, মিনতি পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। বাথ-রুমে গিয়ে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে গুন গুন ক'রে গান গায় ভাবীকালের অভিনেত্রী।

দিন যায়, দিন আসে। এমনি যাওয়া-আসা ক'রে কয়েকটা দিন বেশ কেটে যায় মিনতির। রোজই স্যুটিং থাকে। মিনতি নিয়মিত জগন মেকআপম্যানের হাতে গালটা পেতে দেয়, আর কোন সঙ্কোচ হয় না তার। বরঞ্চ এক-একদিন গালটা বাড়িয়ে বলে, দেখ তো ঠিক হয়েছে কি না?

ঠিক আছে, ঠিক আছে।—ব'লে তবলায় লহরা দেওয়ার মত হাতটা গালের ওপর কয়েকবার চালিয়ে দেয় জগন মেকআপম্যান।

মা রোজই সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। মিনতির স্টুডিওর এই পরিবেশে বিধবা মাকে বেগুন-ক্ষেতে ক্রস-করা বাঁশে—ছেঁড়া জামা পরা, ভাঙা হাঁড়ি দেওয়া স্কেয়ার-ক্রোর মত মনে হয়।

অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে মিনতির। ছবির নায়ক অজিতবাবু বেশ লোকটি। অনর্গল কথা বলে, অসম্ভব সিগারেট খায়। ক্রিকেট খেলায় অদ্ভুত ঝোঁক। চনমন ক'রে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু মনটা পরিষ্কার। সামনেই 'শালা-বেটাচ্ছেলে' ব'লে গাল দেয়, ভুল বুঝলে তখুনি তাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, কিছু মনে করিস না ব্রাদার। তা সে যেই হোক, জগন মেকআপম্যানই হোক আর অতীন চৌধুরীই হোক। সমরেরও বেশ লাগে অজিতবাবুটিকে—এত নাম, এত গুণ, কিন্তু একটুও অহঙ্কার নেই। অজিতবাবু একটা জীবন্ত ব্যতিক্রম। আর মিনতির আলাপ হয়েছে শোভা দেবীর সঙ্গে। ভদ্রঘরের মেয়ে, বিদ্রোহ ক'রে নয়, স্বামীর মতামত ও সাহায্য নিয়ে এ লাইনে তার মত এসেছেন। ভদ্রমহিলা কম কথা বলেন, কিন্তু অপূর্ব অভিনয়ে দক্ষতা।

আসুন মিনতি দেবী, আপনার ক্লোজ-আপটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিই।—হন্তদন্ত হয়ে ব'লে যায় অতীন। অজিত এক ধারে ব'সে ছিল চম্পা দেবীর পাশে, বেফাঁসভাবে ব'লে ওঠে, অতীনবাবু দেখছি মিনতির প্রতি একটু বেশি ইণ্টারেস্ট নিচ্ছেন।

স্বাভাবিক।—মুখ টিপে মন্তব্য করেন ঘাগী অভিনেত্রী চম্পা দেবী।

মানে?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে অজিত।

কিছু না।—এড়িয়ে যান চম্পা দেবী। অবশ্য এই 'কিছু না'টা কিছুদিন পরেই একটু একটু ক'রে বোঝা যেতে লাগল।

নিয়তি তার অদ্ভুত খেলা দেখাল মিনতির মায়ের ওপর দিয়ে। বাথ-রুমে স্নান করতে এসে পা হড়কে প'ড়ে পাটা গেল ভেঙে। খবরটা শুনে বিধাতার মত ছুটে এল অতীন চৌধুরী। নিজে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দিয়ে এল। সান্ত্বনা দিয়ে এল, ওষুধপত্র কিনে দিয়ে এল।

স্টুডিওতে তুমি একটু মিনতিকে চোখে চোখে রেখো বাবা।—সরলা মা আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে অনুরোধ করেন অতীনকে।

সে সবের আপনি কোন চিন্তা করবেন না।—অতীন সাগ্রহে উত্তর দেয়।

সত্যি, চোখে চোখে রাখতে লাগল অতীন চৌধুরী। স্যুটিঙের শেষে স্টুডিওর এক ধারে আবছা আলোয় আবছা আঁধারে মেকআপ উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিনতি, কোম্পানির গাড়ির অপেক্ষায়। ঘস্ ক'রে পাশে এসে দাঁড়ায় অতীন চৌধুরীর 'কার্'টা। এই যে আসুন— স্টিয়ারিঙে হাত রেখে মুখ ফিরিয়ে বলে অতীন।

আমাকে বলছেন? সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস ক'রে মিনতি।

তবে আবার কাকে? ভেংচি কাটার মত ক'রে হেসে দরজাটা খুলে দেয় অতীন।

কোম্পানির গাড়ি?—প্রশ্ন করে মিনতি।

আজ্ঞে, মাকে দেখতে হসপিটালে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে লিফ্‌ট নিতে পারেন।—এই ব'লে পাশের খালি জায়গাটা দেখিয়ে দেয় অতীন।

ওঃ! একটু হেসে জড়সড় হয়ে পাশে এসে বসে মিনতি।

গিয়ারটা বদলাতে বদলাতে চুরুটটা কামড়ে বিজ্ঞের মত জিজ্ঞেস করে অতীন, কেমন লাগছে এ লাইন?

ভাল।

ভাল! থ্যাঙ্ক ইউ।

অ্যাকসিলারেটারের বুকে সজোরে পা চালায় অতীন।

কয়েকদিনের মধ্যেই মা একটু ভাল হয়ে ওঠেন। অতীন ডাক্তারকে বলে, যতদিন না কমপ্লিট্লি কিওর হচ্ছে ততদিন এখানে রাখবার চেষ্টা করবেন।

হাসপাতাল থেকে মাকে দেখে মিনতিরা যখন বাড়ি ফিরছিল তখন বোধহয় রাত্রি নটা। কিছুদূর এগিয়ে সোজা না গিয়ে ডান দিকে স্টিয়ারিং ঘোরায় অতীন।—এদিকে কোথায় চললেন? একরকম চেঁচিয়েই বলে মিনতি।

চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি।—নেকড়ের মত দাঁতটাকে বার করে অতীন।

না না।—শিউরে উঠে মিনতি। প্রথম দিন জগন মেকআপ

ম্যানের হাতে গাল পাতবার সময় যে শিহরণ উঠেছিল, তারই ঢেউ আবার উঠল মিনতির সারা অঙ্গের অণুতে পরমাণুতে। থাক, অতীন গিয়ার বদলে ব্যাক করতে লাগল।

সকালবেলায় মিনতি স্নান-টান সেরে একটা সাময়িক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল, আজ তার স্যুটিং নেই। এমন সময় বাইরে থেকে পরিচিত ইলেকট্রিক হর্নটি বেজে উঠল। মিনতি তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেয়। অতীন ঘরে ঢুকই বলে, আমি খুব ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি একটা খবর দিতে এসেছি।

সামনে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে মিনতি বলে, বসুন না।

না না, নো টাইম।—তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় অতীন, চম্পা দেবী আজ রাত্রে আপনাকে ইন্‌ভাইট করেছেন।

কেন?—জিজ্ঞেস করে মিনতি।

এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না অতীন।

আজ ওঁর জন্মদিন।—ফস ক'রে বানিয়ে কথাটা ব'লে দিয়ে লটারিতে টাকা পাওয়ার মতন আনন্দ পায় অতীন।

আচ্ছা, সন্ধোবেলায় মাকে দেখে ফেরার পথে যাওয়া যাবে। এই কথা বলতে বলতে ট্রাউজারের পেছন-পকেট থেকে ভারী মানিব্যাগটা বার ক'রে এক তাড়া নোট টেবিলের ওপর রাখে—এই রইল আপনার এ-মাসের পেমেণ্ট—আর কোন কথা না ব'লে চ'লে যায় অতীন।

মিনতি নোটের তাড়াটা হাতে ক'রে নেয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড আজ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে সে। এর জন্যে চুরি, এর জন্যে ডাকাতি, মান, সম্মান, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সব। সমস্ত দোষ ঢাকা প'ড়ে যায়, সকল অপরাধ ক্ষমা করা যায়, চিরদুঃখী দুঃখ ভুলে যায়। পেয়েছে, সে পেয়েছে। ধন্যবাদ অতীন চৌধুরী তোমাকে, ধন্য করতে পেরেছ প্রগতিবাদিনী মিনতি দেবীকে। ট্রাঙ্কের শাড়িগুলোর তলায় সযতনে নোটগুলো রেখে দেয় মিনতি।

রাত্রে চম্পা দেবী খুবই খাওয়ালেন অতীন আর মিনতিকে।

আড়ালে ডেকে উপদেশ দেন মিনতিকে, অতীনবাবুকে হাতে রেখো, উন্নতি হবে। মৃদু মৃদু হেসে ওঠে মিনতি। চম্পা দেবীকে চেনে না মিনতি। ইনি সেই চম্পা দেবী, যিনি এককালে পথের ধারে সেজে গুজে দাঁড়িয়ে শত শতকে পথে বসিয়ে আজ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের পাশে তিনতলা প্রাসাদ হাঁকিয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। এখন তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী চম্পা দেবী। শুধু সিনেমায় নয়, সিনেমার বাইরেও চমৎকার অভিনয় করেন চম্পা দেবী।

এ কদিনের মধ্যে মা বেশ ভাল হয়ে উঠেছেন। তিনি বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অতীন ডাক্তারকে আড়ালে ডেকে বলে, আর কিছু দিন রেখে দিন।

ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারেন।—বোকার মত বলে ওঠে ডাক্তার।

না না, একেবারে নিখুঁত হয়েই যাওয়া ভাল। এখনও তো খোঁড়াচ্ছেন।—এই বলে বড় সাইজের একটা নোট ডাক্তারের হাতে গুজে দেয় অতীন।

একটু পরেই মিনতিকে নিয়ে অতীনের গাড়িটা ছুটতে থাকে। সেদিনও চৌরঙ্গীর কাছে এসে অতীন বেহায়ার মতন জিজ্ঞেস করে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক না। মিনতি আজ আর এ কথা শুনে শিউরে ওঠে না, একটু শুধু সংকোচ হয় তার।—আচ্ছা চলুন, কিন্তু রাত হয়ে হয়ে যাবে না অনেক?

কি আর এমন রাত! মিনতিকে মাঝপথে থামিয়ে, গিয়ার বদলে ডান দিকে মোড় নেয় অতীন। জায়গাটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছাকাছি। একেবারে নির্জন নয়, জন কয়েক দম্পতি ঘাসফুলের মত এধারে ওধারে ছড়িয়ে আছে। গাড়িটাকে একধারে থামিয়ে অতীন মিনতি সামনের মাঠটায় পায়চারি করে।

তারপর?

এই 'তারপর'টা যেন একটা বিরাট হাঁ, যার ম্যাড়মেড়ে দাঁত, লোল জিহ্বার লকলকানি দেখে শিউরে উঠতে হয়। মিনতি কিন্তু

পিউরে উঠল না। যে একটু একটু ক'রে আফিম খাওয়া বাড়িয়েছে, সে একতাল আফিম খেলে মরবে না, বরঞ্চ তার নেশাটা ভালই জমবে। নেশায় পেয়েছে মিনতিকে—টাকার নেশা, নামের নেশা, যৌবনের নেশা।

এ ছবিটা 'সিওর' হিট করবে। তখন দেখবে তোমার নাম, বম্বে নিয়ে যাব তোমায়।—ফুলস্পীডে গাড়ি চালাতে চালাতে অতীন আশ্বাস দেয় মিনতিকে। মিনতিরও মনের মোটর আস্তে আস্তে টপ গিয়ারে ফুলস্পীডে চলেছে, দেয়ালে দেয়ালে কাগজে কাগজে তার ছবি, থলি থলি টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রডিউসাররা, বাড়ি, গাড়ি, রঙ-বেরঙের শাড়ি, সিনেমার আকাশে একটা জলজলে তারকা।

সমস্ত স্টারকে তুমি ম্লান ক'রে দেবে, তুমি আমার সৃষ্টি।—সগর্বে ব'লে যায় জ্যোতির্বিদ অতীন।

অতীনের গাড়িটা আজ আর মায়ের কাছে হাসপাতালে যায় না। মা তো ভালই আছেন, সান্ত্বনা দিয়ে অন্যায়টাকে ঢাকা দেয় ওরা। গাড়িটা এসে দাঁড়ায় একটা বিলিতী হোটেলের সামনে। অতীন মিনতির হাত ধ'রে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে। নানান প্রেমিক-প্রেমিকা অভিসারে আসে এই বিলিতী হোটেলটিতে। এক-একটি টেবিলের দুধারে চা বা কফি নিয়ে পিংপং খেলার মত চটপট প্রেমালাপ ক'রে যায়। অতীন আর মিনতি কোণের টেবিলটায় বসে। অতীন প্রলাপ ব'কে যায়—তার স্ত্রীর অভদ্র ব্যবহারের কথা। তার জীবনের ব্যর্থতার কথা। সে তার সফলতার আলো মিনতির মুখে দেখতে পায়। সফলতার আলোয় নয়, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে মিনতির কান দুটো। তারপর ওরা উঠে যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে সেই নির্জন জায়গাটায়।

মা হাসপাতালে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজল।

আজ আর এলেন না, ডাক্তার এসে বলে।

হ্যাঁ, শুষ্ক ম্লান মুখে মা বলেন, কাজের তো খুব খাটুনি।

কাজ থেকে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বোধ হয়।—আদুরী মেয়ের কথা ভাবতে থাকেন মা।

আপনি এবার শুয়ে পড়ুন, ডাক্তার বলে।

হুঁ।—অসহায়ের মত মা শুতে শুতে বলেন, কাল একবার অতীনকে ফোন ক'রে মিনুর খবরটা নিও বাবা।

আচ্ছা।—আশ্বাস দিয়ে ডাক্তার চ'লে যায়।

মা আর কিছুতেই হাসপাতালে থাকতে চান না। কিন্তু অতীন মিনতি দুজনেই বাধা দিয়ে বলে, না মা, একেবারে ভালভাবে সেরে যাওয়াই ভাল। অতীনের ডোনেশনের থাবায় ডাক্তারের মুখ বন্ধ।

রাত্রি দশটা। আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই জায়গাটা খুবই নির্জন। মিনতি অতীনের কি কথা হয় ঠিক বোঝা যায় না। মুখের কথা ওদের শেষ হয়ে গেছে, এখন কথা চলছে মনে মনে। তারপর? আবার সেই হাঁ, ম্যাড়মেড়ে দাঁত, লোল জিহ্বার লকলকানি।

মিনতি।—ফিসফিস ক'রে বলে বলিষ্ঠ অতীন, তোমাকে ছাড়া আমি আমাকে ভাবতে পারি না। ছবির নায়কের মত ব'লে যায় অতীন। স্বপ্নালু চোখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিনতি। অতীন ভালুকের মত বুকে চেপে ধরে মিনতিকে।

আকাশের একটা তারা উল্কাপাত হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। রতিপতি, তোমার জয় হোক। তুমি রাজাকে ফকির করেছ, ফকিরকে করেছ বাদশা। ধন্য তোমার সাম্য, ধন্য তোমার কীর্তি, তোমার জয় হোক!

ঘরের কোণে খাটের তলায় ইঁদুর প'চে ম'রে থাকলে যেমন দুর্গন্ধে সারা ঘরটা ভ'রে যায়, অতীন-মিনতির খবরটাও ঠিক তেমনি ভাবেই স্টুডিওর চারিদিকে চাউর হয়ে গেল।

এ হতে পারে না, সমর প্রতিবাদ করে।

কি হতে পারে না?—একটা লাইট রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস

করে নরেন মিস্ত্রী। সামনেই ব'সে ছিল জগন মেক্‌আপম্যান, টাকে হাত বুলিয়ে সেই উত্তর দিলে, এই অতীন আর মিনতির হয়ের কথা।

কেন হতে পারে না? প্রশ্নের ভঙ্গীতে জবাব দেয় নরেন মিস্ত্রী।

অসম্ভব!—সমর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলে।

আপনি নতুন এসেছেন এ লাইনে, আমার এসব দেখে দেখে চালসে পড়ে গেল—বুঝিয়ে দেয় নরেন মিস্ত্রী—এখানে এলেই মনটাকে তাসের মতন সবাই ছড়িয়ে দেয়, যে তুরুপ মারবার সে মেরে নেয়। খেলা শেষ হয় আবার তাস-ভাঁজাভাঁজি, এই তো এখানকার জীবন।

তা ব'লে মিনতি এমন কাজ করবে!—এখনও সন্দেহ করে সমর।

আরও করবে! নরেন মিস্ত্রী ইন্ধন দেয়।

জগন বলে, তবে অতীন কিছু করতে পারবে না। ও কাকের বাসায় কোকিলের ডিম, পাখা গজালেই উড়বে।—রসিকতা করে জগন।

না না না। সমর কথাটাকে মেনে নিতে চায় না। তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। মিনতিকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতে হবে।

মিনতি একটা চক্‌চকে সাটিনের সালওয়ার প'রে উড়েদের বটুয়ার মত ভ্যানিটি ব্যাগটা ঘোরাতে ঘোরাতে আসছিল। সমর মাঝপথে তাকে ধরল।

কি বলছেন? এক মুখ হেসে জিজ্ঞেস করে মিনতি। ডেন্টিস্ট যেমন দু-একবার নাড়িয়ে একেবারে কড়াৎ করে তুলে ফেলে দাঁতটা, তেমনি একটু দ্বিধা, একটু থেমে, একেবারে ব'লে ফেলে সমর, অতীনবাবুকে নিয়ে আপনার সম্বন্ধে এ কি শুনছি?

কি শুনেছেন? ফ্যাকাসে মুখে নির্লজ্জের মতন প্রশ্ন করে মিনতি।

যা শোনা উচিত নয়, তাই শুনেছি। দৃঢ় ভাবে বলে সমর।

চুপ করে থাকে মিনতি।

সত্যি?—আক্রমণের ভঙ্গীতে সমর জিজ্ঞেস করে।

আমার সত্যি মিথ্যে জেনে আপনার লাভ? পাল্টা প্রশ্ন করে মিনতি।

শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের। বলুন, সত্যি কি না?—সমর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বলুন?

খাবার ঘর থেকে তাড়া-খাওয়া বেড়ালের মত কোন উত্তর না দিয়ে পালিয়ে যায় মিনতি।

সন্ধ্যেবেলায় স্টুডিওর ফাঁকা জায়গাটায় যেখানে এক ঝলক নীল রঙের নিওন লাইট গোল হয়ে পড়ে, সেখানে এসে নিয়মিত জড়ো হয় বড় বড় তারকারা আর মাতব্বররা। আজও তারা চম্পা দেবীকে মধ্যমণি ক'রে অতীন-মিনতির আলোচনাটা নিয়ে বমির ওপর মাছির মত ভনভন করছিল।

পরাজিতের মত সমর চ'লে যায়। হাসপাতালের ঠিকানা যোগাড় ক'রে সোজা মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় সে। উৎকণ্ঠিত হয়ে মা মিনতির পথ চেয়ে ব'সে ছিলেন, আজ তিন দিন আসে নি মিনতি। সমরকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, মিনু কেমন আছে জান?

জানি।—গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় সমর। তারপর একটু পরে অতীন-মিনতির নির্মম খবরটা শুনিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে।

মিনতিকে বাইরে মোটরে বসিয়ে রেখে অতীন বাড়ির ভেতর যায়, কি একটা আনতে। বেরুবার মুখেই দরজার সামনে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায় অতীনের স্ত্রী।

কি চাই?—মনিব যে ভাবে চাকরকে জিজ্ঞেস করে, ঠিক সেই ভাবে প্রশ্ন করে অতীন।

আমি জানতে চাই, তুমি আমাকে চাও, না, মিনতিকে চাও?—শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় অতীনের স্ত্রী।

তোমাকে তো আমি পেয়েই গেছি।—চরম অবজ্ঞায় জবাব দেয় অতীন।

বেশ, তোমার যদি সব পাওনাই চুকে গেছে, আমায় যেতে ব'লে দাও, চ'লে যাচ্ছি।—স্থির ভাবে ব'লে যায় অতীনের স্ত্রী।

পথ ছাড়।—ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায় অতীন। প্রেতাত্মার মত তার মনে হয় স্ত্রীকে। একটা হুঙ্কার দিয়ে মোটরটা চ'লে গেল। কোলের ছেলেটা ক'কিয়ে কেঁদে ওঠে। বড় ছেলেটা সভয়ে ব'লে ওঠে, মা!—নির্বাক হয়ে স্ট্যাচুর মতন দাঁড়িয়ে থাকে অতীনের স্ত্রী।

মিনতি ঘরে ঢুকেই গোখরো সাপ দেখার মতন মাকে দেখে চমকে ওঠে।—কখন এলে মা? কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে।

একটু আগে।—শান্ত ভাবেই উত্তর দেন মা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে মিনতি। বাইরে অতীন ইলেক্ট্রিক হর্নে হাত দেয়। মিনতি তাড়াতাড়ি শাড়িটা ছেড়ে অন্য আর একটা পরতে থাকে।

এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস? শান্ত ভাবেই মা জিজ্ঞেস ক'রে যান।

সিনেমায়।—শাড়ির আঁচলটা ঠিক করতে করতে উত্তর দেয় মিনতি।

কার সঙ্গে?

অতীনবাবুর সঙ্গে।

না, তোমার সিনেমায় যাওয়া হবে না।

মা নিজের যথাযথ দাবী জানান মেয়ের প্রতি।

কেন?—মাকে বিস্মিত ক'রে মেয়ে প্রশ্ন করে।

এমনি। এসব আমি পছন্দ করি না।

তোমার পছন্দমত আমায় চলতে হবে?

হ্যাঁ।

বাইরে অতীনের ইলেক্ট্রিক হর্নটা আবার বেজে ওঠে। অসম্ভব।—ব'লে মিনতি বেরুতে উদ্যত হয়। মা খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনে এসে দাঁড়ান। বলেন, অতীনের সঙ্গে তুমি মেশো, এ আমি চাই না। মা স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেন।

আমি কিন্তু চাই, অতীনবাবু চান।—স্পষ্টতর ভাবে উত্তর দেয় মিনতি।

না না, এ অসম্ভব, আমার বাড়িতে এ আমি হতে দোব না।—আর্তনাদ ক'রে ওঠেন মা, বার ক'রে দোব বাড়ি থেকে।

যার ক'রে দেবে ?—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পালটা প্রশ্ন করে মিনতি, কার বাড়ি, কার টাকা, সেটা একবার চিন্তা ক'রে দেখেছ ?

কি বলছিস ?—পাগলিনীর মত ব'লে ওঠেন মা।

যা বলছি, ঠিকই বলছি।—ব'লে যায় প্রগতিবাদিনী, বড় হয়েছি, আরও বড় হব। মনে রেখো এখানে যা কিছু হবে, আমার ইচ্ছায়, আমার টাকায়।

ঠিকই বলেছে মিনতি। পৃথিবী টাকার বশ—অর্থনৈতিক জগতের প্রধান মানদণ্ড আজ মিনতির হাতের মুঠোর মধ্যে। তাকে মেনে নিতেই হবে। টাকা ভর্তি ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে মাকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায় মিনতি।

বল্লমের মত অতীনের ইলেক্ট্রিক হর্নটা মায়ের বুকে আস্তে আস্তে বিঁধে কোথায় মিলিয়ে যায়।

কয়েক দিন পর। এত অবজ্ঞতার মধ্যেও সমররা এক নতুন আলোর সন্ধান পায়। সন্ধান দিয়েছেন স্বনামধন্য পরিচালক অমলবাবু। সিনেমা-লাইনে এতদিন থেকেও গায়ে একটুও পাঁক লাগে নি অমলবাবুর। চম্পা দেবী ঠাট্টা ক'রে বলেন, পাঁকাল মাছ। সমররা শ্রদ্ধা ক'রে বলে, পঙ্কজ। অমলবাবুর, অমলবাবু যে স্টুডিওতে কাজ করেন সেই স্টুডিওর স্বপ্ন দেখত সমর। যেমনি মার্জিতরুচি-সম্পন্ন স্টুডিও, তেমনি চমৎকার অমলবাবুর পরিচালনা। মুগ্ধ হয়ে গেছে সমর! কয়লার স্তূপের মধ্যে উজ্জ্বল হীরকের মত জলজল করে অমলবাবু। এই হীরকেরই দ্যুতিই এঁকে দিয়েছে তাদের নব-আলোকের পথনির্দেশ। নতুন ভাবে নতুন ছবি করবেন অমলবাবু। এ ছবিতে থাকবে না অতীন চৌধুরীদের মতন অজ্ঞাত-কুলশীলদের একাধিপত্য। এ ছবি হবে তাদেরই, যারা এ ছবির নির্মাণে নিজেদের শ্রমকে স্বেচ্ছায় ঢেলে দেবে। জগন মেক্‌আপম্যান, নরেন মিস্ত্রী, ক্যামেরাবাবু, সমর, অমলবাবু, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরের মত সকলের সমান দায়িত্ব, সমান কৃতিত্ব থাকবে নতুন ছবির প্রতিটি ইঙ্গিতে। মুগ্ধ নেত্রে সমর অমলবাবুর দিকে

চেয়ে থাকে—ফরসা ফরসা দোহারা চেহারা, কপালের ওপর দুধারে একটু টাক, কম কথা বলেন, কিন্তু সিগারেট খাওয়ার তালে তালে কাজ করেন বেশি।

আপনার কথা শুনেছি।—অমলবাবু বলেন সমরকে, আপনার মতন শিক্ষিত ছেলেই তো আমরা চাই।

আচ্ছা, আর্টিস্ট গ্রুপকে বললে হয় না।—সমর অমলবাবুর পরিকল্পনায় সাহায্য করে।

বলেছি।—সাগ্রহে বলেন অমলবাবু।—অজিত, শোভা দেবী, আরও দু-একজন আসবেন আমাদের ইউনিটে। আচ্ছা।—অমলবাবু গিয়ে গাড়িতে ওঠেন, স্টিয়ারিংটা ধ'রে বলেন, আপনি তা হ'লে কাল আমাদের স্টুডিওতে গিয়ে সমস্ত ফাইনালাইজ্‌ ক'রে নেবেন। নমস্কার।—নতুন বার্তা দিয়ে অমলবাবুর মোটরটা আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

সবাই যেন বুকে একটা বল পেল। তাড়াতাড়ি সাড়ে আট আনা দিয়ে এক প্যাকেট ক্যাপস্ট্যান এনে, বিলি ক'রে নিমেষের মধ্যে শেষ ক'রে দিলে প্যাকেটটা পঞ্চাশ টাকা মাইনের জগন মেক্‌আপম্যান। তার আজ আর আনন্দ ধরে না। দূর থেকে চিৎকার করতে করতে অজিত আসে। সমর ছুটে গিয়ে বলে, শুনেছ অমলবাবুর কথা?

হ্যাঁ।—উত্তর দেয় অজিত।—কিন্তু এদিকে যে ক্যাচ আউট হয়ে গেল!

কে?—ক্রিকেট-প্রিয় অজিতকে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে সমর, মোস্তাক আলি?

আরে না না।—বাধা দিয়ে বলে অজিত, মিনতি। অতীন মিনতিকে নিয়ে আলাদা বাসা ক'রে আছে।

ভাতের গ্রাসের কাঁকরের মত কথাটা শুনে চমকে ওঠে সমর। তারপর নিজেকে সামলে সবাইকে ডেকে বলে, এর প্রতিবাদ করতে হবে।

তাতে লাভ?—প্রশ্ন করে অজিত।

প্রতিকার হবে।—সগর্বে উত্তর দেয় সমর।

হবে কি ?—আধ পোড়া বিড়ির আগুনে জগনের দেওয়া সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে নরেন মিস্ত্রী ব'লে ওঠে।

হবে, হবে, নিশ্চয়ই হবে।—সমর জোর গলায় ব'লে যায়, অতীতে এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি ব'লেই আজ আমাদের তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।—একটু থেমে, দৃঢ় কণ্ঠে ডান হাতের ঘুষিটা বাঁ হাতের তালুতে মেরে বলে, ভবিষ্যতের কাছে আমাদের কাজের জবাবদিহি দিতে হবে। সেই জবাবটা যাতে দেবার মতন হয় তারই ব্যবস্থা আজ আমাদের করতে হবে। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা এখানে না এলে আমরা কোনদিন ভদ্র হতে পারব না। আমাদের বড় হতে গেলে শিক্ষা দিতে হবে অভদ্র অতীনদের।—সমর ব'লে যায়, তার কথায় সকলের সারা অঙ্গের শিরায় শিরায়, প্রতিটি ধমনীর বাঁকে বাঁকে প্রতিবাদের প্রহরী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠে। নরেন মিস্ত্রী, জগন মেক্‌আপম্যান, অজিত—সবাই উপলব্ধি করলে সমরের কথা। সমর এগিয়ে যায় অতীনের কাছে। আজ সে একটা বোঝাপড়া করবে। তার পেছনে থাকে অজিত, নরেন মিস্ত্রী, জগন, ক্যামেরাবাবু, সেটের কুলিরা—আরও অনেকে।

অতীনও সমরের কার্যকলাপে ক্ষেপেছিল, দূর থেকে সমরকে দেখে রাগের মাথায় চুরুটের পেছনটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেললে।

শুনুন।—গম্ভীর ভাবে সমর অতীনকে ডাকে।

কি ? নীচের ঠোঁটটা একটু উলটে অবজ্ঞায় উত্তর দেয় অতীন।

সমর সোজা তার সামনে গিয়ে বলে, কি যা-তা আরম্ভ করেছেন ?

চুপ কর। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! তুমি আমার চাকর।—হুঙ্কার দেয় 'মুখর-আখর পিক্‌চার্সে'র' প্রডিউসার অতীন চৌধুরী।—আমি কি করি না-করি, তা তোমার কাছে এক্‌স্‌প্লানেশন দিতে হবে ?

হ্যাঁ।—দৃঢ় কণ্ঠে হুকুম ক'রে সমর।

কি ? কি ?—ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘেউঘেউ ক'রে ওঠে অতীন।

থাক্ থাক্।—নেউলমুখো এসে অতীনকে ধরে। চুপ কর সমর।—মিহি গলায় চিৎকার করে ম্যানেজার। সমর রাশটা টেনে ধরলে, কিন্তু কথাগুলো উন্মত্ত ঘোড়ার মত সামনের দু পা তুলে কণ্ঠনালীর ভেতর অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে।

রাস্কেল কোথাকার! অতীন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, চাকরের কাছে এক্স্প্ল্যানেশন দিতে হবে?

হ্যাঁ। পিঠে একটা সাঁই করে চাবুক লাগিয়ে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেয় সমর, শুধু এক্স্প্লানেশন নয়, শাস্তিও পেতে হবে।

হোয়াট! হঠাৎ ইংরেজীতে বলে ওঠে অতীন, যার নুন খাবে তারই···

বাধা দিয়ে সমর চিৎকার ক'রে বলে, আর তুমি যে খুন খাচ্ছ, জোঁক কোথাকার! কেন, কেন তুমি মিনতিকে নষ্ট করেছ? জবাব দাও। আশপাশের সবাই নির্বাক হয়ে গেছে। সার্কাসের আফিম-খাওয়া জানোয়ারের মত দাঁত খিঁচয় অতীন। রিং-মাস্টারের কায়দায় কথাটাকে চাবুকের মত চালিয়ে সমর ব'লে ওঠে, জবাব দাও, কেন নষ্ট করেছ?

কে বললে আমি নষ্ট করেছি?—বেহায়ার মত জবাব দেয় অতীন।

আমি বলছি। আবার চাবুক চালায় সমর।

লায়ার!—হুঙ্কার দেয় অতীন, মিনতি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

অ্যাব্‌সার্ড! হঠাৎ অজিত ব'লে ওঠে, আপনার না স্ত্রী আছে?

ভেংচি কাটার মত ক'রে হেসে অতীন বলে, হিন্দুমতে বহু-বিবাহের নিষেধ আছে কি? হিন্দুধর্মের চিতার মত দাউদাউ ক'রে জ'লে ওঠে অতীনের রাতজাগা চোখ ছুটো।

ছেড়ে দাও, ভেতরে এস—বলতে বলতে হঠাৎ মিনতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অতীনের হাত ধরে। সত্যি তার সীমন্তে সিঁছুর রয়েছে। মনে হয় মিনতি যেন অতীনের স্ত্রীর, অতীনের ছুটি ছেলের বুকের রক্ত দিয়ে সযতনে লাল ক'রে নিয়েছে নিজের সিঁথিটাকে।

তোমাকে খুন ক'রে ওই সিঁথি সাদা ক'রে দোব—ক্ষেপে যায় সমর। অতীন আর নিজেকে সামলাতে পারে না, ঝাঁপিয়ে পড়ে সমরের ওপর। ছুজনেই প'ড়ে যায় রকটার ওপর, সবাই এসে ছাড়িয়ে দেয়। সমরের কপালটা কেটে দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে। অজিত তখুনি তার ফরাশডাঙা কাপড়টা ছিঁড়ে বেঁধে দেয়। কিন্তু তবুও রক্ত থামে না। চালশে-ধরা চোখে নরেন মিস্ত্রী আজ নতুন জগৎ দেখতে

পায়। দুখানি মাত্র কাপড়, তবু তখুনি চড়চড় ক'রে ছিঁড়ে দেয়। জগন এসে তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে অতীনকে দেখিয়ে বলে, কেউ ওর কাজ করব না। সবাই স-রবে সমর্থন ক'রে ওঠে। এই তো পেয়েছে সময়। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, এ তো যে-সে ব্যাণ্ডেজ নয়। এ ব্যাণ্ডেজ তৈরি হয়েছে অজিতের ফরাশডাঙা—আর পঁচাত্তর টাকা মাইনের নরেন মিস্ত্রীর আড়ময়লা কাপড় দিয়ে। সময় যেন আজ বিজয়মুকুট পরেছে। সায়েস্তা ক'রে দিয়েছে শয়তান অতীন চৌধুরীকে। দিবালোকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে পুঁজের মত তার কদর্য রূপকে। ঘৃণিত করতে পেরেছে অতীন চৌধুরীকে। সময়, তোমার জয় হোক!

স্টুডিওর গরম আবহাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা হ'লে মিনতির মায়ের খবরটা নেওয়া সময় আশু কর্তব্য মনে করে।

আশ্চর্য, যে সময় একটু আগে বীরের মত অতীনকে পরাজিত করেছে, মায়ের কাছে এসে সে সময় যেন মুষড়ে গেল, পৃথিবীর যেন সকল দ্বিধা, সব জড়তা, সমস্ত লজ্জা এসে জড় হ'ল সময়ের মনে। বিকেলের রোদটা বারান্দায় এসে পড়েছে। মা চুপ ক'রে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখের জল পাপের আগুনে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। মূর্তিমতী অভিশাপের মত, জীবন্ত প্রায়শ্চিত্তের মত হয়ে ব'সে আছেন মা। সময়ের আসা বুঝতে পারেন তিনি। শুষ্ক কণ্ঠে বলেন, যা বলতে এসেছ জানি। মিনতির চিঠিটা হাত দিয়ে ঠেলে দেন মা। ছোট চিঠি—

মা—

অতীনবাবুকে বিয়ে করছি, না ক'রে উপায় নেই। ইচ্ছে করলে আসতে পার।

মিনতি

মা সময় দুজনেরই মুখে কোন কথা নেই, এর পর কোন কথা বলবারও থাকে না। সব চুপচাপ।

একটু পরে সময়কে বিস্মিত ক'রে মা অনুরোধ করেন, আমি

একটু অতীনের স্ত্রী আর তার ছেলে ছুটোকে দেখতে যাব, একবার নিয়ে যাবে বাবা ?

এ কি কথা বলছেন মা, ভিখারী ভিখারীকে ভিক্ষা দেবে, মূক বধিরকে শোনাবে সান্ত্বনার বাণী ? একটু ভেবে সমর বলে, চলুন। মাকে নিয়ে সমর অতীনের স্ত্রীর বাড়ি যায়।

শেষ প্রহরের পশ্চিম দিগন্তে চ'লে-পড়া কৃষ্ণা তিথির ক'য়ে যাওয়া ম্লান চাঁদের মত অতীনের স্ত্রী দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্নান নেই, খাওয়া নেই, রুক্ষ আর শুষ্ক চেহারাটা দেখলে ভয় হয়। ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া কচি কোরকের মত ছেলে ছুটো ধুলোয় নেতিয়ে প'ড়ে আছে। মা চৌকাঠটা ধ'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সমর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। চারটে অসহায় সত্তা বাধ্য হয়ে একটা নির্মম অস্বীকারকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে যেন। "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"—ভগবান তুমি কি অতীন চৌধুরীকে ক্ষমা করতে পারবে ? ভালবাসতে পারবে মিনতিকে তুমি ?

কে একজন মিনতির মাকে বললে, আপনি এখান থেকে যান। আপনাকে দেখলে আরও বেশি কষ্ট পাবেন।

মা আস্তে আস্তে সমরের কাছে চ'লে এলেন। কোথায় যাবেন মা ? —ব্যথিত চিত্তে সমর জিজ্ঞেস করে। মা চুপ ক'রে থাকেন।

আপনার ছেলের কাছে দিয়ে আসতে পারি, আমার বাসাতেও থাকতে পারেন। থাকবেন মা ? সমর অনুরোধ করে।

চল। আর কিছু বলেন না মা। কোথায় ? কার কাছে ? কিছু না। মায়ের আজ কোন প্রশ্ন নেই, কোন নালিশ নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। ঠেলাগাড়ির মত সমরের সঙ্গে চলতে থাকেন মা।

এস্‌প্ল্যানেডে ট্রাম থেকে নেমে মা বহুপরিচিত একটা ডাক শুনতে পান, মা মা! চেরাপুঞ্জির পচা বর্ষার আকাশে সূর্যকিরণ দেখার মত মা সেই ডাকটার দিকে ব্যস্ত হয়ে তাকালেন। মা মা! দূর থেকে ছুটে আসে পরেশ। হাতে স্টেথেস্‌কোপ, ডাক্তারী ব্যাগ, পরনে একটা আড়ময়লা শার্ট। মা-ও ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন পরেশকে।

এতক্ষণে পাষাণীর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে অশ্রুঝরনা গড়িয়ে পড়ল। পরেশেরও চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। নিওন লাইট জলছে নিবছে, সাহেব মেম যাচ্ছে আসছে, পাশ্চাত্য অতি-আধুনিকতার সে পরিবেশের মধ্যে এই সনাতন মাতাপুত্রের মহামিলন শোভন হয়েছিল কি না জানি না—সমর কিন্তু মাতাপুত্রের অশ্রুর পুণ্য ত্রিবেণীতে আপন চোখের ধারাকে মিলিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করল।

মিন্নু ম'রে গেলেও এত কষ্ট পেতাম না। মা কেঁদে ফেলেন।

ও আমি জানতাম।—পরেশ নিজেকে সামলে আস্তে আস্তে বলে, যাক ওসব, দাঁড়াও, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে মাকে হাত ধ'রে নিয়ে যায়। একটা কমেডি যেন একটা ট্র্যাজিডির হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে।

সমর, এস। মা বলেন।

উনি কে? পরেশ জিজ্ঞেস করে।

ও সিনেমায় কাজ করে।—মা উত্তর দেন। মাকে মাঝপথে থামিয়ে পরেশ সহসা ঘৃণাভরে ব'লে ওঠে, ওঃ, ইনিও সিনেমাওলা। হুঁ!

আহত সমর পুনরাহত হয়।

না বাবা, সবাই কি সমান? এ ছেলেটি সত্যিই ভাল। মিন্নুকে বাঁচাবার খুব চেষ্টা করেছিল।—মা উচ্ছ্বসিত হয়ে সমরের কথা বলতে বলতে ট্যাক্সিতে ওঠেন। সমর মাকে প্রণাম করে।

আমার ওখানে মাঝে মাঝে এস বাবা।—মা সমরকে বলেন।

মাকে থামিয়ে পরেশ তাড়াতাড়ি সমরকে বলে, আচ্ছা নমস্কার, আমার আবার কতকগুলো রুগী অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার, চল।

ট্যাক্সিটা চলতে লাগল। আশাবাদী সমর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, কবে সেদিন আসবে, যেদিন পরেশ সিনেমাওলা ব'লে তাদের ঘৃণা করবে না, যেদিনের মিনতিরা স্টুডিওর কাজ সেরে মায়ের পাশে মায়ের মিন্নু হয়ে, পরেশের সহোদরা হয়ে সানন্দে বাড়ি ফিরে যাবে! কোন গ্লানি থাকবে না, কোন কলঙ্ক মাখবে না। কবে আসবে সেদিন, কবে, কবে?

জনাকীর্ণ রাজপথে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত সমর ধাবমান ট্যাক্সিটার দিকে চেয়ে থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

দীনেন্দ্রকুমার রায়

১৮৬৯—১৯৪৩

অর্থকরী "নন্দন-কানন সিরিজ" বা "রহস্য-লহরী সিরিজ" সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে কতকটা পতিত করিলেও সাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই; খরচের খাতে অঙ্কপাত যত বেশীই হউক, জমার ঘরে অঙ্কপাত ততোধিক। তাঁহার 'পল্লীচিত্র,' 'পল্লীবৈচিত্র্য,' 'পল্লী-চরিত্র' এবং বিবিধ স্মৃতিকথা এমনই সরস সচল ভঙ্গীতে লেখা যে তাহার প্রভাব স্বীয় কালকে অতিক্রম করিয়া আজিও বহমান আছে এবং আরও দীর্ঘকাল বহমান থাকিবে। তাঁহারই 'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট,' 'চীনের ড্রাগন,' 'নানা সাহেব' প্রভৃতি এক দিন জীবনী ও গল্প-পিপাসু বাঙালীকে তৃপ্ত করিয়াছিল, এ কথা বিস্মৃত হইলে আমরা সাহিত্য-শিল্পী দীনেন্দ্রকুমারের প্রতি সত্যই অবিচার করিব। পেটের দায়ে অবিশ্রান্ত লিখিতে লিখিতে তাঁহার হাত মিঠা হইয়াছিল, না, অবিশ্রান্ত লেখা সত্ত্বেও তাঁহার মিঠা হাত তিত হইয়া উঠে নাই—এ রহস্য সত্যই উদ্‌ঘাটনের যোগ্য। সরস-সাহিত্য-শিল্পী দীনেন্দ্রকুমারকে প্রায়ান্ধকার হইতে সাধারণের গোচরীভূত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস করিলাম, সেই জন্য বাংলা মিঃ ব্লেকের জনক দীনেন্দ্রকুমারকে অন্ধকারেই রাখিলাম।

জমার দিকে হিসাব করিতে গেলে দেখা যাইবে তাঁহার মৌলিক উপন্যাসের সংখ্যা অল্প হইলেও শুচিসুন্দর ছোট গল্প তিনি প্রচুর লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, প্রাচীন এবং অধুনা দ্রুত পরিবর্তিত পল্লীজীবনের চিত্র তিনি এমন নিখুঁত ও মনোরম করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহা এক দিন ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিবে। এগুলির মধ্যেই তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁহার দান বিপুল এবং সুখের বিষয় পরিমাণ উৎকর্ষকে খণ্ডিত করে নাই।

জন্ম : বংশ-পরিচয়

১২৭৬ সালের ১১ই ভাদ্র (১৮৬৯, ২৬এ আগস্ট), বৃহস্পতিবার, নদীয়া জেলার মেহেরপুরে এক সম্ভ্রান্ত তিলি-পরিবারে দীনেন্দ্রকুমারের

জন্ম হয়। তাঁহার পিতা -ব্রজনাথ রায়। ব্রজনাথ কৃষ্ণনগরে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করিতেন।

শিক্ষা : বিবাহ

বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে দীনেন্দ্রকুমার তাঁহার স্মৃতিকথায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর পর-বৎসর আমরা এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় গোষ্পদ পার হইলাম।*...আমরা কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম।...

দুই বৎসর কৃষ্ণনগরে বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল; কিন্তু সাহিত্যালোচনার উৎসাহে কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রতি অনুরাগ শিথিল হইয়াছিল। বিশেষতঃ 'ত্রিকোণমিতি' ও 'কনিক্‌সেকশনের' সহিত আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ থাকায় অঙ্কশাস্ত্রে পাসের নম্বর রাখিতে পারিলাম না। কাকা রাগ করিয়া বলিলেন, 'আঁকে তুই গোমুখ্‌খু, কল্‌কাতার জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে গৌরীশঙ্কর বাবু খুব ভাল আঁক শেখান, সেখানে ভর্ত্তি হয়ে পড়া শুনা কর। লেখা-লেখিগুলো বন্ধ কর।'—কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যালোচনা বাড়িয়া গেল, পড়াশুনার সুবিধা হইল না; তখন মহিষাদলে গিয়া স্কুলের মাষ্টারি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া [এল. এ.] পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই স্থির হইল।" ('মাসিক বসুমতী,' শ্রাবণ ১৩৪০)

দীনেন্দ্রকুমার কাকার নিকট মহিষাদলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাকা তখন মহিষাদল এস্টেটের ম্যানেজার ও মহিষাদল-রাজ এন্‌ট্রান্স স্কুলের প্রেসিডেন্ট। এই স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল; দীনেন্দ্রকুমার স্কুলের কর্ত্তা তাঁহার কাকাকে ধরিয়া সেই পদে বন্ধু জলধর সেনকে নিযুক্ত করাইবার ব্যবস্থা করেন; জলধর তখন হিমাচলের সুশীতল ক্রোড় হইতে সবে প্রত্যাগত। মহিষাদলে তাঁহাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। উভয় বন্ধুতে মিলিয়া

* বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে প্রকাশ, দীনেন্দ্রকুমার ১৮৮৮ সনে ("বয়স ১৫ বৎসর ৩ মাস") মহিষাদল এইচ. ই. স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

সাহিত্যালোচনারও বিরাম ছিল না। মহিষাদলে থাকিতেই জলধর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। দীনেন্দ্রকুমার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—"বিবাহের পর জলধরবাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাজসাহীতে চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের কথা।

এখানে বলা প্রয়োজন, এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্বে—১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৮৯০) দীনেন্দ্রকুমারের বিবাহ হইয়াছিল।

অন্নসংস্থানে

দীনেন্দ্রকুমারের কর্মজীবনের আরম্ভ রাজসাহীতে। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় এইরূপ বলিয়াছেন:—

"আমি মহিষাদল হইতে কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন চাকরি-বাকরির চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং ভারতী আফিসেই বাস করিতেছিলাম। কলিকাতার উত্তরাংশে কাশিয়াবাগান বাগানবাড়ীতে তখন ভারতী আফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল।...

স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সহিত ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল; পালিত সাহেব কবিবর পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি তখন রাজসাহীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি স্বয়ং আমার জন্য কিছু করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রাজসাহী জেলা-জজের [ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের] নিকট আমার জন্য সুপারিশ করিয়া এক পত্র দিলেন।...

সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। তিন বৎসর রাজসাহীতে ছিলাম; শীল সাহেবের পর ষ্টীনবার্গ, পালিত, ষ্টেপ্লি প্রভৃতি কয়েক জন জজের আমলে চাকরি করিলাম; কিন্তু সেই একঘেয়ে জীবন।...

কিছু দিন পরে আফিসের উপরওয়ালার নিকট এরূপ ব্যবহার পাইলাম যে, চাকরির উপর ঘৃণা হইল, এবং সেই দিন হইতে রাজসাহী-ত্যাগের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম,...তখন রাজসাহীর সেই জজ আমারই মুরুব্বী মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

কিছু কাল পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজসাহী হইতে সুদীর্ঘ পাড়ি—ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে গুর্জ্জরের মরুভূমি! ব্যবধান, সমগ্র ভারতবর্ষের বিশাল বিস্তার, কত নদ, নদী, গিরি কান্তার।"

শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদা-রাজ্যে। সেখানে তাঁহাকে কথ্য বাংলা শিখাইবার জন্য একজন বাংলা শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। দীনেন্দ্রকুমারই তাঁহার বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বরোদায় গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতের প্রারম্ভে, বোধ হয় পূজার কয়েক সপ্তাহ পর, আমি অরবিন্দকে বাঙ্গলা ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় যাই।...আমি দুই বৎসরাধিক কাল তাঁহার সহবাসে যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।" ('অরবিন্দ-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৩, ৮৪)

বরোদা হইতে ফিরিয়া (১৯০০?) দীনেন্দ্রকুমার বন্ধু জলধর সেনের আহ্বানে সহকারী সম্পাদক-রূপে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে যোগদান করেন। 'বসুমতী'র তখন বাল্যজীবন; সবে চারি বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগে জলধরের স্কন্ধেই তখন সম্পাদকীয়-ভার ন্যস্ত। ইহার বছর-পাঁচেক পরে জলধর বিদায় গ্রহণ করিলে তাঁহার শূন্যপদে দীনেন্দ্রকুমারই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'মাসিক বসুমতী' (আষাঢ় ১৩৫০) লেখেন :—

"'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে তিনি প্রথম সাংবাদিকের কাযে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন তিনি ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির নিকট সাংবাদিকের শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরে কিছু কাল 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদকরূপে কায করিয়া তিনি সংবাদপত্রের কায ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার আসিয়া কিছু দিন 'দৈনিক বসুমতী'তে কায করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'র সহিত সম্বদ্ধ ছিলেন।"

'বসুমতী'র সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, রাজসাহীতে অবস্থানকালে দীনেন্দ্রকুমার কিছু দিন আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র—'হিন্দুরঞ্জিকা' পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"বহু দিন হইতে রাজসাহী ধর্ম্মসভার মুখপত্রস্বরূপ একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহার নাম 'হিন্দুরঞ্জিকা'। দুষ্ট ছেলের দল সেই কাগজখানিকে 'হিন্দুর গঞ্জিকা' বলিয়া উপহাস করিত। উহা ধর্ম্মসভা-সংলগ্ন তমোঘ্ন প্রেসেই মুদ্রিত হইত। প্রেস ও কাগজখানি সুপরিচালিত না হওয়ায় ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের পরিচালনভার পূজনীয় হরকুমার বাবুর [স্যর্ যদুনাথ সরকারের পিতৃসহোদর] হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে আমার অনুরাগের পরিচয় পাইয়া তিনি 'হিন্দুরঞ্জিকা'র প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনের ও পরিদর্শনের ভার আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। সে সময় 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় নীলামের ইস্তাহার, কিছু কিছু বিজ্ঞাপন এবং হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য মামুলী ধরণের দুই একটি পাণ্ডিত্য-খচিত প্রবন্ধ থাকিত, তাহাতে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না; এ জন্য কাগজখানি কেহই প্রায় খুলিতেন না। আমরা ছোকরার দল 'হিন্দুরঞ্জিকা' হাতে লইয়া বিদ্রোহের সুর তুলিলাম, কোন কোন ধার্ম্মিকের গুপ্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির প্রসঙ্গে আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। খোঁচা খাইয়া সুপ্ত বিষধর কোঁস করিয়া ফণা তুলিল! সে দলে শক্তিশালী সামাজিক মোড়লদেরও অভাব ছিল না; সেকালের কথা, তাঁহাদের অনেকে পুরুষের চরিত্রদোষটাকে আমোল দিতেন না। আমরা তাঁহাদের দুর্ব্বলতায় আঘাত করায় নানা ভাবে আমাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। হরকুমার বাবুর চেষ্টায় ও প্রভাবে আমাদের মাথা বাঁচিল। আমরা যুবকের দল কাগজখানির সংস্কারের চেষ্টা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। এই সময় ধর্ম্মসভার তমোঘ্ন প্রেস হইতে আমার একখানি ছোট গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'বাসন্তী'। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'নেশনে' তাহার প্রশংসাসূচক একটি ক্ষুদ্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেইখানি আমার প্রথম পুস্তক।" (কার্ত্তিক ১৩৪০)

সাহিত্য-সেবা

পঠদ্দশা হইতেই দীনেন্দ্রকুমারের প্রবল সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মূলে পারিবারিক প্রভাব বড় কম ছিল না। দীনেন্দ্রকুমার 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"আমার পিতৃদেব বাঙ্গালানবিশ ছিলেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল; সে সময় মেহেরপুরে তাঁহার মত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কেহ লিখিতে পারিতেন না।... পিতৃদেব তাঁহার প্রথম যৌবনে 'কুসুম-কামিনী' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যদুগোপাল [চট্টোপাধ্যায়] বাবুর প্রেস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।... মেহেরপুরের শিক্ষিত সমাজে তাঁহার কবিত্বশক্তিরও কিঞ্চিৎ খ্যাতি হইয়াছিল। পিতৃদেবই মেহেরপুরের প্রথম গ্রন্থকার। আমি এই পৈতৃক সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী। (ফাল্গুন ১৩৩৯)

আমাদের সঙ্গে যাঁহারা কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই উত্তরকালে কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।...এই সময় হইতে আমি মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী'তে কিছু কিছু লিখিতাম। ইহার কিছু দিন পরে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হইতে 'সাধনা' প্রকাশিত হইলে আমার রচিত 'পল্লীচিত্র'গুলি তাহাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আমার সতীর্থগণের মধ্যে রায় সাহেব জগদানন্দ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তিনিও এই সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের বাহিরেও আমার দুই একটি বন্ধুলাভ হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয় অতুলচন্দ্র বসু আমার স্নেহাস্পদ সুহৃদ ছিলেন;...মিঃ ঘোষের দুই ভাগিনেয়ী ।বনয়কুমারী বসু ও প্রমীলা বসু চমৎকার কবিতা লিখিতেন; তাঁহাদের দেখাদেখি আমিও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি, আমার কোন কোন কবিতা সে কালের মাসিকপত্রে

প্রকাশিত হইয়াছিল ;* কিন্তু আমি আমার কবিতায় ভাব ও কবিত্বের দৈন্য বুঝিতে পারিতাম, এ জন্য কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিই। তথাপি কবি ভগিনীদ্বয় সে সময় কবিতা রচনায় আমাকে উৎসাহিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। (শ্রাবণ ১৩৪০)

'ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠাতেই সর্বপ্রথমে দীনেন্দ্রকুমারের রচনা প্রকাশিত হয় ; উহা ১২৯৫ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় মুদ্রিত "একটি কুসুমের মর্ম্মকথা। প্রবাদ প্রশ্ন।" তদবধি 'ভারতী'তে তাঁহার নানা বিষয়ক রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। 'ভারতী,' 'দাসী,' 'সাহিত্য,' 'সাধনা,' 'প্রদীপ,' 'ভারতবর্ষ,' 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার বহু রচনা এখনও পুস্তকাকারে অমুদ্রিত রহিয়াছে ; তন্মধ্যে 'মাসিক বসুমতী'তে (১৩৩৯-৪১) প্রকাশিত "সে কালের স্মৃতি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩০৮ সালের আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রদীপে' "জামাই-ষষ্ঠী" ও "বর্ষায় পল্লীদৃশ্য," ১২৯৭ আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' "দেপাড়ার মেলা" এবং ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত "বৈশাখের পল্লী" চিত্রগুলি বোধ হয় এখনও কোন পুস্তকে স্থান পায় নাই।

দীনেন্দ্রকুমারের গ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। এক "রহস্য-লহরী সিরিজে"ই তাঁহার ২১৭ খানি অনূদিত উপন্যাস মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার সকল রচনার পরিচয় দিবার চেষ্টা না করিয়া, আমরা কেবল কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রকাশকাল-সহ একটি তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। বাসন্তী (গদ্য-সমষ্টি)। বোয়ালিয়া, শ্রাবণ ১৩০৫ (২৪-৮-১৮৯৮)। পৃ. ১৪০।

২। হামিদা (উপন্যাস)। বরোদা, গুজরাট্। ? (৩০ আগস্ট ১৮৯৯)। পৃ. ৯৮।

---

* দ্র° "ভেসে যাই" : 'ভারতী ও বালক,' আশ্বিন-কার্তিক ১২৯৮। "কবিতাসুন্দরী" : 'দাসী,' জুন ১৮৯৬।

৩। পট (ডিটেক্‌টিভ গল্প-সমষ্টি)। ১ বৈশাখ ১৩০৮ (১৫-৬-১৯০১)। পৃ. ১৮৯।

৪। অজয়সিংহের কুঠী (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩০৯ (৪-১০-১৯০২)। পৃ. ৪২৭।

৫। সচিত্র আরব্য উপন্যাস, ১-৩ ভাগ। (অক্টোবর ১৯০২)।

৬। মজার কথা (তরুণপাঠ্য)। ইং ১৯০৩।

৭। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। ইং ১৯০৩।

৮। পল্লীচিত্র। মেহেরপুর, ১ বৈশাখ ১৩১১ (২৫-৫-১৯০৪)। পৃ. ২৮৮।

সূচী: সেকালের পাঠশালা, ভগবতী যাত্রা, দশহরা গঙ্গাপূজা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, নন্দোৎসব, দুর্গোৎসব, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। গ্রাম্যশব্দ।

১৯২২ সনে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণে "স্নানযাত্রার মেলা" নামে একটি নূতন 'চিত্র' সংযোজিত হইয়াছে।

৯। পল্লীবৈচিত্র্য। মেহেরপুর, ১ আশ্বিন ১৩১২ (৪-৯-১৯০৫)। পৃ. ২৩৪ + গ্রাম্য-শব্দ ১৪।

সূচী: কালীপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকের লড়াই, নবান্ন, পৌষলা, পৌষ-সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ মেলা, শ্রীপঞ্চমী, শীতল-ষষ্ঠী, দোলযাত্রা, চড়ক।

১০। চীনের ড্রাগন। (ডিটেক্‌টিভ গল্প)। (৪ জুলাই ১৯১৪)। পৃ. ২৭৫।

১১। পল্লীকথা। (চিত্র-সমষ্টি)। ১৩২৪ সাল (২৬-১১-১৯১৭)। পৃ. ১৫৪।

১২। পল্লীবধূ (উপন্যাস)। ? (২০ মার্চ ১৯২৩)। পৃ. ১৬৫।

১৩। পল্লী-চরিত্র (চিত্র-সমষ্টি)। ? (৭ মে ১৯২৩)। পৃ. ১৬২।

১৪। তালপাতার সিপাই (উপকথা, সচিত্র)। ? (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩)। পৃ. ১১৫।

১৫। অরবিন্দ-প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)। মাঘ ১৩৩০ (ইং ১৯২৪)। পৃ. ৮৪।

১৬। নায়েব মহাশয় (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩১ (১৮-৮-১৯২৪)। পৃ. ৩৩৬।

১৭। ঢেঁকির কীর্ত্তি (তরুণপাঠ্য গল্প-সমষ্টি)। মাঘ ১৩৩১ (ইং ১৯২৫)। পৃ. ১৩৬।

১৮। নানা সাহেব (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ? (১ জানুয়ারি ১৯২৯)। পৃ. ৩১৯।

পুস্তকের কোথাও উল্লেখ না থাকিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে রামবাগান দত্ত-পরিবারের শশিচন্দ্র দত্তের *Shankar*, Tale of the Indian Mutiny অবলম্বনে লিখিত।

মৃত্যু

দীনেন্দ্রকুমারের শেষ-জীবন তেমন শান্তিতে অতিবাহিত হইতে পারে নাই। ১৯৩৩ সনে তিনি জীবন-সঙ্গিনীকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার উপর দিয়া বহু শোক-ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। ১৩৫০ সালের ১২ই আষাঢ় (২৭ জুন ১৯৪৩) স্বগ্রামে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে 'মাসিক বসুমতী' (আষাঢ়) লিখিয়াছিলেন :—

> "১২ই আষাঢ় স্বগ্রাম মেহেরপুরে ৭৪ বৎসর বয়সে প্রবীণ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় পরলোকগমন করিয়াছেন।... পঠদ্দশাতেই দীনেন্দ্রকুমার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার গ্রাম্যচিত্র ও গ্রামপরিবেষ্টনে স্থাপিত চরিত্র-চিত্র লইয়া রচিত গল্প বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত তিনি গ্রামের ও গ্রাম্যসমাজের চিত্র অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের সায়াহ্নে—বহু দিন 'বসুমতী'র সেবা উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিবার পর তিনি যে মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া তথায় শেষ শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনের সহিত সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যসম্পন্ন। তিনি যেন তাঁহার পল্লী-জননীর আকর্ষণ অনুভব করিয়া তাঁহার অঙ্কে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন :—
>
> "সন্ধ্যা হ'ল বেলা গেল—
> কোলের ছেলে নে মা, কোলে।"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চোর

বিন্ধ্যাচলে গিয়ে নামলাম সকাল আটটায়। একা এসেছি। অম্বলের ব্যাধি, অনিয়ম এক তিল সহ্য হয় না তাঁর। পুত্রকন্যা এবং আরও কিছু বাক্স-প্যাটরা সহ তিনি পরদিন এসে পৌঁছচ্ছেন। ঘণ্টা কুড়িক সময় হাতে, এরই মধ্যে গোছগাছ সারা ক'রে ফেলতে হবে। পাহাড়ের নীচে একটা কুয়োর জল হজমি ব'লে সুবিদিত। এক কলসী জল আনিয়ে রাখতে হবে সেই দু মাইল দূর থেকে।

স্যানিটোরিয়ামের মালিকটি বিশেষ বন্ধু আমার। চিঠি লেখা ছিল, ট্রেন থেকে নেমে সর্বাগ্রে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। বাড়ি ভাড়া ক'রে দিয়েছেন তিনি, একটা চাকরও ঠিক ক'রে রেখেছেন। চাকর বাড়িটা চেনে। চাবি ও মালপত্র নিয়ে পৌঁছলাম সেখানে।

মেঝেয় ঝাঁটা পড়তেই দম বন্ধ হয়ে এল। এত ধুলো জ'মে আছে! নাকে-মুখে তখন গামছা জড়িয়ে নিলাম। চাকর ভাওনাকেও দিলাম আর একটা গামছা। কোমর বেঁধে ধুলো ঝাড়তে লেগেছি।

এক ভদ্রলোক এলেন। সৌম্যদর্শন প্রবীণ ব্যক্তি। গলা-খাঁকারি দিয়ে তিনি ঢুকলেন।

এসে গেছেন, বারাণ্ডায় ব'সে ব'সে লক্ষ্য করলাম। উই যে সাদা বাড়ি, লাইনের ওধারে পিপুলগাছতলায়, আমি ওখানে আছি। ভাল হ'ল, একজন ভাল প্রতিবেশী পেলাম।

একটা চেয়ার ছিল, ধুলোয় ভরতি, ঝাড়া হয় নি এখনও, তারই ওপর চেপে বসলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত আলাপী। আমি বিরক্ত হচ্ছি মনে মনে, কাজের পাহাড়, গল্প করি কখন? ঠারে-ঠোরে জানালামও সেটা। কিন্তু তিনি আমলে আনলেন না। দীর্ঘ ছন্দে আত্মপরিচয় শুরু করলেন।

পরশু দিন এসেছি। লক্ষ্মীকান্ত রায় আমার নাম; পিতা স্বর্গীয় চন্দ্রমণি রায়। আদিবাড়ি বারাসতে, এখন বরানগরে বসবাস। পুজোর পর এই সময়টায় ভাল এখানে। আরও বার দুয়েক এসেছি, তাই জানি। মাছ মেলে না, মাংস খুব পাওয়া যায় আর বিলক্ষণ সস্তা। চান করতে গঙ্গায় যাবেন মশায়। কলকাতার গঙ্গা দেখেন, আর এও দেখবেন। জলের রঙ দেখে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে। স্রোত কি রকম! ঘা মেরে মেরে পাহাড় ভেঙে ফেলছে। কিন্তু হ'লে হবে কি—

সহসা কণ্ঠস্বর অন্য রকম হয়ে গেল; বিরস মুখে তিনি চুপ করলেন। আমি সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম তাঁর দিকে।

সব দিকে ভাল, কিন্তু চোরের বড় উৎপাত। বেটারা মুকিয়ে থাকে, বাঙালী বাবুরা আসেন, এই সময়টার জন্যে।

ইতিপূর্বেই সেটা শুনেছি চাকরটাকে দিয়ে স্যানিটোরিয়ামের বন্ধু বলেছেন, লোক ভালই হবে মনে হয়। আরও দু-একজনকে বলেছিলাম, কেউ মন্দ বলেন নি। তবু চোখে চোখে রাখবেন। এখানকার এই সব লোকদের বিশ্বাস নেই। আমাদের এক-একটা চাকর দশ বছর পনেরো বছর কাজ করছে, তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নে।

লক্ষ্মীকান্তবাবুও দেখছি সেই কথা বলেন। অস্বস্তি লাগল। অমিয়া এসে পড়লে যে বেঁচে যাই! ভারি সতর্ক ও সংসারী, এসে তার সংসারধর্ম বুঝে নিয়ে আমায় অব্যাহতি দিক।

ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, কটা বাজল বলুন দিকি? এখানে বাজার আবার এগারোটার আগে বসে না। বাজারে যাব এই পথে।

সময় দেখতে গিয়ে বেকুব হলাম। ঘড়ি যথারীতি বন্ধ হয়ে আছে। বললাম, ঘড়ি মেরামতের জায়গা আছে এখানে?

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন।—কজনের ঘড়ি আছে এদিগরে, তাই বলুন? চেঞ্জাররাই যা দু-দশটা নিয়ে আসে।

তারপর বললেন, সে যাক গে। কত আর হবে? দশটা, কি বলেন? আপনার স্ত্রী এলে নিয়ে যাবেন কিন্তু আমার বাসায়। ওই যে পিপুলতলার সাদা বাড়ি। স্বামী-স্ত্রী আর দুটো ছেলে, কোন রকম ঝামেলা নেই। মাস তিনেক থেকে যাব ভাবছি। বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাঙালীদের মিলেমিশে থাকা উচিত, সেই জন্যে মশায় খোঁজ নিতে চ'লে এসেছি। বলেন তো আমার চাকরটাকেও না হয় পাঠিয়ে দি। চটপট গুছিয়ে দিয়ে যাক।

আমি কৃতার্থ হয়ে বললাম, এই তো হয়ে এল। কিছু দরকার হবে না। পুরো একটা বেলা রয়েছে, আর লোক কি হবে?

না মশায়, বড় ক্লান্ত হয়েছেন আপনি। ঘাম বেরিয়ে গেছে। একটু জিরিয়ে নিন। চায়ের সব ব্যাপার আছে। এক কাপ চা খান। চা খেতে খেতে একটু গল্প করা যাবে। এই, কি নাম তোর? চা করতে পারবি রে বেটা? স্টোভটা জেলে বাবুকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া। হাতটা সাবান দিয়ে ভাল ক'রে ধুয়ে নিস।

আমি বললাম, ও কি করবে? বসুন, আমিই করছি। ভাওনা, তুই বাবা স্টোভে কেরোসিন ঢাল্। ঘরের মধ্যে নয়, বারাণ্ডায় নিয়ে যা। যাচ্ছি আমি।

স্টোভ ধরিয়ে জমানো-দুধ সহযোগে দু কাপ তৈরি ক'রে নিয়ে বৈঠকখানায় এলাম। লক্ষ্মীকান্তবাবু দেখি চেয়ারে ব'সে গভীর মনোযোগে আমার পকেট-গীতাখানা পড়ছেন। চা এনেছি, হুঁশ নেই। আহ্বান করতে মুখ তুলে এক গাল হেসে বললেন, আমার জন্তে কেন? চা আমি বেশি খাই নে। তা এনেছেন যখন, দিন।

চা খেয়ে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব ক'রে বাজারের বেলা হয়েছে বুঝে তিনি উঠলেন। যাবার সময় আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'রে গেলেন, সস্ত্রীক যাই যেন তাঁর বাসায়।

অমিয়া এসে গেছে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। পরের দিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাড়ি গেলাম। অমিয়ার এখনও ফুরসত হয় নি, একাই গিয়েছি।

শিকল নাড়ছি।—বাড়িতে আছেন?

ক্ষণপরে একজন বেরিয়ে এলেন।

কাকে চাই?

লক্ষ্মীকান্ত রায় মশায়ের এই বাড়ি?

তীক্ষ্ণ চোখে তিনি আমার আপাদ-মস্তক বার দুয়েক দেখে নিলেন। বললেন, কি দরকার বলুন তো? চোরের খুব উৎপাত, তাই শোনাতে এসেছেন? বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, একটু চা খেয়ে নিন, এই তো?

চ'টে গিয়ে বললাম, বাড়ি পেয়ে যা-তা বলছেন, কেমন ভদ্রলোক আপনি? লক্ষ্মীকান্তবাবুকে ডেকে দিন, তাঁর সঙ্গে জানাশোনা আছে—

সে অধম এই তো হাজির। কিন্তু মশায়কে বাপের জন্মে দেখেছি ব'লে তো স্মরণ হয় না। নাম কি আপনার?

অরীন্দ্রসুন্দর ঘোষ—

সকালবেলা তো আর এক অরীন্দ্রসুন্দর এসে সোনার ঘড়িটি নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। রূপোর চেনটা পছন্দ হয় নি বোধ হয়, সেটা ফেলে দিয়ে গেছেন। কিন্তু আর তজ্জু হবে না। চা আমি খাব না, দুয়োরেও

ডবল হুড়কো লাগিয়ে নিয়েছি ছুতোর ডেকে। নমস্কার, আসুন গে মশায়।

অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এলাম। সে মানুষটির দৃক্‌পাত নেই। সশব্দে হুড়কো বন্ধ করলেন আমি বেরিয়ে আসতেই।

ফিরে আসতে অমিয়া বললে, পাঞ্জাবি ঝুলছে, শুধু ঘড়িটা দেখছি পকেটে। সোনার চেন কি হ'ল, বাক্সে তুলে রেখেছ না কি?

সশব্দে পরীক্ষা ক'রে দেখি। অতএব সদালাপী গীতাধ্যায়ী সেই ভদ্রলোকেরই পরিপাটী হাতের ক্রিয়া। অচল-ঘড়িটা পছন্দ করেন নি, আমার সোনার চেনে লক্ষ্মীকান্তবাবুর সোনার ঘড়ি তাঁকে বাজারের বেলার সঠিক নির্দেশ দিচ্ছে।

শ্রীমনোজ বসু

আষাঢ়ে গল্পের নমুনা

রহমৎ মিঞা গল্প বলছিল।

আমাদের সভার স্থানটা হচ্ছে নতুন পুকুরের পাড়ে কয়েকটি ঘনসন্নিবিষ্ট তালগাছের মাঝখানে একটুখানি ঘাস-বিছানো জায়গায়।

রহমৎ ছোট-খাটো বুড়ো মানুষ। চিরটা জীবন কেটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দরিয়ায় জাহাজের সারেঙ্গ হিসাবে। বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীই সে ঘুরেছে। এখন অবসর নিয়ে গ্রামেই এসে বসেছে। চমৎকার গল্প বলে। গল্পের কোন জায়গা কতটুকু এবং কেমন ক'রে বলতে হবে, কেমন ক'রে আরম্ভ ক'রে কোথায় শেষ করতে হবে, এ বিষয়ে তার একটি স্বাভাবিক এবং সহজাত অশিক্ষিতপটুত্ব ছিল। এই সমস্ত কারণে তার গল্প খুব জমত।

নবীন ছিল তার গল্পের একনিষ্ঠ ভক্ত। উভয়ের মধ্যে প্রীতিও ছিল খুব নিবিড়। মাঝে মাঝে সে তার জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে রহমতের জন্যে আফিম কিনত এবং তাকে নিয়ে এই তালতলায় আসর জমাত।

আফিমের কোনও বিশেষ গুণ আছে কি না জানি না। কিন্তু বঙ্কিমের কমলাকান্ত অহিফেনসেবী ছিলেন। রহমৎ মিঞাও আফিম

খায়, এবং সেবনের পনেরো মিনিটের মধ্যেই তার সাহিত্যিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

রহমৎ গল্পটা শুরু করেছিল তালগাছ নিয়ে। কে কতবড় তালগাছ দেখেছে। যার যা খুশি উত্তর দেওয়া যখন শেষ হ'ল, তখন রহমৎ বললে, তা হ'লে শোন—

আমার তখন ছোকরা বয়েস। গরুর গাড়ি নিয়ে গিয়েছি আমদপুর ইষ্টেশন সোয়ারী পৌঁছে দিতে। এ দিকে রেলের লাইন তখনও তো খোলে নি। আমাদের ইষ্টেশন ছিল তখন আমদপুর। যেতাম সোয়ারী নিয়ে, ফেরার পথে নিয়ে আসতাম কয়লা।

তা আসছি।

ব'লে রহমৎ মিনিটখানেক পশ্চিম আকাশের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। এইটে গল্প সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাবার তার একটা কৌশল। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছি তার ধ্যানস্থ মূর্তির দিকে।

একটু পরে অহিফেনবিজড়িত নেত্র ঈষৎ উন্মীলিত হ'ল। বলতে লাগল—

তা আসছি। নয়নজোড়ের কাঁদড় পেরিয়ে এলাম বাতাসপুরের সাঁকোর ধারে। ভর্তি দুপুরবেলা। মাঠে জনমনিষ্যি নেই, দুধারে ধূ-ধূ করছে বিলেন জমি। হঠাৎ একটা শব্দ উঠল—থস্‌।

আমরা ভয়ে ভাবনায় ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হয়ে উঠেছি। গুরুতর কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কায় প্রশ্ন করলাম, কিসের শব্দ?

রহমৎ আমাদের দিকে ফিরেও চাইল না। যেমন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে গল্প বলছিল, তেমনই বলতে লাগল। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও আবশ্যক বিবেচনা করলে না। আপন মনে তার গল্পের জের টেনে বলতে লাগল—

আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, তাল পড়ছে। পাকা তাল বোঁটা থেকে খ'সে যাওয়ার শব্দ হয়েছে—থস্‌।

তারপরে?

গাটা ছমছম করছিল। চারকুশী বিল। দূরে দূরে লিকলিক করছে সোঁদরপুর, বেলগাঁ, ছাঁদনা। কেউ গলা টিপে মেরে-ধ'রে সব

কেড়ে নিতে এলে চীৎকারে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ শুনতে পাবে না। গরু দুটোকে তাড়াতাড়ি ডাকাতে লাগলাম। কাল সারারাত তারা সোয়ারী বয়েছে, আজ ফেরার পথেও সাত-আট মণ মাল। তারাও আর বইতে পারে না। তবু চলছে কোনও রকমে। ভয়ে আমার গলা কাঠ হয়ে উঠেছে।

এমনি ক'রে কোনও রকমে সোঁদরপু'রর বাঁধা গাছতলায় এসে পৌছুলাম আর অমনি—

ডাকাত?

না বাবা। হুম্!

বন্দুক?

না রে বাপজান, সেই তালটো পড়ার শব্দ। বিবেচনা কর, তালগাছটা লম্বা কত!

প্রমথ চুপ ক'রে এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিল। রহমৎ তাকে একেবারে দেখতে পারে না। এখন বললে, খুব বেঁচে গেছেন চাচা। ভাগ্যিস্ তালটা আপনার মাথায় পড়ে নি!

রহমৎ কিন্তু চটল না। শুধু বললে, না রে বাবা, মাথায় আমার ছত্তরপুরের মাথাল। তার ভেতরে বন্দুকের গুলি ঢোকে না, তাল কোন্ ছার!

নতুন পুকুরের জলে একটা বড় মাছ সেই সময় লাফিয়ে উঠল। নবীন বললে, মাছ আপনি কত বড় দেখেছেন চাচা?

মাছ?—রহমৎ আমেজে চোখ বন্ধ করল।

তারপর বললে, শোন তা হ'লে—

আমরা চলেছি আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে। বেশ চলেছি, বেশ চলেছি। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। জাহাজে সব আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু দিনের বেলা অন্ধকার! কাপ্তেন বাঁশী বাজিয়ে দিলেন। নিশ্চয় কোনও বিপদ ঘটেছে। হয়তো পথ ভুলে জাহাজ কোন অজানা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, কিংবা ওই রকম একটা কিছু।

এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়, তিন ঘণ্টা যায়।

কাপ্তেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। ওপর-নীচে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু অন্ধকার আর কাটে না। কত বড় সুড়ঙ্গ রে বাবা, যে, তিন ঘণ্টাতেও পার হওয়া যায় না! এমন সুড়ঙ্গের কথা কেউ তো কোনদিন শোনে নি।

শেষ-মেশ চার ঘণ্টা কাটল।

আমি আর থাকতে না পেরে কাপ্তেন সাহেবকে গিয়ে সেলাম দিলাম।

কি রহমৎ?

সাহেব, আমার একটা আরজি ছিল।

বল।

হুজুর, সামনের বড় তোপটা একবার দাগবার হুকুম যদি দেন।

সাহেব তো অবাক। বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে রহমৎ? দুশমন কোথায় যে, তোপ দাগবো!

তবু যদি একবার হুকুম করেন। আমার মনে হয়, তা হ'লেই অন্ধকার কাটবে।

অনেক কষ্টে তবে শেষ-মেশ সাহেব হুকুম দিলেন। তোপ দাগা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে আলো বেরিয়ে পড়ল।

সাহেব তো অবাক। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। বললাম, ওই দেখুন হুজুর, পেছুনে চেয়ে।

পেছুনে একটা বোঁড়ে বোয়াল ভাসছে। রক্তে দরিয়া লাল হয়ে গেছে।

প্রমথ অবাক হয়ে বললে, বোঁড়ে বোয়াল!

গল্পের রস নষ্ট হতে রহমৎ ভারি চ'টে গেল। ফোকলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, বুঝলি নে আহাম্মক! ওই লেজটাই তো আমরা তোপে উড়িয়ে দিলাম। তবে না বেরুতে পারল জাহাজ তার পেট থেকে!

রহমৎ রেগে কাঁই

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ

গৃহ-সমস্যা

সব চেয়ে বিপদ হয়েছে কি জানেন?—আমার এই বাড়িভাড়া নিয়ে। খাদ্য-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, মৎস্য-সমস্যা, কন্যা-সমস্যা, প্রেম-সমস্যা নিয়ে কত লোক কত মাথা ঘামাচ্ছেন, কিন্তু আমার প্রধান সমস্যা হয়েছে, আজকের দিনে শুধু নয়, অনেকদিন থেকে—গৃহ-সমস্যা নিয়ে। এর সমাধান বোধ হয় আর জীবনে হবে না। গৃহের চেয়ে গৃহস্বামীর সমস্যা আবার আমায় পাগল ক'রে তুললে। মানে, ব্যাপার যা হয়েছে, তাতে তো মাথা গোঁজবারও আর ঠাঁইটুকু থাকে না দেখছি।

মশাই, পিতৃপুরুষের বুদ্ধির জোরে যাঁরা কলকাতা শহরে এক সময় বাড়ি ফেঁদে ফেলেছিলেন, এখন তো তাঁদের পোয়া-বারো। আমাদের পূর্বপুরুষরা, দু-পয়সা ক'রে, স্ত্রীর হাঁসুলি গড়িয়ে হয়তো তাঁদের খুশি করতেন; কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁদের বংশধররা যে এক ছটাক জমির অভাবে কিল-ঘুষি খেতে খেতে কাহিল হয়ে পড়বে সেটা ভাবতেন না। কিন্তু সেকালে যাঁরা বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁদের নামে হাঁড়ি ফাটলেও তাঁরা খানকতক বাড়ি ক'রে যেতে ভোলেন নি, তার ফলে তাঁদের বংশধররা আমাদের মত হতভাগ্যদের নাড়ীভুঁড়ি বার ক'রে ছাড়ছেন।

বিশেষ আমার বাড়িওয়ালাটি। মশাই, বাইশ বছর আমি তাঁর ভাড়াটে—বাড়িতে দুটো গরু থাকলে, দুধ না দিতে পারলেও তাদের ওপর লোকের মায়া পড়ে, কিন্তু আশ্চর্য, মাসের পর মাস আমি সময়মত ভাড়া দিয়ে গেলেও তিনি শিঙ-নাড়া দিতে ছাড়েন না। নিত্যি 'আরও দাও, আরও দাও' ক'রে তাঁর ক্ষিদে আর মেটে না। অথচ সব ঝরঝরে হয়ে প'ড়ে যাচ্ছে, তা সারাবার কথা বললে তিনি আমাকে তাড়াবার জন্যে আরও অসুবিধে ঘটাতে থাকেন।

বাবা আদমের আমলের বাড়ি—তিনটে তার তলা, কিন্তু জানলা-দরজা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়ই খোলা। হিম, জল, ঝড় সব কিছুই সর্বত্র দিয়ে হুহু ক'রে ঢুকছে। কারণ আধেক গেছে উড়ে,

বাকি যা আছে তা বনেদ খুঁড়ে আবার না ফিরে-ফিরতি তুললে কোন উন্নতির আশা নেই। মেরামত অসম্ভব।

আমি নিজের খরচায় একবার জানলা সারাতে দুটো কব্জা আঁটাবার বন্দোবস্ত করেছিলুম—কব্জা আঁটা চুলোয় যাক, একটু চাড় দিয়ে স্ক্রু বসাতে চৌকাঠটা পর্যন্ত খুলে বেরিয়ে গেল—সে আবার আর এক বিপদ! শেষে নারকেল দড়ি দিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে জানলাকে বেঁধে রাখতে হয়েছে, পাছে কোন সময় রাস্তায় সবসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ হেন বাড়ির একটি তলার পাঁচখানি খুপরির, মনে করুন, পঁচাত্তর টাকা দক্ষিণা।

আগে ছিলুম এক তলায়—কলকাতায় দমাদ্দম যেই বোমা পড়তে শুরু করল, অমনই তিনি আমায় বললেন, মশাই, আপনি তেতলায় যান।

আমি অবাক হয়ে বললুম, সে কি মশাই, বোমার সময় তেতলা থেকে একতলায় লোকে নেমে আসে, আর আমি গুষ্টিবর্গ সমেত সেই টঙে উঠে ব'সে থাকব?

তিনি চট ক'রে ব'লে উঠলেন, তা হ'লে আপনি বাড়ি ছেড়ে দিন, বাড়িওয়ালা হয়ে আমি তো আর তেতলায় শুয়ে মরতে পারি না।

আমি মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললুম, তা আমি বাড়ির ভাড়াটে হয়েই কি এমন অপকর্ম করলুম মশাই যে, মাস মাস ভাড়া গুনে স্রেফ মরবার জন্যে আমায় তেতলায় উঠতে হবে? সে আমি পারব না।

বললুম তো পারব না, কিন্তু ব'লেই হ'ল বিপদ। তিনি কল, বাতি—সব বন্ধ ক'রে দিলেন। বাধ্য হয়ে দুরুদুরু হৃদয়ে মহীরাবণের গুষ্টিকে নিয়ে তেতলায় উঠতে হ'ল। তিনি তাঁর জিনিসপত্তরগুলিকে একতলায় দোতলায় নিরাপদে তালা দিয়ে রেখে নিজের ফ্যামিলি নিয়ে মধুপুরে বোমার হাত এড়াতে বেরিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ থামতে পুনরাবির্ভাব। এসেই পাঁচ টাকা ভাড়া বৃদ্ধি এবং আমাকে সমস্ত জিনিস নাড়ানাড়ি ক'রে আবার নীচের তলায় অবস্থান করার নির্দেশ। সে নির্দেশ পালন করতে দিন তিনেক দেরি হয়েছিল ব'লে কি রাগ! বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসতে

হ'ল। তখন বাড়ির লোকের যত ঝাল আমার ওপর পড়ল।—তুমি নামলে কেন?

কি করব বলুন? বাড়ি তো আর আমার নয়। সেটা বুঝবে না। যাই হোক, এবার তবু একতলায় নয়, দোতলায়—আমার পুত্র পটকাটা আবার একের নম্বরের মিচকে বজ্জাত, নীচে নেমে আসার সময় তেতলার মেঝেগুলো পেরেক দিয়ে ছেঁদা ক'রে এসেছেন, তার ফলে আমার অবস্থা হয়েছে আরও কাহিল।

এখন নীচে মশারির মধ্যে শুয়ে থাকলেও টপটপ ক'রে ওপর থেকে কি যে পড়ে তা ভগবান জানেন—বাড়িওয়ালাটির কচি-কাচার তো অভাব নেই! সারাতে যে বলব, তা হ'লে তো আরও বিপদ বাড়বে। এখুনি মিস্ত্রি আনিয়ে সেই ছুতোয় আমায় পথে দাঁড় করাবে. আর দরজা খুলবে ভাবছেন? রামঃ! তাই সে কথা উচ্চারণও করি না। এই পঞ্চাশ বার সকাল থেকে শুনছি, আপনি উঠে যান।

উঠে যাই বা কোথায়? উঠে গেলে এখন তো ছেলেপুলেদের নিয়ে উটের পিঠে চেপে বেদুইনদের মত ঘুরে বেড়াতে হবে—তার চেয়ে মার খেয়ে প'ড়ে থাকাই ভাল। এর ওপর বঙ্গ-বিভাগের পর থেকে দেশের আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছেন, সব গুটিগুটি আসতে শুরু করেছেন; কারণ দেশে থাকা নাকি অসম্ভব, প্রতিদিন নানা রকম বিপদ রগ ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই সামলে তাঁরা কোনক্রমে এখানে পালিয়ে এসেছেন। এখানে তো এক তিল জায়গা নেই, কিন্তু পিলপিল ক'রে লোকের আসারও কামাই নেই—কাকে ফেলে দিই বলুন? অথচ আর কোন বাড়িতে যে ওঠাব, তার ঠিকানা কোথায়?

আমারই বাড়িওয়ালা পাশে এক ফ্ল্যাট তুললেন, বললুম, মশাই, আমি পুরনো লোক, আমায় যদি একখানা দুখানা ঘর দেন তো বড় উপকার হয়। গোড়ায় বললেন, ওটা আমার থাকবার জন্যে করেছি। আমি তাও বললুম, দেখুন, অত বড় বাড়ির সবটায় তো আর আপনি থাকবেন না। বললেন, হ্যাঁ, তাই থাকব। এক মাস

একতলায় থাকব, এক মাস দোতলায়, এক মাস তেতলায়। আমি বললুম, আজ্ঞে, সেটা তো বোমা পড়লে, তার আগে তো নয়?

তিনি খিঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, যান যান, মেলা বকবেন না, আপনাকে আমি বাড়ি দিতে পারব না। আমার নিজের আত্মীয়েরা আসছে।

বলতে বলতে তখুনি এক পরমাত্মীয় এসে পড়লেন। পাঁচ হাজার টাকা সেলামী দিয়ে পাঁচ মাসের ভাড়া আগাম জমা রেখে তিনি লরি বোঝাই মালপত্তর নিয়ে আমার নাকের সামনে দিয়ে একটা ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলেন। সেলামীর বহর দেখে আমি তো ফ্ল্যাট! লোকে যুদ্ধের বাজারে কত চুরি করেছিল রে বাবা!

তবু বললুম, মশাই, এই রকম সেলামী নেওয়াটা কি উচিত হচ্ছে? আপনিই না বঙ্গবিভাগের সময় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়েছিলেন, যে যেখানে হিন্দু আছ এইখানে চ'লে এস, আমি তোমাদের মত জনকে পারি রামমূর্তির মত বুকের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখব? কিন্তু এখন তো তাদের বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে মারছেন! এইটে কি ভদ্রতা হচ্ছে দয়াময়?

তিনি ব'লে উঠলেন, আলবৎ হচ্ছে। যে বেটারা মাঠের বক্তৃতায় বিশ্বাস করে, সে বেটারা মরবে না তো মরবে কে? ভিড় না বাড়ালে বাড়ির তো দরই হবে না, তার বদলা জুটবে আপনাদের মত কতকগুলো উদো ভাড়াটে। বাড়ির ভাড়া ছ পয়সা বাড়াবার জো নেই, অথচ সতেরো বার বাড়ি সারাবার তাগাদা আছে! আপনাদের মত ঝানু ভাড়াটেগুলো গেলে বাঁচি!

বুঝলুম যে, কোন আশা নেই। এঁর মত বাড়িওয়ালাকে জব্দ করতে হ'লে রেণ্ট কণ্ট্রোলারের আপিসে টাকা জমা দিয়ে ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল। তাই করতুমও। কিন্তু বিপদ কি জানেন? লোকটা থাকে একই বাড়ির ওপরে আর আমি নীচে। সম্ভব অসম্ভব নানা রকম জিনিসপত্তর দিনরাত মাথার ওপর ছুঁড়ে ফেললে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তাই চুপ মেরে রইলুম।

বুঝছি, সংসারে নিরীহদের অনেক দুর্গতি। সত্যিকারের ঝানু হ'লে অনেক দুঃখ ঘুচত। বাড়ির ভাড়াটে হয়েও দেখেছি, আবার বাড়িওয়ালা হয়েও দেখেছি, আমার সবেতেই বিপদ!

মশাই, এক দিদিমার সুবাদে বাড়ি পেয়েওছিলুম, কিন্তু রাখতে পারলুম না। যে দুঃখে বাড়ি বেচে ফেলে দিয়ে, আজ মনে করুন, আমায় এই দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে, তার কারণ ছিলেন আবার আমার ভাড়াটে ঠিক বিপরীত প্রকৃতির। ভাড়ার তাগাদা দিয়ে নালিশ ক'রেও তাকে ওঠাতে জিভ বেরিয়ে পড়েছিল। ছেলেরা যেমন মাঝে মাঝে উকি তুলে দুধ বার করে, আমার ভাড়াটিয়েটিও তেমনই ঝাঁকি মেরে মেরে ভুগিয়ে তবে এক-আধবার টাকা বার করতেন। আটত্রিশ টাকা ভাড়া আদায় করতে আটষট্টি বার তাঁর বাড়ি যেতে হ'ত। তিনি নিজে থাকতেন একখানি ঘরে, আর বাকি সব ঘরগুলোয় আমাকে না জানিয়ে অপর লোকদের ভাড়া দিয়ে বিয়াল্লিশ টাকা আদায় করতেন। এর ওপর দরকার পড়লে জানলা দরজা কড়ি বরগা সব বেচে দিতেন।

খবর পেয়ে একদিন নিজে গেলুম, দেখলুম যে, যা শুনেছিলুম তা মিথ্যে নয়, অর্ধেক জায়গায় বাঁশের চাড়া দেওয়া, উপরন্তু যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন সে ঘরটির যেন বসন্ত বেরিয়েছে, অর্থাৎ দেয়ালের সর্বত্র ফুটো আর কালো কালো দাগ। তাই দেখে রাগ ক'রে ব'লে উঠলুম, আচ্ছা মশাই, পরের বাড়ি ব'লে দেওয়ালটার কি অবস্থা করেছেন বলুন তো? তিনি নিরঙ্কুশভাবে ব'লে গেলেন, মশারির পেরেক পুঁততে হ'লে অমন দাগ হয়েই থাকে।

তার উত্তরে আমি বললুম, আচ্ছা মশাই, মশারির ভেতর কি নিত্যি নতুন সাইজের লোক ঢোকে যে ওপরে নীচে নানা জায়গায় মাপসই ক'রে পেরেক পুঁততে হয়? আশ্চর্য!

এই নিয়ে তর্ক, মহা হাঙ্গামা, কেলেঙ্কারি ব্যাপার! শেষে বিরক্ত হয়ে সেটা বেচে আপদ শান্তি ক'রে দিলুম। তখন যদি জানতুম যে, ভবিষ্যতে আমার বাড়িওয়ালাটির মত একজন সদাশয় ব্যক্তি কপালে জুটবেন, তা হ'লে আমার সেই মহদাশয় ভাড়াটেটির হাতে-পায়ে ধ'রে এইখানে পুরে দিয়ে, নিরাপদে নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারতুম। তারপর তিনি এবং ইনি পরমসুখে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কালাতিপাত করতে পারতেন কি না জানি না, তবে আমার বিপদ খ'ণ্ডে যেত।

শ্রীবিরূপাক্ষ

হয়তো

১৯৫২ সাল।

যুদ্ধের ডামাডোলে একটি চাকুরি জুটিয়া গিয়াছে। অফিসের গাড়ি, বাসা হইতে লইয়া যায় বেলা নয়টায়, বাসায় ফিরাইয়া দিয়া যায় রাত্রি আটটায়।

শ্যামবাজার হইতে ডালহৌসী একটানা মোটরে যাইতে বেশ লাগে। বহুদিন রেলগাড়িতে চড়ি নাই। শহরের ট্রামবাসগুলা যেন প্রতি পদে হোঁচট খাইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিতে থাকে। ট্যাক্সি চড়িবার সৌভাগ্য হয় কালেভদ্রে। গতির আনন্দ আজ প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছি। তাই যাতায়াতের এই সময়টুকু সর্ব দেহ-মন দিয়া সেই আনন্দ উপভোগ করি।

মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটে। হাত উঁচু করিয়া পুলিস রাস্তার মাঝে শিখণ্ডীর মত দাঁড়াইয়া থাকে। আমাদের রথ রুদ্ধগতি হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে।

সেদিনও সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে গাড়ি থামিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া চক্ষু খুলিলাম। পুলিস হাত দেখাইয়াছে। সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, ঠেলাগাড়ি, রিক্‌শ।

বাহিরের দিকে তাকাইয়া এই বিচিত্র সমাবেশ দেখিতেছিলাম। একটি মেয়ের দিকে হঠাৎ নজর পড়িল। বছর বারো বয়স হইবে। আধময়লা একটা ফ্রক গায়ে। অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল বাতাসে উড়িতেছে। বড় বড় দুইটি চোখ। বেশ সুন্দরী। এক হাতে একটি কাঁসার জামবাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আছে, আর এক হাতে উচ্ছৃঙ্খল চুলগুলি মুখের উপর হইতে ক্রমাগত সরাইয়া দিতেছে। রাস্তা পার হইবে। গাড়িগুলির মতিগতি কি, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছে বোধ হয়।

অতি সাধারণ ঘটনা।

কিন্তু অসাধারণ ওই মেয়েটি। ওই কচি মুখে যে বিষণ্ণতার ছাপ পড়িয়াছে তাহা দুঃখের মালিন্য নহে; বৈরাগ্যের স্বাভাবিক কারুণ্য। ডাগর ডাগর চোখ দুইটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে নিস্পৃহতা। এই গাড়ি

ঘোড়া লোকজন সব কিছুই সে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু কিছুই যেন তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না।

পুলিস হাত নামাইল। গাড়ির শোভাযাত্রা সচল হইয়া উঠিল। মেয়েটিকে আর দেখিতে পাইলাম না।

মনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গেল মেয়েটি। চক্ষু বুজিয়া তাহার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। ধাপে ধাপে তাহার অতি-শৈশবের জীবন-কাহিনীর দিকে ফিরিয়া গেলাম।

হয়তো—

বাপ মায়ের আদুরে মেয়ে সে। একমাত্র সন্তান, তাই আদরের ঘটাটা কিছু বেশি। ছোট্ট সংসার। স্বামী, স্ত্রী আর ওই মেয়ে। বাপ করে সরকারী অফিসে চাকুরি। মাহিনা খুব বেশি নয়। বাপ বাহির হইয়া যান নয়টায়। মা কাজকর্ম সারিয়া ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুইয়া বই পড়িবার নাম করিয়া ঘুমান।

সাড়ে তিনটা বাজিয়া যায়। কলতলায় ছরছর করিয়া জল পড়ার শব্দ হয়। ঘুঁটেওয়ালী হাঁক দেয়, ঘুঁটে—। খুকী ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসে। ঘুমন্ত মায়ের দিকে তাকায় দুই-একবার। তারপর মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, মা, খিদে। মা সাড়া দেন, উঁ! তাঁহার উঠিবার কোন গরজ দেখা যায় না।

খুকী কিন্তু অধৈর্য হইয়া পড়ে। মায়ের চুল ধরিয়া দেয় একটান।

মুখে বলে, দল পততে, বাবা আতবে।

এবারে কাজ হয়। মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন। দুই হাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে বলেন, এই দুষ্টু, তোর বাবা কই এসেছে রে!

মেয়ে গম্ভীর হইয়া বলে, দল আতবে, বাবা আতবে।

মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইতে খাইতে মা বলেন, ইস, কি গিন্নী রে আমার!

খুকী এবারে কাজের কথা পাড়ে।

গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, মা, খিদে।

মা হাসিয়া বলেন, ওঃ, তাই এত তাড়া! ব'স চুপটি ক'রে। খাবার নিয়ে আসি তোমার।

খাওয়া-পর্ব শেষ হইতে না হইতেই দোরের কড়া খটখট করিয়া বাজিয়া উঠে। খুকী দৌড়াইয়া জানালা দিয়া উঁক মারিয়া দেখে। ভারিক্কী চালে বলে, খবুর, খবুর। দাব্ভি।

খুকী সব-কিছুই বলিতে পারে। প্রাধান্য দেয় অবশ্য 'ত'-বর্গকে একটু বেশি।

মা দরজা খুলিয়া দেন। খুকী বাপের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। বাপ চুমু খান—একটা, দুইটা, অনেকগুলি।

খুকী কিন্তু ভোলে না। ভুরু নাচাইয়া প্রশ্ন করে, বাবা, কম্‌মা ?

বাবা-মা দুইজনেই হাসিয়া উঠেন। বাবা পকেট হইতে একটি কমলালেবু বাহির করিয়া তাহার হাতে দেন।

খুকী এক হাতে লেবুটা বুকের উপর চাপিয়া ধরে, আর এক হাতে জড়াইয়া ধরে বাপের গলা।

এমনিভাবেই খুকী বাড়িয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু বিপর্যয় ঘটিল।

মা রঙিন কাপড় পরিত্যাগ করিয়া সাদা থান পরিলেন। নিরাভরণা অবস্থায় মেয়ের হাত ধরিয়া উঠিলেন তাঁহার ভাইয়ের বাসায়—সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ে।

মা কাঁদিলেন, মামা কাঁদিলেন, মামী কাঁদিলেন। কেন, তাহা খুকী জানে না। বাপকে না পাইয়া খুকীও কাঁদিল।

মামা-মামী ভাল লোক। মামা অধ্যাপক। হা-অন্ন হা-অন্নও নাই, আবার সচ্ছলতাও নাই। মামীর ছেলেমেয়ে কিন্তু গণ্ডাখানেক। তাহাদের লইয়া লুটাপুটি খান মামী দিন-রাত। তাহার মধ্যেই সময় করিয়া ননদ ও ভাগ্নীর তদারক করেন যথাসাধ্য।

এমনিভাবেই কাটিয়া যায় আরও দুই বছর। অবশেষে মাও মেয়ের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। সে এখন বড় হইয়াছে। এই ছাড়িয়া যাওয়ার অর্থ যে মৃত্যু, তাহা সে বুঝিতে শিখিয়াছে। বাবা গিয়াছেন, মা গিয়াছেন, মামার ছেলে সণ্টু ও মেয়ে রাণুও গিয়াছে। এবারে যে তাহার নিজের পালা নহে—এ কথা কে জোর করিয়া বলিতে পারে ?

তবে ?

জীবন-মরণ সম্বন্ধে সে ক্রমেই উদাসীন হইয়া পড়ে। তাই তাহার মুখে পড়িয়াছে বিষাদের ছায়া, চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে নির্লিপ্ততা।

পাঁচজনের সংসার। নানা ঝামেলা। বিশেষ করিয়া কাহারও দিকে নজর দিবার অবসর কাহারও নাই। তবুও জামা-কাপড় কিনিয়া আনিয়া মামা তাহাকেই সর্বাগ্রে ডাকেন, নিজের পছন্দমত জিনিসটি বাছিয়া লইতে। মামী সকলকে একটি করিয়া সন্দেশ দেন, তাহার হাতে তুলিয়া দেন দুইটি।

সে উৎফুল্ল হয় না, প্রত্যাখ্যানও করে না।

তথাপি মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া হাত পাতিয়া গ্রহণ করে। নতুবা মামা-মামী দুঃখ পাইবেন। মরিবেই যখন, তখন অন্যকে দুঃখ দিয়া লাভ কি ?

মা শেষ সময়ে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মী হয়ে থেকো মা। মামা-মামীর কথা শুনে চ'লো। কাউকে দুঃখ দিও না, তোমাকেও কেউ দুঃখ দেবে না। তুমি দুষ্টুমি করলে স্বর্গে থেকেও আমি আর উনি কষ্ট পাব।

বলিতে বলিতে মায়ের চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। মায়ের বুকের উপর পড়িয়া সেও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল।

মায়ের কথাই তো সত্য। সকলেই তাহাকে ভালবাসে। এক, নতুন মামী একটু-আধটু বকেন।

নতুন মামীর দোষ নাই। বড়লোকের মেয়ে। অনাথা এই ভাগ্নীটিকে পার্শ্বচরী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ও-ই তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে।

বড় হইয়াছে। ঘর-সংসারের টুকিটাকি কাজ অনেকগুলিই সে করে আজকাল। বড়মামীর কোলের ছেলেটাকেও কোলে-পিঠে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

ছোট মামীর শখ আছে প্রচুর, কিন্তু কাজ করিবার উৎসাহ কিছু কম। মেয়েটাকে দিয়া ফাইফরমাশ খাটানো চলে। কিন্তু তাহা কি হইবার উপায় আছে ? বড়গিন্নীর তালে তাল দিবে সর্বক্ষণ। তাহার উপর রহিয়াছে মেয়ের পড়াশুনা।

আদিখ্যেতা দেখ না! চাল নাই চুলা নাই, তাহার আবার পড়াশুনা! কোন্ দোজবরের হাতে পড়িবে তাহার নাই ঠিক।

কিন্তু মেয়েটা যেন হাবা! কোন কথাতেই 'হাঁ'-ও বলে না, 'না'-ও বলে না। ওই এক ঢঙ।

যুদ্ধের হিড়িকে ঠাকুর চাকর পলাইয়াছে। কর্তারা তো নিজের নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত। দোকান হইতে এটা ওটা আনিয়া দেয় কে?

খুকী উঠিয়া দাঁড়ায়, সে-ই যাইবে।

বড় মামী বাধা দেন। মিলিটারী গাড়ির যে দৌরাত্ম্য! রোজই নাকি দুই-একজন চাপা পড়িতেছে!

খুকী একটু হাসে। বলে, রোজই তো কতবার রাস্তা পার হতে হয়। ইস্কুলে যাই না আমি?

গরজ বড় বালাই। বড় মামী সম্মতি দেন। বার বার সাবধান করিয়া দেন, দেখে শুনে রাস্তা পার হ'স মা। দেরি হোক না, ক্ষতি কি?

ছোট মামী আড়ালে ডাকিয়া একটা সিকি হাতে দিয়া বলেন, অমনই মোড়ের ওই পানের দোকান থেকে জরদা নিয়ে আসবি চার আনার। লুকিয়ে আনবি, কেউ যেন না দেখে।

আজও সে আসিয়াছে মুদিখানা হইতে এক সের গুড় লইতে। গাড়িগুলার গতিবিধি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তবে সে রাস্তা পার হয়। মৃত্যুর ভয় তাহার নাই। মা, বাবা, সন্টু, রাণী গাড়ি চাপা পড়ে নাই, তবু মরিয়াছে। গাড়ি চাপা না পড়িলেও সে ম'রবে। কিন্তু গাড়ি চাপা পড়িলে বড় মামী কাহাকেও নাকি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাই সে গাড়িচাপা পড়িবে না।

মিলিটারী গাড়ি সে চেনে। দেখিলেই সে ফুটপাথের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবে।

নাঃ, গাড়িগুলা আজ বেজায় ছুটাছুটি করিতেছে। ইস্কুলে যাইতে দেরি হইয়া যাইবে।

একটা ঝাঁকুনি খাইয়া গাড়িখানা থামিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া চোখ খুলিলাম। অফিসে পৌঁছাইয়া গিয়াছি।

১৯৪৮ সাল।

'৪২ সালেই চাকুরি ছাড়িয়াছি। কয়েক বৎসর জেল-বাসও করিতে হইয়াছে। বর্তমানে সাংবাদিকতাই আমার নেশা ও পেশা।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে একটি সভা ছিল। যে সংবাদপত্রে কাজ করিতাম, তাহার প্রতিনিধি হিসাবে আমাকেই সভায় যাইতে হইল।

কোন এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক বক্তৃতা করিতেছিলেন। দেশের নেতৃবর্গ যে আজ অধঃপতিত, কম্বুকণ্ঠে তিনি তাহা বারম্বার ঘোষণা করিতেছিলেন। শ্রোতৃবর্গও ঘন ঘন করতালি দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। নাটকীয় সেই 'পরিস্থিতি' সহ্য করিতে পারিলাম না। বারান্দায় আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম।

একটি তরুণ ও একটি তরুণী প্রবেশ করিল। তাহাদের সম্বর্ধনা জানাইল সমবেত কয়েকটি তরুণ-তরুণী। নবাগত তরুণটি স্মিতহাস্যে সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তর দিল। তরুণীটি অস্ফুটকণ্ঠে কি বলিল শুনিতে পাইলাম না।

সিঁড়ি বাহিয়া তাহারা উঠিয়া আসিল।

বারান্দার সিলিং-লাইটের আলো তাহাদের উপর পড়িল। সেই আলোকে নবাগতার মুখখানি দেখিতে পাইলাম।

চিনিলাম।

সেই দ্বাদশী। ১৯৪২-এ যাহাকে মুহূর্তের জন্য দেখিয়াছিলাম বিবেকানন্দ-সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে।

সেদিন সে ছিল বালিকা। আজ সে যুবতী। বালিকার স্নিগ্ধ মধুরতাকে সেদিন উপেক্ষা করিতে পারি নাই, তাহার যৌবনের দাহিকাময় দ্যুতিকেও আজ অস্বীকার করিতে পারিলাম না।

স্বীকার করিলাম, অসামান্যা সুন্দরী সে।

না চিনিবারই কথা। তবুও চিনিলাম। তাহার চোখ দুইটিই তাহাকে ধরাইয়া দিল।

জোড়া ভ্রূর নীচে টানা টানা ডাগর দুইটি চোখ। কিন্তু অদ্ভুত এক দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে। স্তব্ধ, মৌন। মানুষকে আহ্বানও জানায় না—আহতও করে না। নির্জীব নহে, নিরাসক্ত। যেন বৈরাগী মনের নিখুঁত ছবি।

যাবার সময় পৌঁছে দেব কি ?

না, দরকার নেই।

ওঃ—সেই পুরনো কথা! আজও তোমার ভয় গেল না?

মেয়েটি একটু হাসিল। মৃদু অপ্রস্তুতের হাসি।

* * *

রিপোর্ট লিখিতেছিলাম। কিন্তু তরুণীটি আসিয়া বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল। ১৯৪২-এর কাহিনী অনুস্মৃতির দাবি করিয়া বসিল।

ভাবিতে লাগিলাম, হয়তো—

সকলের অলক্ষিতে দ্বাদশী সেই মেয়েটি বড় হইয়া উঠিতেছে। এমনিই হয় ছোট বড় হয়। বড় বুড়া হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু সেই বাড়িয়া উঠা পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে কেহ লক্ষ্য করে কি?

করে না।

কেবল জীবনের বিভিন্ন স্তরে সে পারিপার্শ্বিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্তম্ভিত হইয়া সকলে ভাবে, এ বাড়িল কখন, কেমন করিয়াই বা বাড়িল?

সকলের অগোচরেই যে বাড়িয়া উঠিতেছিল, বড় হইয়াই সে বিপদে পড়িল। শুধু যে ফ্রক ছাড়িয়া কাপড়ই পড়িতে হইল তাহা নহে, রূপ বলিয়া যে অপরূপ একটি জিনিস আছে এবং নিজেও সে তাহার অধিকারী, তাহা তাহাকে জানিতে হইল।

সে বিপন্ন বোধ করিল। যে-রূপ লইয়া অপরে এত মাতামাতি করিতেছে, তাহার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে তাহা লইয়া কি করিবে? দেহের লাবণ্য তাহার নিজের মনে দোলা লাগাইল কই?

কিন্তু কেন?

সকলে যাহা পারে, সে তাহা পারে না কেন? আর পাঁচজনের মত সে নিজেও তো খাইতেছে, পরিতেছে, হাসিতেছে—এক কথায় মানুষের পক্ষে যাহা করা স্বাভাবিক, সকলই করিতেছে। তবুও সংসারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে তাহার বাধিতেছে কেন? কেন মনে হয় যে, সংসার তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা? তাহার সত্তা ও বাস্তবতার মাঝে যেন সূক্ষ্ম একটি পর্দার অন্তরাল? পর্দার অন্তরাল ঘুচাইয়া দিবার সাহস তাহার নাই। কে যেন তাহাকে অবিরাম নিষেধ জানায়।

বলে—বাস্, আর আগাইও না। গণ্ডির বাহিরে গেলেই তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তোমার মায়ের গিয়াছে, বাপের গিয়াছে, ছোট্ট সণ্টু, শিশু রাণু—কেহই থাকিবার অধিকার পায় নাই। অধিকারের বাহিরে পদক্ষেপ করিলে তোমাকেও সরাইয়া দেওয়া হইবে।

নিজেকে সে ভালবাসে, ভালবাসে সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিসকে। তাই অজ্ঞাত শক্তির এই নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইয়া সে আপনার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিতে চাহে না। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের এক কোণে বসিয়া যাহা সে দেখিতে পাইতেছে তাহাতেই সে খুশি—নাইবা অভিনেত্রী সাজিল সে, নাইবা পাইল করতালি!

অন্ধকারে নিজেকে অবলুপ্ত করিয়াই বসিয়া ছিল সে। কিন্তু বাদ সাধিল তাহার রূপে, আর বাধ সাধিল তাহার গুণ।

মামা হাসিয়া বলিলেন, খুকী স্কলারশিপ পেয়েছিস রে! তোর স্কুলের সেক্রেটারি এইমাত্র এসে খবর দিয়ে গেল।

খুকী, ছোট শিশুর মতই মামার পিঠে মুখ লুকাইল।

মামা হাসিয়া বলিলেন, পাগলী মা আমার!

বড় মামী ননদের নামে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পাড়া-পড়শী বলিল, সাবাস!

ছোট মামীর কিন্তু গন্ধে রুচি নাই। রঙের উপরই তাঁহার নজর। বলিলেন, সবটাতেই বেশি বেশি এ বাড়ির। পাস দিয়া জলপানি যেন আর কেউ পায় না! আর পড়াশুনা করিয়া কিই বা হয়! মেয়ে তো জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হইবে না! শুধু শুধু যৌবনের অপচয়!

ছোট মামীর বিদ্যা শিশুবোধ পর্যন্ত। তাহা ছাড়া, অন্য একটি কারণেও ছোট মামী চটিয়া আছেন।

নিজের ভাইয়ের সঙ্গে তিনি ভাগিনেয়ীর সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল প্রত্যাখ্যানই করেন নাই, ভাইয়ের স্বভাব-চরিত্রের উপর কটাক্ষও নাকি করিয়াছিলেন!

তিনিও অবশ্য ছাড়েন নাই। স্বামীকে একান্তে পাইয়া দশ কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। তাহার ভাই তো আর হাঘরের ছেলে নয়!

বাপের পয়সা আছে, আমোদ-স্ফূর্তি করিবে বইকি! কিন্তু স্বভাব-চরিত্রের কথা ইহার মধ্যে আসে কোথা হইতে! বাপ-মা-মরা মেয়ে—একটা সঙ্গতি হইত, নতুবা তাহার ভাইয়ের কি আর কনে জুটিবে না, না কি! ঐ যে বলে না—

যদি থাকে মোহন বাঁশী
রাধা হেন কত মিলবে দাসী!

কি হইবে লেখাপড়া করিয়া! আজকালকার মেয়ে, ওদের কি আর বিশ্বাস আছে! ধিঙ্গীর মত ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন কি করিয়া বসিবে! তখন তো লোকে মামা-মামীকেই দোষ দিবে!

কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। ধিঙ্গীর মত সত্যসত্যই সে ঘুরিয়া বেড়ায়। বি. এ. পড়িতেছে। আজ সভা, কাল জলসা—নিত্য একটা না একটা কিছু লাগিয়াই আছে। ইন্ধন যোগান বড় মামা।

রূপের শিখা পতঙ্গেরও ভিড় জমাইয়াছে। স্তাবকের দল রাতদিন চারিপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। বাড়ি পর্যন্তও কেহ কেহ ধাওয়া করে।

কিন্তু পতঙ্গের দল হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। দীপ্তির পিছনে দাহিকা নাই। হীরকের দ্যুতি। চোখ ঝলসাইয়া যায়, কিন্তু ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুড়িয়া মরা যায় না। প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

ভাষাহীন ওই চোখ দুইটির অতল তলের নিশানা কেহই পায় না। পায় না বলিয়াই সখেদে পিছাইয়া পড়ে।

আলোকও সেই গভীরতা ভেদ করিতে পারে নাই। তবুও প্রমিথিয়ুসের অটলতা লইয়া সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ডাইনীর শাপে রাজকন্যা পাথর বনিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই পাথরের বুকে জীবনের স্পন্দন আলোক তাহার শিরা-উপশিরা দিয়া অনুভব করিয়াছে। ডাইনীর জাদু ব্যর্থ করিতেই হইবে। তাই সে তপস্যা করিতেছে। শুভ মুহূর্তটি আসিলেই, জীয়ন-কাঠি ছোঁয়াইয়া পাথরে সে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। ওই গহন-গভীর দৃষ্টি সেদিন হয়তো সাদরে তাহাকে আমন্ত্রণ জানাইবে।

ডাইনী কিন্তু বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াই চলে। ছোট মামীও একটি

মূর্তিমতী বিঘ্ন। এমন হৈ-হল্লোড় লাগাইয়াছেন যে, আলোকের কমলকলি কুঁকড়াইয়া যাইতেছে। বড় মামার স্নেহ-ছায়া না পাইলে সে হয়তো এতদিনে শুকাইয়া যাইত। পাতার আড়াল খোঁজে কমল। ভয় বা লজ্জা তাহার নাই। কিন্তু আলোড়ন সে সহ্য করিতে পারে না; বিশেষত সে আলোড়ন যদি তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া জাগিয়া উঠে।

ঠিক একই কারণে ঘরের কোণে আশ্রয় লইতেও সে পারে না। বড় মামা, ভাই, বোন—সকলেই ব্যস্ত হইয়া প'ড়িবে। প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। ছোট মামী মন-গড়া একটা কিছু ভাবিয়া লইয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিবেন। ছোট মামীর ভাই মনীশের অতিরিক্ত মনোযোগের চোটে সে বিব্রত হইয়া পড়িবে।

কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীর দল তাহাকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিবে। অনুযোগ আর অভিযোগের অন্ত থাকিবে না। আলোড়ন এড়াইতে গিয়া বৃহত্তর আলোড়ন সে সৃষ্টি করিবে।

তাহার চাইতে রুটিন-মাফিক চলাটাই অপেক্ষাকৃত সহজ। যাহা করিবার, নীরবে ও নিপুণভাবে সে করে, অপরিহার্য জানে বলিয়াই এড়াইতে চাহে না।

হৈ-চৈ না বাধাইয়া কাহাকেও যদি বিবাহ করা যাইত, আত্মগোপনের আগ্রহে সে হয়তো তাহাই করিত। ওই মনীশকে বিবাহ করিতেও দ্বিধা করিত না। কিন্তু তাহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইতে সে বুঝিয়াছে যে, বিবাহের দাবিও আত্মগোপনের অন্তরায়।

কপি-হোল্ডারের কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠিলাম।

কপি চাই।

এই নিন, তিন স্লিপ। বাকিটা পরে পাঠাচ্ছি।

এতক্ষণে মাত্র তিন স্লিপ লিখিয়াছি!

কপি-হোল্ডার চলিয়া গেলেন। আমিও লিখিতে বসিলাম।

মার্চ, ১৯৫০।

শিয়ালদহ স্টেশন। প্ল্যাটফরমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। নেশার ঘোরে নয়, পেশার দায়ে।

পূর্ববঙ্গ হইতে গৃহহারা, সর্বহারা নরনারী—দলে দলে আসিয়া ভিড় জমাইতেছে এখানে। তাহাদের মর্মন্তুদ বেদনার কাহিনী সংগ্রহ করি, সাজাইয়া গুছাইয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাহা প্রতিদিন পাঠকদের পরিবেশন করি। যে সব কথা শুনিলে মরমে মরিয়া যাইতে হয়, তাহাও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বর্ণনা করি।

সকলে বাহবা দেয়। মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠি।

বাস্তব সাহিত্য।

মানুষের লজ্জার কথা, মানব-সমাজের কলঙ্কের কথা। কিন্তু অন্তর কি সত্যই বেদনায় টনটন করিয়া উঠে?

করে না।

করিলে পাগল হইয়া যাইতাম। আঘাতে আঘাতে হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে। ধৈর্যচ্যুতি তাই ঘটে না। যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যাই।

হৃদয় অবসর গ্রহণ করিলেও মগজ কিন্তু পরিত্রাণ দেয় না। ইঁহাদের দেখি আর ভাবি, কি করিতে কি হইল!

সাম্প্রদায়িকতাকে তফাতে রাখিবার জন্য পাকিস্তান মানিয়া লইলাম। নিরাপদ হইবার আগ্রহে দ্বি-জাতিত্ব স্বীকার করিয়া লইলাম; সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া জাঁকিয়া বসিল। দূরে বসিয়া ক্রমাগতই সে ভেংচি কাটিতে লাগিল। ঘরে-বাহিরে জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

পরকে আপন করিতে পারিলাম না, লাভের মধ্যে আপনও পর হইয়া গেল।

এ এক বিড়ম্বনা।

খুলনার গাড়ি আসিল।

আর এক দল সর্বহারা নরনারী।

গেটের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন একটি ভদ্রলোক। তাহার কোলে বছর দুইয়ের একটি শিশু। পিছনে অর্ধাবগুণ্ঠিতা একটি মহিলা।

প্রতিনিধির দল তাঁহাদের ছাঁকিয়া ধরিল।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, পুলিসের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

সংবাদ চাই।

টাটকা ও খাঁটি সংবাদ।

ভিড়ের পিছনে আমিও গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, ভদ্রলোক কাতরভাবে অনুনয় করিতেছেন। শারীরিক অপটুতা, ক্রোড়ের শিশুর দোহাই পাড়িতেছেন।

কিন্তু সে কথা কে শুনিবে? খাস বাগেরহাট হইতে আসিতেছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা। সত্যভাষী। বিবৃতি একটা চাই-ই।

ভদ্রলোক হাল ছাড়িয়া দিলেন। ভদ্রমহিলা এবারে মুখ খুলিলেন। সম্মুখের স্বেচ্ছাসেবকটিকে কি যেন বলিলেন। সে ঘাড় নাড়িল।

সকলে পথ করিয়া দিল। একজন পুলিস-অফিসারের পিছনে পিছনে তাঁহারা ওয়েটিং-রুমের দিকে চলিলেন। অতি-উৎসাহী দুই-একজন সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ঘরে ঢুকিবার আগে ভদ্রমহিলা একবার বাহিরের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার মুখখানি দেখিতে পাইলাম।

চিনিলাম।

কমলকলি। ১৯৪২এ দেখিয়াছি, ১৯৪৮এ দেখিয়াছি, ১৯৫০এর মার্চে আবার দেখিলাম। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপে সে দেখা দিতেছে, কিন্তু প্রতিবারই চিনিতেছি।

অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি হইল না। একটা প্যাকিং-বাক্সের উপর বসিয়া পড়িলাম।

কমলকলি!

কিন্তু এখানে এ ভাবে কেন? হয়তো আলোক তাহাকে জয় করিয়াছে। তাই আলোককেই সে জীবনের সঙ্গী করিয়া লইয়াছে। কমলকলি মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই, কিন্তু আলোক তো জানে কি সে চায়। তাই শহরে তাহারা ঘর বাঁধিল না। সুদূর গ্রামে গিয়া নীড় রচনা করিল। ছোট গ্রামখানি ভৈরবের তীরে।

শিক্ষক আর শিক্ষিকা।

বশিষ্ঠ আর অরুন্ধতী। শান্ত, সৌম্য, নিরুদ্বিগ্ন জীবন।

কমলকলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

আসে খোকা। বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া সে দেখে তাহার শিশুকে। জীবন-মৃত্যুর রহস্ত যেন ধরা দেয় তার চোখে। গহন গভীর দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া আসে।

সৃষ্টির অন্তই জীবন। সৃষ্টিই সত্য—সত্যই সুন্দর।

সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া যায় বাস্তবের রূঢ় আঘাতে। হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার আর অপমান। বেড়া আগুন আগাইয়া আসে কাছে—আরও কাছে। সৃষ্টি ও ধ্বংস। ধ্বংসই সত্য—মৃত্যুই সুন্দর।

কমলকলি ভয় পায় না। চোখের দৃষ্টি কিন্তু আবার ঘোলাটে হইয়া উঠে।

আলোকও ভয় পায় নাই। তবু বলে, চল, যাই।

উদাসীনভাবে কমল বলে, কোথায়?

এই অন্ধকারের পরপারে।

কমলকলি হাসে। ম্লান, পাণ্ডুর সে হাসি। আঁধারকে এড়াইতে পারিলেই কি মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? সে জানে, তাহা যায় না।

অনুনয় করিয়া আলোক বলে, কিন্তু খোকা, আমাদের খোকা, আমাদের পরিচয়? মান-অপমান, জীবন-মৃত্যু, আদর্শ—সবার চেয়ে বড় আমাদের ওই খোকা। আমাদের জীবনের সাক্ষ্য, আমাদের সৃষ্টি।

বেশ, চল।

খোকাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে দুইজনে। দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা আর বেদনার মধ্য দিয়া আগাইয়া চলে তাহারা। খোকাকে অন্ধকারের বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে।

ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় বর্তমানের দুশ্চর তপস্যা।

আর একখানা ট্রেন আসিল। উঠিয়া পড়িলাম। সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে।

জুন, ১৯৫০।

রাত্রি প্রায় বারোটা। বেশ জোরে বৃষ্টি হইতেছে। লিখিতেছিলাম।

দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। এত রাতে, এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে কে আসিয়া উপস্থিত হইল?

হইল। দরজা খুলিয়া দেখিলাম, শঙ্কর ওরফে মহাপ্রভু। বুঝিলাম, অদৃষ্টে আজ অনেক দুঃখ আছে।

মহাপ্রভুকে ভয় করিবার কারণ ছিল। অকাজের বোঝা জুটাইয়া আনিতে তাহার জুড়ি কেহ নাই। আমার উপর ভক্তিটা কিছু বেশি, দৌরাত্ম্যটাও তাই মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়াইয়া যায়।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই। মহাপ্রভুর পাশের বাড়ির ভাড়াটিয়ার স্ত্রী মারা গিয়াছেন। সৎকার করিবার লোক মিলিতেছে না। সুতরাং—

বাক্যব্যয় করা বৃথা। বাহির হইয়া পড়িলাম।

ছোট্ট একখানি ঘর। যেমন অন্ধকার, তেমনই স্যাঁতসেঁতে। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্ন। বিছানার উপর শায়িত মৃতদেহটির পাশে বসিয়া আছে একটি যুবক। স্থির-দৃষ্টিতে সে মৃতার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অদূরে আর একখানি বিছানায় বছর দুয়েকের একটি শিশু অঘোরে ঘুমাইতেছে।

মৃতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম।

কমলকলি!

আলোকের তপস্যাকে ব্যর্থ করিয়া কমলকলি ঝরিয়া পড়িয়াছে।

মৃতার মুখের দিকে আমিও একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। সেই চিরপরিচিত বিষণ্ণতার লেশমাত্রও সেখানে নাই। টানা টানা চোখ দুইটি আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে।

তাহাকে লইয়া যে কাহিনী রচনা করিতেছিলাম, তাহা হয়তো সত্য, হয়তো মিথ্যা।

কিন্তু জীবনে আর যে তাহার দেখা পাইব না, তাহা নিশ্চিত।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলাম।

শিশুটি জাগিয়া উঠিয়াছে, হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে।

কমলকলি! এখনও সে আমার দিকে চাহিয়া আছে, হাসিতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

চিতা বহ্নিমান

পৌণে দু'শ বছরের দাসত্বের কারাগার-দ্বার
খুলে গেছে—এই কথা দশে মিলে ঘোষে বারংবার।
তবে কেন শতাব্দীর পুঞ্জীভূত পাপ
দুর্ভাগা দেশের শিরে হানে অভিশাপ?
তামসী রাত্রির ব্যথা বুকে ল'য়ে কাঁপে মধ্যদিন,
ঊষর মাটির বুকে তৃষা অন্তহীন,
অস্থিসার দেহ মাঝে কাঁদে বন্দী প্রাণ,
শ্মশানের বুকে আজো চিতা বহ্নিমান।
ত্যাগী আজ সাজে ভোগী, ভোগী নয় বৈরাগীর ভেক,
স্বার্থের হারেমে বন্দী মানুষের বিচার, বিবেক।
সেবার মুখোশ প'রে যে যাহার কোলে ঝোল টানে,
আকাশ অতিষ্ঠ শুধু বাণী ও স্লোগানে।

মুষ্টিমেয় মানবের সর্বগ্রাসী লোভ
তিলে তিলে গণচিত্তে জাগায় বিক্ষোভ।
রক্ষা নাই আর—
ভেঙেছে শান্তির ঘুম কুম্ভকর্ণ গণদেবতার।
লোভে আর ক্ষোভে
দাঁড়ায়েছে মুখোমুখি সম্মুখ-আহবে;
চরম পরীক্ষা আজি—
বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাসে রণভেরী ওই ওঠে বাজি'।
লোভ যদি হয় জয়ী এ কথা নির্ভুল,
ধরাপৃষ্ঠ হ'তে হবে মানুষ নির্মূল।
কিন্তু এ কখনো নয় বিধির বাসনা—
মহাকাল যুগে যুগে করেছে ঘোষণা।
বঞ্চিত রামের বাণে মরিয়াছে তস্কর রাবণ,
লাঞ্ছিত কৃষ্ণের হাতে অত্যাচারী কংসের নিধন;
বঞ্চকেরে খুশী ক'রে অট্টহাসি হাসে শয়তান,
বঞ্চিতেরে বুকে তুলে আপনি কাঁদেন ভগবান।

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

ফরাসী-শিক্ষক

ঘুঁমিয়ে, বঁ হ্যুই!—শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে পথে নামল অনীতা। মনে একটু আত্মপ্রসাদ হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে। তারা মাত্র তিন মাস কয়েকটি বন্ধু মিলে ফরাসী ভাষা শিখছে। একমাত্র অনাতার উচ্চারণ নিভুর্ল হয়ে গেছে। শিক্ষক প্রতাপ গুইন এজন্য ছাত্রীর উপর প্রসন্ন।

প্রতাপ গুঁই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বাসিন্দা। পরিবারটি বিবাহের দিক থেকে বহু ব্যতিক্রম করেছে। ফলে, বাঙালী পরিবার তো দূরের কথা, ভারতবর্ষীয় পরিবারও বলা চলে না গুঁই-বাড়ির লোকেদের। প্রতাপ গুঁইয়ের বাবা বিয়ে করেন ফরাসী মহিলাকে বিদেশে ছাত্রাবস্থায়। প্রতাপের বিবাহ হয়েছে নাম-করা বাঙালী অভিজাত-পরিবারে। প্রতাপের বোন বিবাহ করেছে পাঞ্জাবী। প্রতাপের তিন ছেলের একজন ইংরেজ মহিলা, একজন বেহারী-দুহিতার পাণিগ্রহণ করেছে। তৃতীয় ছেলে সম্প্রতি আমেরিকায় আছে, শোনা যাচ্ছে, মার্কিন তরুণীর সঙ্গে সে বাগ্‌দত্ত। প্রতাপের কাকা-কাজিন এঁদের বৈবাহিক-তালিকাও বিচিত্র।

মোটের ওপর সমস্ত বাড়িতে একটা খাপছাড়া বৈদেশিক আবহাওয়া। সঙ্গে মিশেছে কলকাতা-প্রবাসীর দেশী সুর। বসবার ঘরে পিয়ানোর টুংটাং ভেসে আসে, আবার দেখা যায়—উড়ে চাকর নেহাৎ বাঙালী-বাড়ির মত র‍্যাশনের থলে ও মাছের চুপড়ি হাতে সদর-দোর দিয়ে বাড়ি ঢুকছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পড়ে ফিরিঙ্গী স্কুলে। বয়স্কেরা পরস্পরের সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু দুর্গাষষ্ঠীর দিনে নূতন কাপড় চাই।

প্রতাপ গুঁইয়ের চলতি নাম পর্‌তাপা গুইন। বিদেশিনী জননীর মুখের বিকৃত উচ্চারণের 'পর্‌তাপা' অন্তরঙ্গ-মহলে চ'লে আসছে।

পিতা ফরাসী মহিলা বিবাহের পরে কিছুদিন ফ্রান্সে বসবাস করেছিলেন। প্রতাপের জন্ম সেখানে। তারপরে মাতৃকুলের সূত্র ধ'রে প্রতাপ বহুবার যাতায়াত করেন। ফরাসী ভাষায় দক্ষতা তাঁর ফরাসী জাতির চেয়ে বেশি। মনে-প্রাণে তাঁর ফরাসী দেশ শিকড় গেড়েছে, সুরা ও সুগন্ধির বেসাতি নিয়ে। শ্যামল বাংলা দূরেই স'রে আছে।

মিঃ গুইনের বয়স পঞ্চাশ হবে। দীর্ঘ দেহ, বিরাট চেহারা। সর্বদা যেন ভাবে আছেন। হাতের কাছাকাছি ফরাসী ভাষার বাছা বাছা মণিমুক্তা থাকে। মিঃ গুইন ফরাসী ভাষায় মহাপণ্ডিত। ভাষার শিক্ষাদান ক'রে তাঁর জীবিকানির্বাহ হয়।

অনীতা ও তার তিনটি বন্ধু ফরাসী ভাষা শিখতে মনস্থ করেছে। বি. এ. পড়ে তারা কলেজে একসঙ্গে। ইচ্ছা—এম. এ.তে বাংলা বা কমার্সের সঙ্গে ফরাসী পেপার নেবে। তা ছাড়া বিদেশভ্রমণের ইচ্ছা আছে। কণ্টিনেণ্টে তো ফরাসী ভিন্ন গতি নেই। ভাষাটাও ভারি মিষ্টি, সাহিত্যিক মূল্য আছে। এমনি শিখে রাখা ভাল।

ইভার কাকা মিঃ গুইনকে ঠিক ক'রে দিলেন। একসঙ্গে চারজন মেয়ে সপ্তাহে তিন দিন তাঁর বাড়ি যেয়ে প'ড়ে আসত। একসঙ্গে টাকা দেওয়াতে প্রত্যেকের কম অর্থব্যয় করতে হ'ত।

অনীতা কুন্দ মীরা ইভা—কজনের মধ্যে পড়াশুনায় ভাল অনীতা। মাথা ভাল, উৎসাহ যথেষ্ট। যে যার বাড়ি থেকে রওনা হয়ে ফরাসী-শিক্ষকের বাড়ি পৌছয়। অনীতা উপস্থিত হয় নিয়মিত, বাড়ির কাজও সে ঠিকমত ক'রে নিয়ে যায়। তিন মাসে ভাষাটিও শিখে ফেলেছে সে যথেষ্ট।

মেঘলা হয়ে আছে, টিপিটিপি বৃষ্টিও পড়ছে। তাই অন্যেরা কেউ আসে নি। বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে পথে নেমে চলতে আরম্ভ করল অনীতা। বিকেল সাতটায় মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে। মিঃ গুইন গাড়ি ডেকে দিতে অথবা নিজে পৌছে দিতে পীড়াপীড়ি করছিলেন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে অনীতা। একা চলা-ফেরার অভ্যাস সে করেছে। কারণ, বিদেশে বিদ্যার্জনের জন্য যাবে সে। ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ আর যেই রাখুক, অনীতা রায় রাখবে না।

বিদ্যা একটা সাধনা। কুন্দ, মীরা, ইভা বোঝে কই? এক দিন আসে তো দশ দিন আসে না। এমন করলে কি ফরাসী ভাষা শেখা যায়? আসলে, ওদের হুজুগ একটা, অনীতার দেখাদেখি ওরা এসেছে। কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেবে নিশ্চয়। এই তো আজ

ক্রিয়াপদ সম্পর্কে এতগুলো তথ্য ওদের জানা হ'ল না। মিঃ গুইনকে সে বলেছিল, আজ এ কথাগুলো না ব'লে ওদের জন্তে রেখে দিতে। তিনি কিছুতে রাজি হলেন না। বললেন, ওরা তো অর্ধেক দিন আসে না। তুমি কেন ওদের জন্তে পিছিয়ে থাকবে? আমার কাজ তোমাকে ভাল ক'রে ভাষাটা শেখানো। তা হ'লে বুঝব, অন্তত একটা মেয়েও আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে মানুষ হয়েছে।

ইংরেজীর সঙ্গে ফরাসী মিশিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন প্রতাপ গুঁই। আগাগোড়া ফরাসী এখনও অনীতা বোঝে না! তবু মিঃ গুঁই যতদূর সম্ভব তাকে দিয়ে ফরাসী বলাবার চেষ্টা করেন, নিজেও বলেন। বাংলা দু-একটা ভাঙা-ভাঙা কথা ছাড়া ওঁর মুখে শোনে নি অনীতা। আশ্চর্য! এবারে একটানা তিন বছর তো স্বদেশে আছেন, তবু স্বদেশী হতে পারলেন না উনি!

পা টিপে টিপে অনীতা পথ চ'লে বাড়ি পৌঁছল। নাঃ, সে হবে অন্য রকম। বিদেশে গেলেও বিদেশী হবে না ও। পরের দিন আবার ফরাসী ক্লাস আছে। ওদের কাল কলেজে জানিয়ে দিতে হবে।

What's that, মীরা?—মিঃ গুঁই গর্জন ক'রে উঠলেন, ঠিক ক'রে পড়। বল 'ল ফ্রুই'। কতবার বলেছি না, No consonant at the end of a word is pronounced, except C F L R. And they are pronounced when at the end of a monosyllabic word—যেমন 'ল ফার'।

কুন্দ ফিসফিস ক'রে বললে, ফার কি বাবা? ভুলে গেছি, ইংরেজী fur নাকি?

দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ গুইনের কানে কথাটা গেল। তিনি বললেন, ঠিক! তিন মাস পরে ফার কি? জান না লোহার ফরাসী শব্দ, f-e-r? জানবে কি ক'রে? কখনও আস না তো নিয়মিত। একে কি ভাষা শেখা বলে? দেখ না অনীতাকে। তোমরা কথার মানে জান না এখনও। অনীতা কেমন অনুবাদ করছে।

মীরা ইভাকে ঠেলা দিলে অলক্ষিতে—আবার আরম্ভ হ'ল।

ইভা Otto-onionএর ফরাসী ব্যাকরণখানা মুখে চাপা দিয়ে হাসি চাপতে গেল। বইখানা ঝট্ ক'রে হাত থেকে খ'সে মেঝের ম্যাটিঙের ওপর পড়ল।

শব্দ শুনে মিঃ গুইন ফিরে তাকালেন মনের মত প্রসঙ্গে বাধা পেয়ে। কটমট্ ক'রে তাকালেন একবার। কিন্তু, মনে-প্রাণে ফরাসী তো! তখনই নীচু হয়ে বইখানি তুলে ছাত্রীর হাতে দিলেন। ইভা ভয়ে ভয়ে বললে, মের্‌সি।

মিঃ গুইন খুশি হয়ে উঠলেন, হ্যাঁ, যতটুকু পার ফরাসীতে বলবার চেষ্টা কর। নইলে শিখবে কি ক'রে? একটা ভাষা একটা দেশের প্রাণ। সেই দেশের সঙ্গে মনে-প্রাণে না মিশলে কি ক'রে হয়? আমি যখন ফ্রান্সে থাকি, ভুলেই যাই আমি বাঙালী। এমন-কি, ইংরেজী ভাষাটাও ত্যাগ ক'রে ফেলি। কথা তো বলিই, চিন্তাও ক'রি ফরাসীতে। তবে তো শিখেছি। আমি চাই, তোমরাও তাই শিখবে। অনীতা পারবে।

কুন্দ হেসে ফেলল। মিঃ গুইন কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলেন. কাভে ভূ? (কি হ'ল?)

Nothing Sir, কিছু না।

ইভার বই একবার প'ড়ে গিয়েছিল, তাই মিঃ গুইন অন্যমনস্কভাবে বললেন, "Ayez soin vos livres? (তোমার বইয়ের কি হ'ল?)

অনীতা ছাড়া কথাটা কেউ বুঝল না। এত ভালমানুষকে নিয়ে ওরা কেন অনীতাকে ক্ষ্যাপায়? বাবার বয়সী লোক, তায় গুরু। অনীতা ঠিকমত আসে, পড়া করে। তাই তো তিনি একটু স্নেহ করেন অনীতাকে। তাই নিয়ে বিশ্রী কথা বলে ওরা, হাসাহাসি করে, জ্বালাতন ক'রে মারে। মিঃ গুইন কিছু বুঝতে পারেন না।

অনীতা ভাষার প্রাণ ধরতে পেরেছে। দেখ না ওর উচ্চারণের কৌশল।

আজকের তা হ'লে পড়া কি অনীতা-প্রসঙ্গ?—মীরা খোঁচা দিলে চুপিচুপি।

মুখ লাল ক'রে মাথা নামিয়ে অনীতা ব'সে রইল। সৌভাগ্যক্রমে

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিঃ শুইন থামলেন, Quelle heure est-il? (কটা বেজেছে? হে ভগবান্!) Mon dieu! লেখ সকলে, বলছি আমি।

প্রত্যেকে দুরুদুরু বক্ষে খাতা-কলম নিয়ে প্রস্তুত হ'ল। খাঁটি ফরাসী উচ্চারণে একগাদা শব্দ ব'লে যাবেন শিক্ষক। এক অনীতা ছাড়া কেউ পাঁচটির বেশি ঠিক লিখতে পারবে না। তারপরে, তাই নিয়ে অনীতার সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনার লাঞ্ছনা আছে।

অনীতা, নাভে ভু পঁৎ দাঁকার? (তোমার কালি নেই?)—নিজের দামী কলমটা অনীতার হাতে তুলে দিলেন তিনি ওর কলমে কালি নেই দেখে।

বাকি তিন বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

প্রতাপ শুঁইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইভা বললে, চল না, এক কাপ কফি খেয়ে যাই। যে বকুনি আজ শুইন সাহেব দিয়েছেন! কফি ছাড়া হজম হবে না।

পাশে কফি-হাউস। চার বন্ধু চেয়ার টেনে বসল। অনীতার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কফির পেয়ালায় কি প্রসঙ্গ উঠবে, সে তা জানে।

কুটকুট ক'রে বাদাম খেতে খেতে মীরা বললে, আর পারা যায় না। ফ্রেঞ্চ শেখবার সাধ ছুটে গেল। হুড়হুড় ক'রে খালি ফ্রেঞ্চ ভাষা বলেন। আমরা যে কিছু জানি না, তাতে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। ওঁর অনীতা বুঝলেই হ'ল। অনীতা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, কই, না! বেশি কথা তো ইংরেজীতেই বলেন মিঃ শুঁই! ফ্রেঞ্চ আর কতটুকু?

কুন্দ ইভাকে ধাক্কা দিলে—দেখছিস, লেগেছে শ্রীমতীর, শুইন সাহেবকে সমর্থন করছে।

ধাক্কা লেগে ইভার কাপের কফি উছলে তার স্কাই-ব্লু শাড়ি চিহ্নিত ক'রে ফেলেছিল, তাই সে বিরক্ত হয়ে বললে, কেন করবে না শুনি? মিঃ শুঁই যেমন 'অনীতা' 'অনীতা' করেন, তার অর্ধেক তোকে করলে তুই তো ওঁর কুকুর হতিস কুন্দ

কুন্দ চ'টে গেল—দরকার নেই আমায়। বাপের বয়সী বুড়ো হাঁ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে আছে, হ্যাংলার মত ছেলেমি ক'রে মরছে। গা জ্ব'লে যায় দেখলে। গঙ্গাপানে পা, সাধ যায় না।

মীরা গলা নামিয়ে বললে, মনে-প্রাণে উনি ফরাসী কিনা। চুল পাকলেও প্রাণ তো সবুজ। সত্তর বয়স হ'লেও সতেরো চাই। তাই আমাদের অনীতাকে মনে ধরেছে বুড়োর। নেহাত জাঁহাবাজ বউ বেঁচে আছে, নইলে বৃদ্ধস্য তরুণী-ভার্যা হয়ে যেত অনীতা।

ছিঃ ছিঃ, কি বলছ? উনি না আমাদের মাস্টারমশাই? আর কত বড় বয়সে!

আহা, অনীতা, নিদয়া হ'স না।—ইতা কুন্দকে চটিয়ে দিয়ে অপ্রতিভ হয়েছিল। এখন কুন্দর মান রেখে বললে, তা, কুন্দ ঠিক বলেছে। অনীতা ব'লে সহ্য করে। আমার তো বুড়ো বয়সের খেড়ে রোগ দেখলেই রাগ ধরে।

কুন্দ খুশি হয়ে উঠল, বললে, যেন খোকা! যতটুকু সময় অনীতার প্রশংসা না করেন, ততটুকু সময় নিজের ব্যাখ্যান! এই করেছি ফ্রান্সে, এই নাচে গেলাম, ওই মহিলা এই কথা বললেন। এসব কথা প্রচার করবার উদ্দেশ্য যে, আমাকে তোমরা বুড়ো ভেবে অবহেলা ক'রো না। আমার বহু অভিজ্ঞতা আছে, রস আছে।

ইতা বললে, এক-একদিন দুপুরবেলায়ও ড্রিঙ্ক্ ক'রে ব'সে থাকেন। চোখ লাল, গায়ে কি গন্ধ, বাবা! লজ্জাও করে না, বাঙালীর ছেলে হয়ে ফরাসী সাজতে! মা ফরাসী হ'লেও বাবা তো বাঙালী। চিপটেন কেটে তো এ ধারে আমাদের মতই খাস বাঙালী-চালে থাকেন। পয়সা জুটলে তো। এই তো কটি ছাত্র-ছাত্রী! পড়ানোর টাকাটা সম্বল। যৌথ পরিবার না হ'লে বিপদে পড়তেন। তবু সাজের ঘটা কি, বাটন-হোলের ফুলটি চাই।

মীরা ব'লে উঠল, মনে-প্রাণে ফরাসী কিনা। দ্রাক্ষার রস চাই। আর চাই নারী। স্বভাব তো ভাল ব'লে মনে হয় না। অত মদ খাওয়া, সাজগোজ আর এসেন্সের ঘটা!

অনীতার দিকে কেমন ভাবে চেয়ে থাকেন, দেখেছিস? পায়ে

তো গিলে খায়। মাঝে মাঝে আবার ওর মুখের দিকে চেয়ে পড়াতে ভুলে যায়। বুড়ো পাকা বদমাস। কি করব? ধরন-ধারণ দেখে আমার তো একদিনও শিখতে ইচ্ছে নেই। বাড়ি থেকে ছাড়ে না।—কুন্দ বললে। অবশেষে প্রতাপ গুঁইয়ের অসচ্চরিত্রতা তাঁর ছাত্রীদের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল, তাঁর শেখানো ভাষাটা নয়।

অনীতা হাত-ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, আমার পয়সাটা এই রইল। আমি চললাম। বাড়িতে কাজ আছে।—মিঃ গুইনের গুণ-কীর্তনের আসর থেকে অনীতা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল।

গালে হাত দিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে বসেছে অনীতা। পাশে ফরাসী ব্যাকরণ। আজকের পড়ানোটা আজই দেখে রাখলে পড়াটা ভাল তৈরি হবে। কিন্তু মনে তার আজ উৎসাহ নেই।

সত্যি, মিঃ গুইন ভাল লোক নয়? হ'লে ওরা অত যা-তা বলবে কেন বাবার বয়সী বুড়োর নামে? অনীতা বোকা, বুঝতে পারে না। ওরা তিনজন ঠিক ধ'রে ফেলেছে। কি হবে? কেন অনীতাকে এমন চোখে দেখলেন তিনি? অনীতা তো তাঁকে এত শ্রদ্ধা করত, কত মন দিয়ে দিয়ে ওঁর পড়া করত! মনে হ'ত, এত বড় পণ্ডিত উনি। ঠিক মূল্য কেউ দিতে পারছে না ওঁকে। কেমন মায়া হ'ত ওঁর ওপরে। কোথায় যেন একটা দুঃখ আছে ওঁর।

সমস্ত ফরাসী ভাষার ওপর কালো যবনিকা বিছিয়ে দিলে বন্ধুদের কথাবার্তাগুলো, বিরাটমূর্তি প্রতাপ গুঁইয়ের সাদা চুলে পর্যন্ত যে কালির ছিটে লেগে গেল। অনীতা ঠিক করলে মনে মনে, সে বিশেষ-ভাবে গুঁইকে লক্ষ্য ক'রে যাবে।

ঘরে ঢুকল দিদি মাধবী। এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে ধরাকে সরা দেখছেন। মুরুব্বী ভাব সবতাতে।

কি পড়া হচ্ছে? ওমা, ওই এক ফ্রেঞ্চ! পাগল হয়ে যাবি নাকি? ইংরিজীতে নিয়েছিস অনার্স, কোন সময় পড়তে দেখি না। নেশা লেগেছে তোর ফরাসী ভাষায়। ভাগ্যিস, শিক্ষকটি বুড়ো! নইলে তো সন্দেহ হ'ত।

দিদির কথায় অনীতা আর সামলাতে পারলে না, ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে। এতক্ষণের সঞ্চিত গ্লানি সন্দেহ মূর্তি ধ'রে উঠল দিদির বাক্যবাণে।

মাধবী লজ্জিত হ'ল—ও কি, কাঁদছিস কেন? খুকী নাকি যে, ঠাট্টাটাও সইতে পারিস না!

বড়দিনের শেষ। কাল নূতন বছর। ফরাসী ভাষার পাঠ সেরে মেয়েরা মিঃ গুঁইয়ের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। কলেজ বন্ধ, বড়দিনের চাঞ্চল্য আকাশে বাতাসে। বসন্ত শীঘ্রই আসবে।

অনীতা একটু পিছিয়ে পড়ল। মিঃ গুইনকে বিলিতী প্রথায় নববর্ষ জানানো হয় নি। যা সাহেবী চাল ওঁর! ওঁর কাছে এটা অপরাধ ব'লেই প্রতিপন্ন হবে। সুতরাং প্রিয় ছাত্রী অনীতা পিছিয়ে প'ড়ে দরজায় দণ্ডায়মান প্রতাপ গুঁইকে জানাল আসন্ন বিলিতী নববর্ষের শুভ ইচ্ছা।

প্রতাপ গুইনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীর্ঘ পাদক্ষেপে এক নিমেষে লাফিয়ে অনীতার পাশে রাস্তায় চ'লে এলেন তিনি। সজোরে অনীতার হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, মেয়ার্সি, মেয়ার্সি মা শেয়ারি। হাত ধ'রে ব'লে চললেন তিনি, হ্যাঁ, কাল নতুন বছর আসছে। হ'লই বা বিদেশী, তবু তো জীবনের প্রকাশ। মন খুলে দিতে হয় সমস্ত উৎসবকে বরণ ক'রে নিতে। তোমার এ বোধ আছে দেখে, অনীতা, খুশি হলাম।

অস্বস্তিতে অনীতা ছটফট করতে লাগল। এত বড় মেয়ের হাতখানা চেপে ধ'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিঃ গুইনের উচ্ছ্বাস ভাল লাগল না তার। অন্য মেয়েরা এগিয়ে গেছে বটে, কিন্তু অনীতা আসছে না দেখে ফিরে তাকালেই সর্বনাশ! যা-তা বলবে।

ম'রিয়া হয়ে হাত ছিনিয়ে নিলে অনীতা, বললে, ওরা অপেক্ষা করছে, আমি যাই। ও রিভোয়া, মিঃ গুইন।

ও রিভোয়া, অনীতা।—মিঃ গুইন একটু আহত হলেন যেন।

অনীতা বন্ধুদের সঙ্গ নিল চিন্তিত মনে। না, আর মনকে চোখ

ঠেরে রাখা চলে না। তার প্রতি প্রতাপ গুঁইয়ের মনোযোগ যেন একটু বিশেষ ধরনের, যেন ছাত্রীর প্রতি স্বাভাবিক ও সমীচীন স্নেহের রূপ নয়, মাত্রা ছাড়িয়ে অনেক বেশি। এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ফরাসী-শিক্ষক। সব সময় তাকে লক্ষ্য করেন। দেখে দেখে যেন তৃপ্তি হয় না। সবাই ঠিক ধরেছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ ক'রে দেখল অনীতা সহজ আলোতে। মনে-প্রাণে ফরাসী মিঃ গুইন ফরাসী-সুলভ প্রণয়-ব্যপদেশে চান তাকে। অদ্ভুত লোক! এত বয়স, অথচ টিপ্‌টপ সাজটি চাই। নিস্পৃহ ব্যক্তি হ'লে অত সজ্জার প্রয়োজন হ'ত না। সুরাসক্ত ব্যক্তি, সুরার অন্য আনুষঙ্গিক দোষও আছে নিশ্চয়। ইভার কাকা ঠিক ক'রে দিয়েছেন, বিশেষ আলাপী তাঁর। ইভা তো সব থেকে বেশি নিন্দা করে। জানে ব'লেই করে।

নাঃ, আর ভাল লাগে না। এত উৎসাহের আনন্দের ভাষা শেখা ছাড়তেই হবে শেষে। কত আশা ছিল মনে, কত শ্রদ্ধা ছিল শিক্ষকের প্রতি! মিঃ গুইন সমস্ত নষ্ট ক'রে ফেলেছেন। আজ কি ভাবে হাতখানা ধরলেন অনীতার! কিছুতেই ছেড়ে দেন না। মুখ-চোখ কেমন যেন জ'লে উঠল! ছিঃ ছিঃ! যত কষ্টই হোক, দু-একদিনের মধ্যে ফরাসী শিক্ষা ছাড়বে অনীতা। কতদিন একা একা পড়তে হয়। মিঃ গুইনকে বিশ্বাস করা যায় না। একটা ছুতো নিয়ে কেমন হাতখানা ধরলেন আজ! ক্রমে তো বেড়ে উঠবেন। ফরাসী ছাড়তেই হবে অনীতাকে।

কেন, কেন? ফরাসী পড়বে না কেন তুমি? ভাল লাগে না, না, আমার পড়ানো পছন্দ হয় না?

আজও অনীতা একা। অন্য বন্ধুরা আসে নি কেউ। অত্যন্ত অস্বস্তি হয়ে অনীতা গোড়াতেই মিঃ গুইনকে জানালে, সে আর ফরাসী পড়বে না।

প্রতাপ গুইন ভেঙে পড়লেন যেন। অনীতাকে দেখে চোখ দুটো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছিল, নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কুঁকড়ে গেল বিরাট মূর্তি, মুখ-চোখে হতাশা ব্যথা ফুটে উঠল।

অনীতা বিপদে পড়ল। মিঃ গুইনের কাছে কোন কারণই ঠিকমত দর্শানো যাচ্ছে না। যা বলছে অনীতা, যুক্তিজালে খ'ণ্ডে ফেলছেন তিনি। বিরক্তি বোধ হ'ল অনীতার। পয়সা দিয়ে ভাষা শিখতে এসে মাথা বন্ধক দিয়েছে নাকি শিক্ষকের কাছে? বিব্রতভাবে অনীতা ব'লে উঠল, আমার বাড়ি বড় দূরে। ট্রাম-বাসের রাস্তা নয়। হেঁটে আসতে অসুবিধা হয়।

আমি তা হ'লে যাব তোমার বাড়িতে। তুমি কষ্ট ক'রে এসো না অনীতা। এত দূরে আসতে তোমার কষ্ট হয়, এ কথা আগে বললেই হ'ত।—যেন এ বিষয়ে চরম নিষ্পত্তি ক'রে ফেলেছেন এই ভাবে মিঃ গুইন নিরস্ত হলেন। নিজের বাড়িতে গেলে গুইন আর কি করবে? অনেক লোক থাকবে। প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু অনীতার তরুণ মন বিতৃষ্ণায় ভ'রে উঠেছে বৃদ্ধের কাঙালপনায়। এ অঙ্কে যবনিকা-পতনই ভাল। আর মিঃ গুইনের কাছে পড়ায় মন বসবে না অনীতার। জন্মের মত গেছে অনীতার উৎসাহ। তা ছাড়া সে তো মা-বাবার একা সন্তান নয়, মিঃ গুইন সত্তর টাকার কমে বাড়ি গিয়ে পড়ান না, অনীতা জানে। তার পক্ষে অত টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। উপায়ান্তর না দেখে অনীতা ব'লে দিলে, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কেন?

আমি অত টাকা খরচ করতে পারি না।

মিঃ গুইন হঠাৎ বাংলায় ব'লে উঠলেন, তুমি—তুমি আমাকে টাকা দিতে পার না বলছ? আমাকে তুমি টাকা দেবে?

বাংলা মিঃ গুইনের মুখে শুনে অনীতার প্রাণ উড়ে গেল। স্থির দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন মুখের দিকে। ঘরের আবহাওয়া কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অনীতা দরজার দিকে তাকাতে লাগল ঘন ঘন। ভগবান ওকে রক্ষা করুন। মিঃ গুইন যেন কেমন করছেন!

অনীতা তাড়াতাড়ি বললে, না, আপনার কাছে টাকার প্রশ্ন ওঠে না মিঃ গুইন। তবে বাবা বিনা পয়সায় শিখতে দেবেন না। তাই শেখা হবে না। আমি যাচ্ছি এখন।—দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

মিঃ গুইনের বিরাট দেহ দরজা আড়াল ক'রে দাঁড়াল।—যেও না অনীতা, শোন একটা কথা। কাকেও বলি নি এতদিন।

অনীতার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। মিঃ গুইন যে আর প্রকৃতিস্থ নেই, সে কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কেন ওদের কথা মন দিয়ে শুনে আগেই পড়া ছেড়ে দিই নি? এ বিপদে পড়তে হ'ত না তা হ'লে। এখন কি করা যাবে? বাইরের ঘরে জনমানুষের সাড়া নেই বাড়ির। রাস্তার দরজাটা আগলে প্রতাপ গুঁই দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ লম্পটের হাত থেকে অনীতা আজ কি ক'রে মুক্তি পাবে?

ভাঙা ভাঙা বাংলায় থেমে থেমে প্রতাপ গুঁই ব'লে চললেন, শোন অনীতা। আমাকে তোমার টাকা দেবার প্রশ্ন ওঠে না। সকলে মিলে দিতে, তাই এতদিন নিয়েছি, কে কি মনে করবে ভেবে। কিন্তু তোমার টাকাটা আমি খরচ করি নি, আলাদা ক'রে রেখেছি। তোমাকে একদিন ফিরিয়ে দেব ব'লে। আমার একটিমাত্র মেয়ে ছিল, বেঁচে থাকলে সে তোমার বয়সী হ'ত। ফ্রান্সে মারা গেছে। ফরাসী দেশ, ফরাসী ভাষা সে ভালবাসত বড়। ঠাকুরমায়ের দেশ তার। সে—সে ছিল তোমারই মত দেখতে, তোমারই মত উৎসাহে ভরা। তোমাকে দেখে তার কথা মনে আসে আমার। তাই মা, পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

শ্রীমতী বাণী রায়

—

দ্রষ্টব্য: ৬১৬-২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "দীনেন্দ্রকুমার রায়" প্রবন্ধে যথাস্থানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে। ১৯০০ সনে দীনেন্দ্রকুমার 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। সাংবাদিকের কাজ ছাড়া এই সময়ে তিনি উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বসুমতী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'নন্দন-কানন' নামে "উপন্যাস ও গল্প বিষয়ক মাসিক পত্রিকা"ও সম্পাদন করিতেন; উহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—ফাল্গুন ১৩০৭। এই সংখ্যায় সম্পাদকের রচনা ছাড়া হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জলধর সেন ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত গল্পও স্থান পাইয়াছে।

কখানা পুরানো রেকর্ড

সারানো হইয়া আসিয়াছে গ্রামোফোন,
খোকা-খুকীদের নাহিক বিশেষ কাজ,
বাজাইছে ব'সে—তাই ক'রে আয়োজন—
বহু পুরাতন রেকর্ড কখানা আজ।

সেই সে কণ্ঠ! সেই গান! সে আখর!
নিঙাড়ি নিঙাড়ি তেমনি যে মধু ঢালে,
অতীত শ্রোতায় কখন ভরেছে ঘর,
সব ফিরে আসে সুরের ইন্দ্রজালে।

সে আলো গন্ধ, সেই মুখ, সেই হাসি,
মুছে-যাওয়া ছবি ভুলে-যাওয়া সব কথা,
অতীত সুদিন সুমুখে দাঁড়াল আসি
ল'য়ে আনন্দমধুর চঞ্চলতা।

ঝরা ফুল সব দেখা দিল হয়ে কুঁড়ি
মনের যযাতি যৌবন ফিরে পায়,
ভগ্ন তমালে ঝুলনের রাঙা ডুরি
উজান বহাল জীবনের যমুনায়।

ভাল হ'ল বঁধু—এই সেই গান বটে
ভোরে দেওয়া হ'ত লাগিত বড়ই ভাল।
শুভ সে প্রভাত আনিল সংকটে
বহু বহুদিন হায় যা বহিয়া গেল।

হাসর এ গান? বহুৎ হেসেছি শুনে—
যে সকল যুঁই কখন গিয়াছে ঝরে,
রেখেছিল কে তা সাজিতে যতনে গুনে,
আজি হাসিমুখে সুমুখেতে দিল ধ'রে!

জীবনে অকাল-বসন্ত ফিরে আনে,
রঙিন মনের দিনগুলি রঙ-করা।
আসিয়া আবার চ'লে যায় কোন্‌খানে
দিয়া অলক্ত-চুয়া-চন্দন-ছড়া!

কখানা রেকর্ড, কালো কালো কটা চাকি
কালের চক্র ফিরায় এমন দ্রুত!
রেখেছে নিবিড় কত আনন্দ ঢাকি,
গত উৎসব-নিশি যেন ঘনীভূত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অ্যাঞ্জাইনা*

হে অঞ্জনা, এ কি খেলা খেলিছ কৌতুকে!
অকরুণ স্পর্শ তব সঞ্চারিয়া বুকে
করিয়া রেখেছ মোরে অস্থির চঞ্চল;
বুঝি না ছলনাময়ী, এ কি তব ছল!
সত্য যদি চাহ মোরে, নিবিড় বন্ধনে
বক্ষ মোর বাঁধো তুমি। সুতীব্র স্পন্দনে
সকল পরাণ মোর উঠুক কাঁপিয়া।
তার পর তীব্রতম বেদনায় হিয়া
বারেক শিহরি যাক শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে।
মর্মমাঝে মাঝে মাঝে শুধু র'য়ে র'য়ে
বাজুক করুণা-মাখা ও-পারের সুর—
নিকটে আসুক যাহা আছিল সুদূর।
হে অঞ্জনা, হে প্রেয়সি, নহ তুমি অরি,
শেষের সঙ্গিনী মোর আছ বক্ষ ভরি।

১ অক্টোবর ১৯৫০ শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

---

* অ্যাঞ্জাইনার আক্রমণে শয্যাশায়ী অবস্থায় রচিত

সংবাদ-সাহিত্য

কংগ্রেস

নাসিক কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। যাঁরা মনে করেছিলেন, এবারে সুরাট কংগ্রেসের মত একটা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হবে, তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। বরং অপর পক্ষ উল্লাস ক'রে বলেছেন, কংগ্রেসে এমনতর সংহ'ত আর কখনও দেখা যায় নি।

সংহতি খুব ভাল কথ, কিন্তু সময়বিশেষে সংহতিটাই যে সব চেয়ে বড় কথা, তা নয়। কারণ যদি মূল আদর্শ ঠিক থাকে, তা হ'লে যে কোনও জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে সংকট দেখা দেবে, তার মধ্যে বিচিত্র কিছু নেই। কংগ্রেসের ইতিহাসেই সে কথা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

সেই কারণে সংহতির জন্য যেমন আনন্দ প্রকাশ করি, সেই সঙ্গে একটা কথা তো অস্বীকার করতে পারি না যে. কংগ্রেসের অধিবেশন যতই সাফল্যমণ্ডিত হোক না কেন, তার মধ্যে যতই সংহতি দেখা যাক না কেন. দেশময় আজ একটা রব উঠেছে—কংগ্রেস তো ভেঙে গেল!

এ কথা অবশ্য সত্য যে, এই রবের যতটা আমাদের কানে আসছে, তার সবটাই সত্য নয়, খানিকটা আওয়াজ বাড়ানো ফাঁপানো। কংগ্রেস বর্তমানে যে পথ অবলম্বন ক'রে চলেছে. সেটা হ'ল দক্ষিণ-পন্থীদের চোখে যথেষ্ট বাম, অথচ বামপন্থীদের চোখে একেবারেই দক্ষিণ। এই মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করার জন্য সে কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারছে না। জমিদারি উচ্ছেদ হ'ল, কিন্তু বিনা ক্ষতিপূরণে নয়; কন্‌ট্রোল হ'ল, কিন্তু সুদৃঢ় ভাবে নয়; বৃহৎ শিল্পের উপর নানা রকম ট্যাক্স বসল, কিন্তু তা বেশি দিন রইল না; শিল্পের জাতীয়করণ এখানে-ওখানে একটু-আধটু শুরু হ'ল, কিন্তু এগোল না। এই জন্য কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। যে জমিদারের জমিদারি গেল, যে রাজার রাজগী গেল, যে ব্যবসাদারকে ট্যাক্সের পাল্লায় নাস্তানাবুদ হতে হ'ল, এঁরা সকলেই কংগ্রেসের উপর বিরূপ। কারণে অকারণে এঁরা বলতে কসুর করেন না, কংগ্রেস তো এইবার ভেঙে গেল। তেমনি অন্য দিকে আছেন বামপন্থীরা। তাঁরা বলবেন, ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারি উচ্ছেদ তো জমিদারি উচ্ছেদই নয়, কৃষকদের মুক্তির মূল্য

আবার কৃষকদের কাছ থেকেই আদায় করা? আয়-কর অনুসন্ধানের ব্যাপারে কেন রফা করা হ'ল? এ বিষয়ে কি কোনও রফা চলতে পারে? দুটো চারটে স্টেটবাস চালানোর নামই কি শিল্পের জাতীয়করণ? টাটা-বিড়লা-ডালমিয়াদের গায়ে হাত পড়ে না কেন? চোরাবাজারীদের অপরাধ সাব্যস্ত করবার জন্য সাক্ষী-সাবুদ প্রমাণপত্র আইন-আদালতের কি দরকার, তাদের ধ'রে ধ'রে সরাসরি গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে না কেন? তার কারণ তাঁদের মতে কংগ্রেস এখন দক্ষিণাবর্তে চলছে, তার কাছে আর কোন আশা নৈব নৈব চ। সুতরাং কংগ্রেসের ডাইনে বাঁয়ে এই যে অদ্ভুত রকম জুড়িগান শুরু হয়েছে, তারই প্রাণপণ আওয়াজটা দেশময় শোনা যাচ্ছে।

এ কথায় যে কিছুমাত্র সত্য নেই, এমন বলি না। সময় সময় দেখা যায়, কংগ্রেস-বিরোধী মঞ্চে দক্ষিণবাম ও বামবামের অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছে, যেমন ঘটেছিল যুক্তপ্রদেশে জমিদারি-বিলোপ-বিলের বিরোধিতায় অথবা কলকাতায় কংগ্রেস-সরকার-বিরোধী আন্দোলনে। যুক্তপ্রদেশের জমিদারেরাও বিলের বিরোধী, বামপন্থীরাও। যদিচ এক যুক্তিতে নয়, কিন্তু ফল দাঁড়াচ্ছে একই। কলকাতার বক্তৃতামঞ্চে কংগ্রেস-বিরোধিতায় উগ্র বামপন্থীরা হিন্দুমহাসভার নেতাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন, এ দৃশ্যও একাধিকবার দেখা গিয়াছে। সুতরাং যখন দেশময় একটা ধুয়ো শুনি যে, কংগ্রেস ভেঙে গেল তখন সে ধুয়োর সবটাই যে হিতৈষীদের আক্ষেপ অথবা নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি, এমন কথা বলতে পারি না।

কিন্তু ও-কথাটা যতই সত্য হোক সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণও নয়। কারণ কংগ্রেস ভেঙে গেল—এই কথাটা যে কেবলই হৃতস্বার্থ ব্যক্তিদের উল্লাস অথবা স্বার্থান্বেষী পলিটিক্যাল পার্টিদের কুচক্র, এমন কথা বলা চলে না। তা হ'লে যে সব লোক কংগ্রেস-সাধনায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন এমন লোকদের মুখেও আক্ষেপোক্তি শোনা যেত না, কংগ্রেস ভেঙে গেল। শুধু তাঁদের কথাই বা বলি কেন? দেশে কোটি কোটি লোক আছেন যাঁরা কখনই কংগ্রেসের সভ্য নন, কিন্তু তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন ক'রে এসেছেন, কংগ্রেস-আন্দোলনে সাহায্য করেছেন, কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। বাস্তবিক কংগ্রেসের

জোরই এইখানে। কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা যত, তার চেয়ে ঢের বেশি লোক তার কথা শুনেছে, সেই জন্তই দেশবিদেশে কংগ্রেসের এই অসামান্ত প্রতিষ্ঠা ঘটতে পেরেছিল। অ জ যখন সেই রকম লোকদের মুখেও একই কথা শোনা যাচ্ছে, তখন সে কথার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারি না। বেশি কথা কি, যখন কংগ্রেসের সবময় নেতা স্বয়ং পণ্ডিত নেহরুই আক্ষেপ ক'রে বলেন যে, কংগ্রেসকর্মীরা কংগ্রেসের আদর্শ ভুলতে বসেছে, তখন অন্তে পরে কা কথা!

কংগ্রেস সম্বন্ধে সেই জন্ত গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে। কাউকে কাউকে অবশ্ত বলতে শুনেছি যে, কংগ্রেস থাকল কি গেল সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হয় কংগ্রেসওয়ালারা মাথা ঘামাবেন, জনসাধারণের তার জন্ত মাথা ঘামাবার দরকার কি? এ কথা আমি মানি না, কারণ কথাটা সাধারণভাবে সত্য হ'লেও আমাদের পক্ষে সত্য নয়। যে সব দেশ রাষ্ট্রনীতিতে পাকা, গণতন্ত্রের মহড়া অনেকদিন থেকে দিয়ে আসছে, তাদের মধ্যে পার্টি-গড়া বেশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যদি এক পার্টি ঠিকমত না চলে, দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঠিকমত প্রকাশ হতে না দেয়, তা হ'লে তখনই দেশের কর্তৃত্বভার এক পার্টির হাত থেকে অন্ত পার্টির হাতে চ'লে যায়। য়ুরোপে এ রকম জিনিস হামেশাই ঘটছে, তা ত দেশের অখণ্ড সত্তা কোথায়ও চিড় খায় না, শুধু দেশের কার্যসূচী যায় বদলিয়ে।

আমাদের দেশে অবস্থাটা সে রকম নয়। একে তো ভারতবর্ষের ইতিহাসটাই হ'ল ভাঙনের ইতিহাস, তাতে জোড়ালাগার চেয়ে ভাঙনের উদাহরণ ঢের বেশি। হয়তো গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়, হয়তো বা অশোকের সময়, হয়তো বা চালুক্যদের সময় ভারতবর্ষ খানিকটা জোড়া লেগেছিল, কিন্তু তার চেয়ে ভাঙনের উদাহরণ ভারতের ইতিহাস খুঁজলে অনেক বেশি পাওয়া যাবে। আর সেই ভাঙনের পথেই শনি প্রবেশ ক'রে বার বার ভারতের ভাগ্যাকাশ অন্ধকার করেছে। এই ছিদ্রপথেই বার বার ঘটেছে ভারত-আক্রমণ। জয়চন্দ্র থেকে শুরু ক'রে মীরজাফর পর্যন্ত ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন ক'রে আসছে।

এই রকম ইতিহাস যখন আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ ক'রে আছে,

তখন ইংরেজ-সাম্রাজ্যের সময়ই আমরা খানিকটা জোড়া লাগতে পেরেছিলাম। শুধু ট্রেন মোটর এরোপ্লেনের সাহায্যে দূরবিস্তৃত অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গ'ড়ে ওঠার ফলেই যে এই জোড়-লাগা তা নয়। ইংরেজ যেমন দিল্লীর তখ্‌ত-তাউসে ব'সে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে শাসন করেছে, আমরাও তেমনই আমাদের ধ্যানে এই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের অখণ্ড সত্তা অনুভব করতে শুরু করেছি, আমরাও সারা ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছি। সেই জন্যই বহুকাল পরে আমরা যে অখণ্ড ভারতবর্ষের ঐক্য নিবিড়ভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলাম, সেটা খুব বেশি দিনের কথা নয় এবং এক হিসেবে তা ভারতের ইতিহাসেই অভিনব।

অথচ অভিনব ব'লেই এই ঐক্যের বন্ধন এখনও ভাল রকম মজবুত হয় নি, বাঁধনের জোরটা নিতান্তই কম, তার জোড়গুলি পাকারকম ঝালাই হয় নি, যে কোনও মুহূর্তেই ভেঙে পড়বার আশঙ্কা প্রবল। পূর্বে ইংরেজ-বিতাড়নের পর্বে বরং নানারকম গোলমাল চাপা পড়েছিল। ক্ষমতা ছিল না আমাদের হাতে, পরস্পরের মধ্যে চাপা মন-কষাকষি যতই থাক্ না কেন, বলা চলত—এস ভাই, আগে একসঙ্গে মিলে ইংরেজ তাড়াই, তারপর ধীরেসুস্থে এ সব মামলার ফয়সালা করা যাবে। ঘ'টেও এসেছিল তাই। নানারকম অনৈক্য আমাদের মধ্যে বেশ বেড়ে উঠছিল, আমরা সেগুলির সমাধান করবার চেষ্টা না ক'রে চাপা দিয়ে এসেছি। এখন আমাদের কাছে আর চাপা দেবার মত কোন জিনিসই নেই, কাজেই সে সমস্ত সমস্যা ফণা বিস্তার ক'রে ফোঁস ক'রে উঠছে। আমাদের মনে ভারতের অখণ্ড সত্তা যদি খুব মজবুত হয়ে গেড়ে বসত, তা হ'লে এ সব সমস্যাকে ভয় করবার কিছু ছিল না। কারণ তা হ'লে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যেত যে, এইসব সমস্যা ঝাঁপি থেকে মুখ বের ক'রে ফণা বিস্তার ক'রে যতই তর্জনগর্জন করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত এমন ছোবল দেবে না যাতে ক'রে মৃত্যু ঘটতে পারে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন অংশই এতদূর আত্মবিস্মৃত হবে না যে, স্থানীয় সমস্যায় উন্মত্ত হয়ে সারা ভারতটাকে বিপদের মুখে ঠেলে

দেবে। কিন্তু আজ যখন ইতিহাসের কথা আর বর্তমান দিনের মতিগতি ভাবি তখন মনে অহরহ আশঙ্কা জাগে যে, আমরা এতদিনের চেষ্টায় গ'ড়ে-পিটে যেটুকু ঐক্য গ'ড়ে তুলেছি তার চেয়ে ঢের বেশি অনৈক্য আমাদের মধ্যে চাপা আছে, এমন কি আর চাপাও থাকছে না। আমাদের এই মর্মঘাতী দুর্বলতা লক্ষ্য ক'রে বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> কারণ যাই হোক প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলেনি। মনে পড়ছে আমার কোন-এক লেখায় ছিল, যে জীর্ণ গাড়ির চাকাগুলো বিশ্লিষ্ট, মড়মড় ঢলঢল করে যার কোচবাক্স, জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যতক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে সেঁধে আস্তাবলে রাখা হয় ততক্ষণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা করে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাস্তায় বের করা হয় অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হ'য়ে ওঠে।···ভারতবর্ষের মুক্তি-যাত্রাপথের রথখানাকে আজ কংগ্রেস টেনে রাস্তায় বার করেছে। পলিটিক্সের দড়িবাঁধা অবস্থায় চলতে যখন শুরু করলে তখন বারে বারে দেখা গেল তার এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের আত্মীয়তার মিল নেই।—কালান্তর, পৃ. ৩৬৭-৬৮

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—

> যে জিনিসটা ঘরে বাইরে সাতটুকরো হ'য়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিত মত ক্রোধ হোক বা লোভ হোক কোন একটা প্রবৃত্তির বাহ্য বন্ধনে বেঁধে হেঁই-হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্ম তাকে নাড়ানো যায়, কিন্তু একে কি দেশদেবতার রথযাত্রা বলে? এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেকসই জিনিস?
> —কালান্তর, পৃ. ১৯৮-৯৯

সেই জন্ম কংগ্রেস থাকল কি গেল সে বিষয় সাধারণ লোকের মাথাব্যথা থাক্ আর নাই থাক্, এ কথা ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোককে ভাবতেই হবে যে, আমাদের মধ্যে এমন একটি মিলনক্ষেত্র রাখতে হবে যেখানে সারা ভারতবর্ষ এক হতে পারে। যদি আমাদের অনৈক্যটাই মর্মঘাতী হয়ে ওঠে, তা হ'লে ভারতবর্ষের

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে একটুও দেরি হবে না। সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীন এবং অখণ্ড সত্তা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিকের ভাববার এবং কাজ করবার দায়িত্ব যদি থাকে, তা হ'লে তাকে চিন্তা করতে হবে—কি সেই মিলনক্ষেত্র, যার মধ্যে ভারতবর্ষের এই অখণ্ড ও স্বাধীন সত্তা অব্যাহত রাখা যায়। যতদিন আমরা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটাতে না পারছি, যতদিন আরও গভীর ভাবে ঐক্যের ভিত্তি রচনা করতে না পারছি, ততদিন প্রাপ্ত বস্তু রক্ষার ব্যবস্থাটাও তো করতে হবে, যেটুকু ঐক্য গ'ড়ে উঠেছে সেটুকু বজায় রাখার চেষ্টা তো দরকার।

পূর্বেই বলেছি, কংগ্রেস ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে মিলনসূত্র রচনা করেছিল, সে সূত্রটি খুব মজবুত নয়—সূত্রটি ক্ষীণ এবং স্থানে স্থানে গিঁট-পাকানো। এ সূত্রের দুর্বলতা মনীষীদের চোখে বার বার ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বার বার দেশবাসীকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, গান্ধীজীও বলেছেন—গঠনকর্ম ছাড়া যদি কেবল ধ্বংসের কাজেই আমরা উন্মত্ত হয়ে থাকি, তা হ'লে সেই ভাঙনের মুখে ইংরেজ-সাম্রাজ্য হয়তো উড়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা বলতে জনগণের সুস্থ সবল প্রাণের যে আশ্বাস বোঝায় তার কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না। সেই জন্যেই দেশমাতৃকার বিজয়রথটা হৈহৈ-হৈহৈ শব্দে নড়ছিল, কিন্তু যেই ইংরেজ-বিতাড়নের বন্ধন চ'লে গিয়েছে অমনই তার বিভিন্ন অংশ খুলে পড়বার উপক্রম হয়েছে।

এ সব কথা সত্য, অত্যন্ত নিদারুণ রকম সত্য, এত বেশি রকম সত্য যে এ রকম অবস্থা বেশিদিন চলতে দিলে দেশমাতৃকার রথখানা রাস্তার মধ্যেই অচল হয়ে পড়বে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, এখন পর্যন্ত যেটুকু ক্ষীণবন্ধনসূত্র আছে তা কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অসীম ক্ষমতা। তাঁরা ইচ্ছে করলেই যে কোন প্রাদেশিক সরকারকে নানা উপায়ে জব্দ করতে পারেন, সাহায্যের টাকা দেওয়া বন্ধ করতে পারেন, খাদ্যদ্রব্য পাঠানো বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু এত অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দেখেছি, যখন কলকাতায় ১৯৪৬ সালে নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন পণ্ডিত নেহরু ভারতবর্ষের

প্রধান মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বাংলায় তাঁদের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি। সে সময় বাংলার প্রধান মন্ত্রী সুহরাওয়ার্দি সাহেব পরিষদে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি যে, তাঁরা বহু অখিল-ভারতীয় পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি সগর্বে আরও বলেছিলেন যে, তাঁরা বাংলাকে 'স্বাধীন' অর্থাৎ দিল্লীর শাসনমুক্ত করবেন। এ সবই ইদানীংকার কথা, এ সবই ঘটেছে পণ্ডিত নেহরু ভারতের প্রধান মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও। অথচ এখন আর এ রকম ঘটে না, তার কারণ কেন্দ্রের ক্ষমতা নয়, তার কারণ ভারতের সর্বত্রই কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্ট ব'লে। ধরা যাক্ আজ বাংলায় সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল, বোম্বাইয়ে সমাজতন্ত্রী সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার সাহায্য চাইছেন, বাংলা সরকার আমন্ত্রণ করছেন রুশিয়াকে, বোম্বাই সরকার প্রতিবাদ করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, এমন দৃশ্য তা হ'লে বিরল হবে না। যদি সারা ভারতবর্ষময় সমাজতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কি সাম্যবাদী সরকারে গ'ড়ে ওঠে, তা হ'লে চিন্তা করব না। কারণ তা হ'লে বোঝা যাবে সারা ভারতবর্ষের লোক এই দিকে রায় দিয়েছে, সমাজতন্ত্র কি সাম্যবাদের বন্ধনসূত্রে সে বাঁধা, তাতে আর যাই হোক, সারা ভারতবর্ষ জেনে শুনে সজ্ঞানে একটা দিকে অগ্রসর হতে পারবে। কিন্তু যাই হোক, যে কথাটা বড় সেটা হ'ল এই যে, সারা ভারতবর্ষ একসঙ্গে অগ্রসর হওয়া চাই। তা না হ'লে পরশুরাম-ক'থিত ভূশণ্ডীর মাঠের মত অবস্থা ঘটতে দেরি হবে না এবং সেই ছিদ্রপথে শনি প্রবেশ করতেও বিলম্ব ঘটবে না।

অন্য পক্ষ বলবেন, এ হ'ল ছোটছেলেকে জুজুর ভয় দেখানোর মত। যেহেতু অন্য পার্টি নেই, সেহেতু কংগ্রেসকে সমর্থন কর, তা সে ভালই হোক মন্দই হোক, এ কেমনতর কথা?

এ কথার দুটি জবাব আছে। যাঁরা কংগ্রেসের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন তাঁদের বলব, এ কথার জবাব হ'ল কংগ্রেসকে সেই রকম ক'রে গ'ড়ে তুলুন যাতে এ কথা আর উঠতে না পারে। আর যাঁরা কংগ্রেসের প্রতি একেবারেই প্রীতিসম্পন্ন নন, তাঁদের বলব, ভাল কথা, কিন্তু আপনাদের এমন পার্টি গ'ড়ে তুলতে হবে যার সামনে কংগ্রেস চুলোয় যাক কোন

ক্ষতি নেই কিন্তু সেই পার্টির বন্ধনসূত্রে সারা ভারতবর্ষ বাঁধা থাকবে। জনসাধারণের কাছে আপনাদের দায়িত্ব শুধু এইটুকু যে, এমন কোন ঘটনাই ঘটতে দেওয়া হবে না, যাতে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, কারণ তা হ'লে আমরা আবার পরবশ্যতার সম্মুখীন হব, যার সামনে অন্য সব তর্ক অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

জনসাধারণ নতুন পার্টি গড়বার চেষ্টা করুন, সেটা ভাল, কারণ গণতন্ত্রে সারাদেশ-জোড়া পার্টি কেবলমাত্র একটিই থাকবে এটা কোন কাজের কথা নয়। কংগ্রেস যদি ভাল কাজ করে তা হ'লে সে তার মধ্যেই স্বকীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে নেবে, তাতে তার প্রকৃত মূল্য, তাতেই তার পজিটিভ দাম। কিন্তু যতদিন এ রকম পার্টি গ'ড়ে না উঠছে ততদিন যদি বর্তমানের বন্ধনসূত্র কেটে যায়, তা হ'লে আমাদের মধ্যে যে ভয়াবহ অনৈক্য দেখা দেবে সে অনৈক্য একবারে মূলে আঘাত করতে পারে। এইজন্যই কংগ্রেস সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরও ভাববার কারণ আছে, অন্তত বর্তমানকালে আছে।

২

সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে আজ যখন বিচার করি, কংগ্রেস ভেঙে যাচ্ছে কি না, তখন নিরপেক্ষদৃষ্টিতে এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে কংগ্রেস আজ ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন, এমন সংকট বোধ হয় তার জীবনেই কখনও আসে নি। এ কথা বলার কারণ আছে। কংগ্রেসে ইতিপূর্বেও বহুবার সংকট দেখা দিয়েছে, সুরাট ও ত্রিপুরী দুবারই কংগ্রেসে মতবিরোধ দেশের লোকের মনে শঙ্কা জাগিয়েছিল, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও আছে। কিন্তু তবু সেসব সংকটের সঙ্গে বর্তমান সংকটের খুব গভীর তফাত আছে, এ তফাত একেবারে মৌলিক তফাত।

এই তফাতের কারণটা হ'ল, এতদিন বাইরে যে চাপ ছিল এখন আর তা নেই। সুতরাং বাইরের বাঁধনে আমরা যতটুকু বাঁধা ছিলাম আজ সে বাঁধন খ'সে পড়েছে। আগে যখনই যে কোন সংকট আসুক না কেন, একটা লক্ষ্য সকলেরই ছিল—সেটা হ'ল ইংরেজ-বিতাড়ন। এই ইংরেজ-বিতাড়নের পর্বে আমরা আমাদের বহু বিরোধ বহু সমস্যা চাপা দিয়েছি, যা আজ খুব প্রবল হয়ে উঠছে।

এই হিসেবে এই যে সংকট, যার ফলে কংগ্রেস গভীরভাবে নাড়া খাচ্ছে, এই সংকট শুধু কংগ্রেসের সংকট নয়, সমস্ত দেশেরই সংকট। জাতীয় চরিত্রে এই সংকট দেখা দেবার ফলেই শুধু কংগ্রেস কেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যেই এই সংকট দেখা দিয়েছে। কেবল কংগ্রেসের হাতে শাসনভার থাকায় তারা মার খাচ্ছে, অন্য দলের হাতে শাসনভার নেই ব'লে তারা সগর্বে বক্তৃতা করতে পারছে; কিন্তু আমরা যে ভাবে চলেছি সেই ভাবে চললে তাদের হাতে শাসনভার গেলেও তারা সেই রকমই মার খাবে।

সেইজন্য সংকট যদি সত্য সত্যই দূর করতে হয়, তা হ'লে কংগ্রেসের ধারাই যে বদলাতে হবে তা নয়, সমস্ত দেশের কার্যক্রম ও কর্মভঙ্গীটাই বদলাতে হবে। কথাটা একটু বিস্তৃত ক'রে বলার দরকার আছে। আমাদের স্বরাজসাধনা যখন আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে গণ-আন্দোলনের রূপ নিল, তখন তার প্রথম নমুনা পাওয়া গিয়েছিল বাংলা দেশের স্বদেশী-আন্দোলনে। তারপর তার চেয়ে ঢের বেশি বড় ও ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল সারা ভারতবর্ষময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে। এই আন্দোলন ক্রমে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে হতে এত বড় হয়ে উঠেছিল যে, তাতে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের ভিত আলগা হয়ে গেল। কিন্তু কি স্বদেশী-আমল, কি আগস্ট আন্দোলন, এর বিরাট ইতিহাসের মধ্যে এর মৌলিক দুর্বলতা যা গোড়ায় ছিল, তা শেষ পর্যন্ত সমান র'য়েই গেল, কোনও সংশোধন হ'ল না।

আমাদের আন্দোলনের সময় আমরা বরাবর এই কথাটাই বলেছি, আমাদের যা কিছু দুঃখ তা পরবশ্যতা থেকে, সুতরাং সকলে মিলে এই পরবশ্যতা থেকে মুক্তি পেলেই আমাদের সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। শুধু মুখে বলা নয়, আমরা কাজেও সেই জিনিসই করেছি। অর্থাৎ সকলে মিলে ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে ভাঙবার চেষ্টা করেছি, ট্যাক্স বন্ধ করেছি, থানা দখল করেছি, কাউন্সিল অচল ক'রে দিয়েছি, যাতে ইংরেজ-রাজত্বের চাকা ঘুরতে না পারে তার যতরকম ব্যবস্থা আছে সবই অবলম্বন করবার চেষ্টা করেছি। তার ফল যে ফলে নি তা নয়।

প্রত্যেক বার আন্দোলনের পর দেশের ইচ্ছাশক্তি দুর্জয় থেকে দুর্জয়তর হয়েছে, অন্যায় অত্যাচার অবিচার করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতা আমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।

কিন্তু একটা বিষয়, সেই সেকালে যেমন একালেও তেমন, আমরা বুঝবার চেষ্টা করি নি যে স্বরাজ সাধনা শুধু ভাঙনের সাধনা নয়। আমরা কি করতে চাই, সে সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মের ধারা পরিচ্ছন্নভাবে স্পষ্ট হওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-আমলে লিখেছিলেন :—

> ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে সে কি কেবল নিজের জোরে? আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র; লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনও সহজ পথ নাই। বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষাদানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কি তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না।—রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৬২৯

আমাদের দেশ কিন্তু এ পথে অগ্রসর হয় নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন শাসনকর্তাদের অধিকার আমরা ঠেলে ফেলে দেবার প্রাণপণ প্রয়াস করেছি, অন্য দিকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে কেমন ঢের বড় বড় সমস্যা আমাদের জীবনের মূলে আঘাত করছে তার দিকে কোনও নজরই দিই নি। ট্যাক্স না দেবার বেলায় সারা গ্রামের লোক একসঙ্গে মিছিল ক'রে বেরিয়েছি, চাষ করবার বেলা নয়। থানায় আগুন দেবার বেলা একত্র হয়েছি, ঘরের আগুন নেবাবার বেলা নয়। যদি সে অভ্যাস আমাদের গ'ড়ে উঠত তা হ'লে ঘরে আগুন লাগার

সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা প্রতিকারের ব্যবস্থাও করতে পারতুম, ইংরেজ সরকার যেহেতু সর্বত্র দমকলের ব্যবস্থা রাখে না, সেহেতু সে জাহান্নামে যাক—কেবল এই প্রস্তাব হাততালির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে পাস ক'রেই আমাদের চ'লে আসতে হ'ত না। প্রস্তাবটাও পাস করতে পারতুম, অথচ আগুনটাও নেবানো চলত। পরতন্ত্রতায় অবশ্য আগুন নেবানোর কাজে মধ্যে মধ্যে বাধা আসতই, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন সে বাধাকে অস্বীকার ক'রেই অগ্রসর হয়ে'ছ, এ'দিকেও তো তাই হতে পারতুম। সেইজন্য যখন অসহযোগ-আন্দোলনে দেশ উন্মত্ত, তার অভিনবত্ব ও দুর্জয় সাহস দেশের লোকের চিত্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তখনও রবীন্দ্রনাথ লিখে'ছলেন—

> আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারংবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ব'লে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি ব'লেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অ'ধক ক'রে আমরা আলোচনা ক'রে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে প'রচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি।...আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তারপরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ ক'রে প'রপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি।...যে দেশাত্মবোধী বলে 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব', তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙ করা কাঠামোটার 'পরেই।—কালান্তর, পৃ. ৩৫১-৫২

কিন্তু ভাঙনের আন্দোলনের উত্তেজনায় আমরা এত উন্মত্ত ছিলাম যে, এসব সাবধানবাণী আমাদের কানে পৌঁছায় নি। এমন কি, এই

আন্দোলনের জনক মহাত্মাজীর কথাও আমরা গ্রাহ্য করি নি। তিনি যখন এইরকম আন্দোলনের শুরু করেন, তখন এ কথা বার বার জানাতে তিনি কার্পণ্য করেন নি যে তাঁর আন্দোলনের দুটি দিক আছে—ভাঙনের দিক ও গড়নের দিক, যার মধ্যে গড়নের দিকের গুরুত্ব ভাঙনের দিকের গুরুত্বের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, বরং বেশি। বিশেষত, মহাত্মাজী যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন সে স্বাধীনতা কেতাব-কলমের পুঁথিপত্রের স্বাধীনতা নয়, সে স্বাধীনতা শুধু সমাজের উপরস্তরচারী জীবদের জন্য নয়, সে স্বাধীনতা নতুন আলো-বাতাসের মত প্রত্যন্ত কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়বে, যা প্রাণদ, যাকে চিনিয়ে দেবার কোন দরকার করে না। কাজেই ম্যাকনীল সাহেবের বদলে যেমন সাহেব সেক্রেটারি হ'লেই সে স্বাধীনতা আসবে না, এ কথা বরাবর বলতে মহাত্মাজী ত্রুটি করেন নি। তার উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব মহাত্মাজী দেশের পক্ষে খুব শ্রেয় মনে করতেন না, সুতরাং দেশের নববিধান যে রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই হতে হবে—এ কথা মহাত্মাজী স্বীকার ক'রে নেন নি। রাষ্ট্র কাজে বাধা দেবে না, কিন্তু কাজটা সারা দেশের লোকের, এ কথা তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন। এইজন্যই পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করবার কথা তিনি বলেছিলেন। এই গঠনকর্মের সূচী নিয়ে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতভেদ ছিল, রবীন্দ্রনাথের মতে এই কর্মসূচী আরও বৃহত্তর ব্যাপকতর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে কথা এখানে অবান্তর। যে কথাটা ভাববার সেটা হ'ল এই যে, মহাত্মাজীর মতে গঠনকর্ম ছাড়া কেবল ভাঙনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আসবে সে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ, খুব বেশিদূর এগোবে না।

এতদিন আমরা এই কথা গ্রাহ্য করি নি, তার কারণ, আমরা ফাঁকি দিয়েছি। গঠনকর্ম সহজ নয়, তার মধ্যে অহরহ উত্তেজনা নেই, বরং দুঃখ আছে, বেদনা আছে, একঘেয়েমি আছে। আমাদের হাতের কাছে ছিল ইংরেজ রাজত্ব, যা কিছু ঘটেছে সবই ইংরেজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমরা সহজেই দায়িত্বমুক্ত হতে চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গান্তরে আমি বলবার চেষ্টা করেছি যে, বাংলার গত মহামন্বন্তরের সময় চালের চোরাবাজার আমাদেরই দেশের লোক করেছিল, সেটা চার্চিল সাহেব

করে নি। এখনও সমাজে যে সব দুর্নীতি ও অপকার্য চ'লে আসছে তার দায়িত্ব আমাদেরই উপর। এ সব জিনিস আমরা লক্ষ্য ক'রে আসছি, কিন্তু কিছু বলি নি। আন্দোলনের সময় যে খুব কাজের লোক, অন্য সময় সে যদি ছুটো অন্যায়ও করে আমরা তার সঙ্গে রফা করেছি। শুধু তাই নয়। দেশে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সাধনায় আমরা খুব বেশি চেষ্টা করি নি, আমাদের হাতে ভার এলে আমরা স্বরাজ কি ক'রে গড়ব। অবস্থান্তরের অপেক্ষায় আমরা গঠনকর্ম অগ্রাহ্য ক'রে এসেছি।

তার ফলে দেশের ভারটা যখন আমাদের ঘাড়ে পড়ল, তখন আমরা এক হিসেবে অপ্রস্তুত ছিলাম। কথাটি শুনতে খুব শোভন নয়, কিন্তু সত্য। অর্থাৎ আমরা ইংরেজ তাড়াবার জন্য যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করতে পেরেছিলাম, দেশ গড়বার জন্য সে পরিমাণ শক্তি অর্জন করতে পারি নি। সেই জন্য যখন নানা সমস্যা আমাদের সামনে ভীড় ক'রে দাঁড়াল, সে সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের আগ্রহ হ'ল ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু সে সমস্যা-সমাধানের পথটা খুব নতুন হ'ল না। যেমন ধরা যাক্, খাদ্য সমস্যার কথা। এ সম্বন্ধে যুদ্ধের মধ্যে ইংরেজ শাসনকর্তারা ফসল বাড়ানোর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এখন খাদ্যসংকট আরও গভীর হওয়ায় পণ্ডিত নেহরু দেশের লোককে আহ্বান জানিয়েছেন সর্বপ্রযত্নে ১৯৫১ সালের মধ্যে এই সমস্যাটির সমাধান করতে। এ কথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে, লর্ড লিন্‌লিথগো এ বিষয়ে আহ্বান জানালে যা ফল হ'ত, পণ্ডিত নেহরুর আহ্বানে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ফল ফলবে। কিন্তু তার কারণ পণ্ডিত নেহরুর প্রতি আমাদের দেশের লোকের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা, আমাদের সংস্থাগত সংগঠনের চেষ্টা নয়।

কারণ, পূর্বে আমরা যে পথ অনুসরণ ক'রে এসেছি, এখনও আমরা সেই পথ অনুসরণ ক'রে আসছি। পূর্বে যেমন বক্তৃতা দিয়ে চাষীদের আহ্বান ক'রে বলতাম, ভাই সব, ট্যাক্স দিও না, এখনও তেমনি আমরা মধ্যে মধ্যে গ্রামে যাচ্ছি আর বক্তৃতা ক'রে ব'লে আসছি, ভাই সব, তোমরা ভাল বীজ দাও, সার দাও, ফসল বাড়াও, একথা পণ্ডিত নেহরু তোমাদের কাছে আবেদন করেছেন। সেইখানেই আমাদের দায়িত্ব-মুক্তি। কিন্তু শুক্‌নো কথায় ফসল যা বাড়ে সে হ'ল কথার ফসল,

কাজের ফসল নয়, মাটির ফসলও নয়। যদি সে সময় গ্রামে গ্রামে কর্মীরা ছ'ড়িয়ে প'ড়ে তখুনি চাষের বাধা দূর ক'রে দিতে পারতেন, ভাল বীজ ভাল সার সংগ্রহ ক'রে দিতে পারতেন, বাধা পেলে সেখানে সেই বাধা অতিক্রমণ করবার জন্য আবার আন্দোলন করতে দ্বিধা করতেন না, তা হ'লে বোঝা যেত ভারতবর্ষে প্রকৃত স্বাধীনতার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমি এক মহকুমা-কংগ্রেসের কথা জানি, যার কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বাংলার প্রধান মন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন, স্থানীয় ফুড অ্যাডভাইসরি কমিটী হওয়া সম্বন্ধে এক আলোচনা-সভায় মহকুমা-শাসক মহকুমার অন্য রাজনৈতিক দলদের ডেকে'ছিলেন, কিন্তু মহকুমা-কংগ্রেসকে ডাকেন নি। মহকুমা-শাসক ভাল করে'ছলেন কি মন্দ করেছিলেন সে কথা বিচার করছি না। কিন্তু কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ যদি মনে ক'রে থাকেন যে না'লিশ জানিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ, এবং সরকারী হুকুমে ফুড কমিটীতে তাঁদের প্র'তিষ্ঠা না হ'লে তাঁদের আর কিছু করবার নেই তা হ'লে বুঝতেই হবে, কংগ্রেস দেশে নিজস্ব শক্তিতে নতুন ক'রে সৃষ্টি করছে না। এবং এখানেই তার সব চেয়ে বড় বিপদ। কংগ্রেস ইংরেজ-সরকারকে বিতাড়ন করেছে আইনের তর্কে নয়। তেমনি যদি দেশের সমস্যা সমাধানের বেলায় তাকে কেবল আইনের উপরই নির্ভর করতে হয়, তা হ'লে তার চেয়ে বড় আত্মাবমাননা তার পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।

আসলে, আমরা বাইরের রাজনৈতিক আন্দোলনের আড়ালে ভিতরে ভিতরে যে ফাঁকি দিয়েছি, যে কর্মবিমুখতা দেখিয়েছি এবং কারণে অকারণে আমাদের দা'য়িত্ব অপরের উপর চাপিয়ে সহজেই নিষ্কৃতি চেয়েছি, আজ সেই দীর্ঘ দিনের মজ্জাগত অভ্যাসের ফল ফলছে। আরও দুঃখের এবং আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে, এই ফলটা শুধু যে কংগ্রেসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, এ আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে হতে একেবারে জাতীয় চরিত্রে পরিণত হতে চলেছে। কংগ্রেস যদি এই কারণে দুর্বল হয়ে থাকে, তা হ'লে যে সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের উপর খড়্গহস্ত তাঁরা এই ভুল সংশোধনের চেষ্টা করবেন এ আশা অস্বাভাবিক নয়। অথচ তার

কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আজকের দিনের বাংলার কথাই ধরি। বাংলা দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটেছে, চালের দাম চড়েছে, স্থানে স্থানে অনাহার-মৃত্যুর সংবাদ কোন কোন কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে এবং সরকার তার প্রতিবাদ করছেন। সরকারপক্ষ বলছেন, তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি নেই, তাঁরা বাইরে থেকে চাল আনাচ্ছেন, ঘাটতি অঞ্চলে চাল পাঠাচ্ছেন, গ্রামাঞ্চলে মডিফায়েড রেশনিং চালু করছেন। বিরোধীদল তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তাঁরা দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ-কমিটী করেছেন, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করেছেন এবং কলিকাতার পার্কে পার্কে সভা আহ্বান ক'রে নানা রকম বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন। আজকের সংবাদ পত্রেই (২।১০।৫০) দেখছি দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ-সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন যে, 'ফসল বাড়াও'-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভাল বণ্টন-ব্যবস্থা করতে হবে। এর সরকারী ব্যবস্থা ভাল নেই, সেজন্য বেসরকারী ব্যবস্থা চাই। এ কথা খুব ভাল কথা, কিন্তু কথার ভালমন্দতে শেষ পর্যন্ত কিছু আসে-যায় না। ফসল বাড়াতে হ'লে ভাল সার চাই, বীজ চাই, জলনিকাশ ও জলসেচন চাই, এ সব কথা প্রত্যেকেই জানে, কথাগুলি কিছু নূতন নয়। তার সঙ্গে খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থা ভাল না হ'লে দুর্ভিক্ষ হবে, এ কথা বলাও কিছু কঠিন নয়। কিন্তু যেটা কঠিন সেটা হ'ল, এই কথাটাকে কাজে পরিণত করা। আসল পরীক্ষা সেইখানে। আজ যাঁরা কংগ্রেসকে নিন্দা করেছেন কাজের বেলায় তাঁরা যদি সেই পুরনো পদ্ধতিই অবলম্বন করেন, অর্থাৎ সারাদিন হাইকোর্টে মামলা ও অন্য কাজকর্ম সেরে অবসরমত সভায় গিয়ে গুটিকতক ভাল ভাল পুঁথির কথা বলেন বা শুনে আসেন এবং সেইখানে তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল মনে করেন, তা হ'লে এই সব প্রতিষ্ঠান যেদিন ক্ষমতায় আসবেন সেদিন তাঁরাও যে এমনি ভাবেই মার খাবেন সে কথা বলতে খুব বেশি জ্যোতিষের জ্ঞানের দরকার করে না। কারণ আজ ইচ্ছার দৈন্য যতটা ঘুচেছে, কর্মের দৈন্য ঠিক সেই অনুপাতেই প্রবল হয়ে উঠছে।

আসল কথা, দেশের লোকের কাছে দেশ এখনও বুদ্ধিজগৎ বা

মনোজগৎ থেকে প্রাণজগতে উত্তীর্ণ হয় নি। আমার শরীরে আঘাত লাগলে তা যেমন যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝতে হয় না, বা ডাক্তারী বই প'ড়ে অনুভব করতে হয় না, আমার প্রিয় পরিজনের ক্ষতি হ'লে যেমন প্রাণ স্বতই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আজ সেই সজীব শরীরের বেদনা, সেই প্রাণময় অনুভূতি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই বিরাট দেশের কথা যখন ভাবি, যখন আকাঙ্ক্ষা করি এই দেশের মঙ্গল হোক, তখন সে চিন্তার পিছনে থাকে যুক্তিতর্ক, কিন্তু প্রাণের সহজ আবেগ নয়। এইটে হওয়া উচিত তাই তা করি। এটা করতে হবে, এমন কথা সব সময়ে ভাবি না। শরীর রক্ষার জন্য খাওয়া উচিত, অপেটুকদেরও তাই খেতে হয়। কিন্তু প্রাণধারণের জন্য নিশ্বাস নিতে হবে—এ কথা কাউকে ব'লে দিতে হয় না, যুক্তিতর্ক ক'রে বোঝাতেও হয় না। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল যখন সকলের কাছে নিশ্বাসগ্রহণের মতই অনিবার্য এবং অপরিহার্য হবে তখন সারা দেশকে কর্মোদ্যমে প্রচালিত করতে বেগ পেতে হবে না। কিন্তু যতদিন আমাদের দেশে সেই প্রাণশক্তি গ'ড়ে না উঠছে ততদিন সেই প্রাণশক্তি গ'ড়ে তুলবার দুর্জয় এবং দুরধিগম্য সাধনা যে রাজনৈতিক দল গ্রহণ করবেন না তাঁদের দ্বারা বক্তৃতা হতে পারে, কিন্তু কাজ হবে না। ধর্ম কি আমরা তা জানতে পারব, কিন্তু সেদিকে প্রবৃত্তি হবার কোন লক্ষণই দেখা যাবে না।

সেই জন্য আজ যদি কংগ্রেসে ভাঙন ধ'রে থাকে, তা হ'লে তার সামনে সংহতি বা অসংহতির প্রশ্নটাই খুব বড় নয়। সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল, পূর্বে যে সাধনা করলে আমরা এই সংকটের সম্মুখীন হতাম না, এই সময়েও সেই সাধনায় আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি কি না। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচীও বদলায়। আজকের দুঃখতাপজর্জর ভারতবর্ষে হয়তো আঠার দফা কর্মসূচীর বদলে ছাপান্ন দফা কর্মসূচীর প্রয়োজন হবে, সর্বতোদুঃখ বদলিয়ে সর্বতোভদ্র করতে গেলে সর্বতঃব্যাহার ডাক চাই, প্রত্যেক দিকেই নতুন কর্মোদ্যোগ চাই, কোন দিকই বাদ দিলে চলবে না। কি কর্মসূচী হবে সে কথা ভেবে চিন্তে স্থির করা হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু যে কথাটা সবচেয়ে দরকারী সেটা হ'ল যে, এই কর্মসূচী সূচীপত্র পার হয়ে সম্পূর্ণরকম কর্মে পৌঁছনো

চাই। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞের অভাব নেই, প্ল্যানও বড় কম হ'ল না, কিন্তু কি হবে তেমন প্ল্যান দিয়ে যে প্ল্যান কাজে পরিণত করা যায় না?

সুতরাং আজ যদি কংগ্রেস ভাঙে তার সব চেয়ে বড় কারণ হ'ল সংহতি-অসংহতি নয়, সে কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রেরই দুর্বলতা। যদি কথার বাঁধুনিই আমাদের একমাত্র বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায় তা হ'লে কংগ্রেস তো ভাঙবেই, কিন্তু কোন দলই গড়বে না। সকলেই খুব তথ্যসমন্বিত ভারি ভারি কথা ব'লে নিজের দায়িত্ব পালন করবে, অপরকে উপদেশ দেবে, কিন্তু তার যেটুকু করণীয় সেটুকু করবে না। এর চেয়ে ভয়াবহ সংকট আর কিছুই হতে পারে না।

গান্ধী-জন্মতিথিতে আজ এই কথাটাই স্মরণ করি।

২।১০।৫০ "দায়ভাগী"

বিজ্ঞপ্তি

এই সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি' ২২ বর্ষ সম্পূর্ণ করিল। কার্তিক হইতে নূতন বর্ষারম্ভ। আমরা স্থির করিয়াছি, আগামী বৈশাখ হইতে পত্রিকা আকারে (লম্বায় চওড়ায়) বর্ধিত হইয়া বাহির হইবে। সুতরাং বার্ষিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সডাক ছয় টাকা ও নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা করা হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও অনুপাতে বাড়িবে, বর্ধিত হার যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে। যে সকল গ্রাহকের চাঁদা এই সংখ্যার সঙ্গে ফুরাইল, তাঁহারা বার্ষিক গ্রাহক হইলে পূর্ব-মূল্যেই এক বৎসরের কাগজ পাইবেন, ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে বর্ধিত হারে চাঁদা দিতে হইবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা। যাঁহারা টাকা পাঠাইবেন না অথচ গ্রাহক থাকিবেন, অনুগ্রহপূর্বক যদি পত্র দ্বারা তাঁহারা ষাণ্মাসিক কি মাসিক গ্রাহক থাকিবেন তাহা জানান, তাহা হইলে আমরা সেইভাবে ভি. পি. করিব। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে চান না, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন, নতুবা ভি. পি. করিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব। ২৩ বর্ষ ছয় মাসেই সমাপ্ত হইবে। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে 'শনিবারের চিঠি'র ২৪ বর্ষ গণনা করা হইবে।

শনিবারের চিঠি

বৈশাখ ১৩৫৭—আশ্বিন ১৩৫৭

ষাণ্মাসিক সূচি

অভিনয়—অসিতকুমার	...	...	২৫০
আগ্রাইনা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		...	৬৬৪
আগে-পিছে—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ		...	১৫৫
আজব চিজ—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ		...	৭৭
আত্মা—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...		...	৪৮১
আষাঢ়ে গল্পের নমুনা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী		...	৬২৮
ইন্টার-ভিউ—"সব্যস্ত"	...	...	৪১১
উৎসব-দেবতা—"বনফুল"	...	...	৪৯৯
উদ্বাস্তু-সমস্যা—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়		...	৩৮৫
ওভার ডোজ—শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়		...	১৫৭
কখানা পুরানো রেকর্ড—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক		...	৬৬৩
কবিলাস—শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		...	৪৪১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার —শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি			১, ৯৭, ১৯৩, ২৮৯
কল্যাণ-সঙ্ঘ—শ্রীঅমলা দেবী			২৩, ১১৬, ২২০, ৩১০, ৪১২, ৫২৯
কালপুরুষ—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	৫০১
কোরিয়া— • —শ্রীপ্রভাত বসু	....	...	৪৪০
গঙ্গা-স্তোত্র—শ্রীশান্তি পাল	...	...	১৫৬
গোঁফে-খেজুরে ...	...	...	৫৮৪
ঘুড়ি ...	...	...	৮৭
চিন্তা বহ্নিমান—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী	...	...	৬৫১
চোর—শ্রীমনোজ বসু	...	...	৬২৫
ছাব্বিশে জানুয়ারি—"দায়ভাগী"	...	...	৪৪
ছিন্নসূত্র—শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়	...	...	৪৪৩
জটায়ুর ডানা—অসিতকুমার	...	...	৫৮১

জমি-শিকড়-আকাশ
—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার ৫৯, ১৩৬, ২৬০, ৩২৯, ৩৯৯, ৫৬১
জাতীয় ঐক্য—শ্রীনির্মলকুমার বসু ৪৯৬
টুকরি ৩২৭
ডলানি ২২, ৩৭৩
দরিদ্র-নারায়ণ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২১
দীনেন্দ্রকুমার রায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬১৬
ধামা ও ফাউণ্ড্‌ল—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ... ১৩২
নতুন ফসল ৩৪৭, ৫২৭
নিরুপায়—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ... ১৫৬
নিষ্ফলের স্বপ্ন—শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ... ২১২
নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি—শ্রীনির্মলকুমার বসু ... ৭৮
পঞ্চাশে ১৬২
পণ্ডিত—অসিতকুমার ১৩১
পুরাতনী ৪০৮
পুরাতনী : বেতাজাল—কাজী নজরুল ইসলাম ... ৪৯১
পুরাতনী : মৎস্যগন্ধার আবেদন ৪৯৩
পূজোর ছুটি—"বেতালভট্ট" ৪৫০
প্রত্যাবর্তন—শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৬৭
প্রশ্ন ৪৯৫
প্রশ্ন—অসিতকুমার ১৩৫
প্রেম-চম্পূ—শ্রীভোলা সেন ৫৭২
ফরাসী-শিক্ষক—শ্রীমতী বাণী রায় ৬৫২
ফেয়ারওয়েল—"সবুদ্ধ" ৫৫৩
বাস্তহারা—শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী ৪৩৪
বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ—শ্রীবিরূপাক্ষ ৬৩২
বিশ্বাসে মিলয়ে—শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল ... ৪৩৯
ব্যক্তি-স্বাধীনতা—শ্রীবিভূরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... ১৬৯
ব্রহ্মবান্ধবের বাংলা রচনা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৭৪

ভয় কি?—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৬৩৮
ভারতের বাণী—শ্রীঅবনীনাথ রায়	২১৩
ভালুক—অয়ু অসিতকুমার	৩৫৬
মিছুর চিঠি—শ্রীশান্তি পাল	২৭৩
মুকুন্দ মশাই—শ্রীঅমলেন্দু সেন	২৪৩
যথা বাধতি বাধতে—শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৪৮
রবীন্দ্রনাথের একটি গান শোনবার পর—অসিতকুমার ...	৪৭১
রাধা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৮
রামের দুর্মতি—শ্রীভোলা সেন	৪৫৫
শতকরা—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার	৪৬১
শুকং কাষ্ঠং—শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ...	৪৩৩
সংঘাত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২৫২
সংবাদ-সাহিত্য ...	৮৮, ১৭৭, ২৭৫, ৩৮০, ৪৭১, ৬৬৫
সংযোগী—শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫২
সন্ধানী—শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫২
সিনেমা—শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৮৫
স্টেশনে—শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	১৬৩
স্বাভাবিক দাবি—শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১১৫
স্মরণিকা—শ্রীশান্তি পাল	৫৫০
স্মরণে—শ্রীসুশীলকুমার দে	৩২৮
হয়তো—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৬৩৭
৯ই ভাদ্র ১৩৫৭—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য	৪৩৯

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০